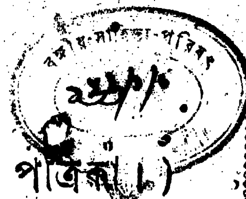


(পয়ারাদি ছন্দে [illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা।)

প্রথম বর্ষ।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"
—রঘুবংশম্।



কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—দুই পয়সা।

সুবোধিনীর নিয়মাবলী।

১। এই পত্রিকা এক ফর্ম্মা করিয়া প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে। মূল্য, অর্দ্ধ আনা মাত্র। স্বয়ং আসিয়া কিম্বা লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইলে, ডাকমাশুল লাগিবে না। মফঃস্বলে, প্রতি মাসে চারি ফর্ম্মা করিয়া এক সঙ্গে পাঠান যাইবে। সাপ্তাহিক প্রতি সংখ্যাও ডাকে পাঠান যাইতে পারে; কিন্তু, তাহা হইলে, দ্বিগুণ খরচ পড়িবে। তবে, এক গ্রামের চার পাঁচজন এক সঙ্গে লইলে, একজনের নামে পাঠান যাইতে পারে। এরূপ 'বন্দোবস্তের বিজ্ঞাপন' পাইলে, সেই মত কার্য্য করিতে পারিব।

২। বাৎসরিক, মাসিক, বা সাপ্তাহিক মূল্য, অগ্রিম দেয়। মফঃস্বলের গ্রাহকদিগের—যাঁহারা প্রতি মাসে বা প্রতিদিন কলিকাতায় আইসেন না—বাৎসরিক মূল্য (ডাকমাশুল সমেত) এক টাকা চৌদ্দ আনা, অগ্রে দিলেই সুবিধা।

৩। গ্রাহকগণ নগদ কিম্বা মনি-অর্ডরে টাকা পাঠাইবেন। অন্য প্রকারের টাকা লওয়া যাইবে না।

৪। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

৫। গ্রাহকগণের মধ্যে কেহ, কিম্বা অন্য কোনজন, যদি নিজ বিরচিত (গদ্যে বা পদ্যে) কোন প্রবন্ধ, কবিতা, উপন্যাস বা সঙ্গীত, এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি পত্রিকা বাহির হইবার, অন্ততঃ, তিন দিবস পূর্ব্বে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়

সুবোধিনী সম্পাদক।

২৯ নং, বৃন্দাবন বসাকের লেন, গরাণহাটা,

কলিকাতা।





শ্রীকালিদাস মিত্র-সম্পাদিত

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে

প্রকাশিত।



প্রথম বৎসর

প্রথম খণ্ড—সন ১২৯৭ সাল।



কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭।

বিশেষ-দ্রষ্টব্য।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের "সুবোধিনী" শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে ৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; আষাঢ় মাস হইতে আমি ইহা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশ করিতেছি;—এই জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের সুবোধিনীর সহিত আষাঢ় মাস হইতে মৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত সুবোধিনীর সংখ্যার সামঞ্জস্য নাই।

কলিকাতা,
৩২, নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
চৈত্র,—১২৯৭ সাল।

শ্রীকালিদাস মিত্র,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সুবোধিনী—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী; প্রথম বৎসর সমাপ্ত হইল। সন ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে দ্বিতীয় বৎসর আরম্ভ হইবে।

মূল্য—সুবোধিনীর দ্বিতীয় বৎসরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৷৹ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। ডাক মাশুল লাগে না।

উপহার—যাঁহারা দ্বিতীয় বৎসরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ৩খানি পুস্তক উপহার পাইবেনঃ—

১। মানস-কুসুম (কবিতা-পুস্তক) সম্পাদক-প্রণীত।
২। একটি চিত্র (উপন্যাস) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত।
৩। A VISIT TO DARJILING, BY BHOLA NATH MITTRA.

সুবোধিনী-সম্বন্ধে অভিমত।

'সুবোধিনী,' সূতিকাগারে, যখন রক্ত মাংসের ডেলার মত,—উহাকে কেহ দেখে না, ছোঁয় না, তখন আমি উহাকে নাটা ঘাঁটা করিয়াছি। এখন বেশ ডাগর ডোগর হইয়াছে, দশ জনে কোলে পীঠে করিতেছে, আমার আহ্লাদ হইবারই কথা। বালিকা হামাগুড়ি দিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে, 'মা' বলিতে 'না' বলিয়া ফেলিতেছে, যে দশ মাস দশ দিন গর্ব্ভভার বহন করিয়া, পরিশেষে দারুণ গর্ব্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সুবোধিনীকে মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছে, সেই প্রসূতি 'ব্রজবল্লভা রাধা'র কোল হইতে স্নেহময়ী কর্ত্তব্য-দীক্ষিতা ধাত্রী 'কালী'র কোলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া হাসিতেছে—উহার এরূপ সকল ভঙ্গিতেই আমার আহ্লাদ হইতেছে; আশীর্ব্বাদ করি—বালিকা যেন কলহ-প্রিয়া না হইয়া আমোদ-প্রিয়া হয়, মুখরা না হইয়া যেন সুভাষিণী হয়, আলু-থালু না হইয়া, যেন কোমলা ও সরলা হয়।

কলিকাতা,
৩০এ চৈত্র, ১২৯১।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার,
'নবজীবন'-সম্পাদক।

"সুবোধিনী; মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত। সুবোধিনী যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে; ইহার প্রবন্ধগুলি পড়িবার উপযুক্ত বটে, "প্রমদা-সুন্দর বাবু" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। এইরূপ মাসিক পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনীয়, আমরা সুবোধিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।"—বঙ্গনিবাসী, ১৪ই চৈত্র, ১২৯১ সাল।

"সুবোধিনী—মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী—বাবু কালিদাস মিত্র সম্পাদক। হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ-সম্বলিত। বঙ্গীয় স্বভাষানুরাগী পাঠকদিগের নিকট সাদরে গৃহীত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।"—সঙ্গিনী, কার্ত্তিক, ১২৯১ সাল।

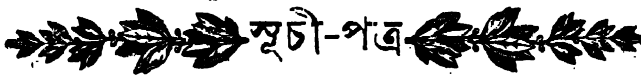


সুবোধিনী।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

শ্রীকালিদাস মিত্র-সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড—সন ১২৯৭ সাল



সূচী-পত্র

(গদ্য)

(পদ্য)

সঙ্গীত।

নমো গণেশায়।



ভূমিকা।

"ব্যসনানন্তরং সৌখ্যং স্বল্পমপ্যধিকং ভবেৎ।
কাষায় রসমাস্বাদ্য স্বাদ্বতী বাম্বুবিন্দতে॥"

আজ কাল আমাদের দেশে পুস্তক লেখা এক প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়াছে, বলিলেও চলে। যিনি একটু লিখিতে জানেন, তিনিই একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য পাঠকপুঞ্জের মনে দারুণ বিরক্তি জন্মিয়াছে; সুতরাং, কোনরূপ নূতন পুস্তক প্রচারের কথা শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলেই, স্বভাবতঃ, তাঁহাদিগের মনে তাচ্ছল্য ভাবের উদয় হয়, এবং তাহা নিতান্ত অমূলকও নহে; কারণ, যে সকল পুস্তক সচরাচর নয়ন-পথে পতিত হয়, তাহা সুরুচি-সাপেক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বরং কুরুচির পরিপোষক ও পরিবর্দ্ধক। ফলতঃ, সকল বিষয় ধরিতে হইলে, ইদানীন্তন আমাদের দেশে, গদ্যে ও পদ্যে নীতিগর্ভ ও হিতোপদেশপূর্ণ পুস্তক, উপন্যাস, এবং সকল রকমের পুস্তক, সংবাদপত্র ও পত্রিকা, এত প্রকাশ হইয়াছে যে, আর কোনরূপ কিছু প্রচারের আবশ্যক নাই, এ কথা বলিলেও, বোধ হয়, নিতান্ত অন্যায় বা অসঙ্গত হইবে না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাত্মার জীবনী-সঙ্কলনে, সুপ্রসিদ্ধ দেশমান্য সুলেখক, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, একস্থানে এইভাবে যথার্থ লিখিয়াছেন যে,—অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় এত পুস্তক লিখিত হইয়াছে যে, তজ্জন্য বাঙ্গালাভাষা বরং কিছু ভারাক্রান্ত। এরূপ স্থলে, যখন আমি "সুবোধিনী" নাম্নী এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রণয়নে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন অনেকেই—বলিতে কি, আমার 'বাতুলতা'র কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই; সুতরাং, তাঁহারা উক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাদিগের সমীপে আমার মনোভাব (অর্থাৎ কার্য্য-সূত্র) প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা কেবল খাঁটি বাঙ্গালায় পয়ারাদি ছন্দে লিখিত হইবে। কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া আমি যে এ পত্রিকা সঙ্কলন করিতেছি না, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, ঘনরাম, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র, রঘুনন্দন, রামপ্রসাদ, গোবিন্দদাস, মদনমোহন, ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন, দীনবন্ধু, দাশরথী, হেমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, রসিকচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরিমোহন, রঙ্গলাল, রাজকৃষ্ণ ও দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি কবিগণের 'কবিতাবলী' থাকিতে, আবার অন্য লোকের কবিতা প্রকাশে উদ্যম কেন?

বিষয়াবলী—উদ্দেশ্য।

মোট কথা এই,—সকলেই জানেন যে, গ্রীসদেশে, রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, ঈসপ্ নামে একজন মহাপণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া কতকগুলি মনোহর হিতোপদেশপূর্ণ "গল্প" রচনা করিয়া, জগতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী প্রভৃতি নানা য়ুরোপীয় ভাষায় ঐ সকল গল্প অনুবাদিত হইয়াছে এবং আজিও অত্যন্ত আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। কথিত আছে যে, মহামতি ঈসপ্ আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থাবলী (যে সকল এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে) হইতেই তাঁহার অনেকগুলি গল্প অনুবাদ করিয়াছিলেন। আমরা আপনাদিগের দোষেই সকল হারাইয়াছি, সোণা ফেলিয়া অঞ্চলে গিরা দিয়াছি, হীরকের পরিবর্ত্তে সানন্দে কাচ গ্রহণ করিয়াছি। দেশবিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শিক্ষা কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্ গর্ডন ইয়ঙ্ সাহেব মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে, এতদ্দেশীয় বালকগণের জন্য উক্ত পুস্তকের কতকগুলি গল্প অনুবাদ করিয়া, "কথামালা" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপরাপর পুস্তকের ন্যায় সর্ব্বজনাদৃত হইয়াছে এবং উহার দ্বারা বালকদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে। উক্ত পুস্তক যে কেবল বালকগণেরই শিক্ষোপযোগী তাহা নহে, উহা সকলেরই পাঠ করা উচিত;—সংসারে কিরূপ করিয়া চলিতে হয়, এমন অনেক বিষয় উহাতে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু, বয়োবৃদ্ধগণের জন্য, আমাদের দেশে, উক্ত ধরণের পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞবর বিষ্ণুশর্ম্মা বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ "হিতোপদেশ" অনেকটা সে অভাব পূরণ করিলেও উহা লঘুকলেবর এবং সর্ব্বজনের পাঠোপযোগী নহে; কারণ, সংস্কৃত-ভাষায় সকলের ব্যুৎপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং, দীর্ঘকলেবর, বঙ্গভাষায়, পয়ারাদি ছন্দে এরূপ পুস্তক-প্রকাশে, বোধ হয়, বিজ্ঞমাত্রেই কোনরূপ ওজর আপত্তি করিবেন না। গদ্যাপেক্ষায় পদ্যে ঐ সকল বিষয় অধিকতর বিশদ, মনোহর এবং পাঠোপযোগী হইবে বলিয়া, উহা আমি পয়ারাদি ছন্দে প্রকাশ করিতেছি। আবাল বৃদ্ধ ইহা সকলেরই পাঠোপযোগী হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ব্রতকর্ম্ম প্রভৃতি নীতি শিক্ষোপযুক্ত অনেক বিষয়ও লিখিত হইবে। 'অভিধান' বা 'পঞ্জিকা'র মত ইহা যে ঘরে ঘরে রাখা আবশ্যক, এ কথা আমি স্বয়ং বলিতে চাহি না;—সহৃদয় চিন্তাশীল পাঠকগণের উপর বিচারের ভার রহিল। ইহাতে যে কেবল মহামতি ঈসপ্ রচিত গল্প গুলিই প্রকাশিত হইবে, এমত নহে। শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টিকাব্য, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, নৈষধচরিত, দশকুমারচরিত, কাদম্বরী, শান্তিশতক, চাণক্য-শ্লোক, জ্ঞানারুণ, জ্ঞানাঙ্কুর, সমাজ-সংস্করণ, আখ্যান-মঞ্জরী, নীতিবোধ, বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, ও ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্যভাষাভিজ্ঞ সুলেখক প্রণীত যাবতীয়

নীতিগর্ভ পুস্তক হইতে এবং ইংরেজী বাঙ্গালা সংবাদপত্র-প্রকাশিত নীতিপূর্ণ প্রবন্ধ সমূহেরও সারাংশ গ্রহণ করিয়া বহুবিধ ছন্দে লিখিত হইবে। জ্যোতিষ, উপকথা, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, মহাকবি শেক্ষপীয়ার রচিত নাটকাদি, লোকমুখে প্রচলিত হিতোপদেশপূর্ণ গল্প, রহস্য এবং গোপাল ভাঁড়ের ব্যঙ্গ ও বুদ্ধির কাহিনী (যে গুলি কখন মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই) সে গুলি ইহাতে বহুবিধ ছন্দে প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ, রোম, গ্রীস ও ইংলণ্ডের ইতিহাস, প্রাকৃতিক ভূগোল-বিবরণ, এবং আয়ুর্ব্বেদ হইতে রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা-প্রণালী, ঔষধ প্রস্তুত করণ, দ্রব্যগুণ ও বহুবিধ মুষ্টিযোগ, সহজে লোকের স্মৃতিপথে স্থায়ী করণার্থে, পয়ারাদি ছন্দে সঙ্কলিত হইবে। ধর্ম্মের জয়, পাপের পতন, ইত্যাদি বিষয় লইয়া অনেক সত্য ঘটনাও বর্ণিত হইবে। খলচরিত্র, সাধুচরিত্র, মূর্খচরিত্র, ধন, বুদ্ধিমান্ চরিত্র, ললাট-লিপি, লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, হিংসা, সত্য, সৌভ্রাত্র, সংসর্গ, বিবাহ, বিদ্যা, বাণিজ্য, জ্ঞান, দয়া, নম্রতা, একতা, ক্ষমা, মোকদ্দমা, মিত্রতা, সুখ দুঃখ, পিতৃমাতৃভক্তি, পরোপকার, পরনিন্দা, প্রণয়, পরিশ্রম, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই প্রবন্ধ এবং গল্প থাকিবে। কথোপকথন সময়ে, যে সকল সাধারণ কথা (প্রবাদ) আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, সকলে সবগুলি জানিবে, এতদভিপ্রায়ে ইহাতে সাধ্যমতে বর্ণ-মালানুসারে প্রকাশিত হইবে; পাঠকগণ তৎপাঠে বিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। বঙ্গের অনেক সুলেখকগণের—যাঁহারা মাতৃভাষার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—পুস্তক ও পত্রিকা হইতে অনেক নীতিপূর্ণ প্রবন্ধের (প্রায় তাঁহাদিগের কথা বজায় রাখিয়া) গদ্য হইতে পদ্যে পরিণতি হইয়াছে। ফলতঃ, এক খানি পুস্তক ঘরে রাখিলে যে, বহুবিধ পুস্তক-সমূহের অভাব পরিপূরণ হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন, ইহাতে শ্যামা, হরি, কৃষ্ণ, রামচন্দ্র, ঈশ্বর, ও প্রেম-বিষয়ক নানা রাগ-রাগিণী সম্বলিত হৃদয়হারী সঙ্গীত ও কৌতুকপূর্ণ প্রহেলিকা (হেঁয়ালি) সুধীগণের মনোরঞ্জনার্থে প্রকটিত হইবে। সুতরাং, ইহা যে 'সাহিত্য' শিখিবার বিশেষ উপযোগী হইবে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। 'সঙ্গীত' থাকিবে বলিয়া, ইহা যে 'সাহিত্য' নহে, কেহই এমন কথা বলিতে পারেন না। "সকল ভাষাতেই সঙ্গীত হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি"—সুবিজ্ঞ 'নবজীবন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্বর্গীয় মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের জীবনী-সঙ্কলনে, এ কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। বালকদিগের চরিত্র-গঠনে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি-প্রদানে, দুশ্চিন্তা দূরীকরণে, পরিশ্রমান্তে সকলের মনে সুখ সঞ্চারণে, বালকদিগের তুষ্টি সম্পাদনে, যুবকদিগকে সুনীতি প্রদর্শনে, বৃদ্ধদিগের তত্ত্বকথায় মনস্তুষ্টিকরণে, স্ত্রীলোকদিগকে পিতৃ মাতৃ-পতিভক্তি ও গৃহস্থালী শিক্ষা প্রদানে, অলসকে পরিশ্রমী করণে, নিরানন্দের আনন্দ সঞ্চারণে, সাধুর চিত্তরঞ্জনে, শোকীর শোকনিবারণে এবং বিপথগামী নরনারী-গণের চরিত্র সংশোধনে, ইহা বিশেষ উপযোগী হইবে। সকল রকমে হিতোপদেশ দ্বারা সুধীগণের মনোরঞ্জন করা যখন পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন সুকবি-প্রসূত সুমধুর সঙ্গীত, কবিতা বা প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া, ইহাতে যে সন্নিবেশিত হইবে না, এমত নহে।

আর এই পত্রিকায়, পাঠকগণকে আমার স্বর্গীয় পিতৃ-বিরচিত কতকগুলি খাঁটী বাঙ্গালায় গীত, কবিতা ও প্রবন্ধ—যাহা তাঁহার জীবদ্দশায় মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই—উপহার দিব। মনুষ্য-সমাজ পাপ-পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া, সুখ-সাগরে সন্তরণ করিবে, ইহাই পত্রিকার মর্ম্ম; কিন্তু, সে উদ্দেশ্য যে কতদূর সাধিত হইবে, সুধীগণ তাহার মীমাংসা করিবেন, ইহাতেই আমি আশ্বাসিত রহিলাম।

কাব্যরস—সকল কবিই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে,—"পৃথিবীতে কাব্য-রসাস্বাদনের মত আর সুখ নাই; এ রসে রসিক হইলে, লোকে অন্য রস ভুলিয়া যায়।" কোন কবি কোন স্থানে লিখিয়াছেন যে,—"ধনলাভে কৃপণের যত আনন্দ না হয়, কাব্যরস পানে সুধীগণের তত আনন্দ হয়।" অপর কোন কবি লিখিয়াছেন যে,—"সংসারে কেবল মাত্র চারিটি সুখের সামগ্রী আছে;—প্রথম, ধন; দ্বিতীয়, অকপট মিত্রতা; তৃতীয়, সাধুসঙ্গ; চতুর্থ, কাব্যরস। 'ধন,' 'অকপট-মিত্রতা,' 'সাধুসঙ্গ,' সকল গুলিই যে সুখকর, তাহা কে না স্বীকার করিবে? বিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ধনা-পেক্ষা, কাব্যরসপান যে অধিক সন্তোষদায়ক, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। অনাহারী ভিক্ষুককেও কাব্যরসপানে তৃপ্তিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং, কাব্য-রসপান যে অতীব সুখপ্রদ, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই রসে বিভোর হইলে, লোকের অন্য রসাস্বাদনের ইচ্ছা তাদৃশ বলবতী থাকে না; যাহা থাকে, ক্রমে, তাহাও লোপ পাইয়া যায়। এই রসে সকলেই অভিষিক্ত হইয়া, দুর্ব্বিষহ সংসা-রের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া, শোক দুঃখ ও পরিশ্রম বিস্মৃত হইয়া, ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, নম্রতা-নৌকারোহণে যশোনদী পার হইয়া, জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া, পাঠক-পুঞ্জ সুখ-স্বর্গে গমন করেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। যদিও বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া আমাদিগের মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছল্য ভাব জন্মিয়াছে, যদিও আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সকলই পরিত্যাগ করিতেছি, যদিও আমরা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করণান্তর, পরাধীনতার শৃঙ্খল পরি-ধান-পূর্ব্বক দুঃখ-সাগরে নিয়ত নিমজ্জিত হইতেছি, যদিও অদৃষ্টদোষে আমাদিগের সকল রকম হীনবস্থা ঘটিয়াছে; কিন্তু, আমরা ত, কেহই ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া যাই নাই—মাতৃভাষার প্রতি আমাদিগের কেন হতাদর থাকিবে? আইস ভ্রাতৃগণ, আমরা সকলে 'মাতৃভাষা'র উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হই; পূর্ব্বপুরুষদিগের মতানুযায়ী স্ত্রীলোক-দিগকে রীতিনীতি শিক্ষা প্রদান করি; হিন্দুশাস্ত্রমতে বালকদিগের চরিত্র-গঠনে প্রবৃত্ত হই; কেহ কাহারও প্রতি আর শত্রুতা সাধিব না; ভ্রমেও কাহারও অনিষ্ট করিব না; ঘরের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; কাহারও মনে কষ্ট দিব না; কাহারও নিন্দা-বাদে কখনও প্রবৃত্ত হইব না; পিতামাতার প্রতি অচলা ভক্তি রাখিব; সহোদরগণের সহিত সদ্ভাবে থাকিব; পরোপকার মহাব্রতে ব্রতী হইব; না বুঝিয়া কেহ দোষ করিলে, তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিব; প্রতিবেশিগণের সহিত পরস্পর প্রেম-পাশে আবদ্ধ থাকিব; কেহ

বিপদে পড়িলে, প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব; পিতৃমাতৃহীন শিশুর ক্রন্দন শুনিব; সাধ্যানুসারে দরিদ্রদিগের দুর্গতি দূর করিতে চেষ্টা করিব; শত্রুকে ক্ষমা করিব; রিপুকুলের এককালে ধ্বংস করিব; দলাদলী-রাক্ষসীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব; কেহ বিপথগামী হইলে, তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিব; মোকদ্দমা-পিশাচকে 'ধনঞ্জয়'-মন্ত্রে দীক্ষিত করিব; তাহা হইলে, আমরা আবার সুখী হইব—"ভারত-লক্ষ্মী" আবার ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইবেন।

প্রার্থনা।

রচনা সম্বন্ধে—শুদ্ধ সাধুভাষায় রচনা করিলে, রচনা সুমধুর বা সুললিত হয় না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আবার চলিত কথায় লিখিলেও অনেক সময়ে 'গ্রাম্যতা' ও 'অশ্লীলতা' দোষ আসিয়া পড়ে। এই উভয়-সঙ্কটে অনেক কবিকেই পড়িতে হইয়াছে। যখন ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, প্রভৃতি সুকবিগণ উক্ত দোষে দূষিত হইয়াছেন, তখন, আমার মতন লোক উক্ত দোষশূন্য রচনা করিবে, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না; বিশেষতঃ, যখন আবার ইহাতে সকল 'রসেরই' সঙ্গীত, কবিতা ও প্রবন্ধ থাকিবে—কেননা, ইহা সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত—তখন, ছলগ্রাহী ও ছিদ্রান্বেষিগণ শতমুখে নিন্দাবাদ করিতে থাকিবে। কিন্তু তাহাদের নিন্দাবাদের জন্য, আমি কোন শঙ্কা করি না; কারণ, আমি জানি যে, বিজ্ঞগণ আপনার বুদ্ধিতেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বিজ্ঞগণ পরের বুদ্ধিতে কার্য্য করেন, ইহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া,' যে একটি প্রবাদ আছে, সেটি নিঃসন্দেহই মূর্খ সম্বন্ধে। সাধু যাহাতে গুণ দেখেন, খল তাহাতে দোষ দেখে—শিশু যে স্তন চুষিয়া পীযূষ বাহির করে, জলৌকা (জোঁক) সেই স্তন চুষিয়াই আবার রুধির বাহির করিয়া থাকে। যত দিন মুদ্রাঙ্কন কার্য্য প্রচলিত হইয়াছে, কোন লেখকই পুস্তক রচনা করিয়া, নিন্দুক-হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। আমি জগৎ ছাড়া লোক নহি; আমি নিন্দুক-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, এমন অসম্ভব আশা করিতে পারি না। সুধীগণ সমীপে আমার সানুনয় নিবেদন যে, আমি অতি স্বল্পমতি; সুতরাং, এবম্বিধ কঠিন কার্য্যে মাদৃশ জনের কৃতকার্য্য হওয়া, দুরাশা মাত্র। তবে, আপনারা নিজ নিজ ক্ষমাগুণে এই পত্রিকার দোষভাগ পরিহার-পূর্ব্বক গুণ-কণা গ্রহণ করিয়া 'কর্ণভূষণ' করিলে, আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত জ্ঞান করিব।

আর দুই একটি কথা বলিয়াই ভূমিকা সম্পূর্ণ করিব। আমার স্বর্গীয় পিতৃ-অনুবাদিত (মূল সমেত) চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ উপকারী মহর্ষি অগ্নিবেশ কৃত "অঞ্জন" নামক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ (যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে); তৎপ্রণীত স্ত্রীলোকদিগের জন্য পয়ারাদি ছন্দে লিখিত "শিশু পালন"; দেশহিতৈষী সুবিজ্ঞ 'নবজীবন' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত-জীবনী; মৎপ্রণীত "তিলোত্তমা" নামক সামা-

জিক উপন্যাস; সুবিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী (জীবিত বা মৃত) মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত-জীবনী এবং পুস্তকাদির সমালোচনা, পাঠকবৃন্দের অভিমতানুসারে ইহাতে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প রহিল। সূচনা-কল্পনা ভঙ্গাশঙ্কায় এ কথা অগ্রে বলিয়া রাখিলাম।

পাঠকবৃন্দের নিকটে আমার আর একটি বিশেষ নিবেদন আছে। যদ্যপি কেহ তাঁহার জানিত কোন হিতোপদেশপূর্ণ "গল্প" এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া, সংক্ষেপে, সেই গল্পটি গদ্যে লিখিয়া, আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে, উহা আমি পয়ারাদি ছন্দে পরিবর্তিত করিয়া, পর সংখ্যাতেই প্রকাশ করিব। এইরূপ করিলে, পত্রিকার কলেবর আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং তদ্দারা দেশের হিতসাধিত হইবে। যাঁহারা স্বয়ং পয়ারাদি ছন্দে লিখিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারা লিখিয়া পাঠাইলে, সাদরে গ্রহণ করিয়া, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম দিয়া, পত্রিকা মধ্যে প্রকাশ করিব। নীতিগর্ভ প্রবন্ধ, গদ্যে বিরচিত হইলেও, ইহাতে প্রকাশ করিবার আপত্তি নাই।

উপসংহার।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, সুবিখ্যাত সুবিজ্ঞ 'নবজীবন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় নিজগুণে কৃপা করিয়া, তাঁহার বহুমূল্য সময় ক্ষতি করিয়া, আমার অধিকাংশ প্রবন্ধগুলির ভ্রম সংশোধন করিয়া না দিলে, আমি সুধীগণ সমক্ষে সেইগুলি প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতাম না। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এরূপ পরোপকার-ব্রতে ব্রতী থাকুন, ঈশ্বরের কাছে, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আর, আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অমায়িকতাগুণে এই পত্রিকার "প্রুফ্"-সংশোধন করিয়া, এবং ভবিষ্যতে করিবার আশা দিয়া, প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; তজ্জন্য, তাঁহার নিকট আজীবন্ কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিলাম। তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্য, তাঁহাকে আমি অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করি।

"নিগুর্ণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।"

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, সন ১২৯৭ সাল।

বিনয়াবনত—
শ্রীব্রজবল্লভ রায়
সম্পাদক।



১ম খণ্ড।] [২ সংখ্যা।



উৎসর্গ পত্র।

(পিতৃ-জীবদ্দশায় লিখিত)

স্বধর্ম্মনিরতাবিরতসৎকার্য্যপরায়ণ বিবিধগুণৈকনিলয় ভক্তিভাজন
পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র রায়
পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

"যথা দেবায় তদ্বস্তু, আত্মনস্তুষ্টয়ে নরৈঃ।
ভবতা শিক্ষিতং পদ্যং, ভবতেঽপি প্রদীয়তে॥"

বহু যত্নে করি এই সংসার-দর্পণ,
আজি তব করে পিতঃ, করিনু অর্পণ।
অপার রচনা-শক্তি আপনার আছে।
যা কিছু করেছি শিক্ষা আপনারি কাছে,
তব শক্তি পেয়ে কিছু লিখেছি এ সব,
গৌরব আমার নহে, তোমারি গৌরব।
'রচনা কঠিন হয় বিশুদ্ধ ভাষায়,—
মনোগত ভাব ভাল প্রকাশ না পায়;
চলিত কথায় লেখা অতি সুললিত,
পাঠ করি মনঃপ্রাণ হয় পুলকিত'—
শুনেছিনু এই কথা আপনার কাছে,
তদবধি মনেতে ধারণা মোর আছে।
গল্পচ্ছলে উপদেশে তুষিতে সবায়,
সাধ্যমতে লিখিয়াছি চলিত কথায়।
কিয়দংশে অভিপ্রায় সিদ্ধ যদি হয়,
শ্রমের সার্থক তবে হইবে নিশ্চয়।
কিন্তু তাহে দেখিতেছি বহু বিড়ম্বনা—
হিংসা করি কুচ্ছা গা'বে যত খল জনা।
পুস্তক লিখিলে কেহ, শত্রু কত তার,
কেমনে সুফল মোর ফলিবে আশার?
দোষ-শূন্য গ্রন্থ কেহ করিলে রচনা,
তবু এসে খোঁচা তাহে দেয় খল জনা!
নাশিবারে খলের হইলে অস্ত্রাভাব,
হাতে মাথা কেটে বসে এমনি স্বভাব!
লিখিয়াছি খলের চরিত্র সবিস্তরে,
ভয়, পাছে সেই খলে ঘাড়ে চেপে ধরে!
ভুজঙ্গ যেমন করি অমৃত ভোজন,
করে থাকে ওগো পিতঃ, বিষ উদ্গীরণ;
নিন্দুক দেখিয়া গুণ, দোষ ব্যাখ্যা করে,
চিরকাল এই প্রথা জগত ভিতরে।
এইরূপ সর্ব্ব স্থানে আরো দেখা যায়,
পরের গৌরব হরে নিন্দুক হিংসায়।

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

মিথ্যা অপবাদ দিয়া হাস্থক যে হাসে,
নিন্দুকের নিন্দাবাদে কিবা যায় আসে।
নীর ত্যজি ক্ষীর খায় মরাল যেমন—
দোষ ত্যজি গুণ সাধু করেন গ্রহণ।
লবণাক্ত সিন্ধুনীর করিয়া শোষণ,
নীরধর সুধা-বারি করে বরিষণ—
তদ্রূপ, সজ্জনগণ হেরিলেও দোষ,
গুণপক্ষপাতী হয়ে পান পরিতোষ।
ধন হ'লে সবাকার হয় দস্যুভয়,
তা বলে নির্ধন হ'তে ইচ্ছা কার হয়?
চিরকাল খল আছে, নহে ত নূতন,
তা বলে কি ছাড়ে লোকে পুস্তক রচন?
যা আছে কপালে মোর অবশ্য ঘটিবে,
অবশ্য আপন ধর্ম্ম খল আচরিবে।
নিজ গায়ে হাত দিয়া কথা কহে যেই,
পরের নিন্দায় কভু নাহি থাকে সেই।
ধন অপহারী যেই চোর সে ত নয়,
মান অপহারী যেই, সেই চোর হয়।
ধন গেলে পুনঃ হয় ধন উপার্জ্জন,
একবার মান গেলে হয় কি কখন।
চোর যেই চুরি করে পালে পরিবার,
বুঝিলাম ধনে হ'ল উপকার তার;
কিন্তু যেই জন পিতঃ, যশ অপহারী,
তার কিবা উপকার বুঝিতে না পারি।
যে যশ হরণ করে, সে যদি তা পায়,
যুক্তিযুক্ত কার্য্য তার সন্দেহ কি তায়।
আপনার উপকার কিছু যাহে নাই,
সে কায করে সে কেন?—মনে ভাবি তাই!
'সুবোধিনী' সবাকার সুবোধিনী হয়,
ইহাই কামনা মোর অন্য কিছু নয়।
সাদরে প্রদান করি ভক্তি উপহার,
জীবন সার্থক আজি হইল আমার।

—*—

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

"নমস্যামো দেবান্‌নন্নু হতবিধেস্তেঽপিবশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপিপ্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥"
—শান্তি শতকম্।

শ্রীশ্রীদুর্গা বন্দনা।

অপর্ণা, অভয়া, জয়া, ঈশানী, ইন্দ্রাণী,
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, বামা, শঙ্করী, শর্ব্বাণী।
দুর্গতি-নাশিনী, দুর্গা, চণ্ডী, মহেশ্বরী,
দয়াময়ী, দাক্ষায়ণী, শ্যামা, শুভঙ্করী।
ত্রিনয়নী, চতুর্ভুজা, শিব-সীমন্তিনী,
জগত-জননী, সতী, কলুষ-নাশিনী।
মহাকালী, রাজলক্ষ্মী, রমা, রাসেশ্বরী,
ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, হরা, শাকম্ভরী।
বিশ্বোদরী, কাশীশ্বরী, কুলকুণ্ডলিনী,
অনন্ত-রূপিণী, দেবী, নৃমুণ্ড-মালিনী।
রাজরাজেশ্বরী, কালী, সারদা, বরদা,
মহিষ-মর্দ্দিনী, গৌরী, শুভদা, সুখদা।
অন্নপূর্ণা, শবাসনা, ধূমী, নিস্তারিণী,
মহামেঘপ্রভা, ভীমা, ত্রিতাপহারিণী।
মহামায়া, উগ্রচণ্ডা, বগলা, মোক্ষদা,
মুক্তকেশী, ক্ষেমঙ্করী, ভবানী, অন্নদা।
বিশ্বেশ্বরী, পার্ব্বতী, তারিণী, নারায়ণী,
দনুজ-দলনী, তারা, শিবা, কাত্যায়নী।
বরাভয়-করাম্বুজা, করাল-বদনা,
দিগম্বরী, কপালিনী, বিকট-দশনা।
ভগবতী, মহাশক্তি, কামাখ্যা রুদ্রাণী,
ত্রিলোক-পালিনী, ভবতারিণী, হররাণী।

ত্রৈলোক্য-মোহিনি ! তব মহিমা অপার,
বর্ণিবারে বল মাগো, সাধ্য আছে কার !
এ সংসারে আসিয়া মা, তোমারে ভুলিয়া,
ই ষ্টানিষ্ট না বুঝিনু মায়ায় মজিয়া ।
প দে পদে বিপদেতে জড়িত জননি,
যা' ব ভবসিন্ধু-পারে দেহ মা তরণী ।
র মণীয় বেশে আসে আশা কুহকিনী,
টি কিতে সংসারে নাহি দেয় সে পাপিনী !
শ্রী হীন সন্তান আমি ধরি তব পদে,
রা খ মা, চরণ-তলে পড়েছি বিপদে ।
ধা বিতেছি অনুক্ষণ বৃথা সুখ-আশে,
জী বন বিফলে গেল, পড়ি মায়াপাশে ।
ব শীভূত এক দণ্ড হ'ল না'ক মন,
ন রক-যন্ত্রণা কিসে হ'বে নিবারণ ।
রা জীব চরণে তব নমস্কার করি,
য দি মাগো, কৃপা কর তবে যাই তরি ।
বি শেষ বিপক্ষ মাতঃ, হয়ে রিপুকুল,
র ণ করি আমা সনে হানে দুঃখ-শূল ।
চি দাকাশে সুখ-সূর্য্য উদিতে না পায়,
ত ব কৃপা না থাকিলে কি সুখ ধরায় ।





শ্রীশ্রীসরস্বতী বন্দনা ।

—:*:—

"বীণা-রঞ্জিত-পুস্তক-হস্তে ।
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে ॥"

—:*:—

বীণাপাণি, বাগীশ্বরি, বিদ্যা-প্রদায়িনি,
শ্রীচরণে স্থান দেহ সরোজ-বাসিনি ।
শ্বেত-পদ্মাসনা, অঙ্গে শোভে শ্বেতাম্বর,
শ্বেত-পুষ্পে সুশোভিতা, কিবা মনোহর ।
আমি অতি মূঢ়মতি কিছুই না জানি,
কেমনে তোমার স্তব করিব মা বাণি !
যোগীঋষিগণ নারে বুঝিতে মহিমা,
জ্ঞানহীন আমি তার কি করিব সীমা ।
রস দান কর বসি রসনার মূলে,
তোমার বন্দনা দেবি, করি মন খুলে ।
বিদ্যাধন বিবর্জ্জিত আমি লঘু প্রাণী,
করুণা-কাঙ্গালী তব করি যোড়পাণি ।
কোথা পা'ব কাব্য-রস ?—শূন্য এই ঘটে
ঘটাও জননি যদি, তবে সব ঘটে ।

ঘটনা-ঘটকত্রী তুমি পূর্ণ কর ঘট,
তব কৃপা বিনা দেখি সকলি দুর্ঘট।
পান ইচ্ছা, সুকবিতা-কমলের মধু,
দেহ দাসে নারায়ণি, মাধবের বধু!
সুবিখ্যাত হয় জীব তোমার কৃপায়,
তুমি যারে রুষ্ট তার সবে দোষ গায়।
তব কৃপা না থাকিলে হেয় হয় ধনী,
দরিদ্র কৃপায় তব জগতের মণি।
চিরকাল দুঃখ পায় যারে প্রতিকূল,
যাহারা বিখ্যাত ভবে তুমি তার মূল।
ভদ্রশীল, ভরদ্বাজ, গৌতম, হারীত,
বৈজবাপ, শরলোমা, শুক, পরীক্ষিত।
বামদেব, বিশ্বামিত্র, চৈতন্য, চ্যবন,
বৈখানস, বৃহস্পতি, আর কাত্যায়ন।
যজ্ঞমালী, যাজ্ঞবল্ক্য, কাম্য, কপিঞ্জল,
পুলস্ত্য, অগস্ত্য, দক্ষ, উশনা, দেবল।
মরীচি, মৈত্রেয়, মনু, গোভিল, গালব,
বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিষ্ণু, পুলহ, ভার্গব।
ভৃগু, বাদরায়ণ, জৈমিনী, মার্কণ্ডেয়,
সাঙ্কৃতি, শৌনক, শাতাতপ, শাকুনেয়।
লোকাক্ষি, লিখিত, ধৌম্য, অঙ্গিরা, কৌণ্ডিল্য,
হিরণ্যাক্ষ, জমদগ্নি, সম্বর্ত্ত, শাণ্ডিল্য।
মৎস্যকর্ণ, ঋষ্যশৃঙ্গ, দধীচি, কশ্যপ,
বিশ্বশ্রবা, বিভাণ্ডক, বিশ্রবা, কাশ্যপ।
সিন্ধু, বৈশম্পায়ন, শরভূ, শরভঙ্গ,
কুশধ্বজ, চিত্রবিক, উতঙ্ক, মাতঙ্গ।
দুর্ব্বাসা, সুবর্ণ, জহ্নু, যম, কাঙ্কায়ণ,
অত্রি, অশ্বালায়ন, আস্তিক, সঙ্গোপন।
ঐষিক, জরৎকারু, অসিত, অন্ধক,
কপিল, কুশিক, কণ্ব, গর্গ, উদ্দালক।
শতানন্দ, সৌতি, শৃঙ্গী, শাণ্ডা, সনাতন,
আপস্তম্ব, গার্গ্য, আর বালখিল্যগণ।
নারদ, নানক, ক্রতু, ত্বষ্টা, পরাশর,
পাতঞ্জল, প্রচেতাদি, বিদ্যার সাগর।
অষ্টাবক্র, মাণ্ডব্য, সনক, সান্দীপনি,
শাক্যসিংহ, ধন্বন্তরি কবিরাজ-মণি।
ক্ষপণক, বররুচি, বরাহমিহির,
ভবভূতি, শঙ্কু, ঘটকর্পর, কবীর,
সনন্দ, শঙ্করাচার্য্য, ধরি কত ক'ব,
জগতে বিখ্যাত এত পেয়ে কৃপা তব।
কবিকুলচূড়ামণি, মূর্খ কালিদাস!
তোমারি কৃপায় তাঁর পূরিয়াছে আশ।
চাণক্য, তুলসীদাস, জয়দেব আর,
পূরায়েছ মনোবাঞ্ছা তুমিই সবার।
যে তোমারে বাঁধে, তার বাড়াও সম্মান,
যে না বাঁধে, মানী হ'লে হয় তার মান।
সাধ্যমতে সেবিতেছি তব শ্রীচরণ,
কণ্ঠের উপরে মোর লও মা আসন।
না বুঝে হয়েছি আশু কবিতা লিখিতে,
যেতেছি অগাধ জলে ভাসিতে ভাসিতে—
অপার এ সাগরে মা, তুমি মাত্র কূল,
কৃপা করি দাস প্রতি হও অনুকূল।
করুণা-পবনে করি তমো মেঘ নাশ,
হৃদয়-আকাশে কর, জ্ঞানেন্দু প্রকাশ;
তবে ত পূরিবে মাগো, বাসনা আমার,
নতুবা, হইবে শুধু পরিশ্রম সার।
গগন-উদ্যানে ফুটে কবিতা-কুসুম,
বামন হইয়া করি পড়িবারে ধুম!
পঙ্গু হয়ে ইচ্ছা মোর গিরির লঙ্ঘন,
কেমনে আমার আশা হইবে পূরণ।
ক্ষমতা অতীত কার্য্য করিবারে যাই,
উপহাস পা'ব ইথে সন্দেহ ত নাই।
মুখ তুলি বারেক তাকাও তুমি যদি,
অনায়াসে পার হই অকূল এ নদী।
হীনবুদ্ধি হয়ে মাগো, কবিযশঃকামী!
শ্রীপদ-পঙ্কজে ঠাঁই পাই যেন আমি।

"করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥"

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥"

—::*::—

আশা।

—:*:—

জগতে মানব যত আশাধীন হয়,
ধন, প্রাণ, পরলোক, অন্বেষণে রয়।
যাহার মনেতে নাহি আশার সঞ্চার,
শ্মশান তাহার জ্ঞান হয় এ সংসার।
একই চন্দ্রমা আশা জীবন-আকাশে—
মনঃ অন্ধকার আশা কটাক্ষেতে নাশে।
আশাহীন হ'লে লোকে কষ্ট পায় কত,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তার পশুদের মত।
জীবন উপরে তার আস্থা নাহি থাকে,
সংসারে সর্ব্বদা যেন রয়েছে বিপাকে।
আশা-নিষ্ফলতা হেতু আত্মহত্যা করে,
মনে আশা করে দেখ সবে ঘুরে মরে।
আশার হিল্লোল নাহি মনেতে যাহার,
জগতের কিছু ভাল নাহি লাগে তার,
বসন্ত-কুসুম আর শরদিন্দু-শোভা,
চক্ষুঃশূল তার কাছে, নহে মনলোভা।
পুনঃ অন্তরেতে হ'লে আশার উদয়,
প্রকৃতি দেবীর ছবি কত সুখময়!
কতই উদ্যম মনে কত অভিলাষ,
হাস্য মুখে সদা করে আনন্দ প্রকাশ।
উন্নতি সাধনে চেষ্টা সর্ব্বদা এখন,
সংসার ছাড়িতে আর নাহি যায় মন।
তেজস্বীর তেজঃ, আশা সাহসীর বল,
আশার সমান কিছু নাহিক সম্বল।
চিন্তারে প্রসূতি বলি জানি এ আশার,
উদ্যমশীলতা হয় সহচরী তার।
চিন্তামাত্র আশা-মাতা কভু নাহি হয়,
আশামাত্রে কিন্তু চিন্তা মূলভাবে রয়।
বাঞ্ছিত বস্তুর ছবি অগ্রে আঁকি মনে,
কেমনে পাইব তাহা ভাবি পরক্ষণে;
তদন্তে, মনেতে হয় আশার সঞ্চার,
চিন্তার সহিত তাহা বাড়ে অনিবার।
সহচরী-শূন্যা আশা নহে বলবতী,
ফল প্রসাধনে তার না হয় শকতি।
উদ্যমশীলতা যদি সাহায্য করিল,
ক্রমে আশা বলবতী হইতে লাগিল।
বল পেয়ে আশা-লতা আপনার মূলে,
অচিরে সজ্জিতা হয় নানা ফল ফুলে!
কিন্তু এই ফল নাহি একরূপ হয়,
বিষে ভরা, কভু কটু, কভু মধুময়।
কি কারণে করে আশা কুফল প্রসব?
কি হেতু সর্ব্বদা নহে সুফল সম্ভব?
প্রসূতির হ'তে পারে দোষ প্রথমতঃ,
সহচরী দোষী হ'তে পারে দ্বিতীয়তঃ;
অথবা, হইতে দোষ উভয়ের পারে,
নতুবা, কুফল আশা প্রসবিতে নারে।
দোষাশ্লিষ্টা হ'লে চিন্তা (আশা-প্রসবিনী)
জন্ম দোষে হয় আশা কুফল-দায়িনী।
বিষ-বীজ-জাত বৃক্ষে ফলে কি সুফল?
কুচিন্তা-প্রসূত আশা আনয়ে কুফল।
মনঃ-ক্ষেত্রে, চিন্তা নাহি বদ্ধ মূল হ'লে,
বিলীন হইয়া যায় ফল নাহি ফলে।
প্রথমতঃ, চিন্তাকালে বিবেচনা চাই,
বিচার করিবে মনে যাতে দোষ নাই।
সুচিন্তা, কুচিন্তা হ'তে ফলে কিবা ফল,

মনে মনে একে একে জানিবে সকল।
সেই চিন্তা, যদ্যপি উত্তম চিন্তা হয়,
সু-আশা তাহার সঙ্গে প্রথমতঃ রয়।
কিন্তু আছে পদে পদে বিপদ আশার,
উদ্যমশীলতা-দোষে রাখা তাহে ভার।
যেরূপ সম্বন্ধ লতা, পুষ্প আর গন্ধে,
চিন্তাদি তিনেতে বদ্ধ সেরূপ সম্বন্ধে।
চিন্তা-বিরহিতা আশা অমূলক জানি,
উদ্যমশীলতা বিনা আশা বন্ধ্যা মানি।
এ আশার ছলনাতে ভুলি কত লোক,
পাইতেছে এ জগতে কত মতে শোক!
ভারতের সেই দশা হ'য়েছে এখন,
আশা আছে, উদ্যমের কিন্তু প্রয়োজন।
ভারত সন্তান এবে উচ্চ হইয়াছে,
স্বদেশের চিন্তা ল'য়ে সবে পড়ে আছে।
আধুনিক যুবকের দল বিশেষতঃ—
ভারতের সুখ-আশে চেষ্টিত সতত।
আহারে বিহারে কিবা শয়নে স্বপনে,
ভারতের দুঃখ জাগে তাহাদের মনে।
উদ্যমেরে কেহ মনে নাহি দেয় স্থান,
কেমনে করিবে আশা সুফল প্রদান?
নির্ভর না করি শুধু চিন্তার উপর,
উদ্যমে যদ্যপি সবে করি সহচর,
তা হ'লে প্রশস্ত হ'বে উন্নতির পথ,
ভারতের ক্রমে পূর্ণ হ'বে মনোরথ।
আবার, মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে,
মন্দার কুসুম—মরুভূমেতে ফুটিবে!
নতুবা, সকল আশা হইবে নিষ্ফল,
অরণ্যে রোদন প্রায় হইবে কেবল।
আশাহীন জন দেখে ধরা মরুময়—
চিত্ত-ভূমে স্ফূর্ত্তি তরু শুষ্ক তার হয়!
তখন জীবন-নাশ অচিরেই ঘটে,
মনে বুঝে দেখ সবে বটে কি না বটে।

প্রকৃত ঘটনা এক করি নিবেদন,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার শুন সুধীগণ;—
ব্রহ্মপুরে কোন এক ব্রাহ্মণ-নন্দন,
বিড়াল পুষিয়াছিল, করিয়া যতন।
কার্য্য উপলক্ষে বিপ্র লয়ে পরিবার
বিদেশে যাইল, গৃহে রাখিয়া মার্জ্জার।
সেই খানে এক মাস রহিল ব্রাহ্মণ,
এ দিকেতে বিড়ালের শুন কি ঘটন—
সজ্জিত গৃহের 'তাকে' খালি হাঁড়ি ছিল,
খাদ্য-দ্রব্য আছে তাহে বিড়াল ভাবিল;
উঠিতে না পারে তাকে—উচ্চ অতিশয়,
মার্জ্জার রহিল বসি দুঃখিত-হৃদয়।
তাকে উঠি খা'বে—আশা মার্জ্জারের মনে,
সেই ভাবে এক মাস রহে অনশনে।
দ্বিজসুত দেখিলেন বাটীতে আসিয়া,—
বিড়াল রয়েছে তাঁর ঘরেতে বসিয়া!
তাক পানে ওতু-দৃষ্টি করি দরশন,
তাকেতে ইন্দুর আছে ভাবিল ব্রাহ্মণ।
হাঁড়ি নাড়ি সে ব্রাহ্মণ দেখিতে লাগিল,
শূন্য হাঁড়ি দৃষ্টিমাত্র মার্জ্জার মরিল!
আশার আশ্রয় ল'য়ে জীব প্রাণ ধরে,
আশাহীন হ'লে লোক এইরূপে মরে।
সকলে নির্ভর করে আশার উপরে,
সাগর ছেঁচয়ে লোক মাণিকের তরে!
সদাগর করে আশা কিসে লাভ হ'বে—
মানী জন করে আশা কিসে মান র'বে।
কারাগারে বন্দী করে মুক্তিলাভ-আশা,
ফসল উত্তম হবে আশা করে চাষা।
রাহুর মনেতে আশা গ্রাসে শশধরে,
পরের অনিষ্ট-আশা খলের অন্তরে।
পিতার সম্পত্তি-আশা করে পুত্রগণ,
ধনীর সদাই আশা কিসে বাড়ে ধন।
বেতনের বৃদ্ধি-আশা-করে ভৃত্যগণে,

প্রচুর গহনা-আশা স্ত্রীজাতির মনে।
সর্ব্ব জাতি আশা করে স্বদেশের সুখ,
বন্ধ্যা আশা করে দেখি সন্তানের মুখ।
খদ্যোতের আশা ধরে শশাঙ্ক-কিরণ,
অন্যের ধনেতে আশা করে চোরগণ।
লম্পটের মনে আশা হরে কুলবতী,
কুলটার আশা ঘরে আনে উপপতি।
জগতের মন্দ-আশা করয়ে কুলোক,
অন্ধ জন আশা করে হেরিতে আলোক।
কুব্জ মনে করে আশা উত্তান শয়ন,
রাজ্যলাভ-আশা করে যতেক রাজন।
ছাতারের আশা শিখে খঞ্জনের নাচ,
ধরিতে হীরক-কান্তি আশা করে কাচ।
শৃগালের মনে আশা পশুরাজ হয়,
গরুড় হ'বার আশা চড়ুয়ের রয়।
বায়সের আশা, পায় পিকবর-ধ্বনি,
নির্ধনের মনে আশা কিসে হয় ধনী।
মুকের মনেতে আশা মুখে কথা কয়,
শশাঙ্ক-প্রণয়-আশে কুমুদিনী রয়।
ধারাজল আশা করি রহে চাতকিনী,
তপন-প্রণয়-আশা করে কমলিনী।
হরিতে নলিনী মনঃ ভেক আশা করে,
বধিরের মনে আশা শ্রুতিশক্তি ধরে।
খঞ্জের মনেতে আশা করে ছুটাছুটি,
দুষ্ট বালকের আশা রোজ হয় ছুটি।
দিবানিশি মদ খায় মাতালের আশা,
সতীর মনেতে আশা স্বামী-ভালবাসা।
বাসুকি সমান হ'তে চাহে নাগগণ,
গগন ধরিতে আশা করয়ে বামন।
কৈলাস-পর্ব্বত হ'তে চাহে গিরিগণে,
চাঁদে পাড়ি, খেলা করে আশা শিশু মনে।
ঈশ্বর-প্রাপ্তির আশে যোগিগণ রহে,
করিয়া কঠোর ব্রত কত কষ্ট সহে।
এইরূপ জগতের সবে পরস্পরে,
স্বার্থ সাধনের তরে মনে আশা করে।
মনেতে যেমন যাঁর আশার উদয়,
সেই অনুসারে তার ফলভোগ হয়।
দ্রৌপদীরে আশা করি কীচক দুর্ম্মতি,
ভীম-হস্তে যমপুরী গেল শীঘ্রগতি।
রাবণের হিত আশে নিশাচরগণ,
ক্রমেতে সকলে দেখ হইল নিধন।
মন্দ আশা করি দেখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে,
একে একে গেল সবে শমন-সদনে।
তাই বলি, সু-আশায় সবে দিবে মতি,—
বিফল হ'লেও তাহে নাহি কিছু ক্ষতি।
শ্রীচৈতন্য, পরাশর গৌতমাদি সবে,
সু-আশার জন্য তাঁরা বিখ্যাত এ ভবে।
আইস, আমরা তবে ঈশ্বর নিকটে
প্রার্থনা করিব সদা সবে অকপটে—
সর্ব্ব জীবে সম দয়া করেন ঈশ্বর,
সকলেই আত্ম তাঁর কেহ নহে পর।
ঈশ্বরের কৃপা হ'লে ঈশ্বর পাইব,
নশ্বর জগতে আর কভু না রহিব।
মায়া-কূপে পড়ে আর কেন খাবি খাই?
রয়েছে বিশ্বাস-রজ্জু ধরে উঠ ভাই।
ঈশ্বরে দোহাই দিয়ে দুটি বাহু তুলে,
নেচে তাঁর গুণ গাও সব যাও ভুলে।
আজ কাল করে আর কেন কাটে কাল?
মিছে কাজে ঘুরে সদা কর গোলমাল।
মুক্তি-আশে ভক্তিভাবে পেয়েছে সবাই,
জেনে শুনে তবে কেন ভুলে যাও ভাই?
বোলে বোলে আর কেন মুখে পড়ে ফেকো?
বুঝে সুঝে আর কেন হয়ে থাক ভেকো?
বিশ্বাসে নিকটে তিনি, তর্কে বহুদূর,
ঠারে ঠোরে বুঝে দেখ ভাঙ্গিব না ভুর।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

মায়া।

—:*:—

হীরক-খচিত বাসে আবরিত কায়,
কে তুমি দেখাও মোরে সুখদ স্বপন ?
স্নেহ-ভরে হাসি মুখে, জননীর প্রায়—
হের মোরে স্তিমিত নয়ন ?

বিকচ বদনে চারু চন্দ্রিকা প্রকাশ,
কেন গো, উদয় আসি দরিদ্রের ঘরে ?
নিশ্বাস প্রশ্বাসে তব বসন্ত বিকাশ !
এত দয়া কেন মোর পরে ?

তুমি যে বিমাতা মম জগত-মোহিনি !
সপত্নী-তনয়ে কেন এত সমাদর ?
গুরু-তরু-মূলে আমি কাটাই যামিনী,
অশ্রুজলে ভাসি নিরন্তর।

কি দেখি হাসিলে সখে সুমন আমার ?
দেখিয়াছ ওই রূপে কলুষিত ছটা—
বাহিরে প্রসন্ন মুখ অন্তরে আঁধার,
হাসি নয়, গরলের ঘটা !

দূর হও মায়াবিনি পাপিনি রাক্ষসি !
কি হেতু দেখাও মোরে এত প্রলোভন ?
দূর হও হেথা হ'তে কুলটার দাসি !
গুরুদণ্ডে করিব নিধন।

শ্রীঅঃ—

মন।

—:*:—

জেনেছি মন এবার তোমায় কেমন তুমি হও,
সুখের আশায় নিয়ে গিয়ে দুঃখ কেবল দাও !
ষোল আনা প্রবঞ্চনা, সব কাজে তোমার,
কোথা থেকে, এলে শিখে, এমন ব্যবহার ?
আপন বলে দেখাও যারে, দিন দুয়েকের পর,
কালের বশে সেই যে শেষে হয়ে দাঁড়ায় পর।
দেহ রাজ্যের রাজা হ'য়ে, কচ্চো সুখে বাস,
ছ'জন রিপু আছে তোমার অনুগত দাস।
ছ'জন রিপুর উৎপীড়নে প্রাণে বাঁচা ভার,
ছয় জনেতে দেহ খানা দিচ্চে ছারে খার !
সুহৃদ হয়ে মজিয়ে দিয়ে মায়িক রসের ঝোঁকে
রঙ্গ দেখ বসে বসে, তুমি আড়াল থেকে !
যদি কভু, কোথায় প্রভু, দেখ্‌তে করি সাধ,
অম্‌নি তুমি ভুলাও মোরে, সেধে কত বাদ।
পরাণ ভরে, ডাক্‌তে তাঁরে, বসি যদি ফাঁকে,
সাত ভাব্‌না এনে জড়াও ভুলিয়ে দিয়ে তাঁকে
দুঃখ দেয়া কাজ যে তোমার বাঁধ্‌তে মায়াপাশে
ক্ষণিক সুখের লোভ দেখায়ে প্রাণে মার শেষে।
গুরু কৃপায় পরম নিধি পেয়েছি এই বারে,
(সেই) হরিনামের বলে তোমায়
রাখব দমন করে।

শ্রীরঃ—

একটি কবিতা।

—:*:—

"ভূম্যো যোজন লক্ষেহর্কংপঙ্কেরুহদ্বয়াদ্বিধুং।"

প্রশ্ন।

কমলিনী সঙ্কুচিতা দেখে নিশাকর,
কি কারণে বল শুনি, ওহে গুণাকর ?

উত্তর।

উচ্চ স্থানে থাকে শশী দ্বিলক্ষ যোজন,
জ্যেষ্ঠ বলে সূর্য্য তারে করে সম্বোধন ;
পঙ্কজিনী মনে জানি স্বামী হ'তে বড়,
চাঁদে দেখি মুদে আঁখি লাজে জড়সড় !

৭ নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে" শ্রীকিশোরীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অথবা,

নিশাকালে সরোজিনী অনাথিনী থাকে,
হিমকর দিয়ে কর নষ্ট করে তাকে ;
রবিতাপে প্রফুল্লিতা, হিমে ভয় বড়,
চাঁদে দেখি মুদে আঁখি তাই জড়সড় !

অথবা,

জলেতে জনমে দেখ, শশী, কমলিনী,
সম্বন্ধে সোদর শশী, ভগ্নী জলজিনী ;
যুবতী ভগিনী, হেরে সহোদর বড়,
লাজ পেয়ে মুদে আঁখি, তাই জড়সড় !

৺ কৈলাসচন্দ্র রায়।

খল-চরিত্র।

"সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে॥"

—চাণক্যশ্লোকং।

—:*:—

খলের সমান শত্রু কে আছে ভুবনে ?
সকল জগত তুষ্ট তাহার মরণে।
ধরাধামে ঘটে যত অশুভ ঘটন,
খল তার মূলে আছে স্থির নিরূপণ।
সাধুজন যদি কভু খল সনে থাকে,
অমনি সে জন যেন পড়েছে বিপাকে।
খলের সেবায় কভু নাহি ফলোদয়,
বিপরীত ফল লাভ অনেক সময়।
দুগ্ধ দিয়া সর্প-শিশু করিলে পালন,
সুযোগ যেক্ষণ পা'বে করিবে দংশন।
খলের করহ যদি, শত উপকার,
তথাপি কৃতজ্ঞ নহে হেন দুরাচার।
খল সম নরাধম কেবা আর আছে ?
জগতে অপ্রিয় সেই সকলের কাছে।
বাতাস খাইয়া সাপ পরিতোষে থাকে,
কারো প্রিয় নহে কিন্তু খলতার পাকে।
খল যদি করে কারো হিত অভিলাষ,
অমনি করেছে যেন তারি সর্ব্বনাশ !
খলের মুখেতে মধু, অন্তরে গরল,—
মিশিলে খলের সনে অনিষ্ট কেবল।
যে সংসারে পরিজন না জানে বিদ্বেষ,—
সে সংসারে হয় যদি খলের প্রবেশ,
কোন রূপ সুখ তথা নাহি থাকে আর,
অচিরেই খলস্পর্শে যায় ছারখার।
যত খল আছে এই অবনি ভিতরে,
মনোদোষে চিরকাল কষ্ট পেয়ে মরে।
রাজা দুর্য্যোধন ছিল অতিশয় খল,
সেই হেতু সবংশে যাইল রসাতল।
রাবণ রাজার কথা নাহি জানে কেবা,
সবংশে মরিল, করি খলতার সেবা।
খলগণে কেহ নাহি সমাদর করে,
ভগবান্ কোপাবিষ্ট তাঁ'দের উপরে।
খলের চরিত্র এবে করিব বর্ণন—
মনোযোগে সুধীগণ কর আকর্ণন।

লাঙ্গুলহীন শৃগাল।

—:০:—

শৃগাল পড়িয়া কোন নিষাদের ফাঁদে,
প্রাণভয়ে ভীত হ'ল বিষম প্রমাদে।
জম্বুকের কাতরতা নিরখি নয়নে,
দয়ার সঞ্চার হ'ল শিকারীর মনে।

শ্রীব্রজব্রত রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে" শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

তখন সে জন তা'রে প্রাণে না মারিয়া,
লাঙ্গুল কাটিয়া দিয়া দিলেক ছাড়িয়া।
লেজ দিয়া, শৃগাল জীবন পেলে বটে,—
লজ্জায় যাইতে নারে স্বজাতি নিকটে।
বলে,—"ভাল প্রাণ-নাশ ছিল এর চেয়ে,
বেঁচে থেকে মরি এ যে অপমান খেয়ে।
'বেঁড়ে' বোলে শত্রুকুল হাসিছে যখন,
কি আর আমার সুখ বাঁচিয়া তখন!"
কি রূপেতে এড়াইবে এই অপমান—
শৃগাল ভাবিয়া হ'ল আকুল পরাণ।
ভেবে যুক্তি নিরূপণ করি অবশেষে,
স্বজাতি মণ্ডলে গেল উল্লাসেতে ভেসে।
বলে,—"ভাই, লেজ কেটে ফেলে দিছি কাল,
কে বয় ভূতের বোঝা বিষম জঞ্জাল!
স্বচ্ছন্দ শরীরে এবে বেড়া'য়ে বেড়াই,
সত্য কথা বলিতে কি, কোন কষ্ট নাই।
শৃগালেরা এত দিন আছে অন্ধ হোয়ে,
হাড়কালী করিতেছে লেজ বোয়ে বোয়ে!
এ কথা শুনিয়া কারো লাগিবেক ধোঁকা,
না মরে যে ভূত হয় তারে বলি বোকা।
কত যে পেতেছি সুখ লাঙ্গুল বিহনে,
লাঙ্গুল যা'দের আছে বুঝিবে কেমনে।
এক জন দেখ আগে কেটে ফেলে লেজ,
চেহারা ফিরিয়া যা'বে গায়ে হ'বে তেজ!
শত্রু-ভয়ে যখন করিবে পলায়ন,
পারিবে দ্বিগুণ বেগে করিতে গমন।
লেজ নিয়ে আমাদের বেঁচে মরে থাকা,
জানি না সুখের বার্ত্তা কথা বলি পাকা।
আমার এ পরামর্শ শুনে যদি কেহ,
সুখ দেখে তুষ্ট হ'বে—ঘুচিবে সন্দেহ।
বেশী আড়ম্বরে কিছু নাহি প্রয়োজন,
লাঙ্গুল কাটিলে সবে বুঝিবে তখন।
ভ্রাতৃগণ! কেন সবে কষ্ট পেয়ে মর?
লেজ কেটে ফেলে দিয়ে সুখ ভোগ কর।"
লেজকাটা শিয়ালের কৌশল বুঝিয়া,
সুবুদ্ধি শৃগাল এক কহে সম্ভাষিয়া;—
"যা বলিলে ভাই, তুমি সত্য সব মানি,
কিন্তু ভাই তোমারে হে কহি এক বাণী,—
লেজ কেটে গিয়াছে গজা'বে না'ক আর,
আমাদেরো বেঁড়ে করো মানস তোমার।
যদ্যপি তোমার আর বাড়িত লাঙ্গুল,
আমাদের সুখ লাগি হ'তে কি ব্যাকুল?
লাঙ্গুল শোভার তরে দিয়াছেন হরি,
সে লেজ কেমনে সবে দেহ-ছাড়া করি!"
এ কথায় সে শৃগাল হয়ে নিরুত্তর,
মনঃক্ষোভে চলিয়া যাইল স্থানান্তর।
তাই বলি, সবে দেখ মনেতে বিচারি,
খলজন জগতের কত মন্দকারী!
সকল নষ্টের গোড়া খলজন যত,
পরের অনিষ্টে তারা সদা থাকে রত।
আপনার মত দশা হয় সবাকার,
বিধিমতে নিরন্তর চেষ্টা পায় তার।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

কৃষক ও হাড়গিলা।

—:*:—

বাস, বাসদেবপুর, নাম মতিলাল সুর,
জেতে চাষা, নাহি চাষবাস;
মুদীর দোকান তার, হয় বেশ রোজ্‌কার;
ভাগ্য ভাল, কমলার দাস।

এক দিন দ্বিপ্রহরে, চাষা যায় ফিরে ঘরে,
পথে দেখে ফিরাইয়া আঁখি—
যাইতেছে গুটি গুটি, পদদ্বয় যেন খুঁটি,
মস্ত এক হাড়গিলা পাখী!

পাখীরে নিরখি চাষা, মুখে তার এল ভাষা,
কি বলিছে, কহি সুধী সবে ;—
"এ অতি জঘন্য পাখী ! কেন বিভু এরে রাখি,
করেছেন ভারাক্রান্ত ভবে ?

গলা কাছে থলি ঘটা, মরি কি রূপের ছটা !
দেখিলে জ্বলিয়া যায় হাড় !
মুখ দেখে ঘৃণা হয়, কোনো উপকারে নয়,
ইচ্ছা হয়, মট্‌কাই ঘাড় !"

কহে কত এই মত ; কহিলাম গোটাকত,
ফল কথা, বলি এইবার ;—
অহঙ্কারে মন ভরা, ধরাকে সে দেখে শরা,
মূর্খ—তাহে সচ্ছল টাকার।

চাষা চলে করি দর্প ; প্রকাণ্ড কেউটা সর্প,
দেখে তারে, করিয়াছে তাড়া ;
ছাড়িয়া জীবন আশা, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চাষা,
ঘুরে গেল হাত মুখ নাড়া !

বেঁকে বেঁকে ছুটে যায়, পথ না দেখিতে পায়,
প্রাণ তার নাহি আর ধড়ে ;
কিছু দূর গিয়া ছুটে, ডেলা বেধে, কাঁটা ফুটে,
মুখ থুবড়িয়া ভূমে পড়ে।

রহিত উত্থান শক্তি, চোট লেগে রক্তারক্তি !
তবু ভয়ে, অভিভূত রয় ;
ভয় হয় নামে যার, দরশন সঙ্গে তার !
ভেবে দেখ, হয় কি না হয়।

সামালিয়া কিছু পরে, পিছু নিরীক্ষণ করে,
দেখে দূরে, হাড়গিলা আসি—
চঞ্চু দিয়া সাপে ধরে, রাখিয়াছে উঁচু করে,
অভিপ্রায়, খায় তারে নাশি।

গিলিতেছে হাঁ করিয়া, অর্দ্ধেক থলিতে গিয়া
করিতেছে ফণী ধড়ফড় !

চাষার আতঙ্ক গেল, ধড়ে তার প্রাণ এল,
মুখে বহে প্রশংসার ঝড়।

শত মুখে কহে চাষা,—"হাড়গিলা পাখী খাসা!
ভূ-ভারতে ছুটি নাহি আর ;
না বুঝে দিয়াছি গালি, তাই বুঝি বনমালী,
দেখা'লেন গুণ কত তার।"

কৃষক জীবন পেয়ে, ভগবদ্ গুণ গেয়ে,
নিজালয়ে গমন করিল ;
এ দিকে ভুজঙ্গে খেয়ে, হাড়গিলা তৃপ্তি পেয়ে,
স্বস্থানেতে উড়িয়া যাইল।

মর্ম্ম বুঝ গুণি সবে, গুণের প্রশংসা ভবে,
শুধু রূপে, নহে শোভমান ;
শিমূলের বাস নাই, হতাদর তার তাই,
মাখালের দেখ অপমান।

শ্রেষ্ঠ যেই গুণে রূপে, তার মান সর্ব্ব রূপে,
ছেলে ফেলে কোল দিই তারে ;
রূপে গুণে যার ঘটা, হেন লোক আছে ক'টা
জনপূর্ণ এ ভব-সংসারে ?

উপর ভিতর কালো, তাহার মরণ ভালো,
রূপহীন গুণবানে চাই ;
কাঁটা ফুটে পদমূলে, দাঁত দিয়া দিব তুলে,
হৃষ্ট মনে মাথায় বসাই।

ঢের কথা আছে মনে, সময়েতে সুধীগণে,
প্রকাশিয়া করিব জ্ঞাপন ;
সরে পড়ি কহি থোড়া, আসিয়াছি চড়ে ঘোড়া,
থাকিতে না পারি বেশীক্ষণ।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

যার যে অঙ্গ।

—:*:—

কমল! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
ভ্রমর যদি বসে।
কুমুদ! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
চন্দ্র যদি হাসে।
মরাল! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
আস্তে যদি যাও।
ঘোটক! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
বেগে যদি ধাও।
বালক! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
বিদ্যা যদি শেখ।
নারি! তোমায় দেখ্‌তে ভালো,
লজ্জা যদি রাখ।
শারদ গগন দেখ্‌তে ভালো,
চন্দ্র যদি উঠে।
তরু লতা দেখ্‌তে ভালো,
ফুল্‌টি যদি ফুটে।
এ সবারে দেখ্‌তে ভালো,
এ সব যদি হয়।
মানব-জীবন দেখ্‌তে ভালো,
সাধন যদি রয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।



মানব-জীবন।

—:*:—

(চতুর্দ্দশ পদী)

লভিয়াছি ভাগ্যবলে মানব-জীবন,
কেবল অনর্থ কাজে বেড়া'ব ঘুরিয়া?
অনিত্য সংসার-প্রেমে হইয়ে মগন,
দুর্ল্লভ জনম যা'বে উপেক্ষা করিয়া?
দু' দিনের তরে আমি জন্মেছি হেথায়,
শুধু কি আপন স্বার্থ করিতে সাধন?
এ জীবনে আর কোন কাজ নাই হায়,
কেবলি মায়ার বশে দেখিব স্বপন?
মনুষ্য-জীবন এ যে—নহে ছেলে খেলা!
প্রতি নিমিষেই হের হ'তেছে মরণ।
আপনার পথ তবে দেখ এই বেলা,
বহু সুকৃতির ফল মানব-জীবন।
সত্বর করহ তবে না করিয়ে হেলা,
সত্য নিত্য বর্ত্তমান পথ অন্বেষণ।

শ্রীরসময় লাহা।

দুর্ভিক্ষে নির্ধন গৃহস্থ।

—:*:—

(রেক্তাচ্ছন্দঃ)

—•—

[এই ছন্দটি অক্ষরগত নহে,—মাত্রাগত। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তখনকার লোকেরা টিকেরার ও কাড়ার বাদ্য-তালে এই ছন্দঃ গান ও পাঠ করিতেন।]

—•—

এ কি ঘোর মন্বন্তর! এ কি ঘোর মন্বন্তর!
ঘর ঘর, শব্দ হাহাকার!
পাঁচ টাকা চেলের মণ, কেমনে সাধ্য কার!

ধনে প্রাণে হ'নু সারা, ধনে প্রাণে হ'নু সারা,
গেনু মারা, বুঝি এই ক্ষেত্রে—
বক্ষে যেন শূল বিঁধে, বারি বহে নেত্রে।

অন্ন বিনা ছন্ন দেশ, অন্ন বিনা ছন্ন দেশ,
কত ক্লেশ, ক'ব বিস্তারিয়া—
কত দুঃখী মরে গেল, খেতে না পাইয়া!

শস্য নাই কাঁদে চাষা, শস্য নাই কাঁদে চাষা,
নাহি ভাঁষা, জমিদার হেরে—
কেমনে খাজানা দেবে, পড়ি এই ফেরে?

টাকায় মজুর দু'টা, টাকায় মজুর দু'টা,
তাও জুটা, হইয়াছে দায়;
কেমনে এমন দেশে বাস করা যায়?

হিতে সব বিপরীত, হিতে সব বিপরীত,
অস্তমিত হ'ল সুখ-ভানু—
অন্তর দহিছে সদা দুঃখের কৃশানু।

ভিখারী ফিরে যায়, ভিখারী ফিরে যায়,
হায় হায়, কত বড় দুখ!
পোড়া কপালেতে বিধি লিখে নাই সুখ!

দ্রব্যের দ্বিগুণ দর, দ্রব্যের দ্বিগুণ দর,
ভয়ঙ্কর, কড়ি কোথা জোটে?
হক্ বল্লে, ভূত ভাগায়, গালাগালির চোটে!

বলী যে মার্ত্তে আসে, বলী যে মার্ত্তে আসে,
বাক্যে শাসে, কাঁপায় শরীর—
হ'লাম রে সংসারের জ্বালায় অস্থির।

ছেলেদের কাপড় নাই, ছেলেদের কাপড় নাই,
কোথা পাই, পরে ছিন্ন-বাস;
যার জ্বালা সেই জানে, বলিয়ে খালাস।

গিন্নীর বদন বাঁকা, গিন্নীর বদন বাঁকা,
ঘরে থাকা, হ'ল মহাদায়,—
দিবানিশি টাকা! টাকা! করিয়া জ্বালায়।

পড়েছে যে বাজার, পড়েছে যে বাজার,
সাধ্য কার, ব্যয় যোগাইতে?
ধনীদেরি দেখি শুধু হয় না ভাবিতে।

মাগীর বড় চোপা! মাগীর বড় চোপা!
বেঁধে খোঁপা, মুখ-ঝাম্‌টা মারে—
বোঝে না ত আগুন যে লেগেছে বাজারে।

টাকায় ছ সের দুগ্ধ, টাকায় ছ সের দুগ্ধ,
জল শুদ্ধ, তবু মুগ্ধ তায়;
ছেলে পিলে না খেলে তা, রক্ষা কিসে পায়?

সার হয়েছে টেনা, সার হয়েছে টেনা,
এত দেনা, শুধিব কেমনে?
পথে ঘাটে যাওয়া দায়, দেনার কারণে

দোকানী পথে ধরে, দোকানী পথে ধরে,
ক্রোধ ভরে, কহে কত মত—
আজি কালি ভাড়াভাঁড়ি, সবে আর কত?

গিন্নীর বড় জ্বালা! গিন্নীর বড় জ্বালা!
হয়ে কালা, বসে থাকি ঘরে—
আমার কি দোষ? মাগী গাল পেড়ে মরে।

উপমা দেয়, এর ওর, উপমা দেয়, এর ওর,
মর তোর, যেমন কপাল!
তোরে বিয়ে করে আমি, হ'লাম নাকাল!

'নারী-ভাগ্যে হয় ধন', 'নারী-ভাগ্যে হয় ধন,'
এ বচন, শাস্ত্র-সুসম্মত;
তোর ভাগ্যে আমি কষ্ট স'ব বল কত?

এ কথা বলি যদি, এ কথা বলি যদি,
ক্রোধ-নদী উঠিবে উথলি—
গা'র ঝাল ঝাড়িবে সে, যা নয় তা বলি!

চুরি কি কর্ত্তে হবে? চুরি কি কর্ত্তে হ'বে?
বল তবে, সংসারের দায়ে—
কুড়ালী হইবে মারা সে যে নিজ পায়ে।

ধরিয়া চৌকীদারে, ধরিয়া চৌকীদারে,
দরবারে, করিবে হাজির—
কার্য্য দেখে, কারাবাস অবশ্যই স্থির।

এই কি হ'বে শেষ! এই কি হ'বে শেষ!
পরমেশ, কপালে আমার?
ঘুচাও দুঃখের দশা ওহে গুণাধার।

করেছি কতই পাপ, করেছি কতই পাপ,
মনস্তাপ, পাইতেছি ভারি—
কোনো জ্বালা পেতাম না হ'লে পরে নারী!

থাক্‌তাম বসে ঘরে, থাক্‌তাম বসে ঘরে,
তেজভরে জ্বালা না থাকিত;
(আর) মোর মত মোর স্বামী, সব যোগাইত।

শুন ওহে দয়াময়, শুন ওহে দয়াময়,
আর নয়, দুঃখের সংসারে;
কৃপা করি লও মোরে, ভবসিন্ধু-পারে।

এড়া'য়ে সংসার দায়, এড়া'য়ে সংসার দায়,
রাঙা পায়, স্থান যেন পাই;
এ ভব-সংসারে যেন আর আসি নাই।

অনন্ত শকতি তব, অনন্ত শকতি তব,
কত ক'ব, এক মুখে আমি—
সকলের কর্ত্তা তুমি জগতের স্বামী।

পাইলে করুণা-কণা, পাইলে করুণা-কণা,
পাপীজনা যায় স্বর্গপুরে,
সংসারে বেড়া'তে নাহি হয় ঘুরে ঘুরে।

তুমি হে করুণা-সিন্ধু, তুমি হে করুণা-সিন্ধু,
কৃপা-বিন্দু, কর বিতরণ,
মোক্ষধামে যাই চলি এড়া'য়ে শমন।

অপরাধ করিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি,
কিসে বাঁচি, বল দয়াময়?
কেমনে সাক্ষাৎ মোর তব সনে হয়?

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুপুত্র যদ্যপি হয়,—
কৃপাময়! কুপিতা ত নহে,
বাপ ত ছেলের 'ঝক্কি,' চিরদিন সহে।

তুমি ত আমার বাপ, তুমি ত আমার বাপ,
কেন তাপ, সন্তানেরে দেহ?
অপরাধ ক্ষমা করি, কর পূর্ব্ব-স্নেহ।

বিপথে যা'ব না আর, বিপথে যা'ব না আর,
দয়াধার! করিনু শপথ;
কৃপা করি পূর্ণ কর মম মনোরথ।

দোষ যদি করি পুন, দোষ যদি করি পুন,
পিতঃ শুন, শাস্তি দিও যত;
কৃপা করি চেয়ে দেখ পুত্রে পদানত—

করিলে তোমার নাম, করিলে তোমার নাম,
মোক্ষধাম, চলি যায় জীব;
যে তোমারে সদা ডাকে সাধ' তার শিব।

না তার' যদি মোরে, না তার' যদি মোরে,
প্রেম-ডোরে, বাঁধি দৃঢ়রূপে,
কিঙ্করে থাকিতে মগ্ন হ'বে পাপ-কূপে।

অতএব কৃপা করে, অতএব কৃপা করে,
এ কিঙ্করে, দিয়ে পদ-তরি—
লয়ে যাও কাছে, ভবসিন্ধু পার করি।

শ্রীরাধাজীবন রায়।



সঙ্গীত

—:*:—

"নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি॥"

ভৈরবী—পোস্তা।

মূল হারা'লাম বুঝি বাণিজ্য করিতে এসে!
সকলি নিস্ফল হ'ল নিষ্পরেরে ভালবেসে।
যিনি অন্তরের ধন, তাঁর প্রতি অযতন,
সদা পরিপূর্ণ মন, কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষে।
হইয়া ঐশ্বর্য্যশালী, ভুলিয়া সে বনমালী,
পাপ-কর্ম্ম করি খালি,উল্লাসেতে আছি ভেসে।
জনম নিলাম যবে, বিভু-পদে মন র'বে,
অন্যথা কভু না হ'বে, কিন্তু সব গেল ফেঁসে।
কিছুতে মিটে না খাঁই, প্রজ্বলিত আশা-বাই,
কিছুই স্থিরতা নাই,কবে ফিরি কোন্ বেশে!
চঞ্চল মানস-পাখী, ধর্ম্ম-ডাঁড়ে বেঁধে রাখি,
পলক ফেলিলে আঁখি,কুসঙ্গেতে নৈলে মেশে।
যে পাঠা'লে ধরাধামে, ভুলে রহি তাঁর নামে,
কি হইবে পরিণামে,দিন গেলে খেলে হেসে,
ভাবি সত্য কথা ক'ব, সদা ধর্ম্ম-পথে র'ব—
সদা বিভু নাম ল'ব,পাপ আসে কাছ ঘেঁসে।
যে কর্ম্ম করেছি যবে, সকলি ত লেখা র'বে,
কি দশা মরিলে হ'বে, কি বলিব পরমেশে?
বলিতেছি 'আছি এই', মুহূর্ত্ত মধ্যেতে নেই,
কি উপায় হ'বে সেই, মৃত্যু দিনে সর্ব্বনেশে।
দারা সুত পরিজন, হেন সুখ-নিকেতন,
দিয়ে সব বিসর্জ্জন, যেতে হ'বে অবশেষে।
এত অহঙ্কার কেন? পরমন্দকারী হেন,
মনে হয় র'ব যেন, চিরদিন এই দেশে!
ধর্ম্ম-পথে নাহি যাই, কর্ম্ম মত ফল পাই,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা খাই, বিপদেতে ধরে ঠেসে।
দিন বুঝি রবিসুত, পাঠাইবে নিজ দূত,
ছেড়ে গেলে পঞ্চভূত, লয়ে যা'বে ধরি কেশে।
এখনো সময় আছে, উঠ মন ধর্ম্ম-গাছে,
যেতে পা'বে বিভু কাছে, রাখি মন বিভুদেশে।

রা,জী, রা।

লাম্পট্য।

—:*:—

"হরিতে পরের কুল আকুল অন্তর,
কিন্তু নাহি ভাব কভু আপনার ঘর!"
—জ্যোতিরিঙ্গণ।

লম্পট! নিষেধ করি শুন দিয়া মন,—
কখন পরের নারী করো না হরণ।
"মাতৃ সম জ্ঞান কর,"—সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়,
পরনারী হরণেতে মহাপাপ হয়।
আপনার নারীরে যে করি অনাদর,
যে তোষে পরের নারী, সে জন পামর।
সতীর সতীত্ব-নাশ করিবার তরে,
সতত ভ্রমিছ তুমি ব্যাকুল অন্তরে।
নারীর সতীত্ব ধন, অমূল্য রতন,
কলে বলে ছলে তুমি করহ হরণ।
অবশেষে তুলি তার কলঙ্ক-নিশান,
ত্যজি তারে অন্য স্থানে করহ প্রস্থান।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা তব অঙ্গের ভূষণ,
কলঙ্কের ভয় তব না হয় কখন।
গুরু জন উপদেশে, হয় তব রোষ,
কখন না হের চোখে আপনার দোষ।
মারি খেলে অপমান না হয় তোমার,
স্বভাবে সে কাজ তুমি কর পুনর্ব্বার।
শার্দ্দূল ভল্লুকে দেখি, শঙ্কা নাহি হয়,

তব মনে শুধু প্রেম-বিচ্ছেদের ভয়।
নিষাদ যেমন পক্ষী, ধরে ফাঁদ পাতি,
ধর তুমি তেমতি, অবলা নারীজাতি।
মধুর বচনে কত দিয়ে প্রলোভন,
আকর্ষণ কর আগে সরলার মন;
হাঁচি পেলে তুড়ী ধর, দেখা'য়ে এমনি,
মজা'বারে চেষ্টা কর সরলা রমণী।
ফুরালে পুষ্পের মধু ভ্রমর যেমন,
অন্বেষণ করে গিয়া কুসুম নূতন;—
সেই রূপ পুরাতনে ত্যজিয়া, নূতনে
ক্রমেতে বাসনা হয়, উপস্থিত মনে।
তখন তাহারে ছাড়ি খুঁজ অন্য জন,
হও তুমি বিশ্বাসের ঘাতক এমন!
কুলটা করিতে যত কুলের কামিনী,
কেবল তোমার চেষ্টা দিবস যামিনী।
রমণীর উদ্দেশেতে ত্যজি নিজ বাটী,
পরের কাণাচে তুমি পাত গিয়া ঘাঁটি!
ভোগ করে কিছু দিন সাধনের ধন,
পুনশ্চ তাহারে ত্যজি কর পলায়ন।
সাজা'য়ে কলঙ্ক-ডালা, মাথে দিয়া তুলে,
চলে যাও, স্মরণ কর না আর ভুলে।
সে নারীর দুর্দ্দশার, নাহি একশেষ,
দেখে তব মনে নাহি হয় দয়ালেশ!
তব লাগি সেই দশা হয়েছে তাহার,
কাঠ প্রাণ! এমন ভাবো না একবার।
নিশীথে যখন সবে ঘুমে অচেতন,
মন্দ অভিপ্রায়ে তুমি কর্হ গমন।
রজনী যদ্যপি হয় অতি অন্ধকার,
মুষলের ধারে বৃষ্টি, পড়ে অনিবার,
সম্মুখেতে যদি তব বৃক্ষ ভাঙে ঝড়ে,
অশনি খসিয়া যদি মাথে তব পড়ে,—
তথাপি মনেতে তুমি নাহি বাস ভয়,
বরঞ্চ তাহাতে তব মনোল্লাস হয়।

গোপনে রাখিতে চাহ কুকর্ম্ম করিয়া,
ধর্ম্ম যে আছেন তিনি দেন ধরাইয়া।
কুকর্ম্ম কখন কারো ছাপা নাহি থাকে,
কাণাকাণি জানাজানি আঁচা আঁচি তাকে।
প্রকাশ পাইবে পরে লোক-পরম্পরা,
ছি ছি কি লাঞ্ছনা! তায় যদি পড় ধরা!
সাধু হ'তে চাহ তুমি বিধি বাদী তায়,
কলঙ্ক ধর্ম্মের ঢাক বিধাতা বাজায়।
কুকর্ম্ম করেছ বোলে গালাগালি খা'বে,
সকলে অস্নেহ করে দেখিবারে পা'বে।
জননী শুনিয়া তব, পা'বে কত দুখ,
পিতা, আত্ম কুটুম্বের, হ'বে হেঁট মুখ।
প্রতিবেশী সকলেই অবিশ্বাসী ক'বে,
পইলে সুযশঃ লোপি আর নাহি হ'বে।
পরনারী যবে তুমি যাও হরিবারে,
অন্যে আসি তব নারী হরিতে ত পারে?
ঘরে থাকি নিজ নারী করহ রক্ষণ,
ইহ পরকালে হ'বে ধর্ম্ম-সংস্থাপন।
তুষিবারে পরনারী যবে তুমি যাও,
আপন নারীর প্রাণে কত ব্যথা দাও!
"স্ত্রীলোকের স্বামী হয়, সুখমোক্ষদাতা,
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী, নারীর বিধাতা।
স্বামী কর্ত্তা, স্বামী ভর্ত্তা, স্বামী মাত্র ধন,"—
জান না কি এ সকল শাস্ত্রের বচন?
কত কষ্ট পা'বে সেই, তোমার বিহনে,
ভুলেও উদয় নাহি হয় তব মনে।
অবলা কুলের বালা পেলে মনস্তাপ,
জান কি লম্পট তুমি জন্মে কত পাপ?
যখন পাইবে শাস্তি শমন সদনে—
তখন জানিবে দুঃখ পাপ আচরণে।

রা, জী, রা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—পাঠক পুঞ্জের অনুরোধে এবং সুবিধার জন্য এই "পত্রিকা" সাপ্তাহিক প্রকাশ না হইয়া মাসিক (একেবারে চারি ফর্ম্মা করিয়া) প্রকাশ হইবে। সুচারু রূপে কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঠকগণের নিকট আমাদিগের সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাসিক মূল্য দুই আনা অগ্রিম প্রদানে

মনের প্রতি উপদেশ।

(চৌপদী)

ওরে মূঢ় মন! ভাব' অনুক্ষণ,
সেই সনাতন, সতত বসি।
যাঁহার শাসনে, অখণ্ড ভুবনে,
উদিত গগনে, হয়েন শশী॥ ১

কিবা দিবাকর, বিতরিয়া কর,
এই চরাচর, করেন শোভা।
প্রভুর প্রেরণ, শীতল পবন,
বহে ঘনেঘন, মানস-লোভা॥ ২

যাঁর আজ্ঞা মত, তরুলতা যত,
ফল পুষ্পে নত, সতত রয়।
যেজন সৃজন, করেন পালন,
নিমিষে হরণ, করেন লয়॥ ৩

যিনি জল, স্থল, পাহাড়, জঙ্গল,
মহিমা সকল, কহিতে নারি।
পিক-পক্ষী যত, মধুস্বরে কত,
গায় ইতস্ততঃ, মহিমা তাঁরি॥ ৪

দীন হীন জনে, তুষিবে যতনে,
ঘৃণা কভু মনে, করিবে নাই।
আত্ম গুরুজন, যাতে তুষ্ট হন,
সদা সর্ব্বক্ষণ, করিবে তাই॥ ৫

সদা সাধ্যমত, পরহিতে রত;
পাপ কর্ম্ম যত, করো না সাধে।
কন্দর্পের বাণ, বিষম সন্ধান,
সদা সাবধান, পড়ো না ফাঁদে॥ ৬

এ ভব সংসার, সকলি অসার,
ক্ষণেক প্রসার, ভোজের বাজী।
কিছু দিন আসা, এত কেন আশা?
পদে নিতে বাসা, হও হে রাজি॥ ৭

ত্যজ অহঙ্কার, মনের বিকার,
কেহ নহে কা'র, দেখ না ভেবে;
যখন শমন, করিবে দমন,
তখন জীবন, কোথায় র'বে॥ ৮

যাঁহারি কৃপায়, জীব মোক্ষ পায়,
ভজ না তাঁহায়, প্রেমেতে মজি।
এ পাপ সংসার, যদি হ'বে পার,
ভাব'সারাৎসার, সকল ত্যজি॥ ৯

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।

বুদ্ধিমান্ চরিত্র।

—:০:—

বুদ্ধি বিনা সংসারেতে বাস করা দায়,
বুদ্ধিহীন হ'লে লোকে কত কষ্ট পায়।
বুদ্ধিহীন নরগণ পশুর সমান,
হিতাহিত কিছু তার নাহি থাকে জ্ঞান।
সর্ব্বস্থানে সেই জন প্রতারিত হয়,
বুদ্ধি দোষে করে সেই ধন মান ক্ষয়।
বুদ্ধি-বলে এ সংসারে দেখ জ্ঞানিগণ,
করেন কতই সুখে জীবন যাপন।
বুদ্ধি-গুণে নরগণ জগতে বিদিত,
বুদ্ধি-দোষে নরগণ জগতে ঘৃণিত।
বুদ্ধিহীন জনেরে কেহ না সমাদরে,
স্বজন বান্ধব তা'র সবে ঘৃণা করে।
জ্ঞানী জন বুদ্ধিহীন কাছে নাহি যায়,
বুদ্ধিহীন মানবের জীবন বৃথায়।
একজন বুদ্ধিমান্ থাকিলে সংসারে,
বিপক্ষ সহস্র মূর্খ কি করিতে পারে।

শ্রীব্রজব্রত রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বুদ্ধি না থাকিলে কেহ সুখী নাহি হয়,
বুদ্ধিহীন জনের সংসার দুঃখময়।
বুদ্ধি না থাকিলে কার্য্যে নাহি হয় ফল,
বৃথা পরিশ্রম সুধী, জানিবে কেবল।
ধরায় যাহারা সুখী বুদ্ধি তার মূল,
বিপদ্-সাগরে বুদ্ধি একমাত্র কূল।
অতএব, সুধীগণে করি নিবেদন,—
বুদ্ধিলাভ করি কর সফল জীবন।
সুবুদ্ধি-লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা যে থাকে,
তাঁহার যতেক গুণ বর্ত্তে এসে তাকে।
অগ্নিযোগে অঙ্গারের কৃষ্ণবর্ণ যায়,
বিজ্ঞ সনে থাকি অজ্ঞ জ্ঞান-রত্ন পায়।
বুদ্ধির কাহিনী এবে কহি প্রকাশিয়া,
শুন সবে সুধীগণ, মনোযোগ দিয়া।

কলু ও চোর।

—*—

নিবাস ধনিয়াখালী, নাম তার বনমালী,
কোন এক তৈলিক-নন্দন,
দু'টা ঘানি চলে তার, হয় দিব্য রোজকার,
সুখে করে জীবন যাপন।
বনমালী বড় কষা, সেই জন্য দৈন্য দশা,
কোটা ঘর না করে তৈয়ার;
পৈতৃক সে ঘর দুটি, বদলিয়া চাল খুঁটী,
রেখেছেন কলুর কুমার।
ব'লে অতি লোক খাটী, অন্ত কলুদের ছাটি,
আসে সবে তাহার সদন;
দ্রব্য ভাল ঠিক্ মূল্য, দিবারে তাহার তুল্য,
গ্রামে নাহি পারে কোন জন।
নাহি চটে খরিদ্দার, এমনি ব্যাভার তার,
মিষ্টভাষী, মাটির মানুষ;
বয়স পঞ্চাশ প্রায়, রীতিমত বল গায়,
কালো বটে, অতি সুপুরুষ।
পরিজন মধ্যে তা'র, এক পুত্র, পরিবার,
ঝাঁঝা ঝাঁঝা ক'রে, সেই ছেলে;
নাম তার 'নীলমণি,' বাপের নয়ন-মণি,
চিন্তাকুল, দণ্ড কোথা গেলে।
বয়স বছর বার, পিতামাতা বাক্য কা'র,—
কখন সে করে না শ্রবণ;
আঁটকুড়াদের ছেলে, এরূপে আদর পেলে,
হয়ে যায় বেদ্ড়া এমন।
কলু বুদ্ধিমান্ ভারি, সাবধানী তার নারী,
ক্রমে ধনী কমলা কৃপায়;
দাঁড়ীপাল্লা বাট্খারা, শয্যা-গৃহে রাখে তারা,
মজার ঘটনা শুন তায়;—
তৈলিকের পরিবার, ভিন্ন শয্যা ছিল তার,
বাপ বেটা এক বিছানায়;
একদা রজনী ঘোর, সিঁধ কাটি কোন চোর,
ঢুকিবারে গৃহে চেষ্টা পায়।
সুড়ঙ্গ হইল কাটা, ঢুকা'য়ে দেখিল পা টা,
মাথা ঢুকে হেন বড় চাই;
শব্দ হয় খুস্ খুস্, মাটী পড়ে ভুস্ ভুস্,—
তৈলিকের নিদ্রাভঙ্গ তাই।
তখন সে নীরবেতে, শব্দ শুনে কাণ পেতে,
বুঝিল কাটিছে সিঁধ চোরে;
ভয়ের সঞ্চার মনে, অস্ত্র আছে তার সনে,
চিন্তা, পা'বে নিষ্কৃতি কি কোরে।
এই ভয় মনে আছে, কেটেকুটে ফেলে পাছে
ধন নিলে ক্ষতি তত নাই;
পুনরপি যাহা হয়, তার চিন্তা করা নয়,
চিন্তা শুধু, কিসে বেঁচে যাই।
আসিল অপূর্ব্ব যুক্তি, পুত্র প্রতি করে উক্তি,—
"নীলমণি, আছহ নিদ্রিত?
কি দশা হইবে তোর, অবর্ত্তমানেতে মোর?"
ধাক্কা মারি, করে জাগরিত।
"বোকা নাহি তোর জোড়া, বাট্খারাগুল ছোড়া

আজিও চিনিতে, পারিলি না ;
একেবারে গেলি বোয়ে,রহিয়াছে ঠিক হোয়ে
আমি মোলে, খাইতে পাবি না।
বুদ্ধিহীন একেবারে ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে,
বেড়াইতে তোরে দেখি হ'বে ;
পুঁজিপাটা র'বে যাহা,দু দিনে উড়া'বি তাহা,
গণ্ডমূর্খ হ'লি তুই যবে !
কাঁচ্চা যেটা অন্ধকারে,আনিয়া দেত আমারে,
তবে বুঝি, খাইবি করিয়া !"
নীলমণি ঘুম-চোকে,কাঁচ্চা আনিবারে ঝোঁকে,
বাপ দেয় ঠেলে পাঠাইয়া।
ক্রমে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল,কাঁচ্চাটা সে লয়ে এল,
বাপ বলে,—"হাতে দেহ মোর ;"
সুড়ঙ্গের প্রতি ছুঁড়ে,কোপে কহে পুত্রে তুড়ে,—
"বেটা পাজি, কাঁচ্চা এই তোর ?"
মোষকের তথা হাত, হ'ল তায় কাঁচ্চাঘাত,
ক্ষত স্থান চুষে, ব্যথা সারে।
লুটিবে কলুর পুরী, কীল খেয়ে কীল চুরি
করে থাকে, লোকে যে প্রকারে।
তৈলিক কহিছে পুন,—"বাপ্ধন, শুন শুন ,
ছটাকটা আন দেখি এবে ;"
নাহি আর চোখে ঘুম, পদ শব্দে দুম্ দুম্,
আনে গিয়া ছটাকটা ভেবে।
বাপে কহে,"এই নাও."বাপ, বলে"কচু খাও,
বোকা বেটা ! এই কি ছটাক্ ?"
মহাকোপে দেখাইল, গর্ত্তস্থানে ছুঁড়ে দিল,
বালকের দেখে লাগে তাক্।
ঠেকে চোর সাবধানী, তবু সে ছটাক্ খানি,
পড়ে এসে পায়ের উপরে ;
আঘাতে তখন দাপি, অন্য পদ দিয়া চাপি,
যন্ত্রণাটা নিবারণ করে।
মনে চোর এই মানে, "এসেছি কলু না জানে,
অজ্ঞানেতে করিছে এরূপ ;
ঘুমাইবে স্বল্প পরে, তখন ঢুকিব ঘরে,
কিছুক্ষণ থাকি মেরে চুপ্।
এতশ্রম করিলাম, না পুরিলে মনস্কাম,
কেমনেতে ফিরে যেতে পারি ;
হ'ল এ বিষম জ্বালা, রঙ্গ করিতেছে শালা,
ইচ্ছা করে গালে ঘুষি মারি !
এইরূপ ভাবি চোর, সেই যামিনীতে ঘোর,
নীরবে, বাহিরে বসি রয় ;
মশা খায়, হিম লাগে, দেহ জ্বলে যায় রাগে,
বুঝ সবে, মন্দ সাজা নয়।
কাণ পাতি চোর রহে ; কলু, তনয়েরে কহে,—
"শীঘ্র করি, সের ল'য়ে আয় ;"
নীলমণি হতভম্বা, "যা করেন জগদম্বা !"
বলি দ্রুত, আনিবারে যায়।
তখন শুনিয়া চোর, ভাবিল বিপদ্ মোর,
সেরাঘাতে, বাঁচাভার হ'বে ;
কলু পাইয়াছে টের, সন্দেহ নাহিক এর,
পলায়ন চিন্তা করে তবে।
মনে হ'ল মোষকের, প্রথমে চায়নি সের,
বড় ভাগ্য, দেখি এই মোর ;
বড় ধূর্ত্ত কলু বেটা, উহারে আঁটিবে কেটা,
দ্রুতপদে, পলাইল চোর।
বুদ্ধিবলে বনমালী, চোর-চোখে দিল বালি,
বিপদ্-সাগরে বুদ্ধি তরী ;
বুদ্ধি বিনা কার্য্য যা'র, পণ্ডশ্রম হয় তা'র,
বুদ্ধিতে জানিবে, বাঁচি মরি।
ফির বুদ্ধিমান্ সাথে, পদধূলী লহ মাথে,—
সুখ পা'বে, জগত-মাঝারে ;
মূর্খ সঙ্গে ভিড়িও না, তার বুদ্ধি লইও না,
মুর্খজন, ঘৃণিত সংসারে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

একখানি চিত্র।

(সত্য ঘটনাবলম্বনে লিখিত)

"হায় রে! আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটা'তাম চিরদিন মনের যে সাধ।
সোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারত ভূমির।
বিদেশের স্ত্রীপুরুষ এ দেশে আসিত,
পতিব্রতা বলে যারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে, কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে!"

১

বৃটীশ ভারত মাঝে কলিকাতা ধাম—
(ত্রিদিবে অমরা যথা স্থান সুখময়)
ধনে জনে পরিপূর্ণ, সুন্দর সুঠাম
ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী শোভার আলয়।

২

বহুদেশ হ'তে নানা পণ্যদ্রব্য ল'য়ে
বাষ্পরথে জলযানে ব্যবসায়িগণ
আসিছে যাইছে মহা কুতূহলী হ'য়ে—
বিকি কিনি ক'রে সবে লভে বহু ধন।

৩

বিদ্যাবান্ জ্ঞানবান্ কলিকাতা বাসী,
পরম সুখেতে সবে যাপেন জীবন;
রোগ শোক দুঃখ তাপ মনে ভয়বাসি
নগর ছাড়িয়ে যেন করেছে গমন।

৪

হেন কলিকাতা মাঝে, (একটি পল্লীতে)
বসতি করেন এক সুখিত দম্পতী—
যেন কোন দেবদেবী উরিয়া মহীতে,
আনন্দেতে বিরাজেন হ'য়ে ফুল্লমতি।

৫

পতি যিনি, রূপে গুণে বাসব সমান,
সদালাপী মিষ্টভাষী সুন্দর প্রকৃতি;
পরদুঃখে দুঃখী অতি সেই মতিমান্,
সকলে সন্তুষ্ট তাঁর দেখে রীতি নীতি।

৬

সাধুর সুহৃত তিনি অসতের অরি,
পর হিতে—দেশ হিতে সানন্দ অন্তর—
সেই চিন্তা সেই কার্য্য দিবা বিভাবরী;
সাধুকার্য্য সম্পাদিতে চিতে নাহি ডর।

৭

পতি-সমযোগ্য অতি পত্নী গুণবতী—
(যাঁর গুণে মুগ্ধ অতি প্রতিবেশিগণ;)
রূপে পদ্মালয়া সমা, গুণে সরস্বতী—
তাঁর সম নারী বুঝি জন্মেনি কখন!

৮

যেমন সুন্দর মূর্ত্তি—হৃদিও তেমন!
সরলতা যেথানেতে করে বসবাস—
কপটতা স্থান তথা পায় কি কখন?
আলোক সঞ্চারে হয় আঁধার বিনাশ!

৯

সুন্দর বদন খানি সুধার আলয়,
মূর্ত্তিমতী দয়া যেন বিপন্নের তরে,
স্বর্গের করুণা আহা করিয়া সঞ্চয়,
দুই হাতে বিতরেন মরত মাঝারে।

১০

বিদ্যাবতী, লজ্জাশীলা, সুমিষ্ট-ভাষিণী—
একাধারে কত গুণ কে করে বর্ণন!
গৃহ-ধর্ম্মে সদা রত, স্বামি-হিতৈষিণী।
ধন্য ধরাধামে সেই ভাগ্যবান্ জন—

১১

এ হেন মহিলা যাঁর সংসার-সঙ্গিনী!
পত্নীভাগ্য ভাল তাঁর নাহিক সংশয়;

বনিতা হইলে আহা সুখের গৃহিণী,
সকল সময় হয় গেহ মধুময়।

১২
যে আলয়ে এ হেন দম্পতী করে বাস—
সন্দেহ কুচিন্তা তথা স্থান নাহি পায়;
পবিত্রতা সেই স্থানে র'ন বার মাস,
পুণ্যের হিল্লোলে পাপ তাপ দূরে যায়।

১৩
পবিত্রতা তথা বাস করিয়া উল্লাসে
কল্যাণ কামনা সদা করে দম্পতীর;
সে আশীষে শোক তাপ সকলি বিনাশে—
মিহির উদিয়া যথা নাশেন তিমির।

১৪
দাম্পত্য-বন্ধন আহা! সুখের নিধান,
মানব মানবী প্রতি হইয়া সদয়—
এসেছে মরত মাঝে স্বর্গের বিধান,
যা'তে নর নারী হৃদি হয় মধুময়।

১৫
সোণার সন্তান দুটি অতুল সুষমা,
কাল-সহকারে কোলে দম্পতী পাইল;
যে আনন্দ উভয়ের, না হয় উপমা!
পুত্র কন্যা লভি দোঁহে স্নেহেতে ভাসিল।

১৬
সুন্দর কুমার আর কুমারী লইয়া,
সংসারে অতুল সুখ ভুঞ্জে অনুক্ষণ;
অশান্তি কলহ ব্যাধি দীনতা লাগিয়া
কোন ভয় দম্পতীর নাহি কদাচন।

১৭
সহাস্য আস্যেতে উভে সুখী সর্ব্বদাই,
এক আত্মা এক প্রাণ, বিভিন্ন শরীরে;
সোণার সংসারে আর কোন দুঃখ নাই
অভিষিক্ত উভয়েতে সুখ-শান্তি-নীরে।

১৮
পতি পত্নী নয়নের হ'লে অন্তরাল;
বিরহ বিকারে করে ব্যাকুল পরাণ;
মনোমাঝে আসে যেন কতই জঞ্জাল,
সুধাসিক্ত গৃহ যেন অসুখের স্থান!

১৯
কার্য্যান্তর হেতু পতি হ'লে স্থানান্তর,
না হেরিয়া প্রাণেশের মোহন মূরতি—
আকুল হইয়া উঠে সতীর অন্তর,
কত কষ্ট মাঝে যেন নিপতিত সতী।

২০
পুত্র কন্যা দুটি আহা! স্নেহমাখা ধন,
সে সময় হয় যদি কাঁদিয়া আকুল—
অন্য মনে থাকে মাতা না শুনে রোদন,
পতির লাগিয়ে তাঁর হয় হেন ভুল।

২১
শিশুর রোদন ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,—
শশব্যস্তে দাস দাসী আসিয়া তথায়,
সযতনে সে দুটিরে করিয়া গ্রহণ,
শান্ত করিবারে ত্বরা বাহিরেতে যায়।

২২
এমন সময়ে যদি আসে প্রাণেশ্বর
চন্দ্রমা পাইল করে যেন বিনোদিনী;
অমনি নাথেরে নানা করি সমাদর—
স্বামি-শ্রম-শান্তি-হেতু ব্যস্ত সীমন্তিনী—

২৩
কোমল করেতে করি বীজন ধারণ,
ব্যজন করেন হ'য়ে সানন্দ অন্তর;
স্বেদ-সিক্ত মুখখানি মুছি অতঃপর,
পতিরে তোষেন করি মিষ্ট আলাপন।

২৪
পত্নীর লাগিয়া পতি সুখী সর্ব্বদাই,
ধরা যেন বোধ হয় অমরা সমান;
সংসারেরে বোধ হয় সুখময় ঠাঁই,
মূর্ত্তিমতী শান্তি যেন তথা বিদ্যমান।

২৫
ইন্দিরা ভারতী এঁরা সতত দু জনে—
(সপত্নী-বিদ্বেষ-ভাব হইয়া বিস্মৃত,)

সে আলয়ে বিরাজিত হরষিত মনে,
পরস্পর সখী-ভাবে হইয়া মিলিত।
২৬
সোণার সন্তান দুটি লইয়া দম্পতী,
যাপন করেন সুখে দোঁহে কিছু কাল;
নিত্য নিত্য নব ভাবে আনন্দিত মতি,
সংসারেতে কোন রূপ নাহিক জঞ্জাল।
২৭
বিধির বিচিত্র বিধি বুঝিতে কে পারে?
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানিলে মানব,
ধরা অমরার প্রায় হ'ত একাধারে;
দূরে যেত শোক তাপ মানি পরাভব।
২৮
এক দিন পত্নী প্রতি পতি ধীরে ক'ন,—
"হৃদয় কেমন মম হ'তেছে অধীর,
অবিরত করিতেছে মস্তক বেদন,
উত্তপ্ত হয়েছে দেখ সকল শরীর।
২৯
"কণ্ঠতালু হইয়াছে শুষ্ক পিপাসায়,
শীতল সলিল দাও আনি ত্বরা করি;
বাতাস করিয়ে প্রিয়ে, বাঁচাও আমায়
নিদারুণ অঙ্গ-দাহে—ওহো মরি মরি!"
৩০
পতির বিকৃত ভাব করি নিরীক্ষণ,
বিনোদিনী বিধুমুখ বিষাদে ঢাকিল;
স্বামীরে করিতে সুস্থ অনেক যতন
করিল; তথাপি শান্তি কিছু না হইল।
৩১
শয্যা'পরি প্রাণনাথে করা'য়ে শয়ন,
পাশে বসি শশিমুখী নীরবে রহিল,
উত্তপ্ত অঙ্গেতে ধীরে করি হস্তার্পণ।
বিকট বেগেতে জ্বর ক্রমে আক্রমিল!
৩২
গাত্র দাহ শিরঃপীড়া প্রলাপ বচন,
মুহুর্মুহুঃ পিপাসায় বড়ই কাতর—
ইহা দেখি চন্দ্রাননা সজল নয়ন,
ত্বরায় দাসীরে দিয়া ডাকান কিঙ্কর।
৩৩
আপনার পিতৃপাশে পাঠা'তে সংবাদ,
শীঘ্র যাইবারে তারে করিলা আদেশ।
ভাবে—"বিধি আজি কিবা ঘটালে প্রমাদ!
কেমনে হইবে এই পীড়ার বিশেষ?"
৩৪
তৃণাঙ্কুরে পদে যার লাগিলে আঘাত,
হৃদয় পাতিয়া দিত আরাম কারণ;
আজি তার হেন পীড়া হেরি অকস্মাৎ,
বিষম বিষাদে সতী হ'ল নিমগন।
৩৫
ভাবে কত অবিরত আকাশ পাতাল—
"কিরূপে পাইব এই বিপদেতে ত্রাণ?
কেমনে এমন ভাবে কাটাইব কাল?
নাথের হেরিব কবে প্রসন্ন বয়ান?"
৩৬
ভৃত্য-মুখে শুনিয়া অশুভ সমাচার,
বড়ই উদ্বিগ্ন হ'য়ে শ্বশুর সুজন,
ত্বরা করি আসিলেন গৃহে জামাতার,
সঙ্গে করি আপনার কৃতী পুত্রগণ।
৩৭
পিতারে হেরিয়া কন্যা করিয়া রোদন,
বলে—"বাবা, অকস্মাৎ আজি কি ঘটিল?
কেমনে এমন পীড়া হ'বে নিবারণ?
কি লাগিয়া ওগো বাবা! এরূপ হইল?"
৩৮
বিপদে মলিনমুখী দেখি দুহিতায়—
কহেন সান্ত্বনা তরে আশ্বাস বচন;
ইংরাজ ভিষক্ ডাকি আনিয়া ত্বরায়,
জামাতৃর চিকিৎসায় কৈলা নিয়োজন।
৩৯
এইরূপে তিন দিন হইল বিগত—
পীড়ার না উপশম হ'ল চিকিৎসায়;

সকলেই বিষাদিত যেন বুদ্ধিহত;
ক্রমেতে রোগীর আয়ু ফুরাইল হায়!"

৪০

তৃতীয় দিবসে নিশা শেষের সময়,
পীড়িতের প্রাণ-বায়ু হইল নির্গত;
পূর্ব্বেতে আছিল যেই গৃহ সুখময়,
এবে তাহা হ'ল হায় শশ্মানের মত!

৪১

নেত্রের অন্তর হ'লে কান্ত গুণধাম,
পত্নীর হইত জ্ঞান পলকে প্রলয়;
হে বিধি! সতীর প্রতি কেন হ'য়ে বাম,
দহিলে দারুণ তাপে কোমল হৃদয়!

৪২

সেইক্ষণে বন্ধুগণে করি হায় হায়,
(পাষাণে বাঁধিয়া বুক হইয়া তৎপর)
সতীর সর্ব্বস্ব ধন দহিয়া চিতায়,
আসিলা ফিরিয়া গৃহে হইয়া কাতর।

৪৩

সতীর সে শোক সিন্ধু করিতে বর্ণন—
বর্ণমালা খুঁজি বর্ণ হয় অপ্রতুল!
ম্লানমুখী বিধবার করুণ রোদন
শুনিলে, হৃদয়ে যেন বিঁধে যায় শূল!

৪৪

শোকাবেগ কথঞ্চিৎ হ'লে নিবারণ,
কুমার কুমারী দুটি অবলম্ব করি,
বিধিমতে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন,
চিত্তক্ষেত্রে পতি মূর্ত্তি অবিরত স্মরি।

৪৫

এরূপে বিধবা দুটি লইয়া সন্তান,
কিঞ্চিৎ করিলা শান্ত শোকাকুল প্রাণ;
তথাপিও নিরন্তর পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরি,
ব্যথিত করয়ে শোক নব ভাব ধরি।

শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

মৃত বন্ধু।

(উদ্যানে উপবেশন করিয়া আক্ষেপ)

বল্ দেখি মন পাখি!
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
মুখ খানি তার সুধাকর,
কেশগুলি তায় জলধর,
কিবা শোভা মনোহর,
দেখ্‌ছি নয়ন ভ'রে;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
কিবা নয়ন, কিবা নাসা,
কিবা সরল মধুর ভাষা,
না পেয়ে সেই ভালবাসা,
আছি প্রাণে ম'রে;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
হাসি জিনি সৌদামিনী,
যেন বিমল রসের খনি,
হের্‌ব ব'লে দিন রজনী,
সদাই নয়ন ঝোরে;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
জুড়া'তে মোর হৃদয়-জ্বালা,
আস্‌ত হেথায় সাঁঝ সকালা,
যুঁই, চামেলী, বেলের মালা,
গাঁথ্‌ত থরে থরে;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
দেখে আমার বদন ভারি,
সাধ্‌ত কত বিনয় করি,
আবার কত গীত-লহরী,
গাইত মধুর স্বরে,
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে?
অস্ত গেলে দিনকর,
উদয় হ'লে শশধর,

তার কুরেতে দিয়ে কর,
যেতাম নদীর ধারে ;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
তার কোলেতে রেখে মাথা,
ক'তাম কত মনের কথা,
জুড়িয়ে যেত প্রাণের ব্যথা,
যেতাম ফিরে ঘরে ;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
তার বিহনে হৃদয় ফাঁকা,
দেহ-তরু ভগ্ন-শাখা,
তার বিহনে বেড়াই একা,
জগৎ-কারাগারে ;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
কত কথা তার কেটেছি,
কত কি যে তায় বলেছি,
কত ব্যথা তায় দিয়েছি,
তাই কি গেল স'রে ?
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
ইচ্ছে করে নয়ন-পাখী,
উড়ে গিয়ে তায় নিরখি,
বনে গেছে বনের পাখী,
কিম্বা সাগর পারে ;
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
ডাক্‌ছি এত দাঁড়া দাঁড়া,
কই কিছু ত দেয় না সাড়া,
এতই কি তার যা'বার তাড়া,
ফেলে গেল মোরে !
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
যা'ব বটে দু দিন পরে ;
তার বিহনে ধৈর্য্য ধ'রে
এখন রে মন ! কেমন ক'রে
থাক্‌ব ব'সে ঘরে ?
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
মিট্‌লো না মোর মনের আশা,
মিট্‌লো না মোর প্রেম পিয়াসা,
কর্‌বো এখন কার ভরসা,
কে দেবে তায় ধ'রে ?
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?
এ জগতে আছে কি সে !
চলে গেছে আপন দেশে,
থাক্‌লে পরে দেখ্‌ত এসে,
তুষ্‌ত প্রেমাদরে ;
(আমায় তুষ্‌ত প্রেমাদরে।)
বল্‌ দেখি মন-পাখি !
তারে ভুল্‌বো কেমন ক'রে ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

পঙ্কজ-বিক্রয়।

—*—

"বিদ্যা" সমা রূপবতী কৃষকের বালা,
পঙ্কজ বিক্রয়ে চলে মাথে ল'য়ে ডালা।
প্রস্ফুটিত প্রতি পদ্ম মূল্য অর্দ্ধ আনা—
কোরক আনায় ছ'টা নাহি তায় মানা।
মূল্য হাঁকি হেলে দুলে পথে চলে ধনী,
কত খরিদ্দার আসি জুটিল তখনি।
দ্রব্য কিনি মূল্য দিয়া গতিশক্তি হীন,
সরোবর শুখাইলে যে প্রকার মীন !
পদ্ম বেচে ধনী মুখে অঞ্চল ঝাঁপিয়া,
কোরক-বিক্রয় করে ঘোম্‌টা খুলিয়া।

প্রশ্ন।

সুধীগণে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য এখন—
কিবা জান বল দেখি ইহার কারণ ?

উত্তর।

পতিরতা পতিপাশে থাকয়ে যখন,
আনন্দে মগন হ'য়ে থাকে সে তখন।
রবিকরে পঙ্কজিনী হয় প্রফুল্লিতা,
চন্দ্রের কোমল করে কিন্তু সে মুদিতা।
মুখরূপ চন্দ্রোদয়ে (পদ্ম প্রস্ফুটিত)
পাছে কোরকত্ব লভে, হইয়া মুদিত ;
সেই ভয়ে চন্দ্রাননী বস্ত্র টানে মুখে—
ইহাই কারণ সবে বুঝ মনঃসুখে।

অথবা

মুখ-পদ্ম হেরি তার পাছে ক্রেতাগণ
পদ্ম নাহি কিনে, তাই মুখে আবরণ !

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

৩ নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে" শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

অন্তিম মিলন।

(উপন্যাস)

উপক্রমণিকা।

সন ১১৭৬ (ইং ১৭৬৯) সালে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও অকাল মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গদেশ ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ সকল, একেবারে উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ইতিহাসে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে লোকের কষ্ট এতদূর হইয়াছিল যে, এক শত বিংশতি বৎসরের অধিক কাল গত হইল, তথাপি উক্ত মন্বন্তরের নাম ভারত-ভূমি হইতে অদ্যাবধি অপনীত হয় নাই। ক্লাইব বিলাত যাইবার পর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়াছে ও ভেরিলষ্ট সাহেব বাঙ্গালার গবর্ণরীপদে নিযুক্ত আছেন, সেই সময়ে এই নৈসর্গিক ভীষণ উপদ্রব ভারতবাসীদিগের অবশিষ্ট শোণিত বিন্দু শোষণ করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, কোম্পানী বাহাদুরের দেওয়ানি প্রাপ্তির পর, ন্যূনাধিক সাত বৎসর কাল এই দেশ এক প্রকার অরাজক অবস্থাতেই ছিল। জমীদার ও প্রজাগণ দেশের প্রকৃত প্রভু কে, কিছুই জানিত না। দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া নগর ও গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। নবাব নজম্‌উদ্দৌলা মুরসিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, রাজকার্য্যের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু ইংরেজেরা সে সময় এদেশে এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের অভিমতেই অধিকাংশ কার্য্য করিতে হইত। বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহআলম্, বাবরের সিংহাসনে প্রকৃত সাক্ষীগোপালের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, শেষ দশায় নানা প্রকার মনস্তাপে কাল হরণ করিতেছিলেন; এমন কি, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া, কেবল মাত্র কড়া ও এল'হাবাদ এই দুই প্রদেশের উপস্বত্ব ও কোম্পানীদত্ত বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বৃত্তি উপভোগ করিয়া এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। এখন আর তিনি "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বা এই উপাধি গ্রহণের অধিকারী নহেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ পাণিপথের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, প্রায় দশ বৎসর কাল ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে তাহারা নব বলে বলী হইয়া, পূর্ব্বপুরুষ দিগের প্রথানুসারে পুনরায় দেশ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইয়াছে। তাহারা বিন্ধ্যাচল উল্লঙ্ঘন করিয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিতেছে ও কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ও কোন স্থানে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড সমুপস্থিত করিয়া, স্বকীয় ইষ্টাভিসন্ধি পূর্ণ করিতেছে। চারিদিক হাহাকারে পরিপূর্ণ, ঐ আসিল, ঐ মারিল, ঐ কাটিল,—এইরূপ নানাপ্রকার গগনভেদী ভয়োৎপাদক শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সময়ে আবার জমীদারগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ উৎপাদন পূর্ব্বক "জোর যার মুল্লুক তার", এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। কাহারও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, আর কেহ বা কয়েক টা

বৃক্ষ প্রোথিত অথবা কয়েকটা মৃত্তিকার স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, পরের বিষয় আত্মসীমান্তর্ভূত করিতেছে। এখন রাজ্য না কোম্পানীর না নবাবের। দীন ভাবাপন্না ভারত-মাতা, উপর্য্যুপরি শত্রু প্রপীড়িত হইয়া উষ্ণ নিশ্বাস মোচন করিতেছেন, ও এক একবার সকরুণ নয়নে সেই বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

এই ত ভারতের অবস্থা,—তাহাতে আবার অন্নাভাবে নিত্য নিত্য অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে গ্রাম সকল এতাদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, তাহা মনে মনে একবার অনুভব করিয়া দেখিলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। নদীতট, প্রান্তর, পথ প্রভৃতি অনাবৃত স্থানে রাশি রাশি মৃত দেহ সকল পতিত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত পান্থগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে। কে বা মৃত ব্যক্তিগণের সংকার করে, কেবা মুমূর্ষুগণের মুখে জলদান করে! সকলেই স্ব স্ব জঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে ব্যস্ত। এমন কি, পিতা মাতাও সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা-শূন্য হইয়াছে; শিশু সন্তানগণ উদরের জ্বালায় গগণভেদী স্বরে ক্রন্দন করিতেছে, তথাপি মাতা সেই ক্রন্দনে বধির হইয়া স্বীয় ক্ষুধার শান্তি করিতেছে; কোথাও বা শিশু মৃত মাতাকে সজীব জ্ঞানে তাহায় স্তন্যপান করিতেছে ও দুগ্ধ না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; কোথাও বা পিতা দুই চারিটি আম্র বা এক মুষ্টি তণ্ডুলের নিমিত্ত স্বীয় সন্তান সন্ততিগণকে খৃষ্টীয়ান-করে সমর্পণ করিতেছে। কোথাও বা মাতা সন্তানের উদর পূরণে অসমর্থ হইয়া তাহাকে গঙ্গার স্রোতে নিক্ষেপ করিতেছে! মাঠে তৃণ নাই, বৃক্ষে পত্র নাই, সরোবরে জল নাই—সকলই নিঃশেষিত হইয়াছে। গাভিগণ তৃণাভাবে হাম্বারবে ইতস্ততঃ ধাববান হইতেছে ও কখন কখন গৃহাচ্ছাদন বিচালি বা গুয়া-পত্র দর্শনে লোলুপ হইয়া গ্রীবা উত্তোলন করিতেছে। হায় কি অসম্ভব দৈব দুর্ব্বিপাক! স্বভাবের কি বিচিত্র গতি! "আজ অমুকের ঘরে দুইটি মরিল, কাল অমুকের ঘরে চারিটি মরিল, পরশ্ব অমুকের ঘরে ছয়টি মরিল,"—এই রূপ হৃদয়-বিদারণ বাক্যই প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রুত হইতেছে। নদী-তটে অসংখ্য আবাল বৃদ্ধবণিতাগণ পালে পালে উপবিষ্ট রহিয়াছে ও সতৃষ্ণ নয়নে দূরস্থ তণ্ডুল বাহী নৌকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। আহা! তাহাদের শরীর এতাদৃশ জীর্ণ শীর্ণ ও বদন-মণ্ডল এতাদৃশ ম্লান যে, তাহারা পরস্পরে চির পরিচিত হইয়াও পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছে না। তাহা দিগকে দেখিলে মৃত্যুর যথার্থ আদর্শ হৃদয়াঙ্গম করা যায়।

বঙ্গের অবস্থা এইরূপ। যাহা হউক, এক্ষণে ঐতিহাসিক বিবরণ লইয়া অধিকক্ষণ আন্দোলন করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ, আমাদের নব্য পাঠক বৃন্দ সম্বৎসর মধ্যে এমন কি দশ বার খানা ইতিহাস মুখস্থ করিয়া এক প্রকার আক্রান্ত হইয়া আছেন; তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, একি বাপু, মনের শুষ্কতা অপহরণ করিবার নিমিত্ত পয়সা দিয়া উপন্যাস ক্রয় করিলাম, এর মধ্যে ও আবার ইতিহাস, এর মধ্যেও আবার সাল, বৎসর, নবাব, বাদসা! কেহ মনে করিতে পারেন যে, পুস্তক খানির কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্যই কেবল কতকগুলা ঐতিহাসিক কথা লিখিয়া কয়েক পাতা পূর্ণ করিয়াছে। এই

নানা প্রকার মনে করিয়া, আমার এই বহু-আয়াস-সাধ্য পুস্তক খানি টান মারিয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিতে পারেন। কিন্তু ইহা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে দেশ, কাল, পাত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ না বলিলে, বিষয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়াঙ্গম করা যায় না, এই নিমিত্তই দুই এক কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাওয়া। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা ঐতিহাসিক বর্ণনায় নিরস্ত হইলাম। ইতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—*—

গঙ্গা-বক্ষে।

বৈশাখ মাস যায় যায়, ভয়ানক গ্রীষ্ম। এমন কি সায়ংকাল উপস্থিত প্রায়, তথাপি চতুর্দ্দিক যেন অগ্নিময় হইয়া রহিয়াছে। থেকে থেকে বাতাস এমন গরম বহিতেছে যে, গাত্রে লাগিলে বোধ হয়, যেন আগুনের হল্কা। সে যাহাই হউক, বিষয়ী লোকের বিষয় কর্ম্ম ত আর বন্ধ যাইবার নয়। ঈশ্বর যাহাকে যতটুকু দিয়াছেন, সে সাধ্যমতে ততটুকুই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রাম লইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে হুগলীর বোল ঘাটে এক খানি ছয়-দাঁড়ে ভাউলে বাঁধা। ভাউলে খানি দেখিতে অতি পরিপাটী, দেখিলে বোধ হয় যেন কোন বড় মানুষের। দাঁড়ী ও মাঝি সকলেই এ দেশীয়। ভাউলের ভিতর সওয়ারি নাই। দাঁড়ীরা কেহ গীত গাইতেছে, কেহ তামাকু সেবন করিতেছে;—ফলতঃ সকলেই এক একটা কার্য্যে ব্যাপৃত আছে, কেহ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি যুবক দুই তিন জন ভার বাহকের মস্তকে কতকগুলি তণ্ডুল ও কতকগুলি তরি তরকারি লইয়া ঘাটে আসিলেন এবং মাঝিকে কহিলেন,—"সমস্ত ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দাও, এ গুলি অনেক টাকায় খরিদ হইয়াছে, দেখ যেন কোন ক্রমে তশ্রূপ্ হয় না। কাল সকালে দরজায় কত কাঙালী জমায়েৎ হ'বে যে, তার সংখ্যা নাই",—এই বলিয়া তিনি ভার বাহকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন এবং একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মেঘ করিয়া আসিল এবং শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। যুবক দেখিলেন আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়, তৎক্ষণাৎ নৌকায় উঠিয়া বলিলেন,—"ওরে নফ্রা! বড় মেঘ করেছে, নৌকা খুলে দে, নৈহাটী যেতে আর কত দেরি হ'বে?" নফর বলিল,—"না ছোট বাবু! এখন নৌকা ছাড়া হ'বে না, আকাশের গতিক বড় ভাল বুঝ্‌ছি নে",—এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতে হইতে হঠাৎ একটা ঝড় তুলিয়া চারি দিক ধূলায় অন্ধকার করিয়া ফেলিল। সকলেই বলিয়া উঠিল,—"তাই ত দেবতা আবার কি কল্লেন্" যুবক উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলেন,—"যা' হোক্ আলো জ্বাল্, সন্ধ্যা হয়েছে, ঝড় থাম্‌লে তবে রওনা হওয়া যা'বে,—সকল বিষয়েই বাগ্‌ড়া। হুগলীর অমন বাজার—বাজারে কিছু নেই; যা' কিছু আছে সমস্তই অগ্নি মূল্য",—এই কথা বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন এবং কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। যুবকের বয়ঃক্রম আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, মুখে বেশ গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ আছে, দেখিলেই বোধ হয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূত।

ক্রমে বড় বড় ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির চট্‌পট্‌ শব্দের সহিত আর একটা যেন কি শব্দ সকলের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল; কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল না। রাস্তায় ও জন মানব নাই। তবে কিসের শব্দ? কাহার কণ্ঠ ধ্বনি? সকলেই কাণ পাতিয়া মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। ক্রমে স্পষ্টই শুনা গেল,—"ওগো কে আছো রক্ষা কর!—সাএব্!—সাএব্!—ওগো আমাদের গোরায় তাড়া করেছে! শীগ্‌গীর বেরোও কে আছ!"—এই রূপ চীৎকার করিতে করিতে দুইটি স্ত্রীলোক আলুলায়িত কেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিগেই দৌড়িয়া আসিতেছে। যুবকের চিন্তা ভঙ্গ হইল। চক্ষু আরক্ত বর্ণ হইল। তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়া বন্দুক হস্তে ছৎরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সোনার দেশটা ছার-খার হ'ল, দেশের লোকেরাই দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে"।

কামিনীদ্বয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে নৌকার-দিকেই ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া, তাহাদিগকে আশ্বাস-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"ভয় নাই, ভয় নাই! তোমরা এই দিকেই এস, পাষণ্ডেরা কি করে দেখি"—

কামিনীদ্বয় প্রায় নৌকার কাছে আসিয়া পড়িল, এমন সময় অদূরে দেখা গেল কয়েকটা গোরা বেগে দৌড়িয়া আসিতেছে। একে সন্ধ্যা হইয়াছে, তাহাতে আবার জলদ-মালায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না যে, তাহারা সংখ্যায় কয় জন। রমণীদ্বয় ভয়ে ও পরিশ্রমে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং যুবকের আশ্বাস বাক্যে অন্তঃকরণে আর কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া নৌকার ভিতরে গিয়া লুকাইল এবং মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, চারিটা নীচ বংশোদ্ভব গোরা মদ্যপান করিয়া, মহা গোলযোগ করিতে করিতে, নৌকার অনতিদূরে আসিয়া পড়িয়াছে; যুবক আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত বন্দুক উত্তোলন করিয়া দুইটি ফাঁকা আওয়াজ করিলেন, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া দুরাত্মারা আর অগ্রসর হইল না; অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে পথ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইল। যুবকও নিরস্ত হইলেন।

দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টি হইয়াই থামিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মেঘ-মালা অপসৃত হইয়া গেল। ভগবান্ চন্দ্রমা পারিষদবর্গের সহিত গগন-মণ্ডলে উদিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে অমৃত-ধারা বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, দিনমানে গ্রীষ্ম প্রভাবে প্রাণ যেরূপ আই ঢাই করিতেছিল, সেটা অনেকটা নিবারণ হইল। যুবক দেখিলেন আর কোন গোলযোগ নাই, এইবার নৌকা খুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু খুলিয়া দিবার পূর্ব্বে একবার কামিনীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাঁহারা কি করিবেন, তাঁহার সহিত নৈহাটী যাইবেন কি হুগলীতেই প্রত্যাগমন করিবেন। স্ত্রীলোক দুইটি, একে ত ভয়ে ও পরিশ্রমে নিতান্তই আক্রান্ত, তাহাতে আবার বন্দুকের ভয়ানক শব্দে তাহাদের কর্ণ একেবারে যেন বধির হইয়া গিয়াছে ও বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া উঠিতেছে। "যাহাই হউক না কেন, জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে। এ বড় বিষম সমস্যা—কাহার কুলবধূ লইয়া

আমি নৈহাটী যাইব?" অন্তঃকরণে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা এখন কি বাড়ী যেতে পার্‌বেন? আমি যদি সঙ্গে লোক দিই, তা' হ'লে বোধ করি বাড়ী যাইবার কোন আপত্তি নাই?"—এই কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতেই, দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল,—"ঐ লাও ছোট বাবুর কথা শুন্‌লে! আমরা আবার গোরাদের হাতে প'ড়ে মারা যাই আর কি! তাও কি হ'য়ে থাকে!" যুবক তাহাদের কথায় ঈষৎ হাস্য করিয়া রমণীদ্বয়কে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি আজ্ঞে করেন?"—যুবক পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে তন্মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা রমণী উত্তর করিল,—"মহাশয়! আমাদের বাড়ী এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ হ'বে, আমাদের এত ভয় কচ্চে যে, আমরা বোধ করি এক পা ও চল্‌তে পার্‌ব না; আপনি আমাদের আজ সঙ্গে করে নিয়ে যান, কাল সকালে বাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।" যুবক পুনরায় বলিলেন,—"তবে আপনারা আমাকে একটু খানি পরিচয় দিন, আপনারা কোথায় থাকেন, কার কন্যা। বয়ঃজ্যেষ্ঠা উত্তর করিল,—"আমাদের বাড়ী ঘোষাল পাড়ায়, যিনি আমার সঙ্গে ইনি ঘোষাল বাবুর মেয়ে, আর আমরা জেতে কায়স্থ; আমার বাপ মা কেউ নাই, আমি ওঁদের বাড়ীতেই থাকি।" যুবক সমস্ত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নফরকে বলিলেন,—"কি বলিস্ নফ্‌রা? সব ত শুন্‌লি,—এখন তবে দুর্গা বলে নৌকা খুলে দে, মায়ের মনে যা' আছে তাই হ'বে, অনেক কাজ আছে ভাবলে আর কি হ'বে?" নফর বলিল,—"এজ্ঞে ছোট বাবু, তা বৈকি, আপ্‌নি আর্ কি কর্‌বেন? কাল সকালে য'া বুঝ্‌বেন! তাই কর্‌বেন, এখন নৌকা খুলে দেই।"

নফর নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা চলিল। যুবক নৌকার বাহিরে ও রমণীদ্বয় ভিতরে বসিলেন; নৌকা খুলিয়া দেওয়াতে কনিষ্ঠার চক্ষে জল আসিল। তিনি জ্যেষ্ঠার অঞ্চল দৃঢ়-রূপে ধরিয়া রহিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুবতী। কনিষ্ঠার বয়স ষোড়শ বর্ষের অধিক হইবে না,—পরিষ্কার গৌর বর্ণ, মুখশ্রী অতি সুন্দর বাম ভুরু একটু কাটা,—তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জ্যেষ্ঠার বয়ঃক্রম ২০।২২ বৎসর হইবে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, মুখশ্রীও মন্দ নয়, নিখুঁত করিয়া দেখিতে গেলে কোন কোন অঙ্গে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মোটা মোটি দেখিলে কেহ 'ছি' বলিতে পারিবেন না। কিন্তু যতই দেখিতে ভাল হউক না কেন, পরিধানে সাদা ধুতি, ও গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই। ফলতঃ, পাঠক মহাশয়, এইরূপ মূর্ত্তিকে আপনি 'ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি' বা 'জ্বলন্ত অঙ্গার' উভয়ই বলিতে পারেন।

অনুকূল বায়ু-ভরে নৌকা যতই দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, কনিষ্ঠার বদন-মণ্ডল ততই মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে সঙ্গিনীর প্রতি অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"সহচরি কি হ'বে?"

সহ। ভাবিস্ কেন গিরিবালা? বাবু কেমন ভদ্রলোক দেখ্ দেখি।

গিরি। আমার বড় ভয় কচ্চে, প্রাণের ভেতর যেন কেমন কেমন কর্‌ছে।

সহ। একটু বস্‌না স্থির হ'য়ে, গঙ্গার জলে চাঁদের আলো প'ড়ে, কেমন শোভা হয়েছে দেখ্ দেখি।

গিরি। ও কি ছাই এখন দেখ্‌তে ইচ্ছে করে?

সহ। কাল সকালেই উনি রেখে আস্‌বেন, ভয় কি?

গিরি। ঐক লহমাই যে এক যুগ—

সহ। শিবের ঘরে বাতি দিতে এসেই ত এত হলো।

গিরি। হে যোগেশ্বর! হে ঠাকুর! তুমি যে সবার ত্রাণ কর্ত্তা; অবলা কি অপরাধ কল্লে ঠাকুর!

সহ। একটু স্থির হ'না গিরিবালা। এমন ক'রে কাঁদ্‌লে কি হ'বে বল্‌ দেখি?

গিরি। কান্না যে আপনি বেরিয়ে আসে। বাবা মা কি মনে কচ্চেন—কত ভাবচেন্‌।

সহ। তা আমাদের পাড়ার বোসেদের বাড়ীর ন গিন্নী ত দেখে গিয়েছে, একটা খবর তঁারা পাবেনি এখন, তার ভাব্‌না নেই।

গিরি। আমরা কোথায় গেলুম, তা'ত আর তাঁরা জান্‌তে পার্‌বেন না।

সহ। যা অদৃষ্টে আছে তাই হ'বে, তা আর কেঁদে কি কর্‌বি?

গিরি। হে মহেশ্বর, এই কল্লে!

—এই কথা বলিয়া গিরিবালা অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার স্বভাব সরল, সহচরীর একটি কথাও তাঁর ভাল লাগিল না। তিনি কেবলই ভাবিতে লাগিলেন বাবা কি মনে কচ্চেন, মা কত ভাব্‌চেন, স্বামী এতক্ষণ বাটীতে আসিয়া কি করিতেছেন,—এই সকল নানা চিন্তা বশতঃ তিনি অনবরতই বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন। যুবক এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্তই ব্যথিত হইলেন এবং নানাবিধ আশ্বাস-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কি করেন, তাঁহার ও ত বিপদ অল্প নয়। জগৎ অতি কঠিন, জগৎ কখনই গুণগ্রাহী নহে,—যুবক ইহাই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। উদার চরিত্র ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণে এরূপ অবস্থায় এরূপ চিন্তার উদ্রেক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু আর একটি গভীরতম চিন্তায় যুবকের বদন-মণ্ডল একেবারে ম্লান-ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি সহচরীর মুখে গিরিবালার পিতার নাম শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রকাশ ভয়ে কেবল ভাব গোপন করিয়া অন্যান্য কথায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। "কেন যে খাল কাটিয়া লোণা জল আনিলাম, কেন যে আপন পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিলাম, অদ্য প্রাতে যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম,"—যুবক এই সকল কথা, চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে নৌকা নৈহাটীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক নামিলেন; এবং কামিনীদ্বয়ও অগত্যা নামিলেন। দাঁড়ীদের মস্তকে তণ্ডুলাদি দিয়া তিনি যুবতী-দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বাটীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার প্রিয় বয়স্য অরুণ বাবুর সহিত দেখা হইল। অরুণ বাবু গঙ্গা-তীরে বায়ু সেবন করিতে যাইতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রতাপচন্দ্র এত রাত্ যে?" প্রতাপ বাবু উত্তর করিলেন,—"সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ভাই?"—এই বলিয়া রমণীদ্বয়ের সহিত বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিষম বিভ্রাট।

রজনী অন্ধকারময়। চতুর্থীর চন্দ্র কিয়ৎক্ষণ মাত্র প্রভা প্রকাশ করিয়া অস্তাচলের শিখর-দেশ আশ্রয় করিয়াছেন। পুঞ্জ পুঞ্জ তারাকাই কেবল গগন-মণ্ডলের শোভাসম্পাদন করিতেছে। পথি মধ্যে জন মানবের সমাগম নাই। কেবল অনবরত ঝিল্লিরব শ্রবণ গোচর হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটা কুক্কুর ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। এমন সময়ে, বটবৃক্ষ-মূলে তিনটি পুরুষ দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে একটি প্রৌঢ় ও অপর দুইটি যুবা, সকলের হস্তেই মোটা লাঠি—কেবল তৃতীয় ব্যক্তির বাম হস্তে একটি জ্বলন্ত মশালও রহিয়াছে। ইহাঁরা কে? কি পরামর্শ করিতেছেন এবং কাহারই বা অন্বেষণ করিতেছেন? প্রৌঢ় ব্যক্তির বয়ঃক্রম প্রায় ৫৫ বৎসর হইবে, মূর্ত্তি অতি ভীষণ, যেমন দীর্ঘাকার তেমনি আবার স্থূলকায়; প্রথম যুবকের বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চবিংশতি, দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু উদ্ধত স্বভাব এবং তৃতীয় ব্যক্তির বয়স পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না,—কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে লম্বা লম্বা চুল, শরীরের আয়তন দেখিলে বয়স কিছু বেশি বোধ হয়। ফলতঃ, তাহাকে দেখিলে একজন 'পাইক' বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। পাটক মহাশয়! আপনি কি চিনিতে পারিয়াছেন, ইহারা কে? যদি না চিনিতে পারিয়া থাকেন, ক্রমে বলিয়া যাইতেছি।

এ দিকে, রাত্রি ক্রমে ৮ ঘটিকা হইল, এখনও গিরিবালা ও সহচরী বাটী আসিল না কেন?—ব্রাহ্মণী মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন এবং কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছেন না, এমন সময় বোসেদের বাটীর ঐ ন গিন্নী আসিয়া তাঁহাকে খবর দিলেন যে, "উহাদিগকে গোরায় তাড়া করিয়াছিল, উহারা যে কোন পথে গিয়াছে তাহা আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু তাহারা যে চীৎকার করিতে করিতে দৌড়িয়াছে, তাহা আমি শুনিতে পাইয়াছি'।"

এই দারুণ সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার স্বামী এবং জামাতা উভয়েই কর্ম্ম-স্থল হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে এত ক্রন্দনের রোল কেন উঠিয়াছে, ইহার কোন তথ্যানুসন্ধান করিতে না পারিয়া, তাঁহারা একেবারেই ব্রাহ্মণীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। "কি হইয়াছে? কি হইয়াছে? কেন কাঁদ, কেন কাঁদ?"—এই রূপ বার বার জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণী সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করিলেন এবং বলিলেন,"—"শীঘ্র যাও আমার গিরিবালাকে লইয়া আইস, আমার গিরিবালাকে না পাইলে আর আমি একদণ্ড বাঁচিব না।" মহা বিভ্রাট! সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া ঘোষাল মহাশয় একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিয়া জামতাকে বলিলেন,—"অম্বিক বাবু! আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে, ছেদিকে ডাকিয়া মশাল প্রস্তুত করিতে বলুন। অম্বিক

বাবু কিছু উদ্ধত স্বভাব। তিনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। তাঁহার চক্ষুঃদ্বয় আরক্তবর্ণ হইল। কি করেন শ্বশুরের সম্মুখে অধিক কিছু বলিতে না পারিয়া, কেবল এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হই-লেন,—"একে এই অরাজক, তা'তে আবার এক দিকে বর্গীর হাঙ্গাম, আর দিকে গোরার হাঙ্গাম, এমন দিনে সন্ধ্যার সময় বাড়ীর মেয়ে ছেলেদের বাহিরে পাঠান কি ভাল হয়েছে?"

ব্রাহ্মণীর ক্রন্দন আবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঘোষাল মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া জায়াকে সান্ত্বনা করিবার অশেষ বিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে অম্বিক বাবুর ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সরোষে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনারা খালি কাঁদ্‌তেই শিখেছেন, আগে বিবেচনা ক'রে কাজ করা হয় নি কেন?" ঘোষাল বাবু জামাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখ বাবা! যা' হয়েছে তার ত আর চারা নাই, এখন যা'তে তাদের খুঁজে পেতে আনতে পার তার একটা উপায় কর।" অম্বিক বাবু কি করেন, শ্বশুরের অনুনয়ে ও নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে, বাহির কক্ষে ছেদীকে উঠাইতে গেলেন। প্রভুভক্ত ছেদী অম্বিক বাবুর মুখের সমস্ত সমাচার জানিতে পারিয়া রোষকষায়িত লোচনে এক লম্ফে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে মালসাট্ মারিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং যষ্টি আস্ফালন করিয়া কহিতে লাগিল,—"জামাই বাবু! এই গাছি যতক্ষণ হাতে আছে, যত বেটাই আসুক্, মাথা নিয়ে কেও আর ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। অম্বিক বাবু বলিলেন,—"শীঘ্র মসাল জাল—দেরি হইলেই সর্ব্বনাশ।" ছেদী মুহূর্ত্ত মধ্যে মসাল জালিয়া প্রভুকে বাটীর ভিতর হইতে লইয়া আসিল এবং তিন জনে গিরিবালা ও সহচরীর অন্বেষণে চলিল। বাটীর বাহিরে আসিয়া প্রায় এক পোয়া পথ চলিয়া গিয়া শিবালয় সম্মুখস্থ বট-বৃক্ষ-মূলে দণ্ডায়মান হইল।

এখন পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন ইহারা কে? এই প্রৌঢ় ব্যক্তিই গিরিবালার পিতা, ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত দামোদর চন্দ্র ঘোষাল (দামু ঘোষাল) দ্বিতীয় ব্যক্তি কে তাহা অগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন,—ইনি ঘোষাল মহাশয়ের জামাতা, ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ হালদার এবং তৃতীয় ব্যক্তি ছেদী পাইক।

এস্থলে ঘোষাল মহাশয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইনি একজন দেশের মান্য গণ্য ব্যক্তি। প্রায় পাঁচ ৫ বিঘা জমীর উপরে ভদ্রাসন, বাটীর পশ্চাতে প্রকাণ্ড আম্র বাগান, ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে আরও বড় বড় বাগান আছে, প্রায় দুইশত বিঘা ধান-জমী, পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য, দশ বারটা গাই; ফলতঃ, পল্লীগ্রামে যাহা থাকিলে ধনাঢ্য বলা যাইতে পারে, দামোদর বাবুর সে সমস্তই আছে। আবার এদিকে দানশক্তি ও বিলক্ষণ আছে। প্রত্যহ অনেকগুলি লোককে অন্ন দিয়া থাকেন। এ সমস্ত গুণ সত্বে ও লোকের কাছে ইহাঁর একটা ভয়ানক বদনাম আছে। পল্লীস্থ সকলেই (যদিও সম্মুখে কিছুই বলিতে পারে না,) কাণাকাণি করিয়া থাকে যে, দামু ঘোষাল ডাকাইত দিগের সর্দ্দার। কিন্তু এমন গুপ্তভাবে ইনি ঐ সকল কার্য্য করিয়া থাকেন যে, কেহই ঘুণাক্ষরে তাহা জানিতে পারে না।

দাস দাসিগণ এমন বিশ্বাসী যে, কেহ তাহাদিগকে কোন ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও সাহস করে না, সুতরাং এ সকল কথা কেহই জানিতে পারিত না। কিন্তু পাপকার্য্য চিরকাল অপ্রকাশ থাকিবার নয়; গোপাল মাইতি নামক তাহার এক জন প্রজা দৈবাৎ এক দিন তাঁহার চণ্ডী-মণ্ডপের পশ্চাৎভাগের জানালায় মুখ ব'ড়াইয়া ছিল, তাহাতে সে দেখিতে পাইল যে ন্যূনাধিক ২৫।৩০ খানি তরবারি শাণিত হইতেছে। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কর্ত্তা বাবু! ও গুলি কি?" তাহাতে দামু ঘোষাল আন্তরিক রুষ্ট হইয়া "ও সব কিছু নয়, ও সব কিছু নয়",—বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। গোপাল শাদাসিদে লোক, জমীদার বাবু বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া তথা হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট গল্প করিতে ছাড়ে নাই। তাহাতেই সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, দামু ঘোষাল ডাকাইত দিগের সর্দ্দার। সে যাহা হউক, এখন ল্যাজে পা পড়িয়াছে, কন্যাটি নিরুদ্দেশ। কাযে কাযেই আস্তে ব্যস্তে অন্বেষণে বাহির হইতে হইয়াছে। ঘোষাল মহাশয়ের এক পুত্র, নাম চণ্ডীচরণ। বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের অধিক নয়। সে দেখিল পিতার সহিত মিথ্যা কর্ম্মভোগ করিতে গিয়া আর কি হইবে, বরং বেশ্যালয়ে গিয়া মদ্যপান করিলে কাজ দেখিবে,—এই ভাবিয়া সে কোন ক্রমেই ভগ্নীর অন্বেষণে বাহির হইল না। ঘোষাল মহাশয় পুত্রকে বরাবর আদর দিয়া আসিয়াছেন, এখন সে কেমন করিয়া আর তাঁহার কথায় বাধ্য হইবে? চণ্ডীচরণ কোন ক্রমেই তাঁহার সহিত আসিল না, অতএব তিনি কি করেন, জামাতা ও ছেদী পাইককে সঙ্গে করিয়াই, এই ঘোর অন্ধকারে কন্যার অন্বেষণে বাহির হইলেন। কোন দিকে গেলে গিরিবালার উদ্দেশ পাইবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অম্বিক বাবু বলিলেন,—"এই ত শিবের মন্দির, এখন কোন দিকে যাওয়া যায়?"

দামো। চল দেখি এই বাঁ দিগের রাস্তা ধ'রে যাওয়া যা'ক্—ছেদী ভাল ক'রে মশাল ধর্।

ছেদী। কর্ত্তাবাবু! মশাল আর বড় টিক্‌চে না। হাওয়া জোরে বইছে।

বাম দিকের পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে করিতে, ঘোষাল মহাশয় অনবরত ও গিরিবালা! ও সহচরি!"—"বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিতে ডাকিতে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল,—মুখ বিবর্ণ হইল,—কিন্তু কাহার ও কোন উত্তর পাইলেন না। কেবল প্রতিধ্বনিই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার সহিত "ও গিরিবালা! ও সহচরি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কোন ও উত্তর পাওয়া গেল না, কি করেন, কোথায় যান, ফলতঃ কোন দিকে তাহারা গিয়াছে তাহার একটা স্থিরতা না থাকিলে, বৃথায় পথ পরিভ্রমণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ছেদী পাইক অগ্রে অগ্রে মশাল লইয়া যাইতেছে, তৎপশ্চাতে দামোদর বাবু ও তৎপশ্চাতে অম্বিকবাবু। বায়ু বিতাড়িত হইয়া মশাল কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছে, কখনও বা দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হইতেছে। এক বার মশাল উত্তোলন করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে ছেদী অদূরে দেখিতে পাইল যে, চারিজন গোরা পথপার্শ্বে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় অবস্থিত হইয়া

হাস্য ও আমোদ করিতেছে। তাহার নিকট দুই একটা মদের বোতল ও রহিয়াছে। তৎ-দর্শনে ছেদী প্রভুকে কহিল,—"কর্ত্তাবাবু! এই বার মিলেছে।" দামোদর বাবু আস্তে ব্যস্তে কহিলেন,—"কি কি ব্যাপার কি? ব্যাপার কি? দেখ্‌তে পেয়েছিস্ নাকি?" ছেদী কহিল,—"আজ্ঞে তা নয়, যারা তাঁদের তাড়া করেছিল তারা ঐ পথের ধারে শুয়ে রয়েছে।" দামোদর কহিলেন,—"চল দেখি ওদের জিজ্ঞাসা করা যা'ক্, আসুন অম্বিকবাবু! ওদের সঙ্গে ঝগড়া না ক'রে ভাব সাব ক'রে কথাটা বা'র ক'রে নেওয়া যা'ক্।"

তিনজনেই তাহাদের সম্মুখীন হইলে, গোরারা উদ্ধত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই বাঙ্গালী লোক! টুম্‌লোক্ বিবিলোক্‌কো ভেকা হ্যায়—বিবিলোক কিডার্ গিয়া?"—এই অসঙ্গত প্রশ্নে উদ্ধত স্বভাব অম্বিক বাবু একেবারেই যষ্টি উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে মারিতে গেলেন। তাহাদের তখন মুষ্ট্যাঘাত সম্বল। চারিজনেই অম্বিক বাবুর প্রতি ধাবমান হইল। মহা বিভ্রাট! একে এই বিপদ—তাহার উপর আবার এই হাঙ্গাম। "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি"। জামাতাকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া দামোদর বাবু ছেদীকে ইঙ্গিত করিলেন। ছেদী একে চায়, তাহাতে আবার প্রভুর আজ্ঞা। সে মশাল বৃক্ষ কোটরে প্রোথিত করিয়া, দীর্ঘ যষ্টি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক লম্ফে গোরাদের সম্মুখে গিয়া পড়িল, এবং দুই আঘাতে দুইটাকে ভূমিসাৎ করিল। তাহাদিগকে অচৈতন্য অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া, অপর দুইটা যথাসাধ্য বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সকলেই তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময় মস্ মস্ জুতার শব্দ শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল; এবং বৃক্ষান্তরাল হইতে খণ্ড খণ্ড আলোক-প্রভা দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। ক্রমে জুতার শব্দ আর ও অধিক শুনা যাইতে লাগিল। দামোদর বাবু দেখিলেন ছেদীর যষ্টিতে শোণিত লিপ্ত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাহাকে বাটীর অভিমুখে পলায়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ছেদী পলায়ন করিল।

দামোদর ও অম্বিকবাবু মৃতদেহ দুইটার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া তফাতে দাঁড়াইলেন এবং মশাল নির্ব্বাণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দল প্রহরী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং "ডাকু হ্যায়! ডাকু হ্যায়!" বলিয়া তাহাদিগকে ধরিল এবং তাহাদের হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইয়া উভয়কেই পীঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ইঙ্গিতজ্ঞ ছেদী প্রভুর ইঙ্গিতে বিপরীত পথাবলম্বন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিল বটে, কিন্তু বংশস্তম্ভ মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিল এবং হতাশ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহিণীর নিকট সমস্ত সমাচার নিবেদন করিল, তৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া গৃহিণী একেবারে প্রমাদ ভাবিয়া ভূতলে পতিতা হইলেন; এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে পুলিশ প্রহরিগণ দামোদর ও অম্বিক বাবুকে থানায় লইয়া চলিল। বিষম বিভ্রাট!



স্তোত্র।

—*—

(লঘু-ত্রিপদী)

—:*:—

জয় ভগবান্! সর্ব্ব শক্তিমান্,
তুমি অখিলের পতি;
ভূতল, আকাশ, করিছে প্রকাশ,
তোমার মহিমা-জ্যোতিঃ
গভীর সাগর, গর্জ্জি ভয়ঙ্কর,
বোষিছে তোমার গুণ;
শাখীর শাখায়, বসি কত গায়
পক্ষী—গীত-সুনিপুণ।
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, নহে প্রভো কারা?
তব আজ্ঞাধীন সবে;
তব ইচ্ছামত, কার্য্য করি যত,
সাধেন মঙ্গল ভবে।
নদ নদী কত, তরু লতা যত,
সকলি তোমার সৃষ্টি—
তব আজ্ঞাধীন, হয় রাত্রি দিন,
গ্রীষ্ম আদি, শীত, বৃষ্টি।
নিখিল ভুবন, জীব জন্তুগণ,
তুমিই পালন কর';
নাহি মম জ্ঞান, অধম সন্তান,
অজ্ঞান-তিমির হর'।
অধম-তারণ, পতিত-পাবন,
ধরেছ হে নাম যদি;
দিয়ে পদ-তরী, তরাও শ্রীহরি,
অকূল এ ভব-নদী।
তব পদে মতি, রাখি, হয় গতি—
না ভুলি তোমার শিক্ষা;
শেষের সে দিনে, দেখা দিও দীনে,
দাস মাগে এই ভিক্ষা।

শ্রীকিশোরী বল্লভ রায়।

যেমন গুরু তেমনি চেলা!

(একটি মজার কথা)

—*—

(১)

কিসে হ'বে ধন, মান কিসে হ'বে যশ,
কেমনে সকলে মোর হ'য়ে র'বে বশ,
এই রূপ কত আশা মানবের মনে—
কেবা নাহি ঘুরে মরে আশার ছলনে?
শেষ হ'য়ে এলে আয়ু, তবু দেখ আশা-বায়ু
প্রবল হইবে, কভু না পায় বিনাশ,
মরণ সদৃশ, হ'লে আশায় নিরাশ।

(২)

স্থবির খ্রীষ্টান্ এক যশের কারণ,
ভরতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ,
অবশেষে চীনদেশে হ'ল উপনীত;
(অদ্ভুত প্রাচীর যার উত্তরে শোভিত।)
গলি গলি চলি যায়, আশে পাশে ফিরে চায়,
ভাবে মনে, "কোথা করি যীশু গুণগান,
শুনিতে আসিবে লোক হরষ-বয়ান।"

(৩)

এত ভাবি উঠে এক প্রস্তর ফলকে,
উচ্চরবে পান্থগণে, সমাদরে ডাকে,—
"শুন শুন ভ্রাতৃগণ! হ'য়ে একমন,
সবে মিলে করি এস যীশু-আরাধন;
গাইলে তাঁহার নাম, যাইবে স্বরগধাম,
যীশু হন সকলের পথের সম্বল;
যীশু-নাম-গানে কর পরাণ শীতল।

(৪)

"অনিত্য শরীর মনঃ অনিত্য জীবন,
পর উপকারে কর' দিবস যাপন ;
এক গালে খেয়ে চড় অন্য দেহ পাতি,
অন্তিম কালেতে যীশু দিবেন সদ্গতি"
শুনিয়ে তাহার বাণী, সবে করে কাণাকাণি
একে একে এল সবে তাহার সদন,
হেরিয়ে হরিষ-মন খৃষ্টান তখন।

(৫)

ভাবে মনে,—"এই বার পূরিয়াছে আশা,
এই বার চীন-দেশে বাঁধিলাম বাসা !
চীনদেশ বাসিগণ সরল সুধীর,
ধর্ম্মের কাহিনী শুনে হইয়ে সুস্থির ;
চীনদেশী যুবাগণে, শিষ্য করি সযতনে,
আনিব বক্তৃতা-বলে আপনার দলে,
হইবে অতুল যশঃ খ্রীষ্টান্ মহলে।"

(৬)

এই রূপ নিত্য নিত্য আসিয়ে তথায়,
বক্তৃতায় সকলের মানস ভিজায় ;
বাছিয়া বাছিয়া করি শিষ্য তিন জন,
শিখায় 'গস্পেল'-মত করি প্রাণপণ।
"তিনটি ঈশ্বর ভিন, তিনে এক একে তিন,
—পিতা পুত্র, পবিত্রাত্মা, বিদিত সংসার,
তিনের ভজন কর' ভবে হ'বে পার।"

(৭)

এরূপ বক্তৃতা শেষে শিষ্য তিন জনে,
নিত্য নিত্য ল'য়ে যায় আপন ভবনে ;
নানা বিধ খুটিনাটি করিতে শিখায়,
এক কথা দশ বার করিয়ে বুঝায়।
শিখার উন্নতি দেখি, হইয়ে পরম সুখী,
নাচিয়া নাচিয়া উঠে অন্তর তাহার ;
ভাবে মনে,—"এই বার আশার সুসার।"

(৮)

এই রূপে সুপণ্ডিত হ'লে তিন জন,
আনিতে হইল ইচ্ছা সবার সদন।
এক দিন সভা হ'বে করিল ঘোষণা,
পরীক্ষা দিবেক তথা শিষ্য তিন জনা ;
মনোমত হ'ল সভা ; দেখা'তে খ্রীষ্টান-প্রভা,
শিষ্য সহ আসিলেন গুরু-মহাশয়,
শুনিতে উদ্গ্রীব যত চীনবাসীচয়।

(৯)

প্রথম শিষ্যরে ডাকি জিজ্ঞাসে তখন,—
"বল বাপু ! এ জগতে ঈশ্বর ক'জন ?"
শিষ্য বলে,—"তিন জন ঈশ্বর নিশ্চিত,
পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা জগতে বিদিত ;
তিনে আছে তিন গুণ, তিন কাজে সুনিপুণ,
তিন জনে এই বিশ্ব করিছে শাসন,
তিনের শাসনে চলে এ তিন ভুবন।"

(১০)

মহাকোপে মহামতি কহেন তখন,—
"কেমনে বলিলে মূঢ় ! এমন বচন ?
একে তিন, তিনে এক, শিখাইনু আমি,
কোথা হ'তে হেন কথা শিখে এলে তুমি ?
এত ক'রে শিখাইনু, এত পড়া পড়াইনু,
এই কি করিলি মোর বদন উজ্জ্বল !
এতেক শিক্ষার কি রে ! এই প্রতিফল ?"

(১১)

দ্বিতীয় শিষ্যেরে ডাকি কহে সশঙ্কিত,—
"তুমি বল কয় জন ঈশ্বর বিদিত ?"
শিষ্য বলে,—"দুই জন ঈশ্বর যে আছে,
দ্বিতীয় ঈশ্বর—সেটি ক্রুশে মারা গেছে।"
জ্বলন্ত অনল সম, বলে,—"ওরে নরাধম !
এই কি শিখানু তোরে এত দিন ধোরে !
কেমনে দারুণ কথা শুনাইলি মোরে ?"

(১২)

এতেক শুনিয়া—তবু নাহি পূরে আশা,
তৃতীয় শিষ্যেরে ডাকি করিল জিজ্ঞাসা ;
শিষ্য বলে,—"কই আর ঈশ্বর কে আছে ?
আছিল ঈশ্বর এক,—ক্রুশে মারা গেছে।
যেমনি করিলে বাখ্যা, তেমনি পাইনু শিক্ষা,
তিনে এক, একে তিন, জানিলাম সার,
এক যদি মারা গেল রহিল কে আর ?"

(১৩)

তাহার বচনে সবে হাসে খল্ খল্,
অভিমানে খ্রীষ্টানের চক্ষে বহে জল ;
ভাবে মনে,—"দুই জন রেখেছিল নাম,
এই বেটা পূরাইল সব মনস্কাম !"
চুল ছিঁড়ে দাড়ি ছিঁড়ে, মারিবারে যায় তেড়ে,
কিলা'য়ে টেবিল খান করে চুরমার ;
(মহারোলে করতালী পড়ে বার বার।)

(১৪)

এই রূপ শিক্ষা পেয়ে শিক্ষা দিতে এসে,
মনঃ-দুখে যায় বুড়া আপনার দেশে ;
ভাবিতে ভাবিতে যায় হইয়ে হতাশ,—
"মারিতে পরের জাতি পেয়েছি প্রয়াস ;
তাই বুঝি বিধি মোরে, ফেলিল এমন ফেরে,
পাপের যে প্রতিফল পাইনু এখন,
হেন কাজে হাত আর দিব না কখন।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সজ্জনের বাক্য।

(সিদ্ধান্ত)

(১)

সতী-সাধ্বী নারী যদি নিজ পতি ছাড়ে,
কৈলাস-শিখর যদি পিপীলিকা নাড়ে ;
গরুড়ের মুখ-গ্রাস কাড়ি লয় কাকে,
নিন্দুকেরা নিন্দাবাদে যদি নাহি থাকে ;—
পশ্চিমেতে যদি হয় ভানুর উদয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(২)

কুপুত্র হইতে যদি যশঃ হয় কুলে,
যদ্যপি সৌরভ হয় শিমুলের ফুলে ;
উপদেশ দিলে, মূর্খ যদি নাহি রোষে,
মক্ষিকায় যদি কভু সিন্ধু-নীর শোষে ;—
সাবিত্রী সমান সতী বেশ্যা যদি হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৩)

গাধা পিটে যদি কভু ঘোড়া করা যায়,
হংস মধ্যে যদি কভু বক শোভা পায় ;
অলঙ্কার লোভ যদি ছাড়ে নারী জাতি,
খদ্যোত যদ্যপি ধরে শশাঙ্কের ভাতি ;—
মাকাল যদ্যপি কভু আম্র সম হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৪)

কমলিনী ভৃঙ্গে ছাড়ি ভেকে যদি ভজে,
মৎস্যাহারে মার্জ্জারের মন নাহি মজে ;
যমালয় হ'তে যদি মৃতগণ ফিরে,
বহ্নির দাহিকা-গুণ যদি বর্ত্তে নীরে ;—
শুভকর যদি হয় শঠের প্রণয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৫)

মূর্খ শিষ্য হ'তে যদি গুরু পায় যশ,
খল যদি হয় কভু বিনয়ের বশ ;
বলী রাজা সম দাতা যদি হয় রেয়ো,
বারবধূ ডেকে লোকে যদি করে এয়ো ;—
শ্রাদ্ধ-বাড়ী, ভাট-শূন্য যদি কভু হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৬)

বন্ধ্যায় যদ্যপি জানে প্রসব-বেদনা,
ফলবতী যদি হয় মুর্খের বাসনা;
আত্ম-ছিদ্র লোকে যদি করে অন্বেষণ,
অন্ধের দর্পণে যদি হয় প্রয়োজন;—
চিন্তা হ'তে শরীরের পুষ্টি যদি হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরাধাজীবন রায়।

পত্নী-বিয়োগে।

আপন বলিয়ে প্রাণ সঁপেছিনু যারে,
কেমন করিয়ে আমি ভুলিব গো তারে?

—*—

প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
এমন কঠিন হিয়ে
সব স্নেহ পাসরিয়ে,—
স্বামী, পুত্র বিসর্জ্জিয়ে
এ অকালে যায়?
প্রণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
ক্ষুদ্র শিশু কিবা জানে?
প্রবোধ নাহিক মানে;
যেতে তব সন্নিধানে,
গৃহ পানে ধায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
কাঁদিছে সে নিশি দিবে,
কার সাধ্য ভুলাইবে?
"মা" বলিয়া সে ডাকিবে
এবে বল' কা'য়?
প্রণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
সংসারে থাকুক যেবা,
মাতা মত আত্ম কেবা?
করিতে সুতের সেবা
দিবানিশি যায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
সে যদি পীড়িত এবে—
তার জন্য কেবা ভেবে
আহারাদি ছেড়ে দেবে?
ভাবি ঘোর দায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
হেরিলে যাহার মুখ,
ভুলে যেতে যত দুখ;
এমন বিমল সুখ,
হারাইলে হায়!
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
সে সন্তান"মা,মা"রবে,
কাঁদিয়া আকুল যবে;
হেরি কা'র মায়া হ'বে;
বলনা আমায়?
প্রণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
স্বেদ-সিক্ত সে বয়ান
কাহার ফাটা'বে প্রাণ?
কেবা দিয়া চুম্বদান
তুষিবে তাহায়?
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
সদা তব শিব-কামী—
অভাগা তোমার স্বামী—
দিবা নিশি ঝুরি আমি
স্মরিয়া তোমায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?
একদা তোমারে স্মরি
স্বর্গ-সুখ ভোগ করি;
সেই আমি এবে মরি
(জ্বলি) বিষের জ্বালায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে! লুকা'লে কোথায়?

সদাই মুখেতে হাসি ;
কহিয়াছ ভাল বাসি,—
"চির দিন র'ব দাসী"
প্রতারণা তায় !
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় ?
পড়ে কি না পড়ে মনে,—
কত কথা মোর সনে ?
দোষ নাই—অকারণে
ফেলে কি পলায় ?
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় ?
যোগা'য়ে সবার মন
লভেছ প্রশংসা-ধন ;
আজি কাঁদি সর্ব্বজন
তব গুণ গায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় !
তুমি বিনা মরু গেহ ;
করিয়া পূর্ব্বের স্নেহ
একবার দেখা দেহ,
—লইব বিদায়,
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় ?
তোমা বিনা হাহাকার,
কাঁদে শিশু স্নেহাধার ;
দেখে যাও একবার
আসিয়া হেথায়।
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় !
মনেতে যে সব আছে
কহিব তোমার কাছে—
জানি—ইচ্ছা হইয়াছে,
(আছ) কি সুখে সেথায় ?
প্রাণের পুতলি প্রিয়ে ! লুকা'লে কোথায় ?
আর কি দর্শন তুমি দিবেনা আমায় ?

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ছাতার মাহাত্ম্য।

"মাথায় বাঁচায় ছাতা ছাতা ধরি তায়,
মাথার বিপদে পাছে পায়েরে ধরায়।"

—*—

ছাতার কি গুণ শুনহ সকলে,
একে একে সব যাইতেছি ব'লে।
বৃষ্টি হ'তে রক্ষা করয়ে মাথায়,
রবির উত্তাপ হইতে বাঁচায়।
হন্যা-কুক্কুরেতে তাড়িয়া আসিলে,
পলাইয়া যায় ছাতা উঁচাইলে।
উড়িয়া বিহঙ্গ মল ত্যজি যায়,
ছাতায় পুড়ে তা নাহি লাগে গায়।
কারো সঙ্গে যদি হ'ল মারামারি,
বুঝে দেখ ছাতা কত উপকারী।
গবাদি তুরঙ্গ, ছুটিয়া আসিলে—
পলায়, ছাতাটি সমুখে ধরিলে।
কুটুম্বের বাড়ী ছত্র হীনে যায়,
'নির্ধন' বলিয়া অপমান খায় !
নিশায় যখন পড়য়ে নীহার,
ছাতা খুলে গেলে কত উপকার।
শূন্য বাড়ী যদি ছাতা রাখা যায়,
লোক আছে ভেবে মোষক পলায়।
নৌকা চড়ি, জলে পড়িলে উড়ানী,
ছাতা দিয়া তুলি, কষ্ট নাহি জানি।
কুম্ভীর জলেতে ধরে যদি তেড়ে,
চোখে ছাতা গুঁজ, দিবে সে ছেড়ে।
কেহ যদি দেখে, ক্ষতি আছে তায়,
ছাতার আড়ালে বাঁচিবে সে দায়।
গৃহ ছাতে উঠি কোন ঠেঁটা ছেলে,
ইট্ পাটিকেল, পথে যদি ফেলে,
কোন চিন্তা নাই ছাতা যদি থাকে,
অনায়াসে বেঁচে যা'বে এ বিপাকে।
কিনিয়াছ দ্রব্য,—নিতে লজ্জা করে,
পূরিয়া তাহাতে ল'য়ে যাও ঘরে।
পড়িলে কখনো দস্যুদল-করে,
ছাতায় অনেক সাহস অন্তরে।
ঋণী-লোক-হাতে ছাতা যদি রয়,
পথে নাহি তার মহাজন-ভয় !
শার্দ্দূলের হাতে অনেক পড়িয়া,
বাঁচিয়া গিয়াছে ছাতা দেখাইয়া।
শিলা-বৃষ্টিকালে, ছাতা খুলি যায়,
সে জন এড়া'বে মরণের দায়।
পথেতে যাইতে পায়ে ব্যথা ধরে,
ছত্র, যষ্টি প্রায়, বন্ধু কার্য্য করে।
খুচুরা জিনিষ ক্রয় দরকার,
ছাতায় পূরিলে হাতের সুসার।

ছাতা হাতে পথে গতি হয় যার,
অতি নিঃস্ব, বলে,—"আছে কিছু তার।"
দংশনে উদ্যত যদি বিষধর—
ছাতার আঘাতে যায় যমঘর।
কোন জন মূতে, দোতালা হইতে,
ছাতা খোলা, গায়ে না পারে লাগিতে।
উপর হইতে ফেলে নিষ্ঠীবন,
ছাতায় আটক্ হয় সুধীগণ।
কেহ ধূলা ফেলে, কেহ বা জঞ্জাল,
ছাতা রহে মাথে না হ'বে নাকাল।
ধূলা আসে ঝড়ে,—পর্ব্বত প্রমাণ,
ছাতা বিনা কেবা, রাখে নেত্র মান?
ছাতা ঠুকি রেতে বন দিয়া যায়,
অহি, নিশা-মৃগ ভয়েতে পলায়।
উপর হইতে কুল্‌কুচা করে,
ছত্র বন্ধু দেখ মাথা পেতে ধরে।
মস্তক, প্রধান মনুজের অঙ্গ,
তারে যে বাঁচায় রাখ তার সঙ্গ।
ছাতার মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ জগতে—
ছাতা ধরে পড় "মনুমেণ্ট" হ'তে!
জগতে ছাতার বান্ধব যে জন,
সকল রকমে উপকৃত হন।
এ বিষয়ে যার লাগিবেক ধোঁকা,
সে জন নিশ্চয় অতি বড় বোকা।
ছাতার সঙ্গেতে শত্রুতা যাহার—
উক্ত যত বিঘ্ন ঘটে যায় তার।
ছত্র-মিত্রে ভবে ত্যাগ যেই করে,
অতি অভাজন জগত-ভিতরে।
সামান্য যা জানি করিনু লিখন,
আরো কত গুণ আছে গুণিগণ।
বুধগণ বুঝ প্রবন্ধের মর্ম্মে,
ছাতা না ছাড়িবে যাতায়াত কর্ম্মে।
হইল ছাতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন,
আর কেন হেথা? যাই নিকেতন।

শ্রীরাধাজীবন রায়।



সঙ্গীত।

(দুর্গানাম-রত্নাবলী)

ত্রিতালী—ভৈরবী।

কালিকা, করালী, শ্যামা, সিদ্ধেশ্বরী।
কপালিনী, কালী, তারা, শুভঙ্করী॥
নৃমুণ্ড-মালিনী, শিব-সীমন্তিনী,
ত্রিতাপ-হারিণী, উমা, কাশীশ্বরী।
কলুষ-নাশিনী, জগত-তারিণী,
মহেশ-মোহিনী, শিবা, শাকম্ভরী;—
সর্ব্বাণী, শারদা, বগলা, বরদা,
মাতঙ্গী, মোক্ষদা, বামা, বিশ্বেশ্বরী।
গণেশ-জননী, করাল বদনী,
মহেশ-ঘরণী, দেবী, যজ্ঞেশ্বরী;—
হরা, হৈমবতী, সতী, ভগবতী,
ভৈরবী, পার্ব্বতী, চণ্ডী, ক্ষেমঙ্করী।
কুলকুণ্ডলিনী, নগেন্দ্র-নন্দিনী,
শঙ্কর-কামিনী, গৌরী, বিশ্বোদরী;—
অন্নদা, ভবানী, ঈশানী, ইন্দ্রাণী,
ষোড়শী, ব্রহ্মাণী, রমা, রণ-করী।
শূলিনী, শঙ্খিনী, মোহিনী, চাপিনী,
খড়্গিনী, দামিনী, ধূমী, মহেশ্বরী;—
অপর্ণা, অভয়া, মাতঃ, মহালয়া,
গিরিবালা, জয়া, দুর্গা, দিগম্বরী।
কল্যাণী, যোগিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
বিরিঞ্চি-বন্দিনী, ভীমা, বিশ্বম্ভরী;—
জয়ন্তী, শুভদা, বৈষ্ণবী, কামদা,
বিজয়া, সুখদা, রাজ-রাজেশ্বরী।
ভূভার-হারিণী, সমর-রঙ্গিনী,
গিরীশ-গৃহিণী, অম্বিকা, শঙ্করী;—
বিশ্বার্ত্তি-হারিণী, কৃতান্ত-দলিনী,
জগত-পালিনী, ভদ্রা, রামেশ্বরী।
হর-নিতম্বিনী, অনন্ত-রূপিণী,
ভুবন-মোহিনী, শক্তি, মহোদরী;—
শ্মশান-বাসিনী, দুর্গতি-নাশিনী,
শমন-ত্রাসিনী, মাতঃ, চিত্তেশ্বরী।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

পতি প্রতি সতী।

"তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপি বিষ্ণোর্ব্বা পতিরেকোঽধিকঃ স্ত্রিয়াঃ॥"
"ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্ম তীর্থ ব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বংপরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ॥"

—*—

পতি উচ্চ দেবতার, শ্রীচরণ বিনে তার,
গতি আর পাইব কোথায় ?
রত থাকি অনুক্ষণ, মম এই নিবেদন,
সুপ্রসন্ন করিতে তোমায় ?
মনে মনে জানি স্থির, তীর্থ-স্থান শ্রীমন্দির
বাসুদেব আদি দেবগণ
পূজি যদি বিধি মতে, কুশল নাহিক তা'তে,
না বন্দিলে তোমার চরণ।
জগন্নাথ পাইবার, সুপথ কোথায় আর,
নাথ! তুমি না হ'লে সদয় ?
নীচাশয়া যত নারী, মনে ভাবে যা'বে তরি,
বিনা পতি-চরণ-আশ্রয়।
যথাবিধি তাই সবে, —কুশলে রহিবে ভেবে—
চন্দ্রচূড় দেবতাদি পুজে ;
পতি যে দেবতা প্রভু, মানে না ভাবে না কভু,
শোনে না দেখে না মনে বুঝে।
তিথি আদি ব্রত বার, রীতি—ধর্ম্ম পাইবার,
অজ্ঞানের সম ভাবে মনে ;
দেখে না দেখে না ভেবে,দাসী যে কেমনে হ'বে
মুক্ত, পতি-পদাশ্রয় বিনে।
বন্দে স্বামী-পদ যেই, সীমন্তিনী ধন্যা সেই,
সে যুবতী—রমণী প্রধান ;
সেই জানে পতি সার, হিন্দু রমণীর আর,
সে শ্রীপদ বিনে নাহি স্থান।

শ্রীরসময় লাহা।

নদী।

(১)

স্রোতস্বিনি! কল্লোলিনি! কল-কল-রবে
নিরবধি এক মনে
ধাইতেছ কি কারণে
লইয়া গর্ভেতে তব জল-জন্তু সবে ?
করিবারে প্রাণিগণে সদা উপকার,
তাই কি হয়েছে নদি! জনম তোমার ?

(২)

সুনীল অম্বর-তলে হইয়া বিস্তৃত—
ঋজু, বক্র গতি ধরি
দেশ-দেশান্তরে ঘুরি
অবশেষে সিন্ধু সনে হয়েছ মিলিত ;
তব তীরে বাস করে যত প্রাণিগণ,
উপকার তাহাদের করিছ সাধন।

(৩)

তব জল পানে জীব ধরিছে জীবন ;
তোমার তরঙ্গ সঙ্গে
নাচিতে নাচিতে রঙ্গে
চলিছে তরণী কত, না যায় গণন।
মানব অর্ণব-পোতে (তব বক্ষো'পরে)
গমনাগমন করে দেশ-দেশান্তরে।

(৪)

উর্ব্বরতা লভে ভূমি তোমার প্লাবনে ;
বাষ্প হ'য়ে তব জল
উঠিয়ে গগন-তল
'বৃষ্টি' রূপে পড়ি, স্নিগ্ধ করে জীবগণে।
নিদয় নিদাঘে নর বসে তব কূলে ;
জুড়ায় তাহার প্রাণ—দুঃখ, শ্রম ভুলে।

(৫)

তব জলে বৃক্ষগণ হয় ফলবান্,

তব বারি-সিঞ্চনেতে
নানা শস্য জন্মে ক্ষেতে ;—
তব জলে ফুটে ফুল কিবা শোভমান্।
মৃদুল অনিল আসি মাখি তব জল,
জগতের যত জীবে করয়ে শীতল।

(৬)

নিভৃত ভূধর-গেহে জনম তোমার ;
কিন্তু তুমি সযতনে
ধাইতেছ এক মনে
করিবারে প্রাণপণে পর উপকার;
অবিরত পর হিত করিতে সাধন—
শিখাও মানবে তুমি—হেন লয় মন।

(৭)

পরহিত-ব্রতে রত তুমি অনুক্ষণ ;
করিবারে উপকার
তোমার সমান আর
কে পারে আপন প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন ?
কত উপদ্রব হয় সহিতে তোমায়,
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তায় চলেছ কোথায় ?

(৮)

চলেছ কোথায় তুমি তরঙ্গ তুলিয়া ?
গাহিয়ে অনন্ত গান,
ঢালিয়ে অনন্ত প্রাণ,
অনন্ত সাগর-কোলে আনন্দে মাতিয়া ?
অনন্ত মহিমা যাঁর করিছ প্রচার,
কল্লোলিনি ! পেয়েছ কি দরশন তাঁর ?

শ্রীকালিদাস মিত্র।

কেরাণী পুরাণ।

(কেরাণীকুলের সহিত রাজহংস-গণের দ্বন্দ্ব)

কায কর্ম্ম আপিষের, সেই জন্য কলমের,
কেরাণীকুলের নিত্য হয় প্রয়োজন ;
পূরাইতে এ অভাব, ধরে সবে শত্রু-ভাব
রাজহংসকুল সনে ; নিরদয় আচরণে,
তাহাদের পক্ষ হ'তে, কলম ছিঁড়িয়া ল'তে,
সঙ্কুচিত নহে তারা হেন অভাজন,
রাজহংসকুল তাহে বড় জ্বালাতন।

(২)

কি উপায়ে ঘুচে দুখ, ভাবিয়া মলিন মুখ ;
মনোদুখে সকলেই গুমরিয়া রয় ;
চিন্তা অন্তে উঠে যুক্তি,পরস্পর করে উক্তি,—
"কি বল ভাবনা আছে ? চল যাই ব্রহ্মা কাছে,
তিনি ত সৃষ্টির কর্ত্তা, সকলের হর্ত্তা ভর্ত্তা ;
এ বিষয়ে সুবিচার হইবে নিশ্চয়,
কেরাণী কুলের তবে দর্প চূর্ণ হয়।"

(৩)

হ'য়ে কথা কাণাকাণি,জাতি মধ্যে জানাজানি,
দল বেঁধে যায় সবে ব্রহ্মার সদন ;
সম্ভাষিয়া কহে তাঁরে,—"কেরাণীর অত্যাচারে,
বাস প্রভো করা দায়, আমাদের প্রাণ যায়,
ডানা ছিঁড়ে পেন লয়, মানা শুনিবার নয় ;
এইরূপ আপনার যদ্যপি মনন,
একেবারে আমাদের নাশুন জীবন।"

(৪)

"ভাল জাতি হ'লে নষ্ট ; নিত্য নিত্য এত কষ্ট,
আর ত সহিতে প্রভো নাহি যোরা পারি ;
কা'রো মন্দোকারী নই, তবে কেন এত সই ?
কেরাণী কুলের কভু, অনিষ্ট করিনা প্রভু,
আমাদের ডিম্ব কেড়ে, খায় যত ভেড়ে' ভেড়ে ;
আস্কারা পাইয়া এত বেড়ে গেছে জারী,
আমরা নিরীহ, তাই এত সহ্য করি।

(৫)

আমাদের পিতা মাতা,প্রভো তুমি সিদ্ধিদাতা,
আশ্রিত গণেরে কর' রক্ষা দয়াময় ;

আমাদের কেবা আছে ? যাইব কাহার কাছে ?
জানাইনু আপনারে, যাহা হয় সুবিচারে,
অচিরে করুন তাই, যা'তে মোরা রক্ষা পাই ;
অহঙ্কারে চূর্ণ হ'য়ে কেরাণীরা রয়,
মনের মতন তবে আমাদের হয়।"

(৬)

শুনি কথা ব্রহ্মা ক'ন, —"শুন রাজহংসগণ !
অবশ্য করিব আমি এর প্রতীকার ;
ডাকা'য়ে কেরাণিগণে,ক'ব আমি প্রতি জনে,
অত্যাচার আর হেন, নাহি তারা করে যেন ;"
এ কথায় হংসগণ হ'য়ে পুলকিত মন,
ফিরিয়া যাইল সবে আপন আগার,
তদন্তে ঘটিল কিবা শুন সমাচার।

(৭)

ডাকা'য়ে কেরাণিগণে,ক'ন ব্রহ্মা প্রতি জনে,—
"হংসকুল প্রতি কেন কর' অত্যাচার ?
আছে ত খাঁকড়া, শর, তাহাতে করহ ভর,
কাব ত চলিয়া যা'বে, হংসেরা নিষ্কৃতি পা'বে,
স্বার্থপর হ'য়ে হেন, কুকর্ম্ম করহ কেন ?
আজ হ'তে এই কর্ম্ম কর' পরিহার—
আদেশ রহিল মোর উপরে সবার।"

(৮)

কহিছে কেরাণিগণ, —"করি প্রভো নিবেদন,
উত্তম লিখন হয়, হংস-জাত পেনে ;
খাঁকড়া, শরেতে প্রভু, লেখা নাহি যায় কভু ;
মোটা মোটা বিশ্রী হয়, সাহেব-পছন্দ নয়—
মুনিব যাইবে চ'টে, কর্ম্মচ্যুতি যা'বে ঘ'টে,
তাই প্রভো সকলেই ভাল রূপ জেনে,
খাঁকড়াদি কঞ্চি শর ফেলে দিছি টেনে।"

(৯)

ব্রহ্মা কহিছেন পুন, —"আমার বচন শুন,
পেনে লেখা ছেড়ে দেহ সবে একবারে ;"
'তথাস্তু' বলিয়া সবে, ফিরিয়া যাইল তবে ;
কিন্তু বাক্য মানিল না, হংস-পুচ্ছ ছাড়িল না !
হ'য়ে পুন জ্বালাতন, ব্রহ্মা কাছে হংসগণ
যাইলেক, আচরণ নিবেদিতে তাঁরে,—
পুনরপি সৃষ্টি-কর্ত্তা ডাকান সবারে।

(১০)

মহাকোপে ব্রহ্মা ক'ন,—"একি দেখি আচরণ ?
আমার বচন হেলা করিয়াছ সবে ;
সবারে দিলাম শাপ, পাইবেক মনস্তাপ,
খরচে কুলা'বে নাক' চির-ঋণী হ'য়ে থাক',
বাড়ীতে কান্নার হাটী,দুঃখে হ'বে হাড় মাটী,"
ব্রহ্মার বচনে, কাঁদি কেরাণীরা তবে,
কহে,—"শাপ বিমোচন করিবারে হ'বে"।

(১১)

ব্রহ্মা বহু অনুনয়ে, কিঞ্চিত সদয় হ'য়ে,
কহিলেন,—"অন্যথা না হ'বে এ কথার ;
ধার পা'বে কিন্তু সবে, সংসার চলিবে তবে ;
আশ্বাস লভিয়া ইথে, কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট চিতে,
ফিরিয়া কেরাণিগণ, নিজ নিজ নিকেতন,
যাইলেক সবে ভাবি কি হইবে আর,
পরের ঘটনা কহি করিয়া বিস্তার।

(১২)

কেরাণীর অত্যাচার, কিছু ত হ'ল না তার ;
হংসগণ পুনরপি করে আবেদন ;—
তখন উপায় তার, করিলেন দয়াধার,
য়ুরোপীয় কারিকরে, ষ্টীল-পেন সৃষ্টি তরে,
আদেশ করেন যবে, আজ্ঞামাত্র হ'ল তবে,
ষ্টীল-পেন হ'ল যদি রাজহংসগণ,
অত্যাচারে অব্যাহতি পাইল তখন।

শ্রীকালীচরণ পাল।



ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপ।

—•—

[পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিলে, নিজ নন্দনগণের মরণরূপ নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বহু চিন্তার পর, সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সংস্কৃত মহাভারত হইতে এইটি তাহার প্রায় অবিকল অনুবাদ।]

(১)

পাণ্ডবেরা কুন্তী সহ জতু-গৃহ হ'তে
পলায়ন করিয়াছে শুনিনু যখন;
বিদুর সাপক্ষ আর—তাহাদের রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২)

সভামধ্যে, (লক্ষ্যভেদ করিয়া) অর্জ্জুন
দ্রুপদ-নন্দিনী লভে, শুনিলাম যবে;—
পঞ্চালের যত বীর পক্ষ তা'তে হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩)

জ্বলন্ত অনল সম ক্ষত্রিয়ের মধ্যে,
জরাসন্ধে, মগধেতে যইয়া যখন—
নাশে ভীম; শুনিলাম, ধরি পদদ্বয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!।

(৪)

দিগ্বিজয়ে বা'র হ'য়ে পাণ্ডু-পুত্রগণ,
বলেতে ভূপালগণে করি বশীভূত;
'রাজসূয়' মহাযজ্ঞে, শুনি, ব্রতী হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৫)

শুনি অক্ষ-সভায়, শকুনি যুধিষ্ঠিরে
পরাজয় করি রাজ্য লইয়াছে কাড়ি;—
বীর্য্যশালী ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে কিন্তু রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৬)

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বনবাসী যবে;
ভিক্ষা-ভোজী, শুনিনু, স্নাতক দ্বিজগণ,—
করি অনুগমন, তাঁহার সঙ্গে রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৭)

সমরে, কিরাত-বেশী মহাদেবে তুষি,
করিয়াছে লাভ,—"পাশুপতাস্ত্র" অর্জ্জুন;
শ্রুতির গোচর ইহা যবে মোর হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৮)

অর্জ্জুনের (সঙ্কল্পিত ব্রতের সাধনে,
যত্ন-পরায়ণ হ'য়ে স্বর্গে গিয়া থাকি)
শুনি যবে, ইন্দ্র কাছে অস্ত্র-শিক্ষা হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৯)

অরিন্দম সে অর্জ্জুন থাকি ইন্দ্র-লোকে,
অসুরগণের নাশে কৃতকার্য্য হ'য়ে—
শুনিনু 'কিরীট-ধারী' প্রত্যাগত হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১০)

কর্ণ পরামর্শ মতে মোর পুত্রগণ,
'ঘোষ-যাত্রা' সঙ্গে থাকি গন্ধর্ব্ব-আবদ্ধ;
শুনি, তাহাদের মুক্তি পার্থ হ'তে হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১১)

শুনি যবে গুপ্তভাবে দ্রৌপদী সহিত,
আছিল বিরাট-রাজ্যে পাণ্ডু-সুতগণ;
চিনিতে লোকেরা মোর অসমর্থ হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১২)

একাকী, বিরাট-বাসী, ধনঞ্জয় বীর,
(আমাদের এ পক্ষের শুনিলাম যবে)

বড় বড় বীরগণে করে পরাজয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৩)

অক্ষক্রীড়া-বিজিত—নির্ধন—নির্ব্বাসিত,
স্বজন-বঞ্চিত আর যেই যুধিষ্ঠির—
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৪)

শাস্ত্র-বাণী,—"পৃথ্বী যাঁর এক পদক্ষেপ,"
রমাপতি, যিনি বসুদেবের নন্দন;—
পাণ্ডবের হিতে সদা চেষ্টা তাঁর রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৫)

সাধিতে জগত-হিত শ্রীকৃষ্ণ যখন,
সন্ধি-প্রার্থনায় যান কৌরব নিকটে—
শুনি যবে নিষ্ফল তাঁহার চেষ্টা হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৬)

যখন পাণ্ডব-মন্ত্রী, (শুনি,) বাসুদেব,
শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য আর,—
সকলে পাণ্ডবগণে আশিস্ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৭)

'আপনি করিলে যুদ্ধ না করিব আমি,'
—এই কথা কর্ণ, ভীষ্মে বলিয়া যখন,
যুদ্ধ-স্থল ত্যাগ করি গমন করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৮)

শুনিলাম যখন হে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন,
আর যে 'গাণ্ডিব ধনু,' অতি বলশালী—
এই তিনে এক সঙ্গে সুমিলিত হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(১৯)

শুনি যবে সংগ্রামেতে অরিন্দম ভীষ্ম,
(নাশে যে অযুত রথী;) কিন্তু তাঁরে দিয়া
পাণ্ডবের কোন বীর নিহত না হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২০)

শুনি যবে শিখণ্ডীকে অগ্রেতে রাখিয়া,
সমর করিয়া সুখে ধনঞ্জয় বীর,—
সংগ্রামে দুর্জ্জেয় ভীষ্মে বিনাশ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২১)

যখন অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য, রণে
দেখান কেবল অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল;
পাণ্ডবের কোন বীর-নাশে মতি নয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২২)

অস্মৎপক্ষীয় যারা করেছিল পণ,—
'অর্জ্জুনে নাশিব, নয় যুদ্ধেতে মরিব;'
শুনি, তা সবার মৃত্যু পার্থ-হাতে হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৩)

যে 'ব্যূহ' করিতে ভেদ কা'রো শক্তি নাই—
সযত্নে রাখেন যাহা দ্রোনাচার্য্য নিজে;
ভেদ করে অভিমন্যু, সুভদ্রা-তনয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৪)

শুনি যবে আমাদের মহারথিগণ,
অর্জ্জুনের কিছু নাহি করিতে পারিয়া;
অভিমন্যে বধ করি প্রফুল্ল হৃদয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৫)

অভিমন্যু-বিনাশেতে মোর সুতগণ,
শুনি যবে আনন্দেতে করিছে চীৎকার;—

পার্থ, ক্রোধে, জয়দ্রথে বধে ব্রতী হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৬)

শুনি যবে জয়দ্রথে পার্থ নাশিতেছে;—
দ্রোণাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, অশ্বত্থমা,
মদ্ররাজ শৈল্য,—সবে দেখি স্থির রয়;
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৭)

করীবল-সমতুল, দ্রোনাচার্য্য সৈন্য;—
শুনি যবে বৃষ্ণিবংশ-সম্ভুত সাত্যকি,
বিধ্বস্ত করিয়া কৃষ্ণ পার্থ কাছে রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৮)

ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্ষত্র-ধর্ম্ম করি অতিক্রম,
অনশনে উপবিষ্ট মৃত্যু-কামী দ্রোণে
দেখি রণ-ক্ষেত্রে (শুনি,) বিনাশ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(২৯)

যখন শুনিনু অতি প্রফুল্ল হৃদয়ে,
যুদ্ধ-স্থলে দুঃশাসন রক্ত ভীম পিয়ে;—
কেহ তারে নিবারণে সমর্থ না হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩০)

শুনিলাম যবে, সেই ভয়ানক যুদ্ধে,
আপনার গুণপনা প্রকাশ করিয়া
নাশিয়াছে, মহাবীর কর্ণে, ধনঞ্জয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩১)

শুনিলাম, সংগ্রামেতে, মদ্ররাজ শৈল্যে,
(সমরে, শ্রীকৃষ্ণে স্পর্দ্ধা করিত যে জন)
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনাশ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩২)

দ্যুত-ক্রীড়া, যেই সর্ব্ব বিগ্রহের মূল,—
সে পাপিষ্ঠ শকুনিরে, বীর সহদেব,
শুনি যবে নাশি অতি পুলকিত হয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩৩)

ভগ্ন-পরাক্রম আর হত-সৈন্য হ'য়ে—
শুনি দ্বৈপায়ন-হ্রদে গিয়া দুর্য্যোধন,
জল-স্তম্ভ মধ্যে রহে করিয়া আশ্রয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩৪)

শুনিনু, পাণ্ডবগণ বাসুদেব সনে—
দ্বৈপায়ন-হ্রদ-তটে করিয়া গমন,
অভিমানী পুত্রে মোর ভৎর্সনা করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

(৩৫)

গদা-যুদ্ধে সুনিপুণ, পুত্র দুর্য্যেধনে,
বৃকোদর, বাসুদেব-উপদেশ মতে,
জঙ্ঘায় মারিয়া গদা বিনাশ করয়,
তখনি জয়ের আশা ছেড়েছি, সঞ্জয়!

শ্রীরাধাজীবন রায়।

শূকরের মোট।

নিবাস পলাশপুর, কায়স্থ-কুমার—
সদাগরী আপিষেতে কর্ম্ম হয় তাঁর।
আমদানী, রপ্তানি, উভয় কর্ম্ম হয়,
বাজারের সরকার কায়স্থ-তনয়।
বুঝিতে পারিত কথা বলিবার মাত্র,
এই গুণে সাহেবের বড় প্রিয় পাত্র।
সব কায দেয় তারে চতুর বলিয়া,
কায করে সাহেবের মন যোগাইয়া।

পশ্চিমে প্রভুর তাঁর কোন বন্ধু জন,
শূকর পাটান "ভেট" বন্ধুর কারণ।
হাবড়ার ইষ্টিশনে শূকর পৌঁছিল,
সরকারে আনিবারে সাহেব কহিল।
সাহেবের আজ্ঞামত কায়স্থ নন্দন
হাবড়ার ইষ্টিসনে করিল গমন।
দেখিল প্রকাণ্ড এক এসেছে শূকর,
কেমন লইয়া যা'বে, ভাবিত অন্তর।
কিছুক্ষণ ভাবি তার যুক্তি আসে মনে,
থলে ক্রয় করি সেই আনে ততক্ষণে।
তাড়া দিয়া সে শূকরে থলেতে পূরিল,
ছুঁচ দড়ী সঙ্গে, মুখ শেলাই করিল।
"মুটে, মুটে"—ব'লে ডাকে কায়স্থ-নন্দন,
জুটিল যবন মুটে আসি চারি জন।
জনেকের সঙ্গে তার "ফুরণ" হইল,
জিনিষ কি জিজ্ঞাসায় —"চিনি" সে বলিল।
বড় উপস্থিত বুদ্ধি কায়স্থ জনার,
এ কথা বলিতে দ্রুত তাই সাধ্য তার।
শূকর শুনিলে পরে ছুঁ'বেনা যবন,
বিপদ উদ্ধার হেতু সে কায়স্থ ক'ন।

তখন ঝোড়ায় মোট তুলি সেই মুটে
যায়; পিছু পিছু তার সে কায়স্থ ছুটে।
অল্প দেরি আছে পার হইবারে পোল—
শূকর থলের মধ্যে ধরে নিজ বোল।
'ঘোঁত, ঘোঁত চিঁহিহি,' শুনিয়া সে যবন,
মোট ফেলে কায়স্থেরে কহে দুর্ব্বচন।
—"ওরে শালা! তুই না বলিয়াছিলি চ্যানি?
জাতি-দফা খা'লি মোর হয়ে তুই জ্ঞানী।
চ্যানি কি চিঁহিহি করে? ও শালা বজ্জাত!"
এত বলি মারিবারে তুলে সেই হাত।
অনেক যবন-মুটে জুটে তথা গেল,
সবাই কায়স্থে রুকে মারিবারে এল।
মুটেরে পয়সা বেশি করিয়া প্রদান,
পরিত্রাণ পেয়ে গেল কায়স্থ-সন্তান।
চল্‌তি গোরুর গাড়ী, ভাড়া শেষ ল'য়ে,
শূকরে লইয়া যান ব্যাকুলিত হ'য়ে।

ফল কথা, নিজ ধর্ম্ম রাখে যে বজায়—
তাহারে কখন নাহি মন্দ বলা যায়।
মুটে গিরি করে খায় যবন-কুমার,
অসীম ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখি তার।
স্বকার্য্য-সাধনে শঠ কায়স্থ-নন্দন.
যবন সঙ্গেতে কিবা করে আচরণ!
নিজ ধর্ম্মে গোলযোগে কত রাগ হয়,
পরের বেলায় সেটা, বোধ কেন নয়?
আদালতে, শালগ্রাম আনার কথায়,
যত হিন্দু রুষ্ট কত হয়েছিল তায়।
যবনের কোপ কভু নহে অমূলক,
কায়স্থ দুর্ণাম কিনে হ'য়ে প্রবঞ্চক।
ধর্ম্মে হাত দিলে পরে মহাকোপ হয়,
বলী যারা খুন করে সে রাগে নিশ্চয়।
যবনেরা মারে নাই ভাগ্য কায়স্থের,
মারিলে বিশেষ, দোষ হ'ত না তাদের।

সরল ভাবেতে সদা করিবে হে কর্ম্ম,
যাহাতে বজায় সুখী রহিবেক ধর্ম্ম।
প্রবঞ্চনা করিলে কি থাকে অপ্রকাশ?
যখন প্রকাশ পা'বে হ'বে সর্ব্বনাশ।
হাটের মাঝেতে শেষ হাঁড়ি ভাঙা হ'বে,
ধর্ম্ম-পথে থাকি ভবে কার্য্য কর সবে।
কায়স্থের শত্রু নহি যবনের মিত্র,—
যশ—ক'ব—ভাল হ'লে স্বভাব চরিত্র।

কে যেন ডাকিতে ছিল গেল বুঝি ফিরে,
দেখে আসি একবার যাইয়া বাহিরে।
সুধীসনে সদালাপে সদা সুখ পাই,
এক দণ্ড ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় ভাই।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র।

—*—

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রচলিত আছে। ইহা পাঠ করিলে যে কেবল নাড়ী-বিজ্ঞান এবং দেহ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহা নহে—রোগ নির্ণয়ে, ভেষজ সম্বন্ধে এবং দ্রব্য-গুণ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—,এই চতুবর্গ ফল লাভের আরোগ্যই যখন মূল, তখন, দেহ যাহাতে নিরোগ, সুস্থ এবং সবল থাকে তাহার উপর লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত। দেহ সুস্থ না থাকিলে কিছুই করা যায় না—চাকুরী বল, ব্যবসা বল, লেখা পড়া বল, কিছুই হয় না। "শরীর ব্যাধি-মন্দির"—সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার উপর তীব্র দৃষ্টি না রাখিলে, সকল দিকেই বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভাবনা।

সকল লোকেরই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পাঠ করা উচিত। কেবল চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রপাঠ করিবেন এবং অপর কেহই করিবে না, এ কথা নিতান্ত ভ্রম-মূলক এবং ন্যায়ের বিচারে কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমরা সকলকেই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলি। প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হউন—অবশ্য মোটামোটি কিছু জ্ঞান থাকা চাই—তাহা হইলে,অনেক সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য বিনা পরিবারবর্গের রোগ বিশেষের চিকিৎসা করিয়া কেবল যে, অর্থের সুসার করিবেন তাহা নহে, রোগ আরোগ্য হেতু বিপুল আনন্দ লাভ করিবেন। অনেক দেশে এমন হইতে পারে যে, চিকিৎসক নাই বা দুষ্প্রাপ্য; সে দেশের প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তার এবং পরিবার বর্গের মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞান থাকা উচিত—অন্ততঃ, টোট্‌কা টাট্‌কি কতকগুলি ঔষধও জানা উচিত।

শিক্ষিত-মণ্ডলী ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিনা। অনেক অশিক্ষিত লোক দিব্য হাত দেখিতে পারে, অনেক রোগের ঔষধ জানে এবং চিকিৎসা করিয়া অনেক রোগও আরোগ্য করিয়া থাকে;—সে স্থলে হয় ত অনেক সুবিজ্ঞ কবিরাজ এবং বিচক্ষণ ডাক্তার ও ঘোল খাইয়া যান। ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ, তাই বলিতে সাহস করিয়াছি। পাড়া-গাঁয়ে অনেক বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণের কন্যা হাত দেখিতে পারেন, এবং সামান্য জ্বর জালা, পেটের অসুখ, আমাশয়, গরল, পাচড়া, নালী ঘা প্রভৃতি রোগের গাছ গাছড়ায় চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এবং আরোগ্যও করেন; সুতরাং, গাঁয়ে তাঁহাদিগের পসার হইয়া যায় এবং চিকিৎসক আনা ব্যয়-সাধ্য বলিয়া, অনেকেই তাঁহাদিগকে ডাকে এবং ঔষধের বিনিময়ে লাউ, কুমড়া, লেবু এবং যে সময়ের যে ফল, কখন টাকাটা সিকাটা দিয়া থাকে—তাহাতেই তাঁহাদিগের মহা সন্তোষ হয় এবং তাঁহারা আপনাদিগের যশের গৌরবে পুলকিত হইয়া থাকেন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য এই যে, পাঠকগণ সকলেই ভক্তি, যত্ন এবং শ্রদ্ধা-সহকারে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া সুখ-সাগরে সন্তরণ করেন। যদ্যপি আমরা এ বিষয়ে পাঠক পুঞ্জের আগ্রহ দেখি, তাহা হইলে আমরাই উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ

লিখিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিব। কিমধিকমিতি।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।



সুবচনীর ব্রত-কথা।

শুন সুবচনী-কথা ; আলো, তমঃ নাশে যথা,—
সেইরূপ, মনঃ-মলা য'াবে ;
গণেশ-জননী, সতী, তাঁর পদে রাখ' মতি,
কেহ আর, দুঃখ নাহি পা'বে।

মথুরায় ছিল ধাম, দুর্গাদাস তাঁর নাম,
অতি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-কুমার ;
ভিক্ষা উপজীবিকায়, ব্রাহ্মণের দিন যায়,
দুঃখের নাহিক সীমা তাঁর।

একদা ব্রহ্মাণ-পুত্র, ভিক্ষা নাহি পান কুত্র,
মনোদুঃখে ফিরেন ভবন —
নৃপতির সরোবরে, হংস-কুল কেলি করে,
নেত্র-পথে পড়িল তখন।

কভু সরসীর ধারে, উঠে সবে ভ্রমিবারে,
—খঞ্জ হংস এক দেখে দ্বিজ ;
থাকি বিপ্র তাকে তাকে, ধরিয়া লইয়া তাকে,
বস্ত্রে পুরি লয় বাসে নিজ।

ভাসিয়া আনন্দ-নীরে, কহে দ্বিজ জননীরে,—
"মাগো ! হংস করহ রন্ধন ;
এমনি অদৃষ্ট পাজী, ভিক্ষা না জুটিল আজি,
রাজ-হংস করেছি হরণ।

এ বার্ত্তা জানে না কেহ, চুপি চুপি রাঁধি দেহ,
সুখে খা'ব আজি গো জননি !"

জননী শুনিয়া কয়,— "এত বাছা ! ভাল নয়,
পা'বে কথা প্রকাশ এখনি।

করিও না মনস্তাপ, উপবাসী থাক' বাপ,
পরদ্রব্যে করিও না লোভ ;
'লোভে পাপ, পাপে নাশ,' শাস্ত্র-কথা সুপ্রকাশ,
—লোভে যাদু, ঘটে মনক্ষোভ।

শুন বাবা মা'র কথা, হাঁস রেখে এস তথা ;"
মাতৃ-বাক্য না শুনে ব্রাহ্মণ ;
ছুরিকা লইয়া করে, হংসেরে নাশিয়া পরে,
মাতৃ কাছে দিয়া, দ্বিজ ক'ন,—

"আমার বচন ধর', এ হংস উৎসর্গ কর',"
জননী "সুবচনী"র নামে ;
তিনি মা সবার বাড়া, কাটা'য়ে দিবেন ফাঁড়া,
কেহ না পাইবে টের গ্রামে।"

দ্বিজ অতি ভীত হ'য়ে, হংস পালকাদি ল'য়ে,
ছাই-ঢিপী-মধ্যেতে পুঁতিল ;
সে পথে রজক যায়, কাণ্ড দেখিবারে পায়,
গিয়া সেই নৃপে নিবেদিল।

শুনিয়া নৃপের ক্রোধ ; ক'ন,—"ল'ব প্রতিশোধ,
এত গর্ব্ব মোর হংস মারে !"
কোটালেরে ক'ন বাণী,—"ব্রাহ্মণে ধরিয়া আনি,
শীঘ্র গতি রাখ' কারাগারে।"

রাজার বচন শুনি, ধরিয়ে ব্রাহ্মণে খুনী,
বন্দী করে রাখিল তাঁহায় ;
হাতে হাত-কড়ি দিল, পায়ে বেড়ী পরাইল,
বুকে আর পাথর চাপায়।

গভীর নিশিতে দ্বিজ, বিপদের বার্ত্তা নিজ,
প্রকাশেন সুবচনী প্রতি—
"শুন গো মা সুবচনি ! মহেশ-মস্তক-মণি,
অধীনেরে কৃপা কর', সতি।

না বুঝে করেছি দোষ, তাই তব অসন্তোষ,
—এ বিপদ ঘটা'লে আমার;
পুত্র তব অপরাধী, চরণে ধ'রে মা সাধি,
দয়াময়ি, করোগো উদ্ধার।"

দুর্গার আসন টলে, পদ্মা সখী প্রতি ছলে
জিজ্ঞাসেন, তাহার কারণ;
পদ্মা পাদ-পদ্মে তাঁর, নিবেদিল সমাচার,
শুনি শিবা দুঃখান্বিতা হ'ন।

স্বপন দিলেন ভূপে,—"ব্রাহ্মণেরে কোন রূপে,
রাখিবে না কল্য কারাগারে;
না শুন আমার বাণী, গোষ্ঠী শুদ্ধ প্রাণ-হানি
করিব, পাইবে দেখিবারে!

আছে তব যত হংস, সকলি করিব ধ্বংস,
রাজ্য তব দিব ছার খার;
ব্রাহ্মণেরে দিয়া ধন, পূর্ণ কর' আকিঞ্চন,
কন্যা সহ বিভা দেহ আর।"

নৃপতি স্বপন হেরে, প্রাতে উঠি ব্রাহ্মণেরে,
দেন তবে মুক্তি কারাবাসে;
সুশীলা তাঁহার কন্যা, রূপে গুণে সেই ধন্যা,
বিভা দেন বিশেষ তরাসে।

ধন, বধূ ল'য়ে দ্বিজ, আবাসে ফিরেন নিজ,
বিপ্র-মাতা হেরে হৃষ্ট মন;
প্রতিবেশী ব্রয়োগণে, ডাকিয়া প্রফুল্ল মনে,
বধূ ল'ন করিয়া বরণ।

হ'ল দুঃখ অবসান, দ্বিজ সুখে ভাসমান,
হৃষ্টমনে যাপেন জীবন;
হয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, আর শত্রু দর্প চূর্ণ,
এ কথা যে করিবে শ্রবণ।

এ কথা না শুনি চাড়ে, অন্য কথা যেবা পাড়ে,
—বদ্ধ হ'বে শনি-নাগ-পাশে;
শাস্ত্রের শুনহ উক্তি,—"তার না ঘটিবে মুক্তি,
নরকে সে র'বে হা হুতাশে"।

শ্রীমতী পরমেশ্বরী দেবী।



বুদ্ধিমান্-চরিত্র।

গোপাল ভাঁড় ও রাজ-ভগ্নী।

রঙ্গ-প্রিয় নৃপবর কৃষ্ণ চন্দ্র রায়,
একদা গোপাল ভাঁড়ে ডাকান সভায়।
গোপালে গোপনে ল'য়ে কহেন রাজন,
—"বুদ্ধিমান্ নাহি আর তোমার মতন।
সহোদরা, অতিব্যয় কাতরা, আমার,
তাঁর কাছ থেকে কিছু কর' টাকা বা'র।
যত টাকা করিবারে পারিবে আদায়,
দ্বিগুণ তোমারে দিব,—পূরিলাম সায়।
আছয়ে অনেক টাকা হাতেতে তাঁহার,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা করেন টাকাতে আমার।"
গোপাল সম্ভাষি কহে,—"শুন মহারাজ!
আমার পক্ষেতে ইহা অতিতুচ্ছ কায।"
এতেক বলিয়া নৃপে গোপাল তখন,
ভূপতি-ভগিনী কাছে করিল গমন।
বিধবা নৃপের ভগ্নী র'ন শুদ্ধাচারে—
গোপাল পৌঁছিল গিয়া তাঁর গৃহ-দ্বারে।
গোপালে আসিছে দেখে ভূপ-ভগ্নী ক'ন,—
"গোপাল কি মনে ক'রে হেথা আগমন?"
"হেতু ছাড়া কর্ম্ম নাই",—কহিছে গোপাল,
"তোমার হাতের রান্না খা'ব পিসি কাল।
কত কাল খাই নাই ইচ্ছা হইয়াছে,—
বলিতে এসেছি পিসি! তাই তব কাছে।"

"কাল হ'বে না'ক বাছা!" নৃপ-ভগ্নী ক'ন,—
"একদিন ভাল ক'রে করা'ব ভোজন।"
গোপাল বলিছে,—"পিসি! কভু না ছাড়িব,
তোমার প্রসাদ মাগো কালই খাইব।"
ভূপ-ভগ্নী ভাবিলেন—ঘটিল জঞ্জাল,
কহিলেন,—"আচ্ছা তবে আসিস্ গোপাল।"
গোপাল কহিছে,—"পিসি! নিবেদন আছে,
লাউ-ঘণ্ট খাইবার সাধ হইয়াছে।
তব মত লাউ কেহ রাঁধিতে না পারে।
কা'রো হাতে খেয়ে তৃপ্তি না হয় আমারে।
কত কাল খাইয়াছি ভুলি নাই তার—
কাল খাইয়াছি মনে হ'তেছে আমার।"
গোপাল "বায়না" ক'রে হ'ল অন্তর্ধান,
ভূপাল-ভগিনী লাউ আনা'য়ে রাখান।
এদিকে গোপাল ভাঁড় বাজারে যাইয়া,
কুচা-চিংড়ী কিনি আনি রাখে ভাজাইয়া,
পরদিন ভোজনেতে যাইবার কালে,
সঙ্গে করি ল'য়ে গেল বাঁধিয়া রুমালে।
এদিকে রাজার ভগ্নী করি আয়োজন,
করেছেন নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন।
গোপাল আসিলে তিনি দেন ভাত বাড়ি,
ভোজনে বসিল সুখে শেয়ানের ধাড়ী।
গৃহান্তরে ভূপ-ভগ্নী গেছেন যেমন,
অমনি গোপাল করে স্বকার্য্য সাধন।
কুচা-চিংড়ী রুমাল হইতে ল'য়ে খুলি,
লাউ ঘণ্টে গোপাল মিশায় সেই গুলি।
লাউ-ঘণ্ট মাখি, ভাত খাইতেছে সুখে,
বলে,—"পিসি!'লাউ-চিংড়ী'ভাল লাগে মুখে,
পিসি মা! একটু দাও আর যদি থাকে—
সব চেয়ে ইহা ভাল লেগেছে আমাকে।"
নৃপ-ভগ্নী ক'ন,—"বাছা! রান্না নিরামিষ,
কেমনেতে 'লাউ-চিংড়ী' তুই বলছিস্?"
গোপাল কহিছে,—"পিসি! দেখ মাছ এসে,
ক'ন তিনি,—"বলিস্ কি ওরে সর্ব্বনেশে?"
কাছে এসে মাছ দেখি উঠেন শিহরি,
"চুপ কর,"—ক'ন গোপালের হাতে ধরি।
গোপাল কহিছে,—"লাউ-ঘণ্টে মাছ আছে—
এ কথা বলিব পিসি! নৃপতির কাছে।
মাছ খাও পিসি তুমি! বিধবা হইয়া,
মহারাজ কি ক'বেন এ কথা শুনিয়া।
আমিও হয়েছি পিসি দেখে জ্ঞান-হারা,
গোপনে বিধবাদের এই বুঝি ধারা?
অতি শুদ্ধাচারিণী গো জানি মা তোমারে—
কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি একেবারে।
ভূপতির মুখ ছোট এ কথায় হ'বে,
নীচ লোকে আপনার কত কুচ্ছা ক'বে।
ঘাঁটিবারে বাগ পা'বে শত্রুরা তোমার,
রাজ-কুলে কালী দিলে কেমন ব্যাভার?
অভ্যাস করেছ খেতে পড়ে গেলে ধরা,
এই রূপে তোমার বিধবাগিরি করা?
চলিত না একদিন পিসি! না খাইলে?
যা' হ'ক পিসি মা তুমি! ভাল চলাইলে।"
নৃপ-ভগ্নী করাঘাত করেন কপালে,
ভাবিলেন,—"মহাদায়ে ঠেকালে গোপালে।"
"কোথা হ'তে মাছ এল?"—কহেন,গোপাল!
"আত্মঘাতী হ'ব আমি গেল পরকাল।"
গোপাল কহিছে,—"মাছ দু' একটা নয়,
তা'হ'লে পড়িতে পারে সন্দেহ ত হয়।
ভৃত্য-বর্গে এক সঙ্গে কিনে মিশাইয়া,
ভিন্ন করে ঢুকে বাটী নিকট আসিয়া।
এক পণ মাছ আছে লাউ-ঘণ্টে মিশি,
আকাশ হইতে আর পড়েনি ত পিসি!"
ক'ন তিনি,—"থাকি কত শুদ্ধাচারে আমি,
জানেন তা' ভগবান্ হরি অন্তর্যামী।
কোন্ জন শত্রু মোর করেছে এ কায—
তাহার মাথায় হরি! পড়ে যেন বাজ।"

কহেন,—"গোপাল! কথা না হয় প্রকাশ,
তা' হ'লে গোপাল মোর হ'বে সর্ব্বনাশ।"
কাকুতি মিনতি আগে করি যথাসাধ্য,
উৎকোচ দিতে, পরে হইলেম বাধ্য।
নৃপ-ভগ্নী অতিশয় হ'লেন নাকাল—
দু'হাজার টাকা নিল চতুর গোপাল।
সব কথা কহিল সে রাজার নিকটে,
ক'ন তিনি, "ধন্য! ধন্য! বুদ্ধিমান্ বটে।"
গোপালের প্রশংসা করিয়া বহুক্ষণ,
নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেন রাজন।
গোপাল-চাতুরী-জাল (যদি) ফাঁসা'বারে,
নৃপ-ভগ্নী কহিতেন এই কথা তারে,—
"তোর তরে আনায়েছি এ মাছ গোপাল।
তা'হ'লে কি এত তিনি হ'তেন নাকাল?
"বিদ্যা চেয়ে বুদ্ধি বড়,"—শাস্ত্রে লেখা আছে,
কোন বল নাহি লাগে বুদ্ধি-বল কাছে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

—*—

বিবাহ-বিভ্রাট।

আজ কাল আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া কি ভয়ানক ব্যাপার হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গভূমে কন্যাগণ কি অশুভক্ষণেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। আহা! নির্দ্দোষ বেচারাগণ জন্মাবধিই পিতার বিষ-নয়নে পতিত হয়, এবং গর্ভ্ভধারিণী জননী ভিন্ন বাটীর অপারপর সকলেই তাহাদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতে ত্রুটি করে না। জন্ম-দুখিনী কন্যাগণ এইরূপে নানা অযত্নে, নয় দশ বৎসর কাল প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তার পর (ইতিপুর্ব্বে অল্পে স্বল্পে) তাহাদিগের বিবাহের কথা উঠে। সেই বিবাহের কথা লইয়াই আমাদিগের এই "বিবাহ-বিভ্রাট" প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে।

অতি কম করিয়া ধরিলেও আজকাল পাঁচ ছয় শত টাকার নীচে, কোন ক্রমেই একটি কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হয় না। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই, তাঁহাদিগের এক হইতে পাঁচ ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। বিশেষতঃ,আবার ছেলে যদি 'পাশ' করা হয়,এবং তাহার পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকেন, তা' হইলে ত কন্যাকর্ত্তার দফা রফা। ভিটা বিক্রয় বিনা বা বন্ধক না রাখিলে বরকর্ত্তার কিয়ৎপরিমাণে মনোরথ সিদ্ধ করা, তাহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। বরকর্ত্তার যদি বাটী না থাকে, পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া লইবেন; সুতরাং, তাঁহার অল্পে ছাড়িলে পোষাইবে কেন? ছেলের বিবাহ উপলক্ষে গিন্নীকেও দু' এক খানা গহনা গড়াইয়া দিবেন। কিম্বা যদি গহনা থাকে এমন হয়,—আসল দরে বাঁধা আছে,—উদ্ধারিয়া দিবেন। এ দুইটির একটি তাঁহাকে করিতেই হইবে। সুতরাং কন্যাকর্ত্তার উপর—যাঁহাকে ভগবান্ মারিয়াছেন—জুলুম না করিলে, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? কন্যাকর্ত্তার কাতোরোক্তি মিনতি শুনিতে হইলে, কম টাকায় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহার উদর পুরিবে না। কাযেই তাঁহাকে অন্ধ এবং বধির হইয়া চলিতে হয়।

ধনাঢ্যই হউন, মধ্যবিত্তই হউন, আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা হতভাগ্য কেরাণীই হউন, কন্যার বিবাহে সকলকেই বেগ পাইতে হয়। এই অপরিহার্য্য অর্থদণ্ডে সকলকারই সমান কষ্ট হইয়া থাকে—তবে সক্ষম অক্ষমের কষ্টের

অবশ্য তারতম্য আছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। ধনী ব্যক্তি—আমরা সকল ধনীর কথা বলিতেছি না—অপ্রফুল্ল মনে ধন-কোষ হইতে টাকা বাহির করিয়া বিষণ্ণ-বদনে গণিয়া দেন;—গরিবকেও সেইরূপ ভিটা বাঁধা দিয়া দিতে হয়। এক জন ধন-শোকে কিছুদিন জীবন্মৃত থাকেন—অপর জনের বাস্তবিকই শ্বাস বহে।

কেরাণীগিরিতে—তাই বা কেন—সকল ব্যবসাতেই অধুনা লোকের যে প্রকার আয় দাঁড়াইয়াছে, এবং উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-লোকে যে প্রকার ব্যয়-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকের মান বজায় রাখিয়া সংসার চালান এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সংসারে দশ জন লোক, সেই সংসারে মধ্যবিত্ত চালে থাকিতে হইলে,এক শত টাকার নীচে কথনই চলিতে পারে না; কিন্তু আট দশ জন লোক বিশিষ্ট সংসার অনেক কেরাণী বাবুকে পনের হইতে ত্রিশ টাকার মধ্যে প্রতিপালন করিতে হয়। ইহার ভিতরেই আবার দুই একটি কন্যাও পার করিতে হয়, পুত্রগণকে লেখা পড়া শিখাইতে হয় এবং আহার ব্যাভার ত আছেই। তাহাতেও ছাড়ান নাই—হয় ত একটি ভগ্নী বা কন্যা বিধবা হইয়া দুই একটি বা দুই পাঁচটী পুত্র কন্যা লইয়া ঘরে আসিয়া সেই মাপা অন্নের উপর ভাগ বসাইলেন। ইহাতে অল্প আয় বিশিষ্ট লোকের দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে এবং অনেকেই এই ভারাক্রান্ত হওন প্রযুক্ত চিন্তাজীর্ণ হইয়া, অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হ'ন—সংসারের সকল যন্ত্রণা এড়াইয়া যান।

হতভাগা কেরাণীর রমণী-বল্লরী এমনিই ফল-প্রদায়িনী যে, যত্নের পাট বিনা সে স্বামীকে প্রতি বৎসরই একটি করিয়া পুত্র কন্যা উপহার প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীর বেতন বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, চাকুরী থাকিলেই পরম লাভ, এই ত আপিষের কথা। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেরাণীদিগের পুত্র অপেক্ষা কন্যা বেশি হইয়া থাকে, এ কথা আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে পারি। পুত্রগণ বেতনাভাবে বিদ্যালয়ে যাইতে না পারিয়া, ঘরে বসিয়া মূর্খ হইতে লাগিল। কেহ বা বিদ্যালয়ে যাইবার ভাণ করিয়া, কুসংসর্গে মিশিয়া, অধঃপাতে যাইতে লাগিল। পুত্রদিগের পরের বাগান হইতে ফল-চুরি, মারামারি প্রভৃতি বিষয় দুই বেলা কেরাণী বাবুর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। একে ত তাঁহার 'মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল', তাহার উপর এই পুত্রগণের দুশ্চরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বাড়ী যদি ঢুকিলেন ত, "এ নাই, তা' নাই, আমি এমন করিয়া সংসার করিতে পারিব না,"—ইত্যাদি বলিয়া গৃহিণী কাণের কাছে ফোঁস-ফোঁসনা আরম্ভ করিলেন। এখনও সকল কথা বলা হয় নাই। গোয়ালা বলিয়া গিয়াছে যে, বৈকালে টাকা না দিলে সে আর দুগ্ধ দিবে না। কাপড়ের দোকানে ২০৲ টাকা দেনা, সে তিন দিনের মধ্যে টাকা না দিলে নালিশ করিবে। মুদীর সরকার টাকা না দেওয়ার জন্য, গালাগালি দিয়া গিয়াছে। ধোবা আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে, টাকা না পাইলে যাইবে না। কেরাণী বাবু গৃহিণীর কোন কথা শুনিবেন? আবার এ দিকে আপিষে দেরি হইলে সাহেবের তিরস্কার খাইতে হইবে—সে ত গায়ে লাগে না—জরিমানা

দিতে হইবে। একে ত সাহেবেরা তাঁহার ভুলের জন্য (কেন না এমন বিপদাপন্ন লোক কখনই নিভুর্ল কায করিতে পারে না) এবং কামায়ের জন্য (কেন না এমন দুর্দ্দশাপন্ন কেরাণী প্রায়ই পীড়িত হইয়া থাকেন) চটিয়া আছেন, তাহার উপর আবার বেলায় আসা—ইহাতে আর রক্ষা আছে? সাহেবেরা কেরাণী বাবুর এই সকল নানা দোষের জন্য পূর্ব্ব হইতেই খাঁড়া শাণাইয়া, হাড়ী-কাঠ পুঁতিয়া, কেরাণী বাবুর মাথায় তেল-সিন্দুর মাখাইয়া রাখিয়াছেন; একটু বাগ পাইলেই—সময় হইলেই, কোপ ঝাড়িবেন। শুধু ইহাই নহে। আপিষের বড় বাবু সর্ব্বদা তাঁহার তিল দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া সাহেবের কাণে তুলিয়া সাধ্যমতে তাঁহার অন্ন মারিবার চেষ্টা করিতেছেন; কারণ, তাঁহার (বড় বাবুর) প্রিয়তম সম্বন্ধীর শীঘ্রই একটি কর্ম্ম করিয়া দিতেই হইবে—শয্যাগুরুর উপরোধ।

কেরাণী বাবুর দুঃখের কথা আর কত বলিব—তাহার সংখ্যা নাই; এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য বিষয়টি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলাম—সে কথা তখন বারান্তরে প্রকাশ করিয়া পাঠকপুঞ্জের কৌতুহল নিবারণ করিব।

ভিটা বাঁধা দিয়া বা বিক্রয় করিয়াই হউক, বা অন্য কোন রকমেই হউক, কেরাণী বাবু কন্যার বিবাহ দিয়াই যে পার পাইলেন, তাহা নহে। "বার মাসে তের পার্ব্বণ,"—সকল গুলিতেই রীতিমত তত্ত্ব তাবাস করিতে হইবে। বিশেষ আশ্বিন মাসে 'পূজার তত্ত্ব' এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জামাই ষষ্ঠী', এই দুইটিই গুরুতর রকম। পূজার সময়ে জামা'য়ের শাল, ভাল জুতা, শান্তিপুরে বা ঢাকাই কাপড় ও উড়ানী চাই—তা' ছাড়া মিষ্টান্ন ত আছেই। সব কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বিয়ানের ভাল শাড়ী চাই, জামায়ের ভ্রাতৃ-বধূ, ভগ্নী, মাসী প্রভৃতির ভাল শাড়ী বা সাদা ধুতি, অন্ততঃ, প্রথম বৎসর ত দিতেই হইবে। খুব কম করিয়া ধরিলেও এই গুলি কখনই ৭০।৮০ টাকার নীচে হইবে না। কিছু ত্রুটি হইলে, অমনি মুখ বাঁকাবাঁকি হইয়া দাঁড়াইল। হয় ত আর মেয়েটাকে পাঠাইবে না—পুত্রকে শ্বশুর-বাটী যাইতে দিবে না—ইত্যাদি, নানা প্রকার বিবাদের সূচনা হইতে লাগিল। কন্যা-কর্ত্তা কিছুতেই বরকর্ত্তার মন পাইবেন না। আবার মেয়েটী যদি তাঁর সুন্দরী না হয়, তাহা হইলে শ্বশুরালয়ে তাহার গঞ্জনার ও খোয়ায়ের সীমা থাকে না। দিবানিশি পিতা মাতার নিন্দা শুনিয়া তাহার কর্ণ বধির হইয়া যায় এবং নানা মনস্তাপে তাহাকে শ্বশুরালয়ে কালহরণ করিতে হয়। অনেক বধূ এইরূপ অবস্থায় বিগড়াইয়া গিয়াছে—এবং উভয় পক্ষের মানহানির হেতু হইয়াছে।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অনেক ব্যয় হয় দেখিয়া, অনেক কন্যাকর্ত্তা আজ কাল জুয়াচুরি করিতে শিখিয়াছেন। ৫০ ভরি সোণা দিব বলিয়া হয় ত ২৬ ভরি সোণা দিলেন। কিন্তু এরূপ করিলে, প্রথম হইতেই বিষ-বৃক্ষ রোপন করা হয় এবং কন্যা লইয়া চিরকাল কুটুম্বের সহিত অসরস থাকে; ইহার অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় আছে? সোজা কথা বলা, যাহা পারিবে তাহা স্বীকার করা, সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা হইলে, কোনও দোষ পড়ে না। বরং, দিবার কথা কম কহিয়া বেশি দিলে যথেষ্ট যশ হইয়া থাকে—এ কথা স্মরণ করা উচিত।

এই সকল নানা কারণে আমাদিগের দিন দিন অবনতি হইতেছে। একে ত সকলেই জাতীয় ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া, পরদ্বারে দাসত্ব স্বীকার করিয়া কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই, তাহার উপর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এই রূপ বিপদ। কিসে দেশের উন্নতি হইবে, কিসে সমাজের উন্নতি হইবে, কিসে লোকের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, দেশে এ বিষয়ে কাহার ও দৃষ্টি নাই; বরং যাহাতে কঠিন ও অশিব-নিয়মাদি প্রচলিত হয়, তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করা আছে। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে রূপার পৈছা, নথ, মল ও মাকৃড়ী প্রভৃতি গহনা (একুনে ৪০।৫০ টাকার জিনিষ) দিয়া কন্যা-কর্ত্তাগণ কন্যার বিবাহ দিতেন। সে হিসাবে, দেশের, এক্ষণে কি ভয়ানক অবস্থা হইয়াই দাঁড়াইয়াছে।

আমাদিগের এই প্রবন্ধটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বরকর্ত্তাগণ কন্যাকর্ত্তাদিগের নিকট যাহা ন্যায্য তাহাই ল'ন, পীড়াপীড়ি করিলে কন্যা-কর্ত্তাকে বিশেষ বিপদাপন্ন হইতে হয়। বর-কর্ত্তার বিবেচনা করা উচিত যে, তিনি যখন তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন, তখন তাঁহাকে ও ঐ রূপ বিপদাপন্ন হইতে হইবে। অতএব যাহা রয় বসে, তাহাই করা ভাল। এ জগতে 'পরোপকারে'র মত আর ধর্ম্ম নাই। কন্যাকর্ত্তার ক্ষমতা বুঝিয়া যদি দেনা পাওনার আকিঞ্চন করেন, তাহা হইলে কার্য্য অতি উত্তম হয়, এবং পরস্পর এই রূপ করিলে দুঃখময় এই জগত সুখময় হইয়া উঠিবে। নতুবা, এই রূপ কুপ্রথার প্রশ্রয় দিলে দিন দিন আমাদিগের হীনাবস্থা হইবে এবং দুঃখ-সাগরে নিয়ত ভাসমান থাকিতে হইবে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

বারোঁয়া-ঠুংরী।

কৃষ্ণ! সত্য সনাতন,
করুণা-সাগর, হরি, শ্রীমধুসূদন!
মস্তকে মুকুট ধর', পরিধান পীতাম্বর,
কিবা রূপ মনোহর, মদনমোহন!
শ্রীহরি, রাসবিহারি, বিশ্বম্ভর, বংশীধারি;
বিতর' করুণা-বারী, গোপিনী-রঞ্জন!
তুমি প্রভো বিশ্ব-স্বামী, তব দাস মোক্ষ-কামী;
দুরাচার পাপী আমি, দীন হীন জন।
কমলা সেবিত পদ, স্মরিলে ঘুচে বিপদ,—
জীব পায় মোক্ষপদ, জগত জীবন!
দিবাকর—নিশাকর, ইন্দ্রাদি তব কিঙ্কর;
পদাশ্রিত মহেশ্বর, জগত তারণ!
তুমি হে পুরুষ সার, তব পদে মতি যাঁর;
অন্তিমে হ'য়ে "উদ্ধার", স্বর্গ বাসী হন।
নানা কষ্ট নিরবধি, তব কৃপা হয় যদি;
পার হ'য়ে ভব-নদী, দেখি শ্রীচরণ।
তুমি অখিলের পতি, অগতির তুমি গতি—
তব পদে থাকে মতি, এই আকিঞ্চন॥
ভক্তাধীন ভগবান্! হানি অদর্শন-বাণ,
বধোনা দাসের প্রাণ, বিনোদ-বরণ!
বিশ্বাধার, নির্ব্বিকার, তুমি সর্ব্বগুণাধার;
মহিমা তব অপার, পতিত পাবন!
দয়াময় ভব-পতি! পদাশ্রিত দাস প্রতি,
করুণা কর' সম্প্রতি, রাধিকা রমণ!
যেন এ ভবের ভার, বহিতে না হয় আর,
ভব-সিন্ধু কর' পার, বিঘ্ন বিনাশন!

শ্রীরাধাজীবন রায়।

বসন্ত-বাহার—আড়াঠেকা।

আজি কি এ দুখিনীকে পড়েছে মনে?
বিচ্ছেদ করিয়ে নাথ! ছিলে কেমনে?
ঘরে পরে প্রতিবাদী, তবু তোমার তরে কাঁদি!
কি দোষেরই সাধ সাধি, ঠেলেছ চরণে?
...দিন, ত্যজিলে ভবন, মজা'লে অবলার মন;
...এ কি আচরণ? না রাখ স্মরণে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

(সংগৃহীত)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

অনুগত জনে ধনি! ক্ষমা কর' দাস ব'লে,
চিরদিন রয়েছি বাঁধা তব প্রেম শৃঙ্খলে।
কভু যদি দাস দোষী, হয় (ওলো) প্রাণ-প্রেয়সি!
তা'হ'লে কি প্রভু রুষি, সহসা চরণে ঠেলে?
উঠ উঠ কথা রাখ', বারেক কর' কটাক্ষ,—
হাসা'ওনা বিপক্ষ, পতিত হ'য়ে ভূতলে।

বারোয়া—ঠুংরী।

আমার প্রাণ যে যায়, (ওগো)
কে আছে সুহৃদ হেন জানা'বে তাহায়।
আমি মরি যা'র লাগি, সে যে পরে অনুরাগী,
তবে কেন দুঃখ-ভাগী, তাহার মায়ায়?
ভাল বাসার অযতনে, কত যে যাতনা মনে,—
অন্তর্যামী হরি জানে, জানা'ব কাহায়?

ঝুম-খাম্বাজ—কাওয়ালী।

...মন উচাটন হয় তা'র তরে?
...করিয়ে যেই ললনার প্রাণ হরে।
প্রথমে প্রিয় সম্ভাষে,—
বদ্ধ করি মায়া-পাশে,
শেষে সে নাহি জিজ্ঞাসে,
দৈবে দেখা হ'লে পরে?

শ্রীমহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাউলের সুর।

চিন্তা কি তোর? বল্‌রে শুনি,
তোর হৃদয়-মাঝে—বিরাজিছে
জগতের চিন্তামণি। (ও ভোলা মন!)
(কেন) মিছে বেড়া'স্ ঘুরে?
পরের উপাসনা ক'রে;—
(ও ক্ষেপা মন!) থাকৃতে তোর নিজের ঘরে,
গুরুদত্ত পরশমণি।
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন,—
(ওরে) তাদের গিয়ে কর্‌গে দমন,
ঘুচা'বে (তোর) মধুসূদন
—শমনের টানাটানি।

শ্রীদয়ালচাঁদ ঘোষ।

—:০:—



শ্রীব্রজবল্লভ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৭ নং বীডন স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে" শ্রীবিহারীলাল নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

[১ম খণ্ড।] আষাঢ়। [৩য় সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা।)

শ্রীকালিদাস মিত্র

সম্পাদিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল।
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

—তাপস বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পত্র।

রজনী প্রভাত হইল। প্রতাপ বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর পশ্চাতে কুসুমোদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার মুখ মণ্ডল পরিম্লান হইয়া আসিল। গত রাত্রে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সমস্ত চিন্তা বলবতী হইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণকে এতাদৃশ অধিকার করিয়াছিল যে, তিনি একবারও ভালরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। যাহার কন্যাকে বাটীতে লইয়া আসিয়াছি, সে ব্যক্তি ত বড় সহজ লোক নয়, আমি যে উপায়ান্তর না দেখিয়া এরূপ সাহস করিলাম, তাহা ত সে বুঝিবে না, প্রতিবেশিগণই বা কি মনে করিবে,—এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি কখন বা ইতস্ততঃ বিচরণ কখন বা উপবেশন করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন,—একখানি পত্র লিখিয়া লোক সমভিব্যাহারে কামিনীদ্বয়কে যথাস্থানে প্রেরণ করি, আবার তাহাতে সন্দিহান হইয়া ভাবিলেন,—না, কেবল একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অত্র বাটীতে আহ্বান করিয়া, তাঁহার কন্যা তাঁহাকে অর্পণ করি। কপোলে কর সন্নিবেশ করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে একটি রমণী-মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল। রমণী অবগুণ্ঠনবতী এবং লজ্জায় বিনম্রমুখী। অর্দ্ধদেহ প্রকাশ্যে রাখিয়া দণ্ডায়মানা—যেন কি বলিতে আসিয়াছেন, কিন্তু লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিতেছে। এরূপ লজ্জিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে কি ফল দর্শিবে, কেমন করিয়াই বা কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এই ভাবিয়া ঐ রমণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া প্রতাপ বাবুর নিকটে আসিলেন। পাঠক মহাশয়! বুঝিতে পারিয়াছেন, এই রমণী কে? ইনি সেই সহচরী, রাত্রে ইহাঁর নিদ্রা হয় নাই। গিরিবালা পথশ্রমে আক্রান্ত ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে সহচরী তাঁহাকে জাগাইলেন এবং চকিতের ন্যায়, ফিরিয়া আসিব বলিয়া, বাহিরে আসিলেন। গিরিবালার ক্রন্দন পুনরায় আরম্ভ হইল। রজনীতে পিতা ও পতির কি অভাবনীয় দুরাবস্থা ঘটিয়াছে,

তাহা যদি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে, গিরিবালা কি করিতেন, তাহা জানি না। তিনি বিষপান করিতেন কি জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন, তাহার নির্ণয় নাই। ফলতঃ, সরল হৃদয়া চারুশীলা ললনা মাত্রেরই অন্তঃকরণ সহজেই এই রূপ দ্রবীভূত হইয়া থাকে। সহচরী ধৈর্য্যশীলা, অন্তরে প্রভূত বল,—ঝড় তুফানে অচঞ্চলা। তিনি ভাবিলেন, বিপদ্ ঘটিয়াছে তা কি হইবে? নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরন্তর অশ্রুমোচনে কি ফল দর্শিবে? তিনি রজনীতেই পরিচারিকার নিকট হইতে কাগজ, কলম ও মস্যাধার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র যে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সেই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পত্র লিখিয়া গিরিবালার পিতাকে সংবাদ দিবেন; তাহা হইলে ত কয়েক ঘণ্টা কাল বৃথা অতিবাহিত হইল, কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিল—অন্তরের গূঢ়তম অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে কণ্টক পড়িল। তাহা হইবে না, অতি প্রত্যূষেই পত্র লিখাইতে হইবে এবং সত্বরই স্বীয় সন্দিহান চিত্তকে সুস্থির করিতে হইবে,—এই ভাবিয়া একেবারে ঐ গুলি হস্তে করিয়া প্রতাপচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতাপ বাবু রাত্রেই নৌকার উপরে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, অতএব অবাধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিগো মা, খবর কি?"

সহ। আমাদের বিদায় দিন্।

প্রতাপ। সেকি, এর মধ্যেই! আগে স্নান আহার করুন্। হুগলী ত ঐ দেখা যাচ্চে।

সহ। তার যে কোন উপায় দেখ্‌ছি না।

প্রতাপ। কেন, আপনার সঙ্গিনী কোথায়?

সহ। তিনি এসে অবধি কেঁদে কেঁদে সারা হচ্চেন।

প্রতাপ। সেকি! আপনারা আমার মাতৃতুল্য। আমার এখানে আপনাদের পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হ'বার আশঙ্কা নাই। একটু সুস্থির হউন। দৈব-দুর্ব্বিপাকে ও বিধি-বিড়ম্বনায় এমন শত শত বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। যাতে আপনারা শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছিতে পারেন, তার উপায় আমি এখনি করিতেছি। কিন্তু মা! সন্তানের প্রতি এই অনুগ্রহ কর্‌বেন, যেন স্নান আহারাদি না ক'রে যাওয়া না হয়। আপনারা আসাতে আমার বাড়ী পবিত্র হয়েছে, আহারাদি না ক'রে গেলে আমাদের মনে বড়ই দুঃখ থাক্‌বে।

সহ। মহাশয়, অধিক কি বল্‌ব, আপনি আমাদের প্রাণদাতা। বলুন দেখি, সেই বিপদের সময় আপনি না থাকিলে, আমাদের কে রক্ষা করিত? আপনার মুখে এরূপ কথা শুন্‌লে আমাদের বড়ই লজ্জা বোধ হয়।

প্রতাপ। ভগবান্ রক্ষা করেছেন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, কি করিতে পারি?

এই রূপ কথোপকথনের পর, সহচরী বিনম্রবদনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। কোন একটি গুরুতর কথায় তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু মুখে প্রকাশ করা ত বড় সহজ নয়, এইরূপ চিন্তা বলবতী হইয়া তাঁহার মুখ-মণ্ডল আর এক ভাব ধারণ করিল। চক্ষে দুই এক ফোঁটা জলও আসিল। তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু

মুছিতে লাগিলেন এবং ভাব গোপনের অশেষবিধ চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ তাঁহার এরূপ ভাব দেখিয়া সরল-হৃদয় প্রতাপচন্দ্র কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি ব্যথিত হইয়া পুনরায় বলিলেন,—"ভাল, আপনারা যা' আজ্ঞা করবেন, তাই করব।"

সহ। মহাশয়, আমি আপনার আশ্রিত।

প্রতাপ। মা! এমন কথা বলছেন কেন?

সহ। আগে ছিলাম না বটে, কিন্তু—

প্রতাপ। মা, আপনার কথা আমি ভাল বুঝ্‌তে পাচ্চি নে! আমার কাছে কিছু বল্‌তে কুণ্ঠিত হ'বেন না; আমি আপনার সন্তানতুল্য।

সহ। আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

প্রতাপ। প্রকাশ ক'রে বলুন, আমার ক্ষমতায় হয়, পূর্ণ করিব।

সহ। মহাশয়, আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী। শিশুকাল হইতেই পিতা মাতার আস্বাদন যে কিরূপ, তা ত জান্‌লেম না। শুন্‌তে পাই, পথের ধারে পড়েছিলেম, ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী গঙ্গা স্নানে গিয়েছিলেন, তিনি দয়া ক'রে আমায় কুড়িয়ে নিয়ে যান। পথের লোকে তাঁকে বলেছিল,—আমি কায়স্থের মেয়ে। আমার বাপ মাকে তারা জান্‌ত। তারা ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রীকে বল্লে,—"মা, আপনি একে নিয়ে যান; এই মাত্র এর বাপ মা হাতে কাপড় বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে। মেয়েটিকে পথের ধারে ফেলে রেখে গেছে, যদি কারো দয়া হয়। ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী আবার তাদের জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"কেন এমন হলো?" তাহারা বলিল,—"জমীদারে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে, তাই মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে। ঘোষাল মহাশয়ের স্ত্রী শুনে কত দুঃখ প্রকাশ কল্লেন, আর আমার হাতে মোয়া কিনে দিয়ে আমাকে কোলে ক'রে বাড়ী নিয়ে এলেন। ছোট বেলা আমাকে সকলে "কুড়ন মেয়ে" ব'লে ডাক্‌ত।"

উদার স্বভাব প্রতাপচন্দ্র চিত্রার্পিতের ন্যায় এই সকল বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে মর্ম্ম পীড়ায় অধৈর্য্য হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—ওঃ জমীদারের কি ভয়ানক অত্যাচার! কি কঠোর পাষাণ হৃদয়! এদের দেহ কি রক্ত মাংসের নয়! প্রজাদের সর্ব্বনাশ করাই কি এদের কার্য্য! নারকী আর কা'কে বলে?—বিষয়ী লোকই নারকী। যারা দিন আনে দিন খায়—যারা সামান্য কৃষি-কার্য্যে কালক্ষেপ করে, তারাই প্রকৃত সুখী, সন্তোষের মুখ তারাই দেখ্‌তে পায়—ওঃ কি পরিতাপ! কি অমানুষিক কার্য্য!! প্রকাশ্যে বলিলেন,—"মা! ভয় কি? ঈশ্বর আছেন, তিনি সকলেরই মা বাপ।"

সহ। মহাশয়! শেষ হয় নি, শেষ হয় নি, আরও কিছু শুন্‌তে হবে। বিধাতা আমাকে একটি দুঃখের পুতুল গড়েছেন। তার পর আমি ঘোষাল বাবুর বাড়িতেই মানুষ হ'তে লাগ্‌লাম। তিনি আমাকে আপনার মেয়ের মত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তার পর কতদিন পরে গিরিবালার জন্ম হয়। আমরা দুটি ভগ্নীর মত খেলা করি-

তাম। সেই শৈশব-কাল হইতেই একত্রে খাওয়া, একত্রে শোওয়া, একত্রে বেড়ান, আমরা পরস্পর সুখের সুখী—দুখের দুখী। তার পর আমার বিবাহের বয়স হইল। ঘোষাল বাবুর অতুল প্রতাপ—তিনি আপন কর্ম্মচারীদের মধ্যে একজন কায়স্থ ভদ্র সন্তানের সঙ্গে আমার বিবাহ দিলেন,—কার মাথার উপর মাথা যে, একটি কথা কয়? আমার শ্বশুর বাড়ী দেবানন্দপুর। ভাল তাই হোক্—স্ত্রীলোকের পরম ধন স্বামী—তাই বাঁচিয়ে রেখে এক রকম ক'রে কাল কাটান যায়—তাতেও বিধাতা বিমুখ। বিবাহের কিছু দিন পরেই খবর এলো—তিনি খাজনা দিতে পারেন নি ব'লে, জমীদারের লোক জন তাঁকে ধরে নিয়ে যায়, খাজনার জন্যে তাঁর প্রতি অনেক অত্যাচার করে, তিনি কিছুতেই দিতে পাল্লেন না—তাই জমীদার বাবুর হুকুমে তাঁকে দেয়ালের ভিতর গেঁথে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কের একটি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঘোষাল বাবুকে খবর দেয় যে, তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে আছেন—তাঁর কাল হয় নি—তাতেই সকলে একটু সুস্থির হয়েছিলেম্। কিন্তু, আজ বার বৎসর হতে গেল, তাঁর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সকলেরই মনে বিশ্বাস হলো—তিনি আর নেই। তাই লোকের গঞ্জনায় আমাকে শুধু হাত ক'রে, সাদা ধুতি পর্ত্তে হয়েছে। মহাশয়! ভেবে দেখুন, আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে? ভাল তাই হোক্, একটা মাংস পিণ্ডের মত—একটা গরু কি একটা ছাগলের মত—দুবেলা দুমুটো খেয়ে, এক রকম ক'রে দিনটা কাটিয়ে দি,—তাতেও পোড়া বিধি বাদ সাধ্‌তে সুরু করেছে। মহাশয়! কোন গুরুতর কারণ আছে, যার জন্যে আমি সেই বাপ হেন ঘোষাল মশাই আর সেই মা হেন ব্রাহ্মণীকে ত্যাগ কর্ত্তে উদ্যত হয়েছি, দিব্য কর্ত্তে পারি অন্তরে যদি তিলার্দ্ধ দরদ উপস্থিত হয়।

প্রতা। কারণ টি কি শুন্‌তে পাই না?—

সহ। পরে সকলই জান্‌তে পারবেন্। এখন আমি আপনার আশ্রিত কি না বলুন্?

প্রতা। আপনার প্রার্থনা বড় সহজ নয়।

সহ। আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে খুব সহজ।

প্রতা। পরে যে কি ঘট্‌বে সে টা কি ভেবেছেন?

সহ। তা' বিলক্ষণ ভেবেছি।

প্রতা। আমার যথেষ্ট বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সহ। আপনি ধনাঢ্য জমীদার।

প্রতা। তা' ব'লে ইচ্ছা ক'রে কি মাথার উপর বিপদ লওয়া যায়?

সহ। চিন্তা নাই, আমার পথ আমি দেখ্‌ব।

প্রতা। পত্রে কি লিখ্‌ব?

সহ। সত্য কথা।

প্রতা। পরে যে মিথ্যা হয়ে দাঁড়া'বে?

সহ। ঈশ্বর যাঁর সহায় তাঁর চিন্তা কি? এই অনাথাকে আশ্রয় দিলে, আপনার পুণ্য বৈ পাপ নাই।

প্রতা। সকলি বুঝ্‌লাম্। কিন্তু আমি পত্র লিখ্‌লে, ঘোষাল মহাশয় যখন আপনা-

দের নিতে পাঠাবেন, তখন আপনি কি কর্‌বেন?

সহ। তার পূর্ব্বে যদি যমে নেয়, তা হলে আর কি কর্‌বেন?

প্রতা। না মা! এমন কল্পনা কর্‌বেন না।

সহ। মহাশয়! আমার এখন হ্রস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নাই। কি বল্‌তে কি বলি, তার ঠিক নাই। আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। আমি এরূপ মর্ম্ম ব্যথায় ব্যথিত যে, কুলের কুল-বধূ হয়েও আপনার নিকট সকলই খুলে বল্লেম্। আপনি নিশ্চয়ই জান্‌বেন, সেখান থেকে তফাৎ হওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হয়েছে। তবে যদি মহাশয়! এত শুনেও এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া না হয়, এই শরণাগতকে আশ্রয় দিতে ইচ্ছা না হয়, তবে মা গঙ্গা আছেন, তিনি ত আর ত্যাগ কর্‌বেন না, বাপ মা যে পথে গেছেন সেই পথে যাব, ভয় কি আছে?—

এই বলিয়া সহচরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রতাপ চন্দ্রের হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইল। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"মা! ভয় নাই, আমার যত বিপদ্ ঘটুক না কেন, আমি আপনার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিব। আপনি ভিতর মহলে যান, আপনার সঙ্গিনী কত ভাব্‌চেন। তচ্ছ্রবণে সহচরী বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি পত্র লিখুন, আমি পত্র শুনে তবে যাব।" প্রতাপচন্দ্র সম্মত হইলেন। কম্পিত করে পত্র লিখিতে বসিলেন। সহচরী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিলেন। পত্র লেখা শেষ হইলে, প্রতাপবাবু বলিলেন,—"মা! এই লিখ্‌লেম্।" সহচরী সাগ্রহে কর্ণ পাতিলেন, প্রতাপ বাবু পাঠ করিলেন।—

"পরম পূজনীয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু দামোদরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

সেবক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাস ঘোষস্য।—

শত সহস্র প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ-প্রসাদে এ দাসের সমস্ত মঙ্গল হয় বিশেষ। পরে গত কল্য সন্ধ্যার সময় হুগলী হইতে নৈহাটী আগমন কালীন দেখিলাম, দুইটি স্ত্রীলোককে গোড়ায় তাড়া করে। তাঁহারা বেগে দৌড়িয়া আসিয়া আমার নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভয়ে আকুল হইয়া, তাঁহারা আর বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না। এবম্বিধায় আমি অগত্যা তাঁহাদিগকে মদীয় নৈহাটীর ভবনে আনয়ন করিয়া, যথাসাধ্য যত্ন-পূর্ব্বক সেবা করিতেছি। পরিচয়ে জানিলাম, তন্মধ্যে একটি আপনকার কন্যা—অপরটি প্রতিপালিতা। মহাশয়! দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ সকলই ঘটিতে পারে;—একারণ মনোমধ্যে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে মদীয় ভবনে তাঁহাদিগের চরণে কুশাঙ্কুর ও বিদ্ধ হইবেক না। আপনি সুবিধা মতে এ দাসের ভবনে শুভাগমন করিয়া পদ-ধূলি প্রদানে এ দাসকে চরিতার্থ করিবেন এবং কন্যাদ্বয়কে স্বয়ং সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। সময়ের অপ্রতুল বশতঃ অধিক লিখিতে পারিলাম না—এ বিষয়ে অপরাধ লইবেন না। সাক্ষাৎকারে সকল বিষয় নিবেদন করিব, ইতি—বৈশাখ সন ১১৭৭ সাল।

নৈহাটী।"

সহচরী শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন,—"পত্র খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে।" প্রতাপ-চন্দ্র "যদুনাথ" বলিয়া ডাকিতে যদুনাথ বেগে দৌড়িয়া আসিলেন। তিনি তাঁহার হস্তে পত্র খানি দিয়া বলিলেন,—"এইখানি শীল মোহর ক'রে হুগলী ঘোষাল পাড়া দামোদর চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও। দ্রুপদ সিং কে ব'লে দাও যেন খাড়া খাড়া জবাব নিয়ে আসে, তিলার্দ্ধ দেরি না হয়।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া, যদুনাথ প্রস্থান করিলেন। গমন কালীন সহচরীর চক্ষু তাঁহার প্রতি পতিত হইল। তিনি অবগুণ্ঠন মধ্য দিয়া কতবার তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পরে প্রতাপ বাবুকে বলিলেন,—"মহাশয় এখন গিরিবালা কি কচ্চে দেখি গিয়ে।" এই বলিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রতাপচন্দ্রও নানা চিন্তায় ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে করিতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শারদা সুন্দরী।

পাঠক মহাশয়! আপনি প্রভাতের শিশির-সিক্ত গোলাপ পুষ্প নিরীক্ষণ করিয়াছেন? বর্ষা-জলে নবোক্ষিত নবীনা বল্লরীর অতুল শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন? শরৎ কালীন জ্যোৎস্নালোকে নবমল্লিকার সিত সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন?—করিয়া থাকেন করিয়াছেন, ক্ষতি নাই। বিশ্ব-নিয়ন্তার এই অসীম বিশ্ব-ভাণ্ডারে কিছুরই অপ্রতুল নাই। আমি পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, অদ্য একটী বস্তুর শোভা দেখিয়া আমার প্রাণ পুলকিত হইল, ভাবিলাম কি নিধিই পাইয়াছি, এমন ত আর জগতে নাই। মাতাকে গিয়া দেখাইলাম, তিনি দেখিয়া হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন,—কচিছেলে, এই দ্রব্য দেখিয়াই এত আহ্লাদ, যদি আবার অমুক বস্তু দেখিতে পায়, তাহা হইলে না জানি আরও কত আহ্লাদিত হইবে। আমার বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইল, অন্য একটি সুন্দর দ্রব্যে আমার মন আকৃষ্ট হইল, সেই বস্তুটি পরম যত্নে সংগ্রহ করিয়া পিতাকে গিয়া দেখাইলাম। তিনি সেই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যে আমার তাদৃশ যত্ন দেখিয়া, মনে মনে হাসিলেন। কিন্তু পঞ্চবর্ষ বয়সে যে বস্তুটি আমার এত ভাল লাগিয়াছিল, বোধ হয়, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও দেখি না। এইরূপে বয়স বৃদ্ধির সহিত যত বহুদর্শিতা জন্মিতে থাকে, যতই উত্তরোত্তর নূতন নূতন সুন্দর বস্তু দেখিতে থাকি, ততই মনে হয়, না জানি এই জগতে আরও কত সুন্দর দ্রব্য আছে, যাহা আমরা দেখি নাই, বা এই নশ্বর জীবনে দেখিয়া ফুরাইতে পারিব না। এ স্থলে একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, রূপ বা সৌন্দর্য্য কোথায়? ইহা কোন বস্তু বিশেষ আছে, বা মনুষ্যের চক্ষে অবস্থিতি করে? কেহ বলিবেন—বস্তুটি দেখিতে ভাল, তাই ভালবাসি। কেহ বলিবেন ও কোন কাজের কথা নয়—যে যাহা ভাল দেখে, সে তাই ভালবাসে। আমার চক্ষে যেটি ভাল, অপরের চক্ষে হয় ত সেটি অতি কদর্য্য। তবে আর কেমন করিয়া জানিব সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে?

হাঁ। ঐ কথা বলিতে পার, এমন কোন কোন বস্তু আছে যাহা সর্ব্বসম্বাদীরূপে সুন্দর—কিন্তু সে কয়টা? সে জগতে অতি বিরল—অতি দুর্ল্লভ। যে বস্তু শিশুর আনন্দপ্রদ, যুবকের চিত্ত বিনোদন, এবং বৃদ্ধের লোচনানন্দদায়ক, স্থূল বিবেচনায়, আমরা তাহাই সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিব। দর্শন বা ন্যায়-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করিবার আবশ্যক নাই। পাঠক মহাশয়! আজি যে রমণী-মূর্ত্তি আপনার সম্মুখে নীত করিলাম, বিবেচনা করিয়া—বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন, ইহা সকল সৌন্দর্য্যের আধার কি না? ইনি চিতোরাধিপতি মহারাজ ভীমসিংহের পদ্মিনী নহেন, বা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নূরজিহানও নহেন। বড় ঘরের বড় কথা। আমি দুঃখীর সন্তান, আমার অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয় থাকিলেও সকলে তাহা কাচ বলিয়া ঘৃণা করিবে, আর বড় লোকে কাচ ধারণ করিলেও তাহা হীরক বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। পাঠক মহাশয়! যদি আপনি জহুরী হন, তবে বিচার করুন্, এই হীরক খানি সাঁচা কি ঝুঁটা। হীরকের যদি বিশেষ কোন গুণ না থাকে, তবে উহা দেখিতেও কাচ, কাযেও কাচ। তবেই দেখুন, গুণেই সৌন্দর্য্য, গুণেই আদর, গুণেই পূজা, গুণ জীবন্তে ও দেহান্তে সকল অবস্থাতেই আদরনীয়। আসুন্, পাঠক মহাশয়! তবে আমরা গুণ ধরিয়াই বিচার করি। এই হীরক খানির দেখিতেও যেমন কমনীয় কোমল কান্তি, ইহার গুণ ও তেমনি অসাধারণ। বাহিরে যাহার রূপ লাবণ্যে প্রবিত্র প্রভা প্রকাশমান, অন্তরও তাহার পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া রমণী, লজ্জাশীলতা, পতি-ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি নানা সদ্গুণের আধারভূতা। ইঁহার মুখ-মণ্ডল দেখিলে বোধ হয়, যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা আসিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। বিধাতা যোগ্য বস্তুর সহিত যোগ্য বস্তুরই যোজনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, এতাদৃশ সদ্গুণসম্পন্না কামিনী উদার স্বভাব প্রতাপচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইবেন, ইহার আর বিচিত্র কি?

পাঠক মহাশয়, যদি ইচ্ছা হয়, আমার সহিত আসুন, ঘোষ বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী৺ দশভুজার মন্দিরে একবার প্রবেশ করিয়া দেখুন, ঐ রমণী মূর্ত্তি কি করিতেছেন। সম্মুখে দেখুন, রজতময় সিংহাসনোপরি অষ্ট-ধাতু বিনির্ম্মিত দশভুজার আনন্দময়ী প্রতিমা, মন্দিরটি ধূমায়িত ধূপসৌগন্ধে পরিপূর্ণ, ও সঘৃত দীপালোকে উদ্ভাসিত। প্রতিমার সম্মুখে নানাবিধ উপকরণ পরিপূর্ণ রৌপ্য ও তাম্রময় তৈজস পাত্রাদি শোভা পাইতেছে। বেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। স্নানান্তে পট্টবাসাবৃতা ঐ রমণীমূর্ত্তি নয়ন মুদিত করিয়া, গললগ্নবাসে ঐ প্রতিমা সম্মুখে আসনোপবিষ্ট হইয়া, একান্ত চিত্তে করপুটে কি প্রার্থনা করিতেছিলেন। উঁহার সুমিষ্ঠ কলকণ্ঠ বিনির্গত ভক্তি পরিপূর্ণ বাক্য পরম্পরা কত দূর সুশ্রাব্য ও মধুরতায় পরিপূর্ণ! রমণী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"হে মা দশভুজা! হে মা দুর্গা! মা গো! এই অধিনীর কথায় কর্ণপাত কর মা! আমি যেন স্বামী-পদে নিরন্তর ভক্তিমতী থাকি। মা গো! স্বামী পরম দেবত,—সে পদে যেন কখন অনাদর না হয়। জন্ম-

জন্মান্তর যেন এমন সোণার স্বামীর পাদ-পদ্ম পূজা করিতে পারি। মা গো! আমার সকল আশা পরিপূর্ণ করেছ। স্বামী চরণে যেন উত্তরোত্তর আরও ভক্তিমতী হইতে পারি, এই প্রার্থনা আমার পরিপূর্ণ কর।

প্রার্থনা শেষ হইলে, রমণী সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুনরায় দেবী সম্মুখে করপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি যখন দেবী সন্নিধানে উল্লিখিত প্রকারে প্রার্থনা করিতেছিলেন, প্রতাপচন্দ্র সেই সময় নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পশ্চাতে লুক্কায়িত ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ অতুল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"শারদা! ত্রুটি কি"?

শারদা সুন্দরী সেই চির পরিচিত কণ্ঠ-ধ্বনী শ্রবণ করিয়া একেবারে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া যেন মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া রহিলেন। স্বামী কতক্ষণ আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান আছেন—তিনি ত আমার সমস্ত প্রার্থনাই শ্রবণ করিয়াছেন—তিনি যখন আমার পশ্চাতে লুকাইয়াছিলেন, তখন আমি কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলাম,—এই সকল যতই তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, দ্বিগুণতর লজ্জাবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তদ্দর্শনে প্রতাপচন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া ভাবিলেন—কাজটা ভাল হয় নাই। যে শিরীষ প্রসুন দ্বিরেফভারে অবনত হয়, তাহাকে আবার বিহগ-চরণে প্রপীড়িত করিবার আবশ্যক কি?—প্রকাশ্যে বলিলেন,—"শারদা আর কেন লজ্জা দাও?"

শার। আমায় এত শাস্তি কেন?

প্রতা। ঘোম্‌টা খুলে কথা কও—এখানে আর কে আছে?

শার। লজ্জা।

প্রতা। আজও এতদূর!

শার। সেটা কি মন্দ?

প্রতা। না।

শারদা সুন্দরী অবগুণ্ঠন খুলিলেন। প্রতাপ চন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার কপোলদেশ লজ্জায় ঈষৎ অরুণাভ হইয়া কমল শোভা ধারণ করিয়াছে এবং ললাট-তিলক স্বেদ-জলে আদ্র হইয়াছে। তাঁহার সে ভাব অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্বীয় উদরে করা-মর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তাই ত বেলা অতিরিক্ত হয়েছে, বড় ক্ষুধা বোধ হচ্চে—কিছু খেতে দেবে কি?"

শারদা সুন্দরী আস্তে ব্যস্তে একখানি রৌপ্য থালে কিছু প্রসাদ লইয়া প্রতাপ-চন্দ্রের হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।

প্রতাপচন্দ্র পশ্চাতে হস্ত রাখিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। শারদা সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—"আজ দাসীর প্রতি এত নির্দ্দয় কেন?"

প্রতা। তোমার এত ভুল?

শার। কিসে?

প্রতা। গৃহস্থালি ভুলে যাও?

শার। কি হয়েছে প্রকাশ ক'রে বলুন।

প্রতা। বাড়ীতে ব্রাহ্মণ কন্যা ও কুটুম্ব কন্যা উপবাসিনী। আগে যত্ন ক'রে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা কর, তার পর অন্য কায।

শার। তাই আগে বল্লেই ত হ'ত?

প্রতা। একটা পরীক্ষা করা গেল।

শার। পরীক্ষায় হারা'তে পেরেছেন কি?

প্রতা। পেরেছি বৈ কি।

শার। আমি জানি আপনিই আমার অভিষ্ট দেব, আপনার উপর আর কে আছে?

প্রতা। সাবকাশ বড় অল্প,—মোকদ্দমা, মামলার হাঙ্গামে আর তিলার্দ্ধ সুস্থির হ'তে পাচ্চিনে। আমি এখন চল্লেম, দেখো যেন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়।

এই রূপ আদেশ করিয়া প্রতাপচন্দ্র বাহিরে চলিলেন। শারদা সুন্দরীও স্বামীর আদেশমত কার্য্য করিতে গেলেন। প্রতাপচন্দ্র বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, দ্রুপদ সিং পত্রের উত্তর লইয়া আসিয়াছে; সাগ্রহে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। পত্রখানি এই:—

"পরম কল্যাণীয়

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়

কল্যাণবরেষু।—

সানুনয় বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবেন। পরে মহাশয়ের পত্র পাইয়া আমার মৃত-দেহে জীবন সঞ্চার হইল। আপনি যে যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আপনকার এই উপকার আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলিতে পারিব না। আমাদের আজ সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। গত রাত্রে কর্ত্তা ও আমার জামাতা উভয়েই মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—এই মাত্র সংবাদ পাইলাম, তাঁহাদের এক সপ্তাহ কাল কারাগারে থাকিতে হইবে। আমার পুত্র চণ্ডীচরণ এই সংবাদ লইয়া আসিয়াই পীড়িত হইয়াছেন। আমি যে এখন কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিধাতা যে আমায় একেবারে এত কষ্টে ফেলিবেন, তাহা স্বপ্নের অগোচর। মহাশয়! আপনি আমাদের নিতান্ত অপরিচিত নহেন। আপনার বাটীতে যে কন্যা দুইটি আশ্রয় পাইয়াছে অপর স্থানে গিয়া পড়ে নাই, ইহাই আপাততঃ মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, এক সপ্তাহ কাল উহাদিগকে আপনকার বাটীতেই রাখিবেন। পরে আমি যাহা ভাল হয়, তাহাই করিব। উহারা যাহাতে উৎকণ্ঠিত না হয়, এরূপ প্রবোধ দিবেন—আর সকল কথা উহাদিগকে শুনাইবেন না। জগদীশ্বরের নিকট সদা সর্ব্বদা আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি—বৈশাখ, সন ১১৭৭ সাল।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী—

শ্রীমতী হৈমবতী দেবী।

সাং হুগলী, ঘোষাল পাড়া।"

প্রতাপচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ও দ্রুপদ সিংকে বিদায় করিয়া পত্রখানি হস্তে লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবং যে গৃহে শারদা সুন্দরী, গিরিবালা ও সহচরীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই গৃহ-দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কাষ্ঠ পাদুকার শব্দে তাঁহারা সকলেই ব্যস্ত হইয়া, অবগুণ্ঠনাবৃতা হইলেন। প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"এই পত্রের উত্তর এসেছে।" সহচরী অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"অনুগ্রহ ক'রে পাঠ করুন্। প্রতাপচন্দ্র পত্রের অধিকাংশই

গোপন করিয়া অন্যবিধ বাক্য-বিন্যাস পূর্ব্বক পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ শেষ হইলে সকলেই বুঝিলেন—কোম্পানি সংক্রান্ত কোন বিশেষ কর্ম্মের অনুরোধে ঘোষাল মহাশয় ও তাঁহার জামাতা অদ্য প্রাতে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন এবং চণ্ডীচরণ পীড়িত হইয়াছেন, অতএব গিরিবালা ও সহচরীর বাটী প্রত্যাগমনের এক সপ্তাহ বিলম্ব হইবে। চতুরা সহচরী পত্র খানি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন—পত্রে সকল কথা সত্য লেখা হয় নাই, কিম্বা প্রতাপচন্দ্র অনেক কথা গোপন করিলেন। যাহা হউক, তিনি মনের ভাব কিছুই ব্যক্ত করিলেন না। পত্র পাঠান্তে প্রতাপচন্দ্র পুনরায় বাহিরে গমন করিলেন এবং পত্রখানি তাঁহার গুপ্ত কাগজ পত্রের সিন্ধুক মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। শারদা সুন্দরী গিরিবালার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"মা! আমি মনে করেছিলেম যে, মা আমার বুঝি আজই আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবেন,—তা'ত হবে না মা! আগে মনের সাধে দু'দিন ঐ রাঙা-চরণ দু'খানি সেবা ক'রে জন্ম সার্থক করি, তবে মাকে আমার ছেড়ে দিব।"

গিরিবালার বিষণ্ণ মুখে হাসি আসিল। সহচরী বলিলেন,—"এখানে কিসের দুঃখ,মা ছেড়ে মা পেয়েছি।" শারদা সুন্দরী বলিলেন,—"এস মা! এস বেলা অনেক হয়েছে।" সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। সহচরী মনে মনে বলিতে লাগিলেন—বিধাতা বুঝি এত দিনে মনের বাসনা পূর্ণ কল্লেন, বিলম্বই ত আবশ্যক। সকলেই প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

নানাবিধ সুখ-সম্ভোগে সাত দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিবস রজনী-যোগে গিরিবালা একান্তে উপবেশন করিয়া, রামায়ণ পাঠ করিতেছেন, আর এক একবার মনে করিতেছেন—কালি বাটী যাইয়া পিতা,মাতা ও স্বামীর চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। সাত দিন যেন আমার পক্ষে সাত বৎসর বোধ হইতেছে! আরও ভাবিলেন—সহচরীর কি কঠিন প্রাণ! তাহার হৃদয়কে ধন্য! সহচরীর মাথার উপর দিয়া কত ঝড় তুফান বহিয়া গিয়াছে. সে কেন কঠিন হইবে না? কঠিন না হইলেই বা সে বাঁচে কেমন ক'রে? বিধাতা জানেন কিনা তাকে অনেক দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে, তাই তাকে পাষাণ দিয়া গঠিয়াছেন। ভাল, তাহার হৃদয় যদি পাষাণ হইল, তবে আমায় এত ভালবাসে কেন? আমার প্রতি ত সে তেমন নয়! আমার মুখে একটু হাসি বাহির করিবার জন্য সে কতই চেষ্টা পায়। এ কয় দিবস আমাকে এক তিলও বসিয়া ভাবিতে দেয় নাই। "গিরিবালা! দেখ্ দেখি কেমন চাঁদ উঠেছে,—গিরিবালা! দেখ্ দেখি কেমন ফুল ফুটেছে,—গিরিবালা! শোন দেখি কেমন পাখী গাইছে,"—এইরূপ কত উপায়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। সহচরীর মত সঙ্গিনী কি আর দু'টি আছে? সহচরী আমার সুখের সুখী—দুখের দুখী। মা'র কাছে গিয়ে সহচরীর কত সুখ্যাতি করব। মা শুনিয়া কত আহ্লাদিত হইবেন,—এই রূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহচরী

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আসিয়া, তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিল। গিরিবালা বলিল,—"ওলো ছাড়্ ছাড়্, এ হাত আমার চেনা।"

সহ। এই ছাড়লেম্। চেনা কেমন ক'রে হলো ?

গিরি। এই রোজ রোজ হাত ধরা ধরি ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে।

সহ। আমার হাত যদি আর ধর্ত্তে না পাস্ ?

গিরি। বলিস্ কি তা' হলে কি আর আমি বাঁচ্ব ?

সহ। আর আমি যদি ম'রে যাই।

গিরি। আমিও ম'রে যাব।

সহ। তুই পাগ্লী।

গিরি। আমি, না তুই ?

সহ। যাগ্ এখন একটি কাযের কথা কব।

গিরি। কি ?

সহ। চণ্ডী আমার ওপর কিরূপ আচ্-রণ করে, তা' তোকে বল্ছি ?

গিরি। হঁ্যা—তা কি হয়েছে ?

সহ। সে আমায় একলা পেলে, কখন চুল ধ'রে টানে, কখন কাপড় ধ'রে টানে—

গিরি। কেন, বাবা ত তাকে খুব তিরস্কার করেছেন সে দিন ;—এমন কি বাড়ী থেকে বার ক'রে দেবেন পর্য্যন্ত বলেছেন।

সহ। তাতে কোন ফল হয় নি। আমি সে দিন তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়েছি। কিন্তু সে আমার কথায় কাণ দিলে না—উল্টে আমায় গালাগালি দিয়ে উঠ্ল! বল্লে,—"কি আমার সতী লক্ষ্মী এসেছেন গো।" তাই এ সকল অপমান প্রাণে সহ্য হয় না ব'লে মনে করেছিলেম্ যে, এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। তুই এক বার গঙ্গায় ঝাঁপ দিব ব'লে ঘাটের দিকেও এসেছিলেম্। কিন্তু তোর মুখ চেয়ে ক্ষান্ত ছিলেম্।

গিরি। বলিস্ কি !

সহ। তাই বিধাতা অঝোর কান্না দেখেই বুঝি আমাকে এখানে এনে ফেলে-ছেন।

গিরি। সে কি তুই আমাকে ত্যাগ কর্বি না কি ?

সহ। তোকে ত্যাগ ক'রে থাক্তে পারি ?

গিরি। তবে কি ? আমায় ভেঙে বল্ না।

সহ। আমি ত ম'রে যাচ্ছি নে।

গিরি। এ যে মরার বাড়া। তুই বেঁচে থাক্বি, আর আমি তোকে দেখ্তে পাব না, সে কি হয়ে থাকে সহচরি ? —

সহ। মনে কর্ আমি যদি শ্বশুর বাড়ী থাক্তেম ?—তাই বলি, অবুঝের মত কথা কোস্‌নে। কথাটা কত দূর একটু তলিয়ে বোঝ্।

গিরি। বুঝ্ব আর কি ছাই! মাথা আর মুণ্ডু ? তোর কথা শুনে আমার হাত পা যে পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

গিরিবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সহ। গিরিবালা কাঁদিস্ কেন ?

গিরি। তোকে ছেড়ে থাক্ব কেমন ক'রে ?—প্রতাপ বাবুকে সকল কথা বলে-ছিস্ নাকি ?

সহ। সব নয়—কেবল এখানে থাক্-বার কথা।

গিরি। তাতে তিনি কি বল্লেন্।

সহ। রাজি হয়েছেন।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গিরি-

বালা অধৈর্য্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—মুখে আর কথা সরিল না। সহচরী যদিও ধৈর্য্যশীলা, কিন্তু গিরিবালার এরূপ ভাব অবলোকন করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, বিয়োগ-যন্ত্রণা কেমন করিয়া সহ্য হইবে, এই ভাবনায় অধীর হইয়া, তিনি গিরিবালার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ রোদন করিয়া তাঁহার মনে হইল—আমি কি করিতেছি। একজনকে বুঝাইতে গিয়া নিজেই অধৈর্য্য হইতেছি, এমন করিলে কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? এই ভাবিয়া উঠিয়া বসিলেন, অঞ্চল দ্বারা অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন। গিরিবালাকে ক্রোড়ে বসাইয়া তাঁহার নেত্র-নীর মুছাইয়া দিলেন। গিরিবালা কহিলেন,—"সহচরি! তোর এখানে থাকা হবে না।" সহচরী কহিলেন,—"আমার গতি কি হবে?" গিরিবালা বলিলেন,—"আমি দাদাকে ভাল ক'রে বুঝাব; তাতেও না শোনেন, তাঁর পায়ে মাথা কুট্‌বো,—তাতেও না শোনেন বাবাকে মাকে ব'লে তোকে এখানে পাঠিয়ে দিব।" সহচরী কহিলেন,—"ভাল তাই হবে, এখন তুই একটু ঘুমো না।" গিরিবালা কহিলেন,—"তা' হলেই তুমি পালাও আর কি?"

সহ। না,—তুই পাগল হয়েছিস্ না কি?—

গিরি। আজ আমি ব'সে রাত কাটাব।

সহ। পার্‌বি?

গিরি। পার্‌ব।

সহ। আচ্ছা দেখা যাক্।

গিরি। তুই কেন ঘুমো না?

সহ। তোর গায়ে হাত বুলোবে কে?

কথা কহিতে কহিতে গিরিবালার তন্দ্রা আসিল। সহচরী তাঁহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাইতে প্রস্তুত হইলে, গিরিবালা বলিলেন,—"আচ্ছা ঘুম্ পাড়াচ্ছিস্ পাড়া, আমি তোর আঁচল ছাড়্‌ব না।" এই বলিয়া সহচরীর অঞ্চল লইয়া স্বীয় হস্তে দৃঢ়রূপে জড়াইলেন এবং শয়ন করিয়াই নিদ্রা গেলেন। সহচরী ও তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

নিদ্রা আসিল না। সুনিদ্রা সহচরীকে অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছে। নিদ্রাবস্থায় গিরিবালা কোন স্বপ্ন দেখিয়া, কাঁদ কাঁদ মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"সহচরি! প্রিয় সখি! কোথা যাও—আমায় ফেলে কোথা যাও—সহচরি! অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিও না,—একটু দাঁড়াও।"—এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। সহচরী দেখিলেন—গিরিবালা বিয়োগাশঙ্কায় এতদূর কাতরা হইয়াছেন যে, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়াও ঐ সকল কথা কহিতেছেন। তিনি তাল-বৃন্ত লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন, গাত্রে হস্ত বুলাইলেন, গিরিবালা সুষুপ্ত হইলেন। সহচরী দেখিলেন—গিরিবালা তাঁহার অঞ্চল ছাড়েন নাই।

ক্রমে রজনী অবসান হইয়া আসিল। সহচরী ভাবিলেন,—আর বিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিলেন, নিঃশব্দে অঞ্চল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন,—রজনী এখনও তমসাবৃতা। কিয়ৎক্ষণ

পরে একটি বন-বিহঙ্গের মধুর নিনাদ তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল। সহচরী ভাবিলেন—ঐ বিহঙ্গই আমাকে বলিল,—"আর কাল বিলম্ব করিও না।" ক্রমে উষার সুশীতল সমীরণ তাঁহার অঙ্গে আসিয়া লাগিল। সহচরী দেখিলেন আর রাত নাই। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, গিরিবালা বেশ ঘুমাইতেছেন। এই সময়;—কিন্তু এই অবস্থায় কেমন করিয়া ফেলিয়া যাই? ঘুম ভাঙ্গিলে কতই ভাবিবেন, কতই কাঁদিবেন; মনে করিবেন, সহচরী বিশ্বাসঘাতিনী! চক্ষে দুই এক ফোঁটা জল ও আসিল; কিন্তু, অন্তর পাছে দ্রবীভূত হয়, এই ভয়ে গিরিবালার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কর-পুটে কহিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি! বিদায় দাও। ও চরণে কত যে অপরাধিনী আছি—সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। বিদায়—বিদায় দাও, একথা বল্‌তে প্রাণ ফেটে যায়। কি করি এ সুখে বিধাতা যে আমায় বঞ্চিত কল্লেন্। সুন্দরি! বিদায় দাও। গিরিবালা! তুমি বিদায় দিলে না, কিন্তু আমার অন্তর বল্‌ছে বিদায়—তোমার আমার এক অন্তর। এক অন্তর বলিলেই হইল বিদায়।" "বিদায় হই," বলিয়া সহচরী আস্তে আস্তে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, দুই এক পা অগ্রসর হইলেন.—পুনরায় ফিরিয়া গিরিবালার সম্মুখে আসিলেন. সস্নেহে তাঁহার নবনীত কোমল গণ্ডস্থলে চুম্বন করিলেন। গিরিবালা নিদ্রায় অচেতন। সহচরী দেখিলেন এখনও একটু একটু অন্ধকার আছে। এই সময় জন মানব কেহই শয্যা পরিত্যাগ করে নাই। এই সময় বাহির হই, এই ভাবিয়া তিনি ঘরের বাহির হইলেন, আবার মনে করিলেন—গিরিবালা কি করিতেছেন, একবার দেখিয়া আসি। আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন গিরিবালা নিদ্রায় অচেতন। এত দিনের দৃঢ় বন্ধন সহসা ছিন্ন করা ত সহজ ব্যাপার নয়! সহচরী পুনরায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। ভাবিলেন—আমি কি করিতেছি। স্বভাব সিদ্ধ দৃঢ়তা পুনরায় তাঁহার অন্তঃকরণ অধিকার করিল। কাল বিলম্ব না করিয়া, সহচরী একেবারে ঘরের বাহির হইলেন। বাটীর পশ্চাতে যে পুষ্পোদ্যান ছিল, সেই পুষ্পোদ্যানের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বাটীর বাহির হইলেন, দেখিলেন পথে কেহই নাই। কিয়দ্দূর গমন করিলেন, তথাপি কেহই নাই। দুই এক দিবস পূর্ব্বে সহচরী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে বলিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, তিনি দুই এক দিন তাহার কুটীরে অবস্থিতি করিবেন। বৃদ্ধা প্রতাপচন্দ্রের বৃত্তি-ভোগিনী। ঘরে অন্নের তাদৃশ সংস্থান না থাকিলেও অগত্যা সম্মত হইয়াছিলেন এবং বাটীর ঠিকানা ও বলিয়া দিয়াছিলেন। সহচরী তাঁহারই কুটীর উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া শুনিলেন কে যেন গীত গাহিতে গাহিতে, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই ব্যক্তি ক্রমে অগ্রসর হইলে, সহচরী দেখিলেন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—দেখিলেই বোধ হয় বৈদিক শ্রেণী-ভুক্ত—কোশা কুশী হস্তে ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, গঙ্গাস্নানে গমন করিতেছেন। ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ দেখিয়া সহচরীর সাহস হইল। বিনয়-পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর!

মাতঙ্গিনী ব্রাহ্মণীর বাটী কোন পথ দিয়া যাইব?"

ঠাকুর বয়স প্রযুক্ত এক প্রকার বধির হইয়া গিয়াছিলেন, সহচরীর কথায় উত্তর করিলেন, "বাঁধা ঘাট ঐ দিকে।"

সহচরী অবাক হইলেন। একটু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ্ঞে আমি তা' বল্‌ছিনে, মাতঙ্গিনী ব্রাহ্মণীর বাড়ী কোথায়?"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—"না এ পথে মাতালের ভয় নাই, তুমি সচ্ছন্দে চলিয়া যাও।"

সহচরী দেখিলেন এত বড় বিষম বিভ্রাট। ইচ্ছা হইল না যে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করেন। কি করেন, প্রাণের দায়ে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ আভাসে বুঝিলেন সহচরী কি চান। মাতঙ্গিনীর কুটীরের ঠিকানা বলিয়া দিলেন। সহচরী তদভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে গিরিবালা সহসা জাগিয়া উঠিলেন, দেখিলেন হস্তে অঞ্চল জড়ান আছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

গিরিবালা! তোমার এত ঘুম! সহচরীর মনস্কামনা সিদ্ধির জন্যই বুঝি বিধাতা তোমার এত ঘুম বাড়াইয়াছেন! দেখিতেছ না যে, সহচরী আর তোমার সহচরী নাই,—তুমি একাকিনী হইলে! এখন নিদ্রা যাইতেছ—একটু পরেই কাঁদিবে!

এ দিকে সহচরী অনেক বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া এবং পথের দুই ধারে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে করিতে, মাতঙ্গিনীর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী তখন ছড়া ঝাঁট্ দিতেছিলেন। সহচরীকে দেখিয়া তিনি আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইলেন—কিন্তু বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণীর তণ্ডুলপাত্রে কেবল এক জনের আহারোপযোগী তণ্ডুল ছিল, আর একজনের ডান হস্তের ব্যাপার কেমন করিয়া চলিবে,—এই ভাবনায় তিনি কিঞ্চিৎ দুর্ম্মণায়মানা হইলেন এবং সহচরীকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন।

সহচরী দাওয়ায় উঠিয়া এক খানি পীড়ি পাতিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণী গৃহ-কর্ম্ম করিতে করিতে, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সে কালের তুলনা করিয়া, নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রৌদ্র উঠিলে ব্রাহ্মণী সহচরীকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, একবার পাড়ার বাহির হইলেন এবং সহচরীও কপোলে কর সন্নিবেশ-পূর্ব্বক ভাবিতে বসিলেন।

ক্রমশঃ।



প্রভাত সঙ্গীত।

জয় জয় জগদীশ! অখিল প্রধান।
করিতেছে সকলেই তব গুণ গান॥
ঊষা-রাণী এলোচুলে
পূরব-দুয়ার খুলে,
দেখাইলা,—হেম-বাস
করি পরিধান,—
আলো করি দশ দিশি,
প্রকাশিয়ে তেজোরাশি,
যোগিবর দিবাকর
করে তব ধ্যান।
হরিত বসন পরি,
প্রশান্ত মূরতি ধরি,
সম্ভ্রমে প্রকৃতি দেবী
হ'য়ে অধিষ্ঠান—
তোমার অর্চ্চনা তরে,
কুসুম অঞ্জলি ভ'রে,
তোমারি চরণ'পরে
করিতেছে দান।
এ দিকে প্রভাত দেখি,
শাখী পরে মেলি আঁখি,
পাখিগণে ঢালিতেছে
সুমধুর তান।
চারি দিকে ফোটা ফুল,
চারি দিকে ফোটে ফুল,
চারি দিকে করিতেছে
সৌরভ প্রদান।
চারি দিকে বহে বায়ু,
বাড়ায় জীবের আয়ু,
যুড়ায় শরীর তায়,
স্নিগ্ধ হয় প্রাণ।
চারি দিকে অলিকুল,
হইয়ে কৌতুকাকুল,
গুণ-গুণ-রব করি
করে মধুপান।
বহিতেছে স্রোতস্বিনী,
করি কল-কল-ধ্বনি,
গাহিতেছে অবিরাম
তব গুণ-গান।
জগজন-মনোলোভা,
হেরি প্রকৃতির শোভা,
কা'র না আনন্দ হয়,
যুড়ায় নয়ান?
এ সকল গান শুনে
কে না শান্তি পায় মনে?
কে না করে ক্ষণে ক্ষণে
তব গুণ-গান?
এ সকল শোভা দেখে
শুধু একবার মুখে
কে না বলে,—"জগদীশ
অখিল প্রধান।
করিতেছে সকলেই
তব গুণ-গান।

শ্রীরসময় লাহা।

সৌন্দর্য্য।

পূর্ণ শশী, সুধা-রাশি, ভালবাসি মুখ্ খানি।
সোণার বরণ, ভুবন-মোহন, নাইক এমন্, দু'খানি॥
কচ্চে আলা, আকাশ-তলা, যোল কলা, রূপখানি।
কোথায় আছে, নয় ত কাছে, দিন করেছে, যামিনী॥
হাসির চোটে, কুমুদ ফোটে, এম্‌নি বটে কারখানা।
রূপটি দু দিন, সুখটি ত দিন, আস্‌বে কুদিন, সার জানা॥
এই বেলা খা', চকোর দাদা! খা' রে সুধা, পেট ভ'রে।
পলায় পলায়; কলায় কলায়, পাবি কি হায়! এর পরে॥
রূপের গরব, বিষয় বিভব, করে রে সব, দিন-কাণা।
মত্ত সদাই, থাকে সবাই, করি রে ভাই! তাই মানা॥

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

বার-বনিতা।

(১)
রাজ-পথ ধারে, অলিন্দ উপরে
দাঁড়া'য়ে রমণী কিসের আশে?
বিশদ বরণী, বিনাইয়ে বেণী,
ভূষিতা হইয়া বিবিধ বেশে।

(২)
সুচারু হাসিনী, ভুবন-মোহিনী,
ভুলায় যতেক অবোধ জনে;
অবলা—সরলা, প্রণয়-বিভোলা,
যেন গো শঠতা নাহিক জানে!

(৩)
হেন বোধ হয়, মধুরতাময়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা এরে;
লেশ মাত্র হায়, নাহি মধু তায়!
কাল-কূট-বিষে রয়েছে ভ'রে।

(৪)
কিবা মিষ্ট ভাষা, মুখে ভালবাসা—
ছলনা-চাতুরী-পূরিত প্রাণ!
যত যুবকেরে, মজা'বার তরে,
হানিছে বিলোল নয়ন-বাণ।

(৫)
কত মূঢ় জনে, সুধা অনুমানে,
ওরূপ আগুণে যেমন পশে—
পতঙ্গ সমান, হ'য়ে হতজ্ঞান,
অবশে পরাণ দেয় গো শেষে।

(৬)
এদের কারণে, কত শত জনে,
ধনে প্রাণে মানে নিধন হয়;
এদের জ্বালায়, পতি সুখে হায়!
কত কুলবালা বঞ্চিত রয়।

(৭)
ইহাদের তরে, হা হুতাশ ক'রে
কত পিতা মাতা অন্তরে জ্বলে;

কত শত জন, হ'তেছে নির্ধন,
পড়িয়া এদের কুহক-জালে।

(৮)

এদের কারণে. কত শত জনে,
নর-হত্যা-পাপ করিছে কত ;
ইহাদের তরে, কত শত নরে,
মহা মহা পাপে হ'তেছে রত।

(৯)

বার-বনিতার, হেন ব্যবহার,
দেখেও নয়ন নাহিক ফোটে!
সকলি ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া —
কামিজন তার চরণে লোটে !!

(১০)

ক্ষণ-সুখ তরে, কাল-সাপিনীরে
ভাবিয়ে সুখের আকর সম—
অকালে জীবন, দেয় বিসর্জ্জন,
এমনি এদের মনের ভ্রম।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

অন্তঃপুরে উদ্দীপনা।

ঘুচা'ব জঞ্জাল সই ! ঘুচা'ব জঞ্জাল,
থালা মেজে—পান সেজে—কাটা'ব না কাল।
হাঁড়ি কুঁড়ি, হাতা বেড়ী, দূর ক'রে দাও,
চীনের বাসনগুলি টেবিলে সাজাও।
কাশীদাস, কৃত্তিবাস, দাও টেনে ফেলে,
সাজাও দেরাজ সই ! নাটক, নভেলে।
ছাই ভস্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাস মুনি,
নাহি তায় গিরিজায়া, দিগগজ, রোহিণী।
অন্তঃপুর-কারাগারে আর ত রব না—
কেরাণী পতির কথা, আর ত সব না।
পতি হবে পশুপতি—কিম্বা জগৎ সিং,
ঘোড়া চ'ড়ে অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং।
ললিত হলেও চলে, নিদেন সুরেন,—
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন।
বক্তৃতা—কবিত্ব—প্রেম এ পতিতে নাই,
বিদুষী নারীর পক্ষে বিষম বালাই।
তাই ব'লে আমি সখি ! ঘুমা'য়ে রব না,
অভাগী ভারতে আর ঘুমা'তে দেব না।
"না জাগিলে মোরা সব ভারত-ললনা,
এ ভারত কোন মতে জাগে না জাগে না।"

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।



বৃক্ষ।

(১)

আহা মরি তরুবর ! কি শোভা ধরেছ।
নব নব পত্র সব, শোভিছে অঙ্গেতে তব,
কে দিল এহেন রূপ ! কি পুণ্য করেছ ?
মোহন শ্যামল বেশে কেমন সেজেছ।
বিবিধ বিহগ গণ ঝাঁকে ঝাঁকে অগণন
তব শাখে অবিরত সুললিত গায় ;—
শুনা'য়ে সে গান তুমি তুষিছ সবায়।

(২)

বায়ু ভরে হেলে দুলে, ভূষিত পল্লব ফুলে,
কত ভাবে নাচ তুমি কত ভঙ্গী ক'রে ;
কার প্রেমে নাচ তরু ! আনন্দ অন্তরে ?
লোকালয়ে অবিরত, উপকার কর কত,
অকাতরে দিয়া তব পুণ্যের শরীর ;
তাই বলি ওহে তরু ! তুমি বড় ধীর।

(৩)

বিজন বিপিন-মাঝে, তুষিবারে বন-রাজে,
বিবিধ কুসুম লয়ে দাও উপহার,—
তোমার যে কত গুণ কি বলিব আর?
তরুবর! তব শোভা, জগজন-মনোলোভা;
তোমার সে চারু ভাব অতি চমৎকার;
না পারে বর্ণিতে মন সে শোভা তোমার।

(৪)

গভীর নিশীথ-কালে, হেরে মন যায় ভুলে,
নীরব সময়ে কর কার উপাসনা?
যাঁহার চিন্তায় থাক আমি ত চিনি না।
বল মোরে দয়া ক'রে,কোথা পাও তুমি তাঁরে?
বল বল, ওহে তরু! হৃদয় খুলিয়া;
দেখিতে না পাই আমি পাপিনী বলিয়া।

(৫)

প্রেম-ভরে ডাক যাঁরে, বল দেখি তরু তাঁরে,
দেখিতে পাইব আমি কি পুণ্য করিলে?
বল সেই বিশ্বনাথে কোথায় পাইলে?
বল বল তরুবর! বিলম্ব না সহে আর;
বল দেখি পাব তাঁরে কোথায় খুঁজিলে?
কি দিয়ে নাথের তুমি শ্রীপদ পূজিলে?

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।



চিরদিন সমান না যায়।

(১)

সর্ব্বক্ষণ দিবস না রয়,
সর্ব্বক্ষণ থাকে না রজনী;
সর্ব্বক্ষণ বহে না মলয়,—
সর্ব্বক্ষণ পড়ে না অশনি।

(২)

শুষ্ক-তরু সময়ে মুঞ্জরে,
ভগ্ন-শাখা বর্দ্ধিত সময়ে;
সময়েতে কোকিল কুহরে,
বিরহিণী, প্রাণেশে মিলয়ে।

(৩)

পুত্র-শোক ভুলেন জননী,
ভুলে নারী বিরহ পতির!
স্বামী ভুলে প্রাণের রমণী;—
আজি মানী—কালি নতশির।

(৪)

আজি যেবা দুঃখ-ভারে নত,
মন যার অমানিশা প্রায়—
কালি তার সুখ-সূর্য্যোদিত;
অন্ধকার আপনি পলায়।

(৫)

আজি যিনি লক্ষ-অধিপতি,
সশঙ্কিত নামে যাঁর সব;
কালি তাঁর দেখ কি দুর্গতি,
কোথা যায় অসীম বিভব।

(৬)

মৃগয়ায়—দশরথ রাজা
ব্রহ্ম-বধ করিল যখন,
ভাবিল না—পাইবে যে সাজা,
শাপ শুনি হাসিল তখন।

(৭)

কল্য রাজা হ'বেন শ্রীরাম,
অদ্য তার সব আয়োজন;
সেই দিন বিধি তাঁর বাম,
সীতা সহ বনবাসী হন!

(৮)

দশানন—লঙ্কা-অধিপতি,
ভয়ে যার কাঁপে দেবগণ;

হরি আনি সে জানকী সতী,
সবংশেতে হইল নিধন।

(৯)

যবনেরা একতা-আশ্রয়ে,
হিন্দুদের করেছিল জয়;
কতই প্রতাপ সে সময়ে!
কালে সব পাইলেক লয়।

(১০)

কিবা বংশ সগর রাজার?
বসুন্ধরা কাঁপিত প্রতাপে;
বুঝে দেখ কি হ'ল তাঁহার,
ছারখার গেল ব্রহ্মশাপে।

(১১)

আজি নৃপ—কালি সে ভিখারী!
আজি নিঃস্ব, কালি মহাধনী!
আজি সাধু, কালি পাপাচারী!
আজি এয়ো, কালি বিধবা রমণী।

(১২)

আজি আমি মহোল্লাসে ভাসি,
কালি আমি পুড়িব শ্মশানে!
আজি রাজ্য, কালি ভস্মরাশি!!
কোন দিন্, কি হয়, কে জানে?

(১৩)

আজি যথা আছে মরু-ভূমি,
কালে তথা আছিল সাগর;
এবে যথা দেখ বন তুমি,—
কালে হ'বে সুন্দর নগর।

(১৪)

এবে যথা—সরল-প্রকৃতি,
বাস করে কৃষকের দল;
ক্রমে তথা যাইবে দুর্ম্মতি;
কালে সব যাবে রসাতল।

(১৫)

মহামতি কলম্বস্ যবে,
আমেরিকা করে আবিষ্কার;
দেশ দেখি চমকিল সবে,—
এবে কোথা সুষমা তাহার?

(১৬)

আগে যথা অসভ্যের দল—
স্বাভাবিক সরল-প্রকৃতি,
ফল—মূল—বারি সুশীতল,
ভোজনেতে ছিল হৃষ্টমতি—

(১৭)

এবে দেখ সুসভ্য সকল,
করিয়াছে বসতি তথায়;
লুপ্তপ্রায় আদিমের দল,
কাল-গতি কে বুঝিবে হায়।

(১৮)

কেন তবে করি অহঙ্কার?
পরিণাম ভাবিনাক হায়!
স্মরি, কার্য্য কর অনিবার,—
'চিরদিন সমান না যায়।'

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

আমাদের অবস্থা।



(প্রাপ্ত।)

চিরদিন কাহারো সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, ইহাই বিধাতার ব্যবস্থা,—ইহাই প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। আজ যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হইতেছে, কালের চক্রে সে ও হয় ত পর-পদানত হইতে পারে। আজ যাহাকে হাসিতে দেখিতেছি, কাল-ক্রমে আবার হয় ত

তাহারই নয়ন-জলে ধরাতল সিক্ত হইতে পারে। আজ যাহার ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল, গাছ-তলা যাহার এক মাত্র আশ্রয়, কালে তাহাকে ত্রিতল-সৌধপরি দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন করিতে দেখাও অসম্ভব নয়। তাই বলি, মানব-ভাগ্য বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। সংসার-খেলায় যে কখন্ বদ্‌পড়তা, আর কখন্ সুপড়্‌তা হয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বড় অশুভক্ষণেই পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরিকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই অবধিই আমাদিগের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; আমরা স্বাধীনতা হারাইয়া পর-পদানত হইয়াছি; তদবধি একাল পর্য্যন্ত আমরা দুঃখের একটানা স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছি। এ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইবে, কি এই অঙ্কেই যবনিকা পতন হইবে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন।

মনুষ্য এক বার দুঃখে পতিত হইলে, নিত্য নূতন নূতন বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং কাহারও একবার সুখের দশা উপস্থিত হইলে নিত্য নব নব সুখ-তরঙ্গে তাহাকে আন্দোলিত করিতে থাকে; ইহাই সংসারের নিয়ম। আমাদের এক্ষণে দুঃখের দশা; নানাপ্রকার নূতন নূতন দুঃখে এখন আমরা প্রপীড়িত হইতেছি। আজ একটি, কাল একটি, করিয়া রাশি রাশি বিপদ্ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতেছে; দুঃখে, কষ্টে আমাদের ভিতর ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে। মানব-জীবন বড়ই কষ্টসহ, তাই আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি; কিন্তু ভাবনা, চিন্তা দুঃখ ও অনাহারে আমাদের কঙ্কাল মাত্র সার হইয়াছে।

আমাদের আয় কমিতেছে এবং ব্যয় বাড়িতেছে। কাজেই হয় উপবাস, নয় দেনার জ্বালায় চুলের টিকি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইতেছে! কিন্তু দেনাতেও ত আর সারা জীবনটা কাটান যায় না; কাজে কাজেই উপবাস ভিন্ন আমাদের উপায়ন্তর নাই।

এই দেখুন না, চাষী লোক চাষ করিতে গেল, কিন্তু ফল তার হয় হাজা, নয় শুকা হইয়া ফর্সা হইয়া গেল। যাউক, এক বৎসর না হয় গেল; কিন্তু পুনরায় নূতন উৎসাহে যেমন তেমন করিয়া চাষের খরচটা যোগাড় করিয়া, চাষী লোকে আবার পর বৎসর চাষ আরম্ভ করিল, কিন্তু পুনরায় ফল তাহাই হইল। এই রূপ বৎসর বৎসর বিধির বিপাকে লাঞ্ছিত হইয়া, চাষী লোকের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইতেছে; সুতরাং তাহাদের উপবাস ভিন্ন, আর গতি কি? আবার কোন কোন চাষী লোক ঐ জন্য হয় ত চাষ ছাড়িয়া মজুর-বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু সামান্য মজুরবৃত্তিতে এক গোষ্ঠী লোকের কি দিন যাইতে পারে? সুতরাং ইহাদেরও দুবেলা আহার জুটিয়া উঠে না। এই ত চাষী লোকের অবস্থা!

আবার দেখুন,—বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসাজীবীদের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে; তাহারও কেহ মজুরি করিতেছে, কেহ বা চাকুরীর উমেদার হইতেছে। কিন্তু যে ঘরে চার পাঁচ জন খাইয়ে, সে ঘরে দৈনিক দুই তিন আনা উপার্জ্জনে কি দিন যায়? না সেই উপার্জ্জনই দিন দিন জুটিয়া উঠে? আর আজ কাল চাকুরীর বাজারে যে কত সুখ, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা দেখুন। আজ কাল যে রূপ দিন সময় পড়িয়াছে,—যে রূপ বদ্‌পড়তার একটানা স্রোতে আমরা ভাসিতেছি, তাহাতে লোকের স্বচ্ছল অবস্থা ত হইবেই না, বরং উত্তরোত্তর কষ্টই বাড়িতেছে। এমন সময়ে কোন আয় বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, পৈতৃক যৎ সামান্য অল্প সল্প বিষয়াদি যাহা লোকের আছে, তাহাই বজায় রাখা সুকঠিন হইতেছে। সেই দৈব-দুর্ব্বিপাকে আমাদের কাহারও কাহারও বরং আয় কমিয়াছে; কিন্তু সাবেক খরচ অপেক্ষা আধুনিক ব্যয় সকলেরই বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। তাহার উপর ঘরে ঘরে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাও প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং পেটের দশা যাহাই হউক, সভ্যতার খাতিরে এবং গলা ধাক্কার ভয়ে বেশ ভূষাটী ষোল আনা রকম আবশ্যক। তাহার উপর দিন দিন জিনিষের দর চড়িতেছে, কাজেই লোকের ব্যয় সঙ্কুলান করা যে, এক রূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

চাষে সুখ নাই, ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গতি নাই, নিজ বৃত্তিতে শত্রু জুটিয়াছে; সুতরাং লোকে এখন করে কি? দুমুঠা খায় কি করিয়া? চাকুরীও এখন আর জুটে না; তবুও কিন্তু ছেলেদের কথা বাহির হইতে না হইতে বিজাতীয় শিক্ষা-গারদে তাহাদিগকে পূরিয়া দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু, ফলে, তাহারা ঢাকের বাঁয়া হইতেছে। কেহ বা এম, এ, বি, এল্, কেহ বা বি, এ, বি, এল্, প্রভৃতি লম্বা লম্বা উপাধি পাইয়াও বাসা খরচের জন্য লালায়িত! কেহ বা দুই একটা পাস করিয়া চাকরীর জন্য এ পাশ ও পাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। আবার কেহ বা উপাধির ধারও ধারে না, চাকুরীর জন্য চীৎকারও করে না,—তাহারা কেমন এক নূতন রকম দেবতা হইয়া উঠিতেছে! সুতরাং দু' পাতা ইংরেজি পড়িয়া চাকুরীর চেষ্টাও বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে। কিছুতেই লোকের আর সুখ নাই। মনুষ্যের ইচ্ছাতে কোন কার্য্যই হয় না; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা অনিবার্য্য; সুতরাং, অদৃষ্ট-দোষে আমাদের এক্ষণে দুর্গতি ভিন্ন সদ্গতির আশা নাই। আমাদিগকে নিতান্ত বিপাকে ফেলাইয়া কষ্ট দেওয়াই কি ঈশ্বরের অভিপ্রেত? নতুবা আমাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া তৈয়ারি ভাতে ধুলা পড়িবে কেন?

জীবনের অনিত্যতা।

—:*:—

সিন্ধু-বক্ষো'পরি নিয়ত লহরী,
উঠিতেছে কল-স্বরে।
তাহে রবি-কর, পড়ি মনোহর,
লাবণ্য ধারণ করে॥
কিন্তু দেখ তার, ক্ষণপরে আর,
নাহি থাকে সে সকল।
জলের তরঙ্গ, জলে করি রঙ্গ,
জলে মিশি হয় জল॥
জানিও তেমন, মানব-জীবন,
সমভাবে নাহি যায়।
সময়-সাগরে, খেলি ফুল্লান্তরে,
সময়েতে লয় পায়॥

শ্রীকালীচরণ পাল।

গোলাপ।

বল দেখি গোলাপ! তোমায়
কে না ভালবাসে?
ঈষৎ কিবা লোহিত-আভা,
তোমার মোহন বিমল শোভা,
জগজ্জন-মনোলোভা,
হৃদয় ভরা রসে;
তোমায় কে না ভাল বাসে?
শিশির-সিক্ত কলেবর,
তায় পড়েছে রবিকর,
মরি কিবা মনোহর,
আছ মোহন বেশে;
তোমায় কে না ভালবাসে?
দেখ্‌তে তোমার শোভারাশি,
দেখ্‌তে তোমার মধুর হাসি,
ধীরে ধীরে অনিল আসি,
দোলায় আশেপাশে,
তোমায় কে না ভালবাসে?
(তোমার)—সৌরভে দিক আকুল করে,
কোথা হ'তে মধুকরে,
তোমার মধু পানের তরে,
এসে কত তোষে;
তোমায় কে না ভালবাসে?
প্রিয় তুমি সকলেরি,
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, নারী,—
সবাই তোমার শোভা হেরি,
সুখ্‌-সাগরে ভাসে;
তোমায় কে না ভালবাসে?

যেমন তোমার কোমল আকার,
তেমনি তুমি গুণের আধার,
দেহখানি ভরা তোমার,—
রূপে রসে বাসে;
তোমায় কে না ভালবাসে?
জন্ম বটে কাঁটার কোলে,
কিন্তু তুমি পরাণ খুলে,
পরিমর্ল যে দিচ্ছ ঢেলে,
পরম পরিতোষে;
তোমায় কে না ভালবাসে?
যখন তোমার পাপ্‌ড়ি খসে,
তখন আমার হয় মানসে,—
"ঝ'রে পড় মনোল্লাসে,
বিভুর চরণ-দেশে;"
তোমায় কে না ভালবাসে?
কিন্তু তুমি গেলে ঝ'রে,
তবু তোমার চারি ধারে,
সৌরভেতে থাকে ভ'রে,—
মাতায় তোমার যশে;
তোমায় কে না ভালবাসে?
গোলাপ! তোমার রূপের তরে,
গোলাপ! তোমার গুণের তরে,
গোলাপ! তোমার যশের তরে,—
সবাই ভালবাসে,
তোমায় সবাই ভালবাসে;—
বল দেখি গোলাপ!
তোমায় কে না ভালবাসে?

শ্রীরসময় লাহা।

অবিচার।

—:০:—

(একটি সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে রচিত।)

সজিনা রক্ষার আশে
চম্পক, চন্দনে নাশে,
সহকারে করয়ে ছেদন;
হিংসা করে অনিবার
মরাল ময়ূরে আর,
পিক-কুলে নাহিক যতন—
কাকে করে সমাদর;
করী বিনিময়ে খর
পেয়ে হয় সানন্দ অন্তর;
কার্পাস কর্পূর সনে
সমতুল্য করে মনে,—
নাহি মানে প্রভেদ বিস্তর;—
যে দেশের গুণিগণ
হেন হতাদর হন,
নির্গুণেতে সমাদর পায়—
সে দেশে উদ্দেশ ক'রে
সবিস্ময়ে জোড় করে
নমস্কার করি তার পায়।

শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।



অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক।

—:০:—

জনেক কৃষক, বৃদ্ধ, থাকে কোন দেশে,
সংসার-নির্ব্বাহ তার হয় কায়-ক্লেশে।
আছিল সে কৃষকের পাঁচটি সন্তান,—
ম'রে যায় চারিটি, কনিষ্ঠ বর্ত্তমান।
কনিষ্ঠ সন্তান তার অতি বড় পাজী,
চাষবাস করিবারে নহেক সে রাজী।
পঞ্চদশ বৎসর তাহার বয়ঃক্রম,
একেবারে চায় না সে করিবারে শ্রম!
বুড়া বাপ খেটে খুটে যাহা কিছু আনে,
সুখে বসে খায় সে জ্বালায় বাক্য-বাণে!
বয়েসের দোষে, ক্রমে—স্বভাব খারাপ,
দিবানিশি কতই বুঝায় বুড়া বাপ।
বলিয়া বাপের মুখ ভোঁতা হয়ে যায়,
ছেলের তা' কথা শোনে হাসিয়া বেড়ায়।
পয়সার দরকার হলো যদি তার,
বৃদ্ধ জনকেরে ধরি দেয় সে প্রহার।
কৃষকের মনোকষ্ট ইহার কারণ,
সদা কহে,—"শীঘ্র মোর হউক মরণ।"
চাষবাস চাষা আর করিতে না পারে,
অতিশয় জ্বালাতন সংসারের-ভারে।
হাট থেকে ক্রয় করি আনিয়া লবণ,
তাই বেচে,সংসারটি করে সে পালন।
একটি ঘোটক আছে—হাটে লয়ে গিয়া,
লবণ কিনিয়া পৃষ্ঠে দেয় চাপাইয়া।
পাড়া পাড়া ফিরে চাষা লইয়া লবণ—
বিক্রয়ে যা লাভ,—তাহে জীবন যাপন।
এক বার বাপ সঙ্গে পুত্র যায় হাটে;
ঘোটকে চড়িয়া বৃদ্ধ, পুত্র পিছু হাঁটে।
উভয়েতে, পুষ্করিণী-ধার দিয়া যায়,
স্ত্রীলোকেরা ঘাটে ছিল দেখিবারে পায়।
মুখ-ফোঁড় কোন ধনী কহিছে তখন,
"মর্ মিন্‌সে হতভাগা! আক্কেল কেমন?
বুড়া হয়ে সব বুঝি গেছিস্ ভুলিয়া?
দুধের বাছারে যাস্, হাঁটা'য়ে লইয়া!
এই বৈশাখের রৌদ্র, যায় কাঠ ফেটে,
কার সাধ্য এ দুকুরে, পথে যায় হেটে?
আহা! কত হইতেছে কষ্ট ছেলেটির,

বুঝেচিস্, শুধু বুড়া ! আপন শরীর।
ছেলেটি নিজের বুড়া ! বুঝি তোর নয় ?
তা'না হলে এত কেন ব্যাভার নির্দ্দয় ?
ছেলেটির দুঃখ দেখে প্রাণ যায় ফেটে,
ঘোড়ায় চড়া'য়ে ওরে ! তুই যা রে হেঁটে।"
শুনিয়া বামার বাণী, অশ্ব হতে উলি,
অশ্ব-পৃষ্ঠে কৃষক সন্তানে দিল তুলি।
কিছু দূর, এই ভাবে যাইছে যখন,
থম্‌কিয়া দাঁড়াইল দেখি চারিজন।
কৃষক-নন্দন প্রতি, কহিতেছে তারা,—
"ওরে লক্ষ্মীছাড়া ছোড়া! একি তোর ধারা?
বৈশাখ-মাসের এই খর রবি তাপ—
ঘোড়া চ'ড়ে যেতেছিস্. হাঁটে বুড়া বাপ !
বাপের হতেছে কষ্ট ভাবিস্‌না কিছু,
দেখিস্‌না একবার, তাকাইয়া পিছু !
দেখিয়া বুড়ার কষ্ট, যায় বুক ফাটি,
পা ফেলিতে পারি'ছেনা তাতিয়াছে মাটি।
ভাল যদি চাস্ ছোড়া ! নেমে যা' হাঁটিয়া,
বুড়া বাপে ঘোড়া' পরে দিয়ে উঠাইয়া।"
তাহাদের কথা শুনি কৃষক-তনয়
অশ্বোপরি তার পিছু বাপে "উঠ," কয়।
বালক-বচন বৃদ্ধ করিয়া শ্রবণ,
তুরঙ্গের পৃষ্ঠেতে করিল আরোহণ।
কিছু দূর বাপ বেটা এই রূপে যায়—
তরু-তলে বসি কেহ দেখিবারে পায়।
সে জন কহিছে হাঁকি,—"এত মন্দ নয় !
পাইলে পরের প্রাণ কষ্ট দিতে হয়।
আহা হা ! ঘোটক, তোর কতই যে পাপ,
এ হেন মনিব পেয়ে কত মনস্তাপ !
হাঁটিলে হইবে কষ্ট যাবে পা পুড়িয়া,
সেই হেতু দুই জনে যাইছে চড়িয়া।
তোর কষ্ট দেখে অশ্ব ! ফেটে যায় বুক,
প্রকাশিতে পারিস্ না ব'লে তুই মূক।
আমাদের দর্ দর্ ছাড়িতেছে ঘাম,
দাপাইয়া বেড়া'তেছি সাত খানা গ্রাম।
তোর কষ্ট, কষ্ট নয়,—কষ্ট আমাদের,
হেন বিবেচনা দেখি কেবল হীনের।"
এই বাক্য পিতা পুত্রে শুনি দুইজনে,
ঘোটকের পৃষ্ঠ হতে নামে ততক্ষণে।
ঘোড়ার হ'তেছে কষ্ট শুনি মুখে তার,
কষ্ট তার নাশিবারে ভাবনা অপার।
নিকটেতে এক খানি বাঁশ পড়ে ছিল,
কৃষক-কুমার গিয়া, কুড়া'য়ে আনিল।
বাঁধিয়া লাগাম-দড়ী ঘোটকের পায়,
বাঁশ দিয়া বাপ বেটা কাঁদে লয়ে যায়।
কিছু দূর দুই জনে গিয়াছে যখন,
দুই জন তাহাদের করে সম্ভাষণ।
বলে,—"কি নির্ব্বোধ তোরা ! জগত ভিতরে,
ঘোড়ায় না চড়ি, নিস্ মাথার উপরে !
এই বৈশাখের রৌদ্র,—পা পুড়িছে তাতে,
কত সুখ, তাহা হ'লে হইত ইহাতে।
ভু-ভারতে, বোকা মেড়া নাহিত এমন !
চূণ কালী গালে দিতে যায় মোর মন।"
অন্য জন সে কথায় কহে সম্ভাষিয়া,—
"মোর ইচ্ছা দু'বেটারে ফেলি হে কাটিয়া।
এত বড় আহাম্মুখ কোথাও ত নাই !
ইচ্ছা করে সপাসপ্, চাবুক লাগাই।"
দেখিয়া ভবের কাণ্ড, রুষ্ট বাপ বেটা,
কেটা কি বলিছে আর শুনিছেনা সেটা।
কারো কথা শুনিবেনা—ভাব এইরূপ—
চ'লে যায়, ভার কাঁধে,—শব্দ দুপ্ দুপ্।
পথি মধ্যে ছিল নালা হ'তে হয় পার,
কাঁধ ভেরে, বৃদ্ধজন ফেলে দিল ভার।
সুতের কি সাধ্য সেই ভার রাখে টেনে,
ছেড়ে দিল ব'লে,—"দূর, পারিনাক মেনে।"
গড়া'য়ে ঘোটক জলে পড়িয়া যাইল,

নাকানি চোবানি খেয়ে পঞ্চত্ব পাইল।
পিতা পুত্রে খেদ করি, ফিরিল ভবনে।
কার সাধ্য, তুষিবারে পারে জগজ্জনে?
একজন কহে এক, অন্য বিপরীত,—
কে বুঝিতে পারে ভবে মানব-চরিত।
এ জগতে যাদের নিজের বুদ্ধি নাই,
চাষা-সুত চাষা মত কষ্ট পায় ভাই।
ঘটে যার বুদ্ধি আছে তরি সেই যায়,
মূর্খ যেই জন, তার, বাস করা দায়।
লোকের বচনে ভাই! কেহ না ভিজিবে,
আপনার হৃদয়েতে বুঝিয়া দেখিবে।
যেই জন কার্য্য করে ভাবি পরিণাম,
তাহারি জগতে হয় পূর্ণ মনস্কাম।
নির্ব্বোধেরা কষ্ট পেয়ে মরে শুধু ভাই,
তাই বলি, বুদ্ধি-বলে কার্য্য করা চাই।
"কাকে তব কান নিল," কেহ যদি বলে,—
আগে দেখে জ্ঞানী;—নাহি কাক পিছু চলে।
নিজের বুদ্ধিতে মরি সে ও মন্দ নয়,
পরের বুদ্ধিতে গেলে বিপদ্ নিশ্চয়।
জব্দ করিবার ইচ্ছা দেখি সবাকার,
লইলে পরের বুদ্ধি রক্ষা আছে আর?
বিশেষ বান্ধব হন—বুদ্ধিমান্ অতি,
তাঁর পরামর্শ নিলে হ'বেনাক ক্ষতি।
জগজ্জনে জব্দ করা কুলোকের ধারা,
যার তার পরামর্শ নিলে, যাবে মারা।
কি করিলে কি গোড়া'বে জ্ঞান যার আছে,
অনুতাপ কভু নাহি যায় তার কাছে।
প্রকাশিয়া বুদ্ধি-বল কর্ম্ম যাঁর হয়,
আপশোষ্-বহ্নি তাঁর দহে না হৃদয়।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

☞ [বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্যের" কবিতা-কুঞ্জ মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত কবিতাটি অতি সুন্দর ও সুললিত বোধে আমরা সেইটি আমাদিগের পাঠকপুঞ্জের মনোরঞ্জনার্থে উদ্ধৃত করিয়া, নিম্নে প্রকটিত করিলাম।]

অসময়।

(কমল দর্শনে সখীর প্রতি সখী)

কমল ফুটেছিল, শুকিয়ে গেল,
দেখ্‌লো সখি! অই;
ওর মুখটি দেখে, মনের দুখে
চুপটি ক'রে রই।
ও যে ঘোম্‌টা টেনে, বিরস মনে,
বিবশ কলেবর;
কত ভাব্‌ছে ব'সে, কপোল-দেশে
দিয়ে মৃণাল-কর।
এই দেখ্‌নু সেদিন, সোণার নলিন,
মুকুল-দশায় ছিল;
কবে ফুট্‌ল সখি! হাস্যমুখী
মলিন কবে হ'ল?
শুধু একটি কথা, কনক-লতা!
সুধাই তোরে সই!—
অলি বস্‌ত পাশে, মধুর আসে;
এখন বসে কই?
ভবে দেখ্‌ছি দু'দিন, সুদিন, কুদিন,—
রয় না চিরদিন;
তবে সুদিন গেলে, কুদিন এলে,
বন্ধু ভাবে ভিন্।



রাধা-কুঞ্জ-দ্বারে বৃন্দা, চন্দ্রা-বলীর কুঞ্জ হইতে শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। হইয়াছে দেরি, তাই তাড়াতাড়ি,
ছুটিয়া এসেছি, ও বৃন্দে সই!
এমন কি বেশি, হইয়াছে নিশি?
এখনো এখানে সুধাংশু ওই।

বৃন্দা। কি হেতু এখানে? কে তুমি? কই?

কৃষ্ণ। করিয়াছি দোষ, তাই এত রোষ,
বটে বটে, রাগ করিতে পার;
শুন বৃন্দে! কই, যেখানেই রই,
রাধা বিনে আমি নহি ত কার।

বৃন্দা। দেখিতেছি তুমি বাতুল বড়!

কৃষ্ণ। হ'য়েছি বাতুল, নহে তব ভুল,
যে দিন হইতে এ ভালবাসা;
সেদিন হইতে, রাধারে দেখিতে,
কদম্ব-তলাতে, ক'রেছি বাসা।

বৃন্দা। বল শুনি, কেন এখানে আসা?

কৃষ্ণ। কিছু কি জাননা, ছাড়না ছলনা,
কিঞ্চিৎ বিলম্বে এত কি ক্ষতি?
রাধা-কুঞ্জে যাব, রাধারে দেখিব,
ঠেঁটা কথায় কেন বাড়াও রাতি?

বৃন্দা। পরনারী দেখা এ কোন্ রীতি!

কৃষ্ণ। এ জগতে ধনি, পুরুষ রমণী
কে আছে? আমারে লুকা'য়ে র'বে?
যেখানে যে চরে, এই চরাচরে,—
আমার নজরে আছয়ে সবে।

বৃন্দা। জুয়াচোর তুমি বুঝিনু তবে।

কৃষ্ণ। দিলে নাহি লই, সাধিলে না রই,
জুয়াচুরি কার করেছি ক'টা?
কড়া-কড়া বুলী, দাও গালাগালি,
কেন বৃন্দে! তুমি এতই চটা?

বৃন্দা। বাড়ী কোথা? তুমি কাহার বেটা?

কৃষ্ণ। নাজানি ভিতরে, কি যে হবে পরে,
দ্বারে যদি এত বাক্‌-চাতুরী;
প্রবেশিতে রোকে, খই ফোটে মুখে,
একা বৃন্দে যেন এক শ নারী।

বৃন্দা। পরিচয় জেনে ছাড়িতে পারি।

কৃষ্ণ। জানত আমার, সব সমাচার,
নূতন ক'রে কি জানিতে চাও?
এত ছল কেন? চেন বা না চেন,
বলি, যদি কিছু বলিতে দাও।

বৃন্দা। শুনিতেছি, তুমি বলিয়া যাও।

কৃষ্ণ। রাখ রাখ দূতি, আমার মিনতি,
গিছে কাঁদে, রাতি বাড়িয়ে যায়—
এই বাঁশী ধোরে, বল গে রাধারে,—
"বংশীধারী দ্বারে; আসিতে চায়।"

বৃন্দা। এঁটো ছোঁব কেন? এত কি দায়?

কৃষ্ণ। ধর ধর চূড়া, যাও যাও ত্বরা,
বাঁশী ছুঁতে যদি বাধাই থাকে;—
দ্বারেতে দাঁড়াই, প্রবেশিতে চাই,
পারি কি না পারি, সুধাও তাঁকে।

বৃন্দা। কে ছোঁবে ও মরা ময়ূর-পাখে?

কৃষ্ণ। এ যে বড় দায়, ঘটিল বেজায়,
যত বলি, বৃন্দে ততই কাটে;
না রাখে মিনতি, এ বড় দুর্গতি!
ঠেকেছি ত বড় বিষম গাঁটে।

বৃন্দা। ছেলের হাতে কি পেয়েছ পিটে?

কৃষ্ণ। ছেলে যদি নও, রমণী ত হও,
নারী হ'য়ে বল এত কি তব!
সাধিনু এখন, কি হবে তখন,
সজোরে যখন, ভিতরে যাব?

বৃন্দা। নারী ব'লে বুঝি আনাড়ী ভাব?

কৃষ্ণ। আর কেন বৃথা, রাখ রাখ কথা,
দেখ দেখ বৃন্দে! চাওনা ফিরে;
করোনা বেজার, ছাড় ছাড় দ্বার;
বৃন্দে! তোরে মোর মাথার কিরে।
বৃন্দা। কথায় কভু না ভিজিবে চিঁড়ে।
কৃষ্ণ। মায়া দয়া হীন, বড়ই কঠিন,
ভাল দ্বারী তুমি রাধার দ্বারে;
দেখিতে কিশোরী. যা'বল তা' করি;
পরিচয় দিলে দেখা'বে তারে?
বৃন্দা। দেখিব তখন বিচার ক'রে।
কৃষ্ণ। বলি তবে দূতি, আমি লক্ষ্মীপতি,
আমা হ'তে হন কমল-যোনি;
নারায়ণ নাম, ত্রেতাযুগে—রাম,
গোলকেতে ধাম, শুন লো, ধনি!
বৃন্দা। ভূলোকে কেন গা, বল না শুনি?
কৃষ্ণ। আমারে পালিতে, জননী হইতে,
নন্দ-রাণী বড় করিল আশ;
পূরা'তে বাসনা, ওহে গোপাঙ্গনা!
বৃন্দাবনে তাই ক'রেছি বাস।
বৃন্দা। কি কাযে কাটাও বারটা মাস?
কৃষ্ণ। ধড়া চূড়া পরি, বনে বনে ফিরি,
'ননী চোরা' আমি জান ত সখি;
"রাধা, রাধা" ব'লে, কদম্বের মূলে,
মুরলী ফুকারে রাধারে ডাকি।
বৃন্দা। ব'লে যাও, আর কি আছে বাকি?
কৃষ্ণ। দেখিতে রাধারে, যমুনার ধারে,
ছল ক'রে ছাড়ি গোধন-পাল;
গোপাঙ্গনা সনে, প্রেম করি বনে;
না শুনি শ্রবণে, কুটিলা গাল।
বৃন্দা। কংসে জানাইব এ কথা কাল।
কৃষ্ণ। ভয় নাহি করি, ওহে গোপ-নারী!
বিধি, মহেশ্বর আইলে খোদ;
শুনে হাসি পায়, কংসে পাব ভয়;
কি করিবে কংস করিয়ে ক্রোধ?
বৃন্দা। কারাগারে বেঁধে করিবে রোধ।
কৃষ্ণ। এত বল হবে, আমারে বাঁধিবে,—
সাগর রোধিবে বালির বাঁধে?
কে আছে এমন, দেখি না তেমন!
বামন ধরিবে গগন-চাঁদে!!
বৃন্দা। কেহ নাই হেন তোমারে বাঁধে?
কৃষ্ণ। আছে হেন জন, ক'রেছে বন্ধন,
সে কথা গোপন, নহে ত আর;
বলি-রাজা মোরে, বান্ধি নিজ দ্বারে,
দ্বারী ক'রে রাখে সদত তাঁর।
বৃন্দা। ইহা ছাড়া—কেহ নাই কি আর?
কৃষ্ণ। হয় বটে মনে, রাজা দশাননে,
রাম অবতারে জানকী হরে;—
তাই সে কারণ, হ'ল মহারণ,
নাগ-পাশে বাঁধে, রাবণি মোরে।
বৃন্দা। সাঙ্গ হ'ল পুঁথি, বাঁধিলে ডোরে?
কৃষ্ণ। আর যাহা বাকি, জান ত তা'সখি!
বলিতে হবে কি নূতন ক'রে?
চুরি করি ন'নী, তাইতে জননী
যশোদা, বাঁধিল যুগল করে।
বৃন্দা। দেখ দেখি আরো স্মরণ ক'রে?
কৃষ্ণ। আর যদি ধরি,তোমরা নাগরী (সুন্দরী)
বেঁধেছ বাঁধন বিষম কড়া।
পূজি কাত্যায়নী, ক'রেছ বাঁধনি,
কেহ ত বাঁধে নি এমন ধারা!
বৃন্দা। (কেন) চন্দ্রাবলী নয় সবার বাড়া?
কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলী-ভাব,'হ'য়েছে প্রকাশ,
পেয়েছ আভাষ, ও কালাচাঁদ!
হবে বাড়াবাড়ি, এবারে কিশোরী.
(ঘুঘু দেখিয়াছ) দেখা'বে ফাঁদ।

শ্রীগোকুলচন্দ্র সিংহ।

প্রিয় ও অপ্রিয় সম্ভাষণ।

(গদ্য)

[এই গদ্যটির এবং পর পৃষ্ঠার পদ্যটির ছোট এবং বড় ছত্র উভয় এক সঙ্গে পাঠ করিলে, "প্রিয় সম্ভাষণ" হইবে; শুদ্ধ বড় গুলি পাঠ করিলে তাহার বিপরীত, অর্থাৎ "অপ্রিয় সম্ভাষণ" হইবে]

যে দিন তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও সেই দিন হইতে
আমি বড় কষ্টে আছি; কিন্তু তুমি বোধ হয় মনে করিতেছ যে,
আমি পরম সুখে ও নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে কাল যাপন করিতেছি।
যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমার নিতান্ত ভ্রম; আমি
তোমাকে এক দণ্ড এমন কি এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ের জন্য দেখিতে
না পাইলে ব্যাকুল হই; এবং তোমাকে নিমেষের জন্য চক্ষের অন্তর করিতে
না হয়, আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট সতত তাহা প্রার্থনা করি।
আমার ঐকান্তিক বাসনা যে, তুমি অহঃরহঃ আমার নিকটে থাক।
যখন তুমি আমার সম্মুখে থাক এবং আমি তোমায় দেখি, তখন
আমার অন্তর আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হয় এবং তোমাকে না দেখিতে পাইলে
আমি আমার হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে থাকি;
এবং বোধ হয় যে, সে যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যু হওয়া শ্রেয়ঃ।
যখন তুমি কথা কও, তখন তোমার বাক্য আমার শ্রবণে
মধুর অমৃত ধারা বর্ষণ করে; এমন কি সুললিত সঙ্গীতও তখন
যৎপরোনাস্তি অপ্রীতিজনক, কর্কশ ও বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়।
তোমার বিরহে আমি যে, কি কষ্টে আছি তাহা বলিতে পারি না।
আমি তোমাকে আমার মন প্রাণ ও হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণ রূপে
ভালবাসি; তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গ সুখ ভোগ করিতেও আমি
ঘৃণা করি; তুমি কখন ভ্রমেও মনে করিওনা যে, আমি তোমাকে ভালবাসি
না; আমার হৃদয় তোমাতেই মুগ্ধ—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ধন।
তোমার দর্শন, স্পর্শন, বাক্য-শ্রবণ, এমন কি তোমার বিষয় চিন্তা করাও
আমার নিকট সুখ-প্রদ; এবং তুমি না থাকিলে জগতের সমস্ত প্রিয় বস্তুই
আমার পক্ষে বিষবৎ বলিয়া বোধ হয় ও আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত করে।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

প্রিয় ও অপ্রিয় সম্ভাষণ।

(পদ্য)

যে দিন চলিয়া গেলে সেই দিন হতে
দুঃখে আছি; কিন্তু তুমি ভাবিতেছ মনে
নির্ব্বিঘ্নে রহেছি আমি পরম সুখেতে।
মনের সে ভ্রম তব জানিও নিশ্চয়।
এক মুহূর্ত্তের তরে হেরিতে তোমায়
না পেলে ব্যথিত হই; বিচ্ছেদ কখন
না হয়, প্রার্থনা করি পরমেশ-পায়।
বাসনা—সতত তুমি রহ মোর পাশে।
যখনি সম্মুখে হেরি তোমার বয়ান,—
ভাসি সুখ-পারাবারে; বিরহে তোমার—
দারুণ যাতনানলে দগ্ধ হয় প্রাণ।
মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ তার চেয়ে।
শ্রবণ-বিবরে মম তোমার বচন,
ঢালে অমৃতের ধারা; সঙ্গীত তখন—
বোধ হয় অতিশয় বিরক্তিভাজন।
র'য়েছি দারুণ দুঃখে তোমার বিহনে।
তোমায় প্রাণের সহ অন্তরে অন্তরে
ভালবাসি; তোমারে ছাড়িয়া স্বর্গ-সুখ
ঘৃণাকরি; কভু ভালবাসি না তোমারে
ভুলেও ভেবনা ইহা নিমেষের তরে;
দরশ পরশ কিম্বা ভাবনা তোমার
সুখ-প্রদ; তোমা বিনা প্রিয় বস্তু যত—
হলাহল ঢালে যেন হৃদয়ে আমার।

——— শ্রীকালিদাস মিত্র।



সন্ন্যাসীর-উপাখ্যান।

[গোল্ড্স্মিথ্ কৃত ইংরেজী হইতে অবিকল অনুবাদ।]

(১)

"ফির, গিরি-তল-বাসি, তাপস সুজন!
জন-শূন্য পথ মোর,—চল দেখাইয়া;
যথা ওই দীপ-দ্যুতি;—আতিথ্য-কিরণ
বিস্তারিয়া, শৈল-তল রাখে সুশোভিয়া।"

(২)

"হেথা পরিত্যক্ত, আর ভ্রমি পথ ভুলে—
অতি শ্রান্ত, চলিতেছি মন্দ মন্দ পায়;
অরণ্যানী-সীমা নাহি দেখা যায় মূলে,
যত অগ্র হই, যেন তত বৃদ্ধি পায়!"

(৩)

"ক্ষান্ত হও, বাপু! তুমি," সে সন্ন্যাসী কন,—
"গমন করিতে এই ভীষণ আঁধারে;—
প্রবঞ্চক-দীপাকার করিছে ভ্রমণ,
নাশিবেক, লয়ে গিয়ে ভুলা'য়ে তোমারে।"

(৪)

"নিরাশ্রয় নিঃস্বগণ প্রতি এই স্থানে,
অবারিত আছে মোর কুটীরের দ্বার;
হীনাবস্থা আমার, সক্ষম স্বল্পদানে—
সুমনে সে দান কিন্তু জানিবে আমার।"

(৫)

"ফির, রহ আজি নিশা আশ্রমে আমার,—
যাহা কিছু আছে ইথে অংশ তার লবে;
কুশের আসন, মম পরিমিতাহার,
আমার আশিস পাবে শান্তিলাভ হবে।"

(৬)

"পশু-কুল, শৈলে, সুখে করে বিচরণ,
তাহাদের প্রাণ-নাশে ঘৃণা আমি করি;

যেই 'মহাশক্তি' মোরে অনুকূল হন—
তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়ে সেই ভাব ধরি।"

(৭)

"ঘাস-পূর্ণ শৈল-পার্শ্ব হতে আনি তুলি,
আহারের দ্রব্য,—পাপ-শূন্য যে সকল;
ফল মূলে পরিপূর্ণ করি মোর ঝুলী,—
নির্ঝর হইতে আর ধ'রে আনি জল।"

(৮)

"পাথক! ভাবনা ত্যজ, ফির মোর ঘরে,
জগতের চিন্তা যত জানিবে অলীক;—
জগতে মানব-কুল অল্প আশা ধরে—
যাহা কিছু, নাহি রহে দিবস অধিক।"

(৯)

"ধীরে, যথা স্বর্গ হতে পড়য়ে নীহার,—
লাগিল তেমতি তাঁর স্নেহ-সম্ভাষণ;
লজ্জাশীল সে অতিথি, যাইতে স্বীকার;
কুটীরে তাপস পিছু করিল গমন।"

(১০)

"অতি দূরে, বিজন সে মাঝে বিপিনের,
এক মাত্র ছিল, সেই তাপস-ভবন;—
আশ্রম—সে নিকটস্থ দরিদ্র দিগের,
বিদেশী, বিপথে আর যাহার গমন।"

(১১)

"সামান্য কুটীর মধ্যে সে ভাণ্ডার নাই,—
কর্ত্তার যতন চাই যাহার কারণ;
দুয়ার অর্গলাবদ্ধ; খোলা হলে তাই,
সে সাধব-যুগলেরে করিল গ্রহণ।"

(১২)

"পরিশ্রমী নরকুল খাটিয়া যখন
বাটী ফিরে, হয়ে সন্ধ্যা বিশ্রামের বশ;
নিজ আহরিত কাষ্ঠ জ্বালিয়া তখন—
তাপী অতিথিরে তাঁর তুষেন তাপস।"

(১৩)

"আহরিত ফল মূল করিয়া প্রদান,
খাইবারে উপরোধ মৃদু হাসি মুখে;—
উপকথা-নিপুণ তাপস মতিমান,
মন্দগতি দীর্ঘকাল কাটাইল সুখে।"

(১৪)

"তাদের আনন্দ হেরি হয়ে আনন্দিত,
বেড়ায় মার্জ্জার-শিশু চারিদিকে ঘুরে;—
'উচুঙ্গা' অগ্নির পাশে করি চিত্ চিত্,
পুড়িতে, ফাটিয়া কাষ্ঠ, পড়ে গিয়া দূরে।"

(১৫)

"কিছুতেই হইল না শান্তি মানসের—
অতিথির মনোব্যথা তদ্রূপ রহিল;
অতিশয় গুরুতর শোক হৃদয়ের,
নেত্র হতে, ক্রমে অশ্রু বহিতে লাগিল।"

(১৬)

"ক্রমে বৃদ্ধি দেখি তার মানস-বেদন,
তাপস অন্তর হ'ল তদ্রূপ পীড়িত;—
জিজ্ঞাসা করেন,—"নিরানন্দ যুবাজন!
কি লাগিয়া শোক তব হৃদয়ে উত্থিত?"

(১৭)

"সুখের নিলয় হতে হয়ে পরিত্যক্ত—
অনিচ্ছায় বেড়াইছ দেশ দেশান্তরে?
মিত্র যারে ভাব, সে কি নহে অনুরক্ত?
কিম্বা, শোক করিতেছ নারী-অনাদরে?"

(১৮)

"হায়! হায়! যে আনন্দ ধন হ'তে হয়,
বৃথা সার-হীন তাহা ক্ষয়বান আর;
অসার সে বস্তু, যার সারবোধোদয়,
ধনাপেক্ষা তারে দেই, অধিক ধিক্কার।"

(১৯)

"মিত্রতা অসার ভবে—নামেতে কেবল—
নিদ্রা আকর্ষণ করে কুহকের প্রায়!

অর্থ, যশঃ, মানবের নহেক সম্বল,—
ভাগ্য-হীন জনে ছাড়ি রোদন করায়?"

(২০)

"মিত্রতার চেয়ে 'প্রেম,' আরো শূন্যাকার,—
আধুনিক রমণীর বিদ্রূপ-বিষয়;
জগতে অদৃশ্য,—(যদি দেখিবে কাহার)
তবে ত সে তোষে মাত্র ঘুঘুর আলয়।

(২১)

"শোক ত্যাগ কর যুবা! সরম কারণ,—
কামিনী-কুলের মুখে আগুন দিইয়া;"
এ কথা শুনিয়া লাজ-লোহিত-আনন,
বিদেশী বিয়োগী-ভুর দিলেক ভাঙ্গিয়া।"

(২২)

"চমকি, সন্ন্যাসী হেরে সৌন্দর্য্য নূতন,
দ্রুত যথা, নেত্র-পথে পড়ে দৃশ্য-পট;—
প্রভাতে প্রকাশি ভানু রঞ্জিত-গগন,
অদৃশ্য, চমক ধরি হ'ল যেন ঝট্।

(২৩)

"লাজুক বদন, আর পীনোন্নত স্তন,—
একে একে সঞ্চরিল মানসে সংশয়;
সুন্দর সে অতিথির ঘুচে আবরণ,
অতুল সৌন্দর্য্যশালী রমণী সে হয়।"

(২৪)

"এ অসভ্য অতিথিরে ক্ষমা কর," বলে,—
"অতি অভাগিনী, আমি অনাথিনী নাথ!
অনাহূতা, যার পাপ পদদ্বয় চলে,
যেখানে বসতি তব অমরের সাথ।"

(২৫)

"কুমারীরে কৃপা-বারি কর বিতরণ,—
প্রেম-দায়ে পাগলিনী ছাড়িয়াছি বাস;
সুখ-অভিলাষে আমি করি হে ভ্রমণ,
পথের সঙ্গিনী মোর সদত 'নিরাশ'।"

(২৬)

"টৈন-নদী-উপকূলে জনক-আলয়,
আছিলেন পিতা মোর ধনবান্ অতি;—
সকল সম্পত্তি তাঁর আমারি ত হয়,
আমি বই তাঁর আর ছিল না সন্ততি।"

(২৭)

"তাঁর হস্ত ছাড়াইয়া লভিতে আমারে,
সংখ্যা নাহি তার—কত এসেছিল পাত্র;
কল্পিত রূপানুবাদ অশেষ প্রকারে,
করিত; প্রণয় সত্য কিম্বা ছল মাত্র!"

(২৮)

"ঘড়ি ঘড়ি, সমারোহে আসি ধনী কত,—
অর্থ দানে ভুলাইতে—চাহে মোর মন;
যুবা 'এডুইন' তার মধ্যে সমাগত;
প্রেমের উল্লেখ, কিন্তু, না করে সে জন!"

(২৯)

"সামান্য পোষাক তাঁর, ছিল পরিধান—
অর্থ, কি ক্ষমতা কিছু নাহি ছিল তাঁর;
অতি জ্ঞানী আছিলেন সর্ব্বগুণবান,
তাহাতেই প্রয়োজন জানিবে আমার।"

(৩০)

"শৈল-তলে যবে তিনি আমারে লইয়া,
শুনা'তেন, মনোহর প্রেমের সঙ্গীত;
সুকণ্ঠ যাইত তাঁর মলয়ে মিলিয়া,—
সুমধুর রবে কুঞ্জ হইত গুঞ্জিত।"

(৩১)

"প্রভাতের পরশনে প্রফুল্ল মুকুল,—
কিম্বা আর সুবিমল স্বর্গের শিশির;
বিশুদ্ধতা, (এডুইন-অন্তরের তুল,)
কদাচ নাহিক পারে করিতে বাহির।"

(৩২)

"মুকুলে, শাখীর'পরে নভের শিশিরে,
সৌন্দর্যতা, দৃষ্ট হয় স্থিরতা-বিহীন;—

তাদের সৌন্দর্য্য তাঁর; কিন্তু দুঃখিনীরে
বর্ত্তিয়াছে, তাদের স্থিরতা দৈবাধীন।"

(৩৩)

"গর্ব্বিতা হইয়া, কভু অধৈর্য্য হইয়া--
করিয়াছি রসিকতা তাঁহার সহিত;
তাঁর প্রেম, হৃদে মোর প্রবেশ দেখিয়া,
হই নাই তাঁর দুঃখে তথাপি দুঃখিত।"

(৩৪)

"আমার ঘৃণায় শেষ হইয়া হতাশ,—
মোর তেজে রাখি মোরে করেন বর্জ্জন!
বিজন অরণ্যে গিয়া করিলেন বাস,
হায়! গোপনেতে তথা ত্যজেন জীবন।"

(৩৫)

"সে পাপ আমারি, আমি দোষের ভাগিনী,
এবে, প্রতিশোধ দিবে আমার জীবন;
বিজন বিপিনে যথা গিয়াছেন তিনি,
তাঁর মৃত্যু-স্থানে কায়া করিব পতন।"

(৩৬)

"সেই খানে—পরিত্যক্ত—হতাশ-মাননে,
লুকা'য়ে এ দেহ ঢালি পরাণ ত্যজিব;—
ক'রেছেন 'এডুইন' মোর প্রেম-বশে,
আমিও তাঁহার তরে তদ্রূপ করিব।"

(৩৭)

"রক্ষা কর, জগদীশ!" তাপস বলিয়া,—
জাপটিয়া রমণীরে হৃদয়ে ধরিল;
চমকিতা হয়ে তাঁরে ধম্‌কাতে গিয়া,—
তাঁরি 'এডুইন' তাঁরে ধরেছে দেখিল!"

(৩৮)

"প্রাণ প্রিয়ে! এঞ্জেলিনা, ফিরাও বদন.
হৃদয়-হারিণি মোর! হের লো নয়নে,
তব 'এডুইন' হেথা, পূর্ব্বহারাধন—
তব প্রেম পুনরায় পাইল এক্ষণে।"

(৩৯)

"এইরূপে চিরদিন হৃদি-মাঝে রাখি,
কোন চিন্তা এ মানসে না রাখিব আর;—
কভুনা ত্যজিব (ও) হৃৎপিঞ্জরের পাখি!
হৃদি-রত্ন! প্রাণ ধন!! সর্ব্বস্ব আমার!!!"

(৪০)

"এই দণ্ড হতে নাহি তোমা ছাড়া হ'ব,
প্রণয়-পাশেতে বদ্ধ র'ব চিরদিন;—
যে শোকেতে পরিতপ্ত হবে হৃদি তব,
সেই শোকে জর্জ্জরিত হবে এডুইন!"

শ্রীরাধাজীবন রায়।



ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কি হ'বে তোর গতি রে মন!
এক বার কি তা' ভাবিস্ না?
দিনান্তে কৈ হরি ব'লে,
এক বারও তো ডাকিস্ না!
বিষয়-মদে মত্ত হয়ে,
পরম-তত্ত্ব ভুলে গিয়ে,
আছ রে উন্মত্ত হয়ে!
দিন যায় তা' দেখিস্ না?
ছেড়ে দিয়ে বিষয়-আশা,—
(সেই) চরণ কর ভরসা;
মোক্ষধামে পাবি বাসা,
তা' কি তুই জানিস্ না?
তাই বলি ত্বরা করি,
মুখে বল,—'হরি, হরি,'
ভব-সিন্ধু যাবি তরি;
শমনে ভয় করিস্ না।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ।



১ম খণ্ড।] শ্রাবণ। [৪র্থ সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা।)

শ্রীকালিদাস মিত্র
সম্পাদিত।

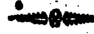
"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"
—তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৭ সাল।

শরতে শ্রাবণ।



গান

সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ!
গাইতেছে ঘন-দলে,
বিপুল গগন-তলে,
মুরজ-মধুর স্বনে,
গরজি গম্ভীর গান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

শিরে চারু হেম-আভা,
ময়ূখ মুকুট শোভা,
শ্যামল বিটপী-শাখে
বিহগ ছাড়িল তান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

বিমল সরসী-জলে,
কৌতুকে মরাল চলে,
বিকচ কমল-কোলে,
অলি করে মধুপান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

কল্লোলিনী কল-কলে,
সাগর উদ্দেশে চলে,
গরবে হৃদয় ভরা,
আমোদে বহিল বান,
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

বিধুমুখে মধু হাসি,
ধবল কৌমুদী রাশি,
নিরখি কুমুদী সতী,
হরষে ত্যজিল মান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সরস সকলি দেখি,
আমার আঁধার-হৃদে,
করে না কিরণ দান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

ফুরা'য়েছে সব আশা,
ভেঙ্গেছে স্নেহের বাসা,
সুখের শিশির-দিবা,
হ'য়ে গেছে অবসান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

এত কি ভাগ্যের জোর!
আবার দেখিব তোর
শারদ অমিয়-রাকা,
মধুমাখা সে বয়ান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

বিষাদ-জলদ ঘোর,
ঘেরেছে হৃদয় মোর,
মানস-সরোজ মম,
শোক-ভরে ম্রিয়মাণ।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

নিদয় পাষাণ বিধি,
হরিল সুখের নিধি,—
শরতে শ্রাবণ-ধারা,
বরষিছে এ নয়ান।
সরস শরতে আজি বিরস কেন রে প্রাণ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।



অমাবস্যা-নিশীথে।

আজ অমানিশি—অন্ধকার রজনী—আঁধার-রাশি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত! অনন্ত অন্ধকার মনের সাধে ধরণী-কোলে অন্ধকার ঢালিতেছে; ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল অন্ধকার!—ধরাতল অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন কর। ক্ষীণ দীপালোকে তোমার কি করিবে? ক্ষীণ খদ্যোতালোকেই বা তোমার কি করিবে? আর, ক্ষীণ নক্ষত্রালোক? সে ত তোমার প্রভাবে আজ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তোমার অনন্ত মহিমা, অনন্ত অনন্ত অক্ষরে প্রকাশ করিতেছে। তোমারই অনুকম্পায় আজ নক্ষত্র-পুঞ্জ বিমল, বিশদ, স্বচ্ছ,—পবিত্র হৃদয়ে তোমারই অনন্তধ্যানে নিমগ্ন!

প্রিয়তম অন্ধকার! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তুমি বড় ভয়ানক বটে, তোমার ভীষণ ভীম মূর্ত্তি, তোমার গভীর আঁধার-রাশি সমস্ত ভুবন ভরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি তোমার কি সুন্দর সুগম্ভীর মূর্ত্তি! মরি, মরি! তুমি কি মনোরম! তুমি কি হৃদয়-স্পর্শী, কি মর্ম্ম-স্পর্শী! তোমার মত প্রাণস্পর্শী আর ত কাহাকেও দেখি না। তোমার মত মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্তে ডুবাইতে আর কেহই পারে না। তাই বলি, অন্ধকার! তুমি আমার প্রিয়তম! আমার হৃদয় আজ তোমার অনন্তে মিশিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হইতে প্রয়াস পাইতেছে। তুমি ত অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছ, প্রত্যেক প্রাণে প্রাণে পরমাণুতে পরমাণুতে মিশিয়া রহিয়াছ; অনন্ত জগতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াও আরও অন্ধকার ঢালিতেছ। একবার আমার হৃদয় তোমার এই অনন্ত আঁধার-রাশিতে মিশাইয়া লও। আমি একবার এই অনন্তের মধ্যে ডুব দিব,—দেখিব কোথায় কি আছে। অনন্তের অনন্ত সীমানাই বা কোথায়? অনন্ত জগতে একবার আধিপত্য বিস্তার করিব।

না, না, অন্ধকার! তোমার ও অনন্তের মধ্যে ডুবিব না,—তাহা হইলে, আমি আর আমাতে থাকিব না, আমার সমস্ত অস্তিত্ব একেবারে লোপ পাইবে। জগতের উপর আধিপত্য করিব কি রূপে? তোমার অনন্ত আঁধার-স্রোতে ডুব দিলে, মিশাইয়া যাইব। তাহা হইবে না; তোমার ও আঁধার-স্রোতে ডুব দিব না—ভাসিব। তাহা হইলে, আমার সকল আশা পূর্ণ হইবে।

তবে, এস অন্ধকার! এস প্রিয়তম! হৃদয়ের ধন! প্রাণের প্রাণ! অনন্ত প্রাণ! একবার তোমার উপরে ভাসি; একবার তোমার অনন্ত বিকাশ মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখিয়া লই। দেখাও, আমাকে অনন্ত প্রকৃতির অতুল শোভা। প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিব। দেখাও প্রিয়তম! একবার আমাকে দেখাও।

আহা, মরি মরি! প্রকৃতিদেবি! আজ

তুমি কি অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছ! তোমার গম্ভীর মুখশ্রী, তোমার পবিত্র উদার হৃদয়, তোমার এমন অনন্ত-মগ্ন প্রাণ, আর কখনও দেখি নাই। মরি মরি! দেবি! শ্যামাঙ্গিনি! আজ তুমি অনন্ত ধ্যানে বিভোরা। তোমার শুদ্ধ প্রশান্ত মূর্ত্তি বড়ই মধুর, বড়ই প্রাণস্পর্শী।

আঃ! বৃথা আশা তোমার কালপেচক! কালরাত্রি পাইয়াছ, অন্তরে বড় অহঙ্কার হইয়াছে, না? তাই বুঝি ধ্যান-মগ্না প্রকৃতি দেবীর—শ্যামাঙ্গিনীর অনন্ত ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছ? বৃথা আশা! অনন্ত ধ্যান-মগ্না ভাবভোরা আঁখি উন্মীলন করা কি তোর ক্ষমতা? ধিক্ তোরে! হিংস্রক—নীচ—অসুর! তোদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র!

আবার, এ কি! এ কি! কে তুমি গগন-তলে বসিয়া শান্তি-জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছ? কৈ তোমাকে ত এতক্ষণ দেখি নাই। আহা! তোমার কি অমল ধবল, বিমল, মধুর, উজ্জ্বল মূর্ত্তি! দেব! তুমিও কি সেই অনন্তের অনন্ত ধ্যানে মগ্ন? তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ও অনন্ত ধ্যানে মগ্ন হইতে চাহিতেছে। আমিও একবার তোমার মত অনন্ত ধ্যানে মগ্ন হইব।

প্রিয়তম অন্ধকার! তুমি একবার আমার সহায় হও। আমি এই চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার হৃদয়ে একবার অনন্তভাব ঢালিয়া দাও; আমিও অনন্তভাবে ভোর হইব; অনন্ত পদে এই নশ্বর জীবন মিশাইব; অনন্ত সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিব। আমার এই অনন্ত আশা তুমি না হইলে কে পূর্ণ করিবে? এস, তুমি সহায় হও; আমিও নয়ন নিমীলন করিয়াছি।

* * * *

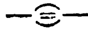
মরি মরি! কি মধুর স্বপ্ন! এমন অভূতপূর্ব্ব স্বপ্ন ত কখনও দেখি নাই। আমার হৃদয় যেন আলোকময়; হৃদয়াকাশে শুকতারার বিকাশ; আলোকময় হৃদয়ে মধুর উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা,—"এই অন্ধকারের মধ্যে সত্যের আলোকময় পথ দেখিয়া চল, অনন্ত জীবন পাইবে।" সহসা সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। চারি দিকে চাহিয়া দেখি, হায়! হায়! এ কি! এ কি! কোথায় তুমি প্রিয়তম অন্ধকার! অনন্ত আঁধার-নিশি! আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? তোমার সে অনন্ত কায়া কোন্ অনন্তে মিশাইলে? হায়! কে জানিত, তুমি মুহূর্ত্তমাত্র? তোমায় অনন্ত ভ্রমে আমার হৃদয় দিলাম; তুমি আমায় ফেলিয়া কোথায় পলাইলে? তোমায় অনন্ত ভাবিয়া আমি যে জগতের উপর অনন্ত আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলাম,—সে আধিপত্য যে আমার লোপ পাইল! সম্মুখে অনন্ত জগৎ আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, কে আমাকে রক্ষা করিবে? তবে কি তুমি কেবল মায়া? মায়াময় অন্ধকার! হায়, হায়! কি করিলাম? কোথায় অনন্ত! কোথায় তুমি অনন্ত প্রাণ! আমার এ জীবন যায় যায় হইয়াছে। তুমি আমায় অনন্ত জীবন দাও।

পূর্ব্ব দিক্ একটু আলোকময় হইল, কে যেন আবার হৃদয়-তন্ত্রী সজোরে বাজাইয়া বলিল,—"আলো দেখিয়া চল, অনন্ত জীবন পাইবে।"

অমনি হৃদয় পুলকিত হইল। একবার উৎফুল্ল নয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ করিলাম; নিমেষ মধ্যে সে আনন্দ লোপ পাইল। জগৎ এক্ষণে আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; সুতরাং, জগতের কাজে আবার ডুবিলাম।



সজ্জনের বাক্য।



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

নিম্ব-বৃক্ষ যদি ধরে মধুময় ফল,
খলের চরিত্র হয় যদ্যপি সরল;
এক স্থানে থাকে যদি কুরঙ্গ, শার্দ্দূল,
মহিষ, তুরঙ্গ আর ভুজঙ্গ, নকুল;—
নির্ব্বাসিত ব্যক্তি যদি মন সুখে রয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৮)

পেচক যদ্যপি নাহি বায়সেরে ডরে,
যুবতী যদ্যপি তুষ্টা হয় বুড়া বরে;
পুত্রের মরণে যদি নাহি হয় শোক,
যদ্যপি রুধির-প্রিয় নাহি হয় জোঁক;—
সেলামে সাহেব বশ যদ্যপি না হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(৯)

বাঙ্গালীরা দাস্য-বৃত্তি করে পরিহার,
কপি-গলে যদি শোভে মুকুতার হার;
কাক যদি তুষ্ট হয় পাকিলে 'শ্রীফল'
সতীনে সতীনে যদি না করে কোন্দল;—
পাপীর মরণে যদি নাহি থাকে ভয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(১০)

ইন্দুর উয়েতে যদি ক্ষতি নাহি করে,
কেশরীর শক্তি যদি শৃগালেতে ধরে;
কাকের যদ্যপি হয় কোকিলের স্বর,
ফুটে যদি শতদল গিরি শৃঙ্গোপর;—
ছুঁচার গায়েতে যদি পদ্ম-গন্ধ বয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(১১)

কৃপণেরা যদি কভু পেট ভ'রে খায়,
অলস বালক যদি ছুটী নাহি চায়;
মূষিক যদ্যপি করে মার্জ্জারে শিকার,
সর্প যদি হয় কভু ভেকের আহার;—
আপন অদৃষ্টে সবে তুষ্ট যদি রয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(১২)

চক্ষুঃ-প্রিয় হয় যদি শত্রুর আকৃতি,
তিক্তাহারে নাহি হয় বদন-বিকৃতি;
তুষার-রাশিতে যদি অনল উগরে,
অন্তঃরীক্ষে মীনগণ যদ্যপি বিচরে;—
শালী বিনা শোভে যদি শ্বশুর-আলয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

(১৩)

মূর্খ যদি শোভে কভু জ্ঞানীর সভায়,
যদ্যপি চন্দ্রমা উঠে অমার নিশায়;
উকীলেরা মোকদ্দমা যদি নাহি খুঁজে,
বিভুর চরণ যদি পাপী কভু পূজে;—
পুত্র প্রতি স্নেহ-হীনা মাতা যদি হয়,
সজ্জনের বাক্য তবু নড়িবার নয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কারাগার।

যে রাত্রে প্রহরিগণ দামোদর বাবু ও তাঁহার জামাতাকে পিছ্‌মোড়া করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়, সে রাত্রে তাঁহাদের যন্ত্রণার আর সীমা ছিল না। একে পিপাসায় কণ্ঠরোধ হইতেছিল, তাহাতে আবার মারি খাইয়া সর্ব্ব শরীর চূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিলেন এবং উৎকোচ প্রদানে ও সম্মত হইলেন, তথাপি তাহারা কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া, হড়্‌হড়্‌ করিয়া উভয়কে টানিয়া লইয়া গেল এবং দারোগার অনুমতিক্রমে হাজতে রাখিল। এ দিকে, প্রভুভক্ত ছেদী রাত্রি প্রভাত না হইতেই যে স্থানে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল, মৃত দেহ সেখানে নাই। শৃগাল ও কুক্কুরেরা দলবদ্ধ হইয়া, সেই দুইটাকে টানিয়া, একটা ঝোপের অন্তরালে লইয়া গিয়াছে এবং রক্ত মাংস সমস্তই ভক্ষণ করিয়া কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে ;—কোন্ জাতির মৃত দেহ কিছুই জানিবার উপায় নাই। তাহাদের ছিন্ন বস্ত্রগুলি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল। ছেদী সেই সমস্ত একত্র করিয়া, একটা গর্ত্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, মৃত্তিকা চাপা দিল এবং রাশীকৃত শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিয়া, ঐ কঙ্কালদ্বয় আবৃত করিল। যে স্থানে এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল, যদিও তথায় জনমানবের সমাগমের সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি প্রকাশ-ভয়ে ভীত হইয়া, ছেদী এ বিষয়ে উপেক্ষা করিতে পারিল না। নিঃসংশয় হইয়া পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া, ছেদী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং চণ্ডীচরণকে জানাইয়া এবং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রভুর উদ্দেশে গমন করিল। দেখিল, দামোদর ও অম্বিক বাবু উভয়ে অধোবদনে বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। নিষ্ঠুর প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। দামোদর ইঙ্গিত করিবামাত্র ছেদী ও চণ্ডীচরণ কিছু তফাতে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রহরিগণ উভয়কে বিচারালয়ে লইয়া গেল। বিচারে বিশেষ কোন দোষ সপ্রমাণ হইল না বটে, কিন্তু রাত্রে মশাল জ্বালিয়া যষ্টি হস্তে পথিপার্শ্বে তাহারা কি করিতেছিল, এই সন্দেহপ্রযুক্ত বিচারপতি তাঁহাদিগের উভয়কেই এক সপ্তাহকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। অপমানে উভয়ের আর কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে কারাগারে লইয়া গিয়া লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ করিল। তদ্দর্শনে চণ্ডীচরণ ও ছেদী উভয়ে রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এবং ব্রাহ্মণীকে সংবাদ দিতে, ব্রাহ্মণী কপালে কঙ্কণ মারিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং পুর-

বাসিনীরা সকলেই রোদন করিয়া উঠিল। চণ্ডীচরণ শোকে ও ভাবনায় পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। সকল দিকেই হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্বামী ও জামাতা কারারুদ্ধ, চণ্ডীচরণ পীড়িত,—গিরিবালা ও সহচরী নিরুদ্দেশ। একেবারে সকল বিপদ্ উপস্থিত। বিধাতার কি অপূর্ব্ব-লীলা! স্বভাবের কি বিচিত্র গতি! এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এমন সুখের সংসার দুঃখ-সাগরে ভাসমান হইল! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে পুরী নানাবিধ আনন্দ-সূচক কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহা আর্ত্তনাদ-পরিপূর্ণ প্রকৃত শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

পূর্ব্বকালে কারা-যন্ত্রণার মত অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই ছিল না। বিশেষতঃ, ঐ সময় রাজ্য একেবারে অরাজক অবস্থাতেই ছিল। চারি দিকেই দস্যুগণের উপদ্রব, চারি দিকেই উৎপাত। এইরূপ বিদ্রোহ-সঙ্কুল রাজ্য কিরূপে শাসিত হইবে, তাহার উপায় অবধারণ করিতে কোম্পানী বাহাদুরকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অতএব, অপরাধিগণ ধৃত হইলে, তাহাদিগের প্রতি লঘু দোষে গুরুদণ্ড বিধান করা হইত। দামোদর বাবু যে অপরাধে অপরাধী, তাহা যদি বিচারে সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে, কি আর রক্ষা থাকিত? সেটি গৃহিণীর পুণ্য-বলে বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু, সপ্তাহ কাল তাঁহাকে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে শত বার বলিতে হইয়াছিল,—'ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল ছিল।' চতুর্দ্দিকে অপরাধিগণের আর্ত্তনাদ, বেত্রাঘাত ও কোড়া প্রহারের শব্দ ও প্রহরিগণের বিকট মুখভঙ্গী-সহকারে কঠোর বাক্য-প্রয়োগে তাঁহার কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছিল। দিনমানে কঠিন পরিশ্রম ও রাত্রে অনিদ্রা বশতঃ তাঁহার সেই ভীষণ শরীর সপ্তাহ মধ্যেই শীর্ণ ও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। একদা রজনীযোগে বিজাতীয় গ্রীষ্ম-প্রভাবে ও দারুণ মশক দংশনে ছট্‌ফট্ করিয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ও মুখে কথা সরিতেছে না। প্রহরীকে ডাকিয়া অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন,—"বাবা! পিপাসায় প্রাণ যায়, আমায় একটু জল দাও!" প্রহরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় করাতে, সে রুষ্ট হইয়া বলিল,—"তোর প্রাণ যায়, তা আমার বাবার কি? জল কখনই দিব না।" দামোদর বাবু নীরব হইলেন; বোধ হইল, যেন প্রহরীর মধুমাখা বাক্য শ্রবণেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল,—জলের আর বড় প্রয়োজন রহিল না। যাঁহার ভোজন-পাত্রে দধি দুগ্ধ ও অপমান প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে এখন লোহিতবর্ণ তণ্ডুলের অন্ন কোন প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া, ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইল! যে ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে, দাস দাসীগণে চরণ-সেবা ও তাল-বৃন্ত বীজন করিত, তাঁহাকে এখন ধরাতলে শয়ন করিতে হইল! যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত ব্যক্তি সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হয়, আজি কি পরিতাপ! তাঁহাকে প্রহরীর বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইল! ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও গ্রহ-বৈগুণ্য বশতঃই অকস্মাৎ যে তাঁহার এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

এক দিন দামোদর রৌদ্রে বসিয়া খোয়া ভাঙ্গিতেছেন এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া দর দর ধারে স্বেদ-জল বিনির্গত হইতেছে, এমন সময় অম্বিককে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —“বাবা! আর কত দিন আছে?” অম্বিক বিষণ্ণ বদনে উত্তর করিলেন,—“এই সবে তিন দিন গিয়াছে বৈ ত নয়, এখনও চারি দিন বাকি।”

দামো। বাবা! যন্ত্রণা ত আর সহ্য হয় না।

অম্বিক। যন্ত্রণার এখন্ কোথায় কি?

দামো। এ অপেক্ষা আরও যন্ত্রণা আছে?

অম্বিক। অসংখ্য।

দামো। কত পাপ ক'রেছিলেম,—তাই এই শাস্তি।

অম্বিক। (স্বগত) সেটা যে চমক হয়েছে, তবু ভাল।

দামো। বাবা! ঈশ্বর কখন পক্ষপাতী নন।

অম্বিক। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি। রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন ও বিপদ্,— এই সমস্তই জীবের আত্মাপরাধ-রূপ বৃক্ষের ফল স্বরূপ।

দামো। আর দেখ বাবা! লোভেই পাপ, পাপেই মৃত্যু।

উপস্থিত ঘটনায় দামোদরের বাস্তবিক কোন অপরাধ থাক্ বা নাই থাক্, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক যে সকল মহাপাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইয়া, তাঁহাকে বিশেষ রূপ ব্যথিত করিয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, জগদীশ্বর অদ্য আমাকে সেই সকল পাপের প্রতিফল দিতেছেন। এইবার অবধি আর আমি কখন স্বেরূপ পাপ কার্য্য করিব না। কিন্তু পাঠক মহাশয়, এরূপ শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণ কালের জন্য— স্বভাব সংশোধন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার।

একদিন প্রাতঃকালে দামোদর গাত্রোত্থান করিয়া, কারাগৃহে বসিয়া আছেন, প্রহরী কর্ত্তৃক দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, এমন সময় একটি সুললিত গীত-ধ্বনি তাহার কর্ণ-গোচর হইল। মনোযোগ-পূর্ব্বক শুনিয়া, আভাষে বুঝিতে পারিলেন যে,কোন ভিখারিণী গাইতেছে। কারাগৃহের প্রাকারে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। তাহাতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, রাজপথ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা এত উচ্চে অবস্থিত যে, দামোদর কোন ক্রমেই তন্মধ্যে মুখ বাড়াইতে পারিলেন না। কারাগৃহ কখন্ বন্দীর সুখ-প্রদ হইয়া থাকে? আবার মনোযোগ-পূর্ব্বক কাণ পাতিয়া শুনিলেন; বুঝিলেন, কোন পরিচিত কণ্ঠ-স্বর; কারণ ঐ ভিখারিণী প্রত্যহই তাঁহার দ্বারে ভিক্ষা করিতে যায়। দামোদর কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়াই কি সে কৌশল-ক্রমে তাঁহাকে একটি গীত শুনাইতে আসিয়াছে, বা অন্য কোন কারণ আছে, তাহা বুঝা গেল না। ভিখারিণী ‘আসা’ রাগিণীতে বীণা বাজাইয়া গাইতেছে,—

“শ্যাম! তুয়া লাগি, পরাণ তেয়াগিনু,
দেহ দেহ দরশন আসি।
একি তোমার অবিচার,বধিতে অবলা প্রাণ,
কি হেতু বাজা'লে মোহন বাঁশী?
না দেখি তোমার সম, কপট চূড়ামণি,
নিদয় কঠোর পাষাণো—
ওহি পদ-পঙ্কজে, হৃদয় বিকাইনু,—

মজিনু—নিরখি মধুহাসি।
দারুণ-বিরহ-বিষে তনু হ'ল জর জর ;
কর কর করুণা প্রদানো—
তুহি নব জলধর, মুহি চাতকিনী,
তব প্রেম-সলিল পিয়াসী।"

গীত শুনিয়া, দামোদরের বক্ষঃস্থল অশ্রু-জলে ভাসিয়া গেল। মনের আবেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ভিখারিণি! আবার গাও।" ভিখারিণী আবার গাহিল। দামোদরের উদ্বেগ দ্বিগুণতর প্রবল হইল, নয়নে অবিরল বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে কারাগৃহের লৌহ-অর্গল-বদ্ধ লৌহময় কবাট ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে উদ্ঘাটিত হইল। প্রহরী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দামোদরকে তদবস্থ দেখিয়াও কিছু মাত্র ব্যথিত হইল না, বরং কর্কশ বচনে জিজ্ঞাসা করিল,—"শালা! রোতা হয় কাহে?" দামোদর কোন উত্তর করিল না দেখিয়া, সে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। দামোদর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উৎকোচ প্রদানে সম্মত হইলে, দুরাচার ক্ষান্ত হইল ; সে দিন দামোদরকে আর বড় পরিশ্রম করিতে হইল না।

এইরূপ নানা কষ্টে সাত দিবস অতীত হইল। আজি প্রাতে দামোদর কারামুক্ত হইবেন—স্বামী ও জামাতা উভয়েই গৃহে আসিবেন; এই স্থির জানিয়া, হৈমবতী ভৃত্যের হস্তে নব বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া, ছেদী ও চণ্ডীচরণকে তৎসমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। হৈমবতী নিতান্ত পতিপ্রাণা। যে দিবসাবধি স্বামী এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি অন্ন জল ত্যাগ করিয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। কতক্ষণে উভয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিবেন, কতক্ষণে উভয়কে ভোজনাদি করাইয়া, তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন, এই আশা করিয়া, বাতায়ন-পথে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কতক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন, অগ্রে অগ্রে দামোদর, তৎপশ্চাতে অম্বিক ও তৎপশ্চাতে চণ্ডীচরণ ও ছেদী এবং ভৃত্যেরা আসিতেছে। বেলা এক প্রহর অতীত হইতেই দামোদর বাটী প্রবেশ করিলেন। হৈমবতী অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে স্বামীর পদ প্রক্ষালন করিয়াদিলেন এবং চণ্ডীচরণের প্রতি আজ্ঞা করিলেন,—"যাও বাবা! ছেদীর সঙ্গে গিয়া, ভগিনী দু'টিকে ল'য়ে এস, আজ তারা বাড়ী এলে তবে আমি ঠাণ্ডা হ'ব।"

যে রাত্রে গিরিবালা ও সহচরী নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সে রাত্রে চণ্ডীচরণ এতদূর ঘটিবে, তাহা জানিতে পারিলে, উপেক্ষা করিত না। বিশেষতঃ, যে সহচরীর প্রতি তাহার এতাদৃশ অসঙ্গত আসক্তি জন্মিয়াছিল, সেই সহচরী নিরুদ্দেশ, ইহা তাঁহার বক্ষঃস্থলে শেলসম আঘাত করিয়াছিল। কি করে, পীড়িত হইয়া পড়িল, উত্থান-শক্তি-রহিত হইল ; কাযে কাযেই মনকে প্রবোধ দিয়া, কোনরূপে এই সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এখন সে সবল ও সুস্থকায় ; অতএব, মাতৃ-আজ্ঞাই যেন তাহার শিরোধার্য্য, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া শিবিকা-বাহকদিগকে সত্বর শিবিকা আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিল ও ছেদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, নৈহাটি যাত্রা করিল। দামোদর ও অম্বিক কারা-যন্ত্রণায় নিতান্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই অপমানের

পর কেমন করিয়া প্রতিবেশীদের নিকট মুখ দেখাইবেন, এই লজ্জায় আর বাটীর বাহির হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, গিরিবালার একটা উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, আর তাহারা উভয়েই প্রতাপ বাবুর বাটীতে এক প্রকার সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, এখানকার দুর্ঘটনার বিষয় তাহারা জানিতে পারে নাই, এই সমস্ত ব্রাহ্মণীর নিকট অবগত হইয়া, কথঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন। ব্রাহ্মণী উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া, স্বয়ং রন্ধন-শালায় প্রবেশ করিলেন। নিকটস্থ প্রজাগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দামোদর বাবু সকলকেই সম্ভাষণ করিয়া বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

পরিচয়।

এ দিকে গিরিবালা নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, সহচরীর ছিন্ন অঞ্চল-খণ্ড তাঁহার হস্তে জড়ান রহিয়াছে; কিন্তু সহচরী নাই। উঠিয়াই বাহিরে গেলেন, এদিক্ ওদিক্ দেখিলেন, দেখিতে পাইলেন না। এ কয়েক দিন প্রত্যহই সহচরী অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া গিরিবালাকে জাগাইতেন; কিন্তু অদ্য আর জাগাইবার ত কোন কথা নাই, জাগাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কেন? এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয় হইলেও গিরিবালার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। যাহা হউক, মহা মুস্কিল। রজনীতে সহচরীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, সকলি এখন সত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মিল। ভাল, সহচরী যদি এখানে থাকিবার বাসনা করিয়া থাকে, তবে ত সে এই খানেই আছে; কিন্তু এখনও তাঁহার দেখা নাই কেন? অঞ্চলই বা ছিন্ন করিবার কারণ কি? এই সকল মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মুগ্ধে! তুমি চতুরার কৌশলমধ্যে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? যে বস্তুটি মহামূল্য, তাহা একবার হাত ছাড়া হইলে, আর পাওয়া ভার; চতুর ব্যক্তি কখনই তাহা একটিমাত্র আবরণের ভিতর রক্ষা করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। অবশ্যই একটি আবরণের উপর আর একটি আবরণ দিয়া থাকেন। সহচরীর একটি মহামূল্য বস্তু রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। সে বস্তুটি কি?—**সতীত্ব।** সেটি একবার হাত ছাড়া হইলে আর পাওয়া যায় না। সহচরী কেমন করিয়া উহা একটিমাত্র আবরণ মধ্যে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যদি সেই আবরণটি কীট-কর্ত্তৃক নষ্ট হয়, তাহা হইলে কি হইবে? গিরিবালা! তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, "কীটটি কি?" আমি বলিব,—"তোমার ক্রন্দন।"—তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও না কেন, বাটী গমন কালে অবশ্যই কাঁদিবে। তোমার ক্রন্দন দেখিলে, সহচরী আর কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিবে? তবেই ত কীট আসিয়া আবরণটি নষ্ট করিল। তাই বুদ্ধিমতী সহচরী অনেক বিবেচনা করিয়াই, দ্বিতীয় আবরণটি প্রদান করিয়াছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর, দ্বিতীয় আবরণটি কি? তাহা তোমাকে বলিব না, কারণ তুমি পাষাণ-ভেদী ক্রন্দনে এখনি মহা অনর্থপাত করিবে।

গিরিবালা সঙ্গিনীর অদর্শনে প্রমাদ ভাবিয়া, সজল নয়নে শারদা-সুন্দরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া শারদা-সুন্দরী নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মা! আজ এত কান্না কেন? আজ বরং আমরাই কাঁদ্‌ব, আর তুমি হাস্‌তে হাস্‌তে পাল্কী চ'ড়ে বাপের বাড়ী যাবে; ছি মা! কাঁদ্‌তে আছে কি?"

গিরিবালা যে কেন কাঁদে তাহা ত কেহ এখনও জানিতে পারে নাই। তাঁর যে হৃদয়-পিঞ্জরের পোষা পাখী ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গিয়াছে, তাহা ত তখনও কেহ জানিতে পারে নাই। গিরিবালা রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সহচরী কোথায়?" শারদা-সুন্দরী বলিলেন,—"কেন তিনি কোথায় গেলেন?" গিরিবালা বলিলেন,—"সকাল অবধি দেখি নাই। এই দেখ না আঁচল ছিঁড়ে আমায় ফেলে কোথা পালিয়েছে।" শারদা-সুন্দরী সমস্তই জানিতেন, তথাপি ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—"সেকি! এমন মতি তাঁর কেন হলো? কে তাঁকে এমন পরামর্শ দিলে?"

গিরিবালা আরও কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার ক্রন্দনে কেহ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, এ ঘর ও ঘর করিয়া সহচরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সহচরী ত আর সেখানে নাই যে, খুঁজে পাওয়া যা'বে। শারদা-সুন্দরী দেখিলেন মহা মুস্কিল, কি করেন, তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"এস মা! তুমি আজ বাড়ী যাবে, তোমায় স্নান করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে দি।" স্বহস্তে তাঁহার কবরী-বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন এবং পরিচারিকাদিগকে বলিলেন,—"ঠাকরুণ্‌কে বেশ ক'রে স্নান করিয়ে দে।"

আজ্ঞামত কার্য্য সমাধা হইলে, শারদা-সুন্দরী একখানি নূতন পট্ট-বস্ত্র আনিয়া স্বহস্তে গিরিবালাকে পরাইয়া দিলেন, ললাটে সিন্দুর ও গলদেশে পুষ্প-হার প্রদান করিলেন; তাহাতে গিরিবালার অপূর্ব্ব শোভা হইল। শারদা-সুন্দরী প্রণাম করিয়া পরিচারিকাদিগকে বলিলেন,—"দেখ দেখি, মাকে আমার কেমন মানিয়েছে?"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন-সময়ে অপর একটি পরিচারিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—"মা! ঠাকুরুণের ভাই নিতে এসেছেন, সঙ্গে পাল্কী, কত লোক জন এসেছে।" সকলেই দেখিবার জন্য শশব্যস্ত হইলেন। গিরিবালা যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"মা! আজ আপনাদের ছেড়ে চল্লেম্। মা! আপনার যত্ন আত্তি কি এ জন্মে আর ভুল্‌বো! মা! আপনি সতী সাবিত্রী—কমলা আপনার ঘরে অচলা হ'য়ে থাকুন, আর কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো সম্বৎসরের মধ্যে একটি খোকা হোক্, বাবাকে মাকে ব'লে দেখ্‌তে আস্‌ব!"

সকলেরই চক্ষে জল আসিল। শারদা-সুন্দরী দেখিলেন, আর কালবিলম্ব করিলে চলিবে না, গিরিবালাকে আর একটি ঘরে লইয়া গেলেন, সেখানে তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎ

আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত ছিল। গিরিবালা ভোজন করিতে বসিলেন। শারদা-সুন্দরী তাল-বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। পাছে সেবার ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় শারদা-সুন্দরী পরিচারিকা-হস্তে কোন কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন না। তিনি যেরূপ সরল-স্বভাবা, তাঁহার সেবা কার্য্যও সেইরূপ ভক্তি-পরিপূর্ণ।

ভোজন ও আচমনান্তে শারদা-সুন্দরী গিরিবালাকে লজ্জিতভাবে বলিলেন,—"মা! আমি তোমার মেয়ে, মেয়ের একটি আবদার আছে।" গিরিবালা বলিলেন,—"সেকি কথা! আপনার গুণের কথা আমি শতমুখে বল্‌তে পার্‌ব না; আপনি যা' বল্‌বেন, আপনি যা' কর্‌বেন, তার উপর আর কথা কি?"

শারদা-সুন্দরী গিরিবালার কাণে কাণে সহচরী সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিলেন এবং পুনঃপুনঃ বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখো মা! যেন কোন মতে প্রকাশ হয় না। যদি মা! প্রকাশ কর তবে মেয়ের মাথা খাবে। সময় এলে প্রকাশ কর্‌বেন, তাতে ক্ষতি নাই।"

গিরিবালা বলিলেন,—"সেকি মা! সহচরী আর আমি—এক আত্মা, এক প্রাণ—কেবল দেহ দু'টা ভিন্ন। তার যাতে কষ্ট হবে, এমন কায আমি কর্‌বো? সহচরী যদি সুখী হয়, তা হ'লে আমিও পরম সুখে থাক্‌ব; আর সে দুঃখ পেলে আমিও অন্তরে ব্যথা পাব; আপনি জান্‌বেন প্রাণ গেলেও এসব কথা প্রকাশ কর্‌বো না।"

শারদা-সুন্দরী গিরিবালার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কয়েক দিবস একত্র থাকাতে গিরিবালা সকলেরই স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। তাই আজ তাঁহার যাবার সময় যাহার যা ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে তাহাই গিরিবালাকে উপহার দিতে লাগিল। কেহ ভাল ফুলটি, কেহ ভাল ফলটি, কেহ ভাল কাপড়খানি, কেহ নথটি কেহ আংটিটি, কেহ সিন্দুর-কৌটাটি—এইরূপ কত লোকে কত সামগ্রী প্রদান করিলেন। শারদা-সুন্দরী দুই গাছি সুবর্ণ কঙ্কণ গিরিবালার দুই হস্তে পরাইয়া দিলেন। সেই মৃণাল-করে সুবর্ণ কঙ্কণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। এইরূপ সকলেই আপন আপন মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া, গিরিবালার চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া বসিলেন এবং সহচরী সম্পর্কে কত কথা আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

এদিকে সদর-মহলে মহা সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। দামোদর ঘোষালের পুত্র চণ্ডীচরণ শুভাগমন করিয়া বৈঠখানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়াছেন, দুইদিকে দুইখানা পাখা চলিতেছে, উৎকৃষ্ট খাম্বিরার সৌগন্ধে ঘর আমোদিত হইয়াছে। সরদারেরা নিম্ন পদস্থ ভৃত্যগণকে মহাধুমে হুকুম করিতেছে, কখনও বা কাহাকে অকারণ দুই একটা চপেটাঘাতও করিতেছে। সকলেই ব্যতিব্যস্ত—পাছে অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয়। মুহূর্ত্ত মধ্যে আদেশ প্রতিপালন করিতে কেহই পরাঙ্মুখ হইতেছে না। গ্রামস্থ ভদ্র সন্তানগণ অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। জমিদারী, মোকদ্দমা, দুর্ভিক্ষ, অকাল প্রভৃতি নানা বিষয়িনী কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কখন বা অতি তুচ্ছ কথায় উচ্চ হাস্য-তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। আসল কথা এখনও কিছুই উঠে নাই। একে একে সকলেই বিদায়

হইল। গৃহ মধ্যে কেবল মাত্র প্রতাপচন্দ্র, চণ্ডীচরণ ও যদুনাথ অবশিষ্ট রহিলেন।

যদুনাথ এখন প্রতাপচন্দ্রের জমিদারীর নায়েব। যদুনাথ এক জন সচ্চরিত্র ও আমোদ-প্রিয় লোক, নানাবিধ গ্রহ ফাঁড়া তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তিনি সকল অবস্থাতেই অটল, আমোদ পাইলে তিনি আর কিছুই চাহেন না। এই নিমিত্ত তিনি শীঘ্রই সকলের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। সম্প্রতি জমিদারী কাগজ পত্র বুঝাইবার জন্য তিনি দিন দশ বার হইল মহেশপুর হইতে নৈহাটি আসিয়াছেন।

প্রতাপচন্দ্র চণ্ডীচরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! নিত্য নিত্য এই প্রকার যে নানা উপদ্রব হতে আরম্ভ হলো, এর একটা বিহিত করা চাই। আপনার পিতা ঠাকুরকে আমার প্রণাম জানিয়ে বিশেষ ক'রে বল্‌বেন, যেন ত্বরায় একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত ক'রে এবং তাতে আমাদের ও অপরাপর ভদ্র সন্তানগণের স্বাক্ষর লয়ে কোম্পানী বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হয়; কোম্পানী বাহাদুর অবশ্যই এর একটা তদন্ত ক'রে সুবিবেচনাই কর্‌বেন। একে এই অকাল, দুর্ভিক্ষ, গরিব গুরবো লোক পথে ঘাটে অন্নাভাবে মারা পড়্‌চে, তার উপর আবার এই সব উপদ্রব! তবে আর মানুষ বাঁচে কেমন ক'রে? নিত্য নিত্যই ত শুনে শুনে কান ছেঁদা হয়ে গেল যে, আজ অমুক কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট হ'য়েছে, আজ অমুক ব্যক্তি গোরাদের ঘুষি খেয়ে পঞ্চত্ব পেয়েছে, আজ অমুকের ঘরে ডাকা'ত প'ড়ে সর্ব্বস্ব লুটে পুটে নিয়ে গিয়েছে, তবেইত মহাশয়! দেখুন দেখি, কেমন করে আর দেশে বাস করা যায়?"

চণ্ডীচরণ উত্তর করিলেন,—"হাঁ যা' বল্‌ছেন সকলই সত্য, তবে মহাশয় এই অরাজক দেশে দরখাস্ত কার কাছেই বা করি, আর কেই বা শোনে? এখন দেখ্‌ছি কোম্পানী বাহাদুর দেশ শাসন কচ্চেন। যদি লোক পেটের দায়ে এক মুটো চাল চুরি কল্লে, তবেই তাকে ফাঁসি দেবার চেষ্টা! মহাশয়! ভেবে দেখাও চাই যে, কেন এমন দুর্ভিক্ষ হলো? কার দোষে হলো? কেন এই বাঙ্গালা দেশে—যে দেশে বসে আমরা কথা কচ্চি—সের সা কি টাকায় আট মণ চাল চালিয়ে যান্ নি? বাঙ্গালা দেশ হলো সোণার দেশ, এ দেশের মাটি এমন উর্ব্বরা যে, যে বীজ রোপণ করুন, তাতেই সোণা ফল্‌বে। তা এখন রাজ্যটি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কার রাজ্য, কে রাজা, কিছুরই ঠিক নাই, তবে কার পাপে রাজ্যটা ছার খার হতে চল্‌লো, তা' কেমন করে বলি? শুনেছি—'রাজার পাপেই রাজ্য নষ্ট হয়।' হাজার ডাকাতি হোগ্‌না কেন, ডাকাতি আজ বলে ত নয়, এমন পূর্ব্বাপর চলেই আস্‌ছে, তাতেই কি লোকের এত দুর্গতি হ'য়েছে?"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে যদুনাথ বলিয়া উঠিলেন,—"মহাশয়! সকলই ত বুঝ্‌লেম, সতীর সতীত্ব-রক্ষা বিষয়ে ত কিছুই আজ্ঞা কর্‌লেন না।"

চণ্ডীচরণ উত্তর করিলেন,—"ওটা কি জান্‌লেন—ওটা আজ বলে নয়, ও চিরকালই আছে, ও সেই মান্ধাতার আমল থেকে চলে আস্‌ছে। বলুন দেখি, ইন্দির

কি কল্লে, চন্দর কি কল্লে, কেষ্ট কি কল্লে! তা অন্য পরে কা কথা?”

যদুনাথ বলিলেন,—“তবে কি ওটা দূষ্য বল্‌ছেন না? ও যা’ পুরাণে দেখেছেন ও সকলের এক এক মর্ম্ম আছে—”

যদুনাথের কথা শেষ না হইতেই চণ্ডীচরণ বলিয়া উঠিলেন,—“হাঁ মশাই রেখে দিন্, দেবতার বেলাই লীলে খেলা, আর যত দোষ মানুষের বেলা!—কিয়ৎক্ষণ যদুনাথের দিকে চাহিয়া চণ্ডীচরণ কিঞ্চিৎ যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—“মশাই! আপনাকে যেন চেন চেন কচ্চি যে? যেন ছেলেবেলা আপনাকে আমাদের বাড়ীতেই দেখেছি।”

যদু। মহাশয়ই কি আমার অপরিচিত?

চণ্ডী। আরে তাই ত ঠিক্ মনে আস্‌ছে না যে—

যদু। আজ্ঞে সে আজ বার বৎসরের কথা হলো, আপনি তখন ছেলে মানুষ।

চণ্ডী। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনার বিবাহ কোথায় হয়েছিল?

যদু। মশায়দের বাড়ীতেই।

চণ্ডী। মহাশয়রা?

যদু। আজ্ঞে আমরা কায়স্থ—আপনাদের দাস।

চণ্ডী। অবশ্য, তবে আমাদের বাড়ীতেই বল্‌ছেন?

যদু। আজ্ঞে ঘোষাল মহাশয়ের যে এক পালিতা কন্যা আছেন—

চণ্ডী। ওহো হো! ঠিক্ ঠিক্! আপনি তবে আমাদের যদুনাথ বাবু।

যদু। আজ্ঞে।

চণ্ডী। এত দিন ছিলেন কোথায়?

যদু। আজ্ঞে, কোথাও যাই নি, চরণ পানে চাইলেই দেখ্‌তে পাবেন, ঐ খানেই বাঁধা আছি।

চণ্ডী। না, বলি তোমার যে আর একটা কথা কি শুনেছিলেম?

যদু। তা সেটা কি মিথ্যে? এই দেখ্‌ছেন চারদিকে দেয়াল, আর আমি এর ভিতরে গাঁথা!

চণ্ডী। আবার যে কেউ কেউ বলে নিরুদ্দেশ!

যদু। ছিলাম বটে,—এখন ত আর নই।

চণ্ডী। আপনার পরিবার এখন কোথায়?

যদু। ছিলেন আপনাদের,—আপনাদেরই কাছে আছেন।

চণ্ডী। এ ক’ দিন যে এই খানেই, আপনি এখানে আছেন, কোন খবর জানেন না?

যদু। আজ্ঞে সকলই জানি, চিনব কেমন ক’রে?

চণ্ডী। তাই ত এখানে এসে যে একটা মস্ত কায হলো দেখ্‌তে পাই।

প্রতাপচন্দ্র উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং বলিলেন,—“একি! আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি না কি? এ যে আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চিনে। যদি কোন বাধা না থাকে, ভেঙ্গেই বলুন না কি হয়েছিল?

চণ্ডীচরণ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“মহাশয়! এ বড় শক্ত জমিদারী! এ বোঝা বড় কঠিন।

প্রভা। তাই ত। আমি কি আকাশ থেকে পড়্‌লেম না কি?

চণ্ডী। এক প্রকার বটে।

প্রতা। যদুনাথ কি তবে আপনাদের বাড়ীতেই বিবাহ করেন?

চণ্ডী। মহাশয়! ওঁদের স্ত্রী পুরুষের বিবরণ বল্‌তে গেলে, এক খানা ইতিহাস হয়। আমি আপনাকে সংক্ষেপে বলে যাই।

এই বলিয়া চণ্ডীচরণ সংক্ষেপে সমস্তই বর্ণন করিলেন, প্রতাপচন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া চণ্ডীচরণ প্রতাপচন্দ্রকে বলিলেন,—"মহাশয়! আর কাল বিলম্ব করিবেন না, এইবার তাঁদের পাঠিয়ে দেবার উদ্যোগ কর্ত্তে হচ্চে। প্রতাপচন্দ্র বিষণ্ণ হইলেন; কেমন করিয়া সত্য ঘটনা সকল বর্ণনা করেন, সেই চিন্তায় আকুল হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—"মহাশয়! বল্‌তে আশঙ্কা হচ্চে, আজ ভোর থেকে ঘোষাল মহাশয়ের পালিতা কন্যাটিকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। বাটীর সকলেই পাতি পাতি করে অন্বেষণ করেছে, কিন্তু কোথায় তিনি গিয়েছেন, তার নির্ণয় কর্ত্তে পারে নাই।"

চণ্ডীচরণ শুনিয়া প্রথমতঃ উপহাস জ্ঞান করিলেন এবং উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—"কি, তিনিও নিরুদ্দেশ নাকি? এ বড় মন্দ কথা নয়, নিরুদ্দেশের স্ত্রী নিরুদ্দেশ!" প্রতাপচন্দ্র কহিলেন,—"মহাশয়! কথাটি উপহাস জ্ঞান করবেন না, কাল রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁদের দু'টিকে সকলেই একত্রে শয়ন কর্ত্তে দেখেছেন, কিন্তু প্রাতে উঠে শুনলেম যে, তিনি বাটী পরিত্যাগ ক'রে গেছেন, আপনার ভগ্নীটি কাঁদ্‌ছেন, আর সকলে তাঁকে প্রবোধ দিচ্চেন।"

চণ্ডীচরণ এতক্ষণ কথাবার্ত্তা কইছিলেন মন্দ নয়, কিন্তু এই মর্ম্ম-ভেদী কথায় আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই বার তিনি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন,—"মশাই! কথাটা বড় বাঁকা বাঁকা ঠেক্‌ছে, আমি আপনাদের ভাব ভঙ্গী কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্চিনে।"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি এমন অন্যায় আজ্ঞা করবেন না, এমন কুলে আমার জন্ম নয়, যে ব্রাহ্মণের নিকট মিথ্যা কথা কয়ে জিহ্বাকে দূষিত কর্‌বো। যা' সত্য ঘটনা তাই বল্‌লাম, এখন আপনাদের যা' ভাল বিবেচনা হয় তাই করুন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"ভাল বিবেচনা আর কি কর্‌বো? আমার কথা এই,—আপনার আশ্রয়ে দুটি এসেছিলেন, দুটিকে ফিরিয়ে দিন্। আশ্রয় দিয়েছিলেন, ভালই করেছিলেন, এমন নিরাশ্রয় দেখ্‌লে মহত্তেরা আশ্রয় দিয়ে থাকেন, আপনি বলে নয়, মহৎ মাত্রেই এমন করে থাকেন। যেমন আশ্রয় দিয়ে আপনার মহত্ব প্রকাশ করেছেন,—তেমনি শেষ রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেই ভাল।"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"তাই ত আপনি যে আমাকে নিতান্ত নারকীর মত জ্ঞান কচ্চেন দেখ্‌তে পাই। আমার কথাই আপনি বিশ্বাস কচ্চেন না যখন, তখন আর আপনাকে অধিক কথা বলা বাক্যব্যয় মাত্র,—ঈশ্বর যেন আমাকে এমন মতি গতি না দেন।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"কথায় সাধুতা প্রকাশ অনেকেই করে থাকেন, কাযে সেরূপ হলে বুঝতে পারি। ভাল, আর বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, আপনার যা' মনে আছে তাই করুন, কিন্তু তাঁকে রাখা আপনার পক্ষে কঠিন হবে জান্‌বেন।"

এইরূপ অসঙ্গত বাক্য শ্রবণে প্রতাপচন্দ্র

ঘৃণা ও অভিমান-ভরে যদুনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেমন যদুনাথ! পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলেছিলেম্ এ আমার খাল কেটে লোণা জল আনা হলো, এমন হবে পূর্ব্বে কে জান্ত?"

এইরূপ বিষয়ে যদুনাথের কোন বাঙ্-নিষ্পত্তি করা অসঙ্গত বোধ হইলেও তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি চণ্ডীচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! অনর্থক বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়,—লোক সমভিব্যাহারে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই চণ্ডীচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"আরে তুমি ত ও কথা বল্বেই হে, আজ বার বৎসরের পর যুবতী মাগ্ পেয়েছ কোলে,—আর কি ছাড়্তে পার? ভাল এতদিন যার নুণ খেলে, তার মুখপানে একবার চাইতে নাই? বিয়ে দিয়েছিল কে তোমার? 'তাকে খুঁজে পাওয়া গেলে,—'তাকে কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? এ জন্মে ত নয়!"

যদুনাথ উত্তর করিলেন,—"সত্য আমি বালককাল থেকে আপনাদের অন্নে প্রতিপালিত, আপনারাই আমার বিবাহ দেন; কিন্তু নিবেদন করি, আপনি এমন অন্যায় আজ্ঞা কর্বেন না; আপনি বল্ছেন, আমি তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছি,—কিন্তু আমি তাঁকে চক্ষেও দেখি নাই।"

চণ্ডীচরণ সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন,—"হাঁ চক্ষে দেখনা বটে, কিন্তু বক্ষে রেখেছ। আমি আর এক দণ্ড ও এখানে থাক্তে চাই না, এ দিক্কার উদ্যোগ করে দাও—"

এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, এমন সময় একজন পরিচারিকা শিবিকা-বাহকদিগকে শিবিকা লইয়া আসিতে বলিল। তাহারা শিবিকা অন্তঃপুরের নিকট লইয়া গেলে, রোরুদ্যমানা গিরিবালা এক পরিচারিকার হস্ত ধারণ করিয়া আসিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। তিনি মনকে অশেষ বিধানে প্রবোধ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিয়োগ-যন্ত্রণা এতদূর বলবতী হইয়াছিল যে, তাঁহার ক্রন্দনের স্বর সকলেই শুনিতে পাইতে লাগিল। শিবিকা বাহকেরা শিবিকা উত্তোলন করিয়া গমনোদ্যত হইল। চণ্ডীচরণ ও ভৃত্যরা উঠিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীচরণ গিরিবালার ক্রন্দন শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"চলো, আর কাঁদ্তে হবে না, কেঁদে ত সকলি কর্বে তুমি? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, এরা তোমার সে পাত্র নয়, যে কাঁদ্লে ছেড়ে দেবে!"

যদুনাথের অসহ্য হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কেন আর ওঁকে তিরস্কার করেন, সকলের সম্মুখে ওঁর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করা উচিত হয় না।"

চণ্ডীচরণ আরও কুপিত হইয়া যদুনাথকে বলিলেন,—"আরে রাখ রাখ, আর তোমার অত ফফল দালালি কর্ত্তে হবে না, তুমি ত তোমার মাগ্ পেয়েছ তা' হলেই হলো, কি অন্যায় দেখ দেখি, বার বৎসর কোন খোঁজ খবর ছিল না, যাই হাতে পেয়েছেন আর অমনি—'পথে পেলুম কামার, দা গ'ড়ে দে আমার।' বলি বাপু! এতদিন কি ভাত কাপড় দিয়ে পুষে ছিলে যে, এত জোর দাবী

দাওয়া কর? যার হোথা থেকে এল তার কাছে আগে ফিরিয়ে দে, তার পর তোর জিনিষ তোরই আছে—তা নয়!"

গিরিবালা শিবিকার ভিতর হইতে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন; তাঁহার ইচ্ছা হইল—সহচরীর স্বামী কিরূপ দেখিব। সভয়ে ও সতর্কে শিবিকার পরদা এক যব পরিমাণ সরাইয়া যদুনাথকে চিনিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"এতদিনে সহচরীর দুঃখ ঘুচিল। সহচরীর এমন রূপবান্ স্বামী সত্বে সহচরী বিধবা! কি পরিতাপ! কি বিধি-বিড়ম্বনা!"

গিরিবালা চক্ষের জল মুছিলেন, মনকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া মনে মনে সহচরীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"সহচরী তুমি যেখানেই থাক, স্বামী-সোহাগিনী হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কন্না কর—"

শিবিকা চলিল, গিরিবালা আবার রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপচন্দ্র মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, যদুনাথ ও তথৈবচ। চণ্ডীচরণ ছেদী ও অন্যান্য ভৃত্যগণ শিবিকা সমভিব্যাহারে চলিল। চণ্ডীচরণ প্রতাপচন্দ্রকে একটি কথাও বলিলেন না, প্রতাপচন্দ্র ও কেবল মাত্র প্রণাম করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

শিবিকা সিংহদ্বার পার হইল, পুরবাসিনীরা ছাদের উপর উঠিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন,—ব্রাহ্মণ-কন্যা রোদন করিতে করিতে বাটীর বাহির হইলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণ-পুত্রও রোষ ও অভিমান-ভরে বাটী ত্যাগ করিলেন,—এ প্রকার অমঙ্গলসূচক চিহ্ন সকল অবলোকন করিয়াও তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা উপস্থিত হইল না। সতীর সতীত্ব রক্ষা-রূপ গুরুতর চিন্তা তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং তিনি এই সকল অলক্ষণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া রহিলেন। 'প্রাণ দিয়াও শরণাপন্নকে আশ্রয় দিব,—' প্রতাপচন্দ্র অনেক দিবসাবধিই এই ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। স্বভাব-সিদ্ধ গাম্ভীর্য্য পুনরায় তাঁহার মুখ-মণ্ডলে প্রকাশ পাইল, তিনি যদুনাথকে ইঙ্গিত করিলেন, যদুনাথ তাঁহার নিকট সরিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"যদুনাথ! এখনও সমস্ত জান্‌তে পার্‌লে?" যদুনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ।" প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"তবে আজই মহেশপুর যাত্রা কর। গত সালের খাজনা পত্রের বিলি ব্যবস্থা করে, পুনরায় এখানে আস্‌বে; —কি বল?" যদুনাথ দুই একবার মাথা চুল্‌কাইয়া সম্মত হইলেন। প্রতাপচন্দ্র পুনরায় বলিলেন,—"তোমাকে বোধ হয় বলে দিতে হবে না—বাটীর ভিতর যেন এ সমস্ত কথা প্রকাশ না পায়। যদুনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে না।" প্রতাপচন্দ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, যদুনাথও অভীপ্সিত স্থানে গমন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

পাপের প্রতিফল।

পাঠক মহাশয়! সহচরীর কথা আমরা অনেকক্ষণ বলি নাই, তাঁকে ত সেই মাতঙ্গিনী ব্রাহ্মণীর মৃত্তিকার দাওয়ায় বসাইয়া

রাখিয়া আসিয়াছি। তিনি সেখানে কি করিতেছেন, একবার দেখা আবশ্যক।

মাতঙ্গিনী অনেক গৃহস্থের বাটী পরিভ্রমণ করিয়া, অনেক কষ্টে কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি আহরণ করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া হাঁড়ি চড়াইলেন। এক পাকে দুই জনেরই অন্ন প্রস্তুত হইল। দুই জনে আহার করিলেন এবং গৃহ-কার্য্য সমাধা করিয়া শয়ন করিলেন। যখন বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, উভয়ে নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া, নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তায় বেলা ক্রমে অবসান হইয়া আসিল। গ্রীষ্ম-কালের বেলা, যায়, যায়; যায় না। ব্রাহ্মণী সহসা সহকার-মস্তকে সুবর্ণাভ রবি কিরণ সন্দর্শন করিয়া সহচরীকে কহিলেন,—"দেখ মা! আর বেলা নাই, আমি এই গঙ্গা থেকে এক কলসী জল আনি, তুমি একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখ; আমার একটু বিলম্ব হবে ফির্‌তে,—তার পর আমি এসেই তোমায় রেখে আস্‌ব, কেমন মা?" সহচরী সুতরাং সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণী কলসী কাঁকে লইয়া বাহির হইলেন।

সহচরী ভাবিতে বসিলেন। সহচরী ভাবিতেছেন, আর এক এক বার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতেছেন, এমন সময় কুটীরের বাহিরে গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। সহচরী ভাবিলেন, কোন ভিখারী হইবে, ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। দাওয়া হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, এক জন বৈরাগী আসিতেছে। বৈরাগী গৌরকান্তি, স্থূলকায়, মস্তকে নামাবলী জড়ান, সর্ব্বাঙ্গে ছাপা, নাকে তিলক, হাতে একতারা,—স্কন্ধে ঝুলী। বৈরাগীর কণ্ঠ-স্বর অতি মিষ্ট, পূরবী রাগিণীতে একতারা বাজাইয়া গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে,—

ঘুচাও ঘোম্‌টা রাধে! থেকোনা লো মান-ভরে;
পড়িয়ে চরণ-চাঁদে কাঁদে নব জলধরে।

কি তব কঠিন প্রাণো?
কি তব দুর্জ্জয় মানো?
এত কেন অপমানো, নাগর কানাই নটবরে?

নিরখি তোমার মানো,
সকলে আকুল প্রাণো;
কোকিল পঞ্চম গানো গাহেনা তমাল-ভরে।

কেন ভাস আঁখি-জলে?
চাহ গো বদন তুলে;—
পঙ্কজ-নয়ন মেলে, হের নিজ প্রাণেশ্বরে।

পুরুষ—পরশ-মণি,
জেনে কি জান না ধনি?
এমন পুরুষ-মণি, আছে কি এ চরাচরে?

বৈরাগী গীত গাহিতে গাহিতে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, সহচরী যতই হাত নাড়িয়া অনুচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ঠাকুর, এখন ফিরে দেখ, ভিক্ষা পাবে না"—সে কথায় একেবারে বধির হইয়া সে ততই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ক্রমে ব্রাহ্মণীর দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুই খানি ঘর নাই যে, সহচরী অন্য ঘরে পলায়ন করিবেন; সুতরাং অবগুণ্ঠন টানিয়া, সেই ঘরের চৌকাট চাপিয়া বসিলেন। সহচরী আটাশে মেয়ে নন যে, ভয়ে অজ্ঞান হইবেন। বৈরাগী গীত সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষা চাহিল। সহচরী কহিলেন,—"চাল বাড়ান্ত।"

বৈরাগী দেখিল, বেশি কথা কহিতে গেলে দেরি হইবে, ব্রাহ্মণী আসিয়া পড়িবে; একেবারে কাযের কথা কহাই ভাল, এই ভাবিয়া কহিল,—"সুন্দরি! আমি চাল ডালের ভিখারী নই।"

চতুরা সহচরী বৈরাগীকে প্রথম দেখিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে, এমন দুর্ভিক্ষের সময়—যখন গরিব গুরব লোক গাছের পাতা খেয়ে, মাটি খেয়ে, জল খেয়ে, কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতেছে—এমন সময়ে, ভিখারীর এমন নধর শরীর, ভিখারীর মুখে আবার গান! কোথায় পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া বেড়াইবে, না মনের আনন্দে গান! ত'াও কি কখন হ'য়ে থাকে? অবশ্যই কোন ছদ্মবেশী ভদ্রলোক হইবে। এক্ষণে বৈরাগী নিকটে আসাতে, সহচরী তাহাকে একটু একটু চিনিতে পারিলেন, মনে করিয়া দেখিলেন, যেন প্রতাপ বাবুর বাটীতে ইহাকে কখন কখন—কখন কখন কেন—প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাগীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে আপনি কি চান?"

বৈরা। আমি যা' চাই, তা' তোমারই হাতে।

সহ। আমি সবে আজ এসেছি,—আমার এখানে কোন হাত নাই।

বৈরা। আজই এস, আর কালই এস, আর দু'দিন পরেই এস,—তোমারই হাতে সব।

সহ। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

বৈরা। এমন চতুরা যে, সে এই শাদা কথা বুঝ্‌তে পারে না!

সহ। ঠাকুর! আমরা অবলা বৈ ত নয়, আমরা কি আপনার কথা বুঝে উঠ্‌তে পারি?

বৈরা। আমরা প্রেমের বৈরাগী—প্রেম চাই।

সহ। গুরুজনের মুখে শুনেছি 'প্রেম' বড় উচ্চ কথা।

বৈরা। উচ্চ বৈ কি, সুন্দরি!

সহ। তবে আপনি বল্‌ছেন,—'আমার হাতে?' আপনি যে পথের পথিক, সেই পথ ধ'রে থাক্‌লে অবশ্যই পাবেন।

বৈরা। সুন্দরি! সেই পথ ধ'রেই ত এত দূর এসেছি।

সহ। আপনি পথ ভুলেছেন।

বৈরা। ভুলি নাই—ঠিক্ এসেছি।

সহ। এখানে সে সব কিছু নাই; আপনি এখন আসুন।

বৈরা। ভিক্ষা না পেলে যাই না।

সহ। তবে আপনি কি ভিক্ষা চান?

বৈরা। স'রে এস, কাণে কাণে বলি।

সহ। সে হ'তে পারে না।

বৈরা। আচ্ছা, আমিই স'রে যাচ্চি।

এই কথা বলিয়া বৈরাগী সহচরীর কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে, সহচরী দেখিলেন বড়ই বেগতিক। এখন যদি ইহাকে কোন কটু কথা বলি, তবে আমারই পক্ষে খারাপি। প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সাহায্যে তিনি তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, ঠাকুর! স্থির হন, আমি আপনার কথা এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। তা আপনি যদি আমার একটি সামান্য প্রার্থনা পরিপূর্ণ করেন, তা হলে আপনার সকল কথাই রক্ষা হবে। বৈরাগী

ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ?"

ব্রাহ্মণীর দাওয়ার সম্মুখে একটি উচ্চ চম্পক-বৃক্ষ ছিল। তাহাতে অসংখ্য বৈশাখী চম্পক প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সহচরী কাল বিলম্ব করিবার জন্য বৈরাগীকে বলিলেন,—"ঠাকুর! আপনি যদি এই চাঁপা-গাছে উঠে আমাকে গুটি চার পাঁচ চাঁপা ফুল পেড়ে দেন, তা'হলে আমার বড় উপকার হয়।"

কামান্ধ বৈরাগী সহচরীর কথায় হাস্য করিয়া বলিল,—"বলি এও কি আবার একটা কথা ? তুমি খোঁপায় পর্‌বে, আর আমি চাঁপা পাড়্‌তে পার্‌ব না! কত ফুল চাই বল না ?"

সহচরী কহিলেন,—"বড় ঢের নয়, গোটা চার পাঁচ। পরের গাছ, ঢের কি নিতে পারি ?"

বৈরাগী বলিল,—"তার পরেই পিঠ্‌টান্! কেমন ?"

সহচরী বলিলেন,—"তার আর সন্দেহ কি ?"

বৈরাগী মালকোঁচা মারিয়া চম্পক-বৃক্ষে উঠিতে লাগিল। কাণ্ডদেশ অতিক্রম করিয়া যেমন স্কন্ধদেশে পদার্পণ করিল, অমনি কাষ্ঠ-পিপীলিকাগণের তীব্র দংশনে জর্জ্জরী-ভূত হইয়া, হস্ত দ্বারা উহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিল। পিপীলিকাগণ নিতান্ত অনিবার্য্য হইল। বৈরাগী জ্বালায় অস্থির হইয়া দুই হাত দিয়া যেমন তাহাদিগকে নিবারণ করিতে যাইবে, অমনি বৃক্ষ-স্কন্ধ হইতে পদস্খলন হইয়া, দশবার হাত নিম্নস্থিত বন্ধুর ভূমি-খণ্ডের উপর পতিত হইল। একে বৈরাগীর শরীর খানি ভারি, তাহাতে আবার অত উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বড়ই বিষম আঘাত লাগিল। একখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল। সুতরাং উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সহচরী দেখিলেন, মহা বিপদ্। বারি-পরিপূর্ণ কলসী কক্ষে ব্রাহ্মণী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই দেখিলেন, সম্মুখে মহা অনর্থপাত। কিছু বুঝিতে না পারিয়া বৈরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন বাপু! কি হয়েছে তোমার ? গাছে উঠ্‌তে গিয়ে প'ড়ে গিয়েছ নাকি ? দেখ্‌ছ বাপু! যার গাছ সে বাড়ীতে নেই, এমন কায কেন কর্ত্তে গিয়েছিলে ?" এই রূপ নাতি-শীতোষ্ণ তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন লেগেছে কোথায় বল ?" বৈরাগী ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল,—"এই পায়ে।"

ব্রাহ্মণীর দয়া হইল, কক্ষস্থিত কলসী হইতে জল ঢালিতে লাগিলেন। জল ঢালিলে কি আর ভাঙা পা যোড়া যাইবে ? ব্রাহ্মণী বলিলেন, "একটু স্থির হও বাপু! আমি তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবার যোগাড় কচ্চি।" এই বলিয়া গৃহ মধ্যে কলসী রাখিয়া সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সহচরী ব্রাহ্মণীর কাণে কাণে সমস্তই বলিলেন। তিনি শুনিয়া অবাক্ হইলেন এবং সহচরীকে বলিলেন,—"দেখ মা! তুমি দরজায় তাড়া বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতর থাক, আমি বাবুর বাড়ী খবর দি,—তিনি এসে যা'হয় এর বিহিত করুন, এত বড় আস্পর্দ্ধা! জানে না—এখনি কাটক হয়ে যাবে।"

ব্রাহ্মণী অতি দ্রুত পদে গমন করিয়া, প্রতাপচন্দ্রকে খবর দিলেন। প্রতাপচন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, একখানি ডুলি ও লোক

জন সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণীর বাটীতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তখন গোধূলি উপস্থিত। প্রতাপচন্দ্র বৈরাগীর সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি?" বৈরাগী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আপনি চিন্‌বেন না।"

প্রতা। ভাল, তুমি পরের বাড়ী এসে ফুল পাড়্‌তে গিয়েছিলে কেন?

বৈরা। আমি কিছু জানি না, ঐ ঘরের ভিতরে যে ছুঁড়ী কপাট বন্ধ ক'রে লুকিয়েছে, ঐ ছুঁড়ী আমায় ফুল পাড়্‌তে বল্লে।

প্রতা। ভাল, তিনি কেন তোমায় ফুল পাড়্‌তে বল্‌লেন?

বৈরা। কেন আর বুঝ্‌তে পাচ্ছেন্ না? আমি গাছ থেকে পড়ে যাব, আর ও শালী খিল্‌খিল্ ক'রে হাস্‌বে,—এই আর কি?

প্রতা। তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

বৈরা। কি কর্‌ব?

এই সকল কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সহচরী আর থাকিতে না পারিয়া দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া, অবগুণ্ঠন মধ্য হইতে অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"আত্মরক্ষার জন্য ফুল পাড়্‌তে বলে ছিলেম।"

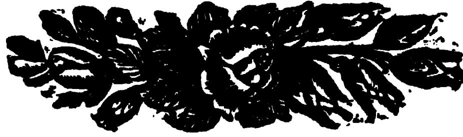
প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"মা! সে আর আপনি আমায় বল্‌বেন, তবে বুঝ্‌ব? যা' হ'য়েছে—সকলি বোঝা গিয়াছে। এখন সন্ধ্যা হয় আপনি বাড়ী চলুন্। আমি ওকে এই ডুলিতে চাপিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দি। ভৃত্যদিগকে বলিলেন,—"ওরে! ওর মাথার নামাবলী খান খুলে দে। ভৃত্যরা নামাবলী ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। বৈরাগী বলিল,—"না বাবা! ও থাক্, ও খুলোনা।" ভৃত্যেরা নিরস্ত হইলে, প্রতাপচন্দ্র তাহাদের উপর রাগ করিয়া বলিলেন,—"আরে তোরা কার কথা শুনিস্?" ভৃত্যেরা টানাটানি করাতে নামাবলী খুলিয়া গেল। প্রতাপচন্দ্র দেখিলেন, বৈরাগী নয়,—শ্রীযুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অতিশয় ঘৃণা ও ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"তোমার এই কায! ওঃ কি জঘন্য লোক তুমি! তোমার এ স্বভাব ত আমি ছাড়া'তে পাল্লেম না—আজ অবধি তুমি আর আমার বন্ধু নও; আর আমি তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই না। তুমি আর আমার বাড়ী মাথা গলাও ত টের পাবে। ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমার এই কায?"

এইরূপ নানা প্রকার ভৎর্সনা করিয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,—"ওকে ডুলিতে চাপিয়ে সঙ্গে ক'রে বাড়ী রেখে আয়।" ভৃত্যেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া, অরুণচন্দ্রকে ডুলিতে চাপাইল। অরুণচন্দ্র যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। লজ্জায় আর মুখে কথা সরিল না। বস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রহিল, প্রতাপচন্দ্র সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ডুলি বাহকেরা অরুণচন্দ্রকে লইয়া তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিতে গেল। ব্রাহ্মণী দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইষ্টদেবতার নাম করিতে লাগিলেন।

অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, প্রতাপচন্দ্র বুঝি আবার অরুণ বাবুকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; কেন না তিনি অরুণচন্দ্রের এই স্বভাব ছাড়াইবার জন্য, পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে পারেন নাই। সুতরাং "ত্যাজ্যোদুষ্ট প্রিয়োপ্যাসীৎ অঙ্গুলীবোরগক্ষতা,"—এই ভাবিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি কি করিবেন, জগদীশ্বর পাপীকে এই-রূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন।

ক্রমশঃ।



শশী।

ভালবাসি, তোমায় শশি!
বড়ই ভালবাসি,
তোমায় বড়ই ভালবাসি;
দেখ্‌তে তোমার শোভা-রাশি,
প্রতি নিশি হেথা আসি;
তোমার কিরণ-তলে বসি,
হেরি তোমার হাসি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

দেখ্‌লে শশি! তোমার পানে,
কত কথা পড়ে মনে—
গাই কত গান্‌ আপন প্রাণে,
কতই সুখে ভাসি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

মেঘ গুলি সব ভেসে ভেসে,
বেড়ায় তোমার কাছে ঘেঁসে;—
যখন তুমি তাদের পাশে
লুকাও হাসি হাসি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

আবার যখন কুতূহলে,
লুকোচুরি খানিক্‌ খেলে;
বেরিয়ে পড় মেঘের কোলে,
উজল্‌ করে দিশি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

দিনের্‌ বেলা কুমুদিনী,—
ছিল হ'য়ে বিরহিনী;
হাসি হাসি বদন খানি,
হেরে তোমায়, শশি!
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

তাইতে তুমি সরোবরে,
নিত্য এস ফিরে ঘুরে;
ভাস্‌তে থাক আমোদ-ভরে,
কুমুদ্‌-অভিলাষি!
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

কোমল কৌমুদী-রাশি,
নদীর হিল্লোলে পশি,
ধীরে ধীরে যায় ভাসি,
হীরায় হেমে মিশি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

রাত্‌ দুপুরে তোমার করে,
দিনের বেলা মনে ক'রে,
কোয়েলা বঁধূ ঘুমের্‌ ঘোরে,
কুহরে উল্লাসি;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

উঠ্‌লে তুমি গগন-তলে,
শিশুগণে দলে দলে,

বিম্ব হেরি বিমল জলে,
কাঁপায় তীরে বসি ;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

মাতা শিশু ল'য়ে কোলে,
তোমার পানে দেখিয়ে বলে,—
"আয় রে চাঁদ্! চাঁদ্-কপালে
টিপ্ দিয়ে যা' আসি ;"
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

ভালবাসি তোমায়, শশি!
তোমার মোহন কিরণ-রাশি,
হেরে তোমার মধুর হাসি—
হাস্য-মুখী নিশি ;
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

সদাই আমার হয় মানসে,—
"চির জগৎ এম্নি হাসে ;
নিতি নিতি এম্নি আসে,
পূর্ণিমার নিশি ;"
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

কিন্তু দেখ, সুদিন, কুদিন—
সকলেরি আছে দু' দিন ;
অমানিশি আস্‌বে যে দিন,
থাক্‌বে কোথা ? শশি!
তোমায় বড়ই ভালবাসি।

(তখন) থাক্‌বে কোথা কিরণ-রাশি ?
মেঘের আড়ে মধুর হাসি ?
তখন নিশি—ঘোর্ তামসী,
ঢাক্‌বে তোমায় আসি ;—
ওহে! ঢাক্‌বে তোমায় আসি।
ভালবাসি, তোমায় শশি!
বড়ই ভালবাসি।

শ্রীকালিদাস মিত্র।



ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

OR,

ATHEISM CHALLENGED.

"What am I ? and from whence ? I nothing know
But that I am ; and since I am,
Conclude something eternal : had there e'r been nought,
Nought still had been : eternal there must be ."

Young .

পরমপিতা বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময় আদেশ প্রতিপালন করিতে হইলে, জগতে পরস্পর প্রণয়ের সহিত বসবাস করিতে হইলে, মনুষ্য-সমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য যে, যখন তিনি ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন সত্যানু-

সন্ধানে প্রবৃত্ত বা যত্নবান্ হন, তখন তিনি সরলান্তঃকরণে তাঁহার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণকেও উহার অংশী দার করেন। সেই জন্যই আজ আমরা সুধীগণকে সরল প্রাণে আলিঙ্গন করিয়া, "ঈশ্বরের অস্তিত্ব" এই বিষয়ে দুই চারিটি কথার আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

আমাদের দেশে অনেকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেই মহাত্মাগণের জন্যই যে, এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই হৃদয়াঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন; নচেৎ, এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে, সভ্য-সমাজে 'মূঢ়' বা 'বাতুল' বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

মেদিনী-মণ্ডলে মনুষ্যমাত্রেই হিতাহিত জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া, পরকাল মানিয়া,স্বকার্য্য-সাধন করা যে, একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয়, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার নরাকার পশু নাস্তিক ব্যতীত, কেহই অস্বীকার করিবে না। ধর্ম্ম-হীন মনুষ্য জগতে কখনই সুখানুভব করিতে পারে না। সে সকল রকম অধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া—পরের অনিষ্ট করিয়া—পরের কুৎসা গাহিয়া—পরের পীড়ন করিয়া—পর ধন আত্মসাৎ করিয়া, যদিও আপনাকে কখন কখন সুখী মনে করে বটে,—কিন্তু পরিণামে তাহার কষ্ট ও দুঃখ স্মরণ করিলে, পাষাণ হৃদয়ও করুণা-রসে আর্দ্র হয়। কত শত নাস্তিক যে, মৃত্যুকালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুস্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহাদিগের প্রতিবেশিগণকে তাহাদিগের মত কুস্বভাব-সম্পন্ন হইতে শিক্ষা দেয়; কেননা, তাহা হইলে, তাহাদিগের প্রতি কেহ আর দোষারোপ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি মারামারি করিতে ভালবাসে, সে সকলকেই মারামারি করিতে পরামর্শ দেয়। চৌর্য্য যাহার অবলম্বন, তাহার ইচ্ছা যে, সকলেই তাহার মত চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করে। বলা বাহুল্য যে, নাস্তিকেরা তাহাদিগের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণকে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া, (যদিও তাহারা অনেক সময় কৃতকার্য্য হয় না বটে) তাহাদিগের মতি গতি ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু সেই উপদিষ্ট মূঢ় ব্যক্তিগণ স্থিরচিত্তে নির্জ্জনে বসিয়া, যদি একবার এই বিশ্ব-সংসারের বিচিত্র গতি ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে, তাহারা কখনই নাস্তিকদিগের মতাবলম্বী হইতে পারে না। মূঢ় বা অল্পবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই নাস্তিক হইয়া থাকে। বাক্য বা রচনা-কৌশলে "ঈশ্বর নাই,"—এ কথা যে বন্ধু শিখাইতে চেষ্টা পান,তাঁহাকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ, তাহার মতাবলম্বী হইলে, যাবজ্জীবন অসুখী এবং পরিণামে নিরয়গামী হইতে হইবে। এরূপ বন্ধুর বাক্য, শ্রবণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু পরিণামে যে, বিষের জ্বালায় জ্বলিতে হইবে,—এ কথায় যেন কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ না থাকে।

অনন্ত সুনীল নভোমণ্ডল—পীত লোহিত হরিত ধূমল পয়োদ-মালা— প্রভঞ্জনের অহর্নিশ অধিষ্ঠান—গগন-ভেদী সাগর-গর্জ্জন—

বজ্র এবং বিদ্যুতের বীভৎসালোক—নভো-স্পর্শী সুবৃহৎ পর্ব্বত-শ্রেণী—বেগবতী প্রবাহিনী-কুল—নদী-বক্ষে প্রবল তুফান—বৈশাখের ঝড়—হেমন্তের শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র-শোভা—পূর্ণিমার শশধর-জ্যোতিঃ—দিনমানে জগত-লোচন রবি-কিরণ—নিয়মিত সময়ে ঋতুগণের প্রত্যাবর্ত্তন—নভোমণ্ডলে তারকাগণের স্থিতি—বসন্তের সুন্দর মনোহর কুসুম-নিচয়—অসংখ্য তরু লতা এবং জীবজন্তু কীট পতঙ্গগণ,মানবের মনে কি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে না? রাজা বিনা রাজ্যের শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না; কর্ত্তা কিম্বা গৃহিনী ভিন্ন সংসার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না;—কিন্তু, 'বিশ্বপতি বিনা এ অসীম বিশ্ব-সংসার শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে,'—এ কথা মূঢ় নাস্তিক ভিন্ন আর কে বলিবে? জগৎ-পিতা জগদীশ্বরের এই সৃষ্টির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সকলকেই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় এবং সেই মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার প্রতি সুদৃঢ় ভক্তি ও প্রেম জন্মে। আমাদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখ, আমরা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহি? কে আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে বসিয়া বুদ্ধি-শক্তি প্রদান করিতেছেন? কোথা হইতে আমরা এই বিশ্ব-ধামে আসিয়াছি? আবার কিছুদিন পরে, কোথাই বা চলিয়া যাইব?—এই সকল বিষয় মনোমধ্যে আন্দোলন করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

নাস্তিক কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে না? নাস্তিকের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য জগদীশ্বর কি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন? আসিয়া দাঁড়াইয়া পরিচয় দিলেই কি নাস্তিক তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে? মূঢ় নাস্তিকের বিশ্বাসের জন্য, তবে কি জগদীশ্বর পর্ব্বত সকল বা সাগরকে স্থানান্তর করাইয়া দেখাইবেন? দেখাইলেই বা সে বিশ্বাস করিবে কেন? 'যাদু' বা 'ভেল্কী' বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। সুবিখ্যাত সুলেখক মহামতি বেকন এক স্থানে এই ভাবে লিখিয়াছেন,—"যে পরমেশ্বর নাস্তিকের বিশ্বাসের জন্য কিছুই আশ্চর্য্য প্রদর্শন করেন নাই; যে হেতু, তাঁহার প্রত্যেক সামান্য কার্য্যও তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

জগদীশ্বরের এই সৃষ্টি-শৃঙ্খলার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার না করা, বড়ই অকৃতজ্ঞের কর্ম্ম এবং ঘোর মূর্খতার পরিচায়ক। বলদ কৃষককে জানে—গর্দ্দভ তাহার মনিবকে জানে—শিশু তাহার জননীকে জানে—কিন্তু, অন্ধ অকৃতজ্ঞ নরকের কীটাপেক্ষা নীচ নাস্তিক তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তাকে জানে না, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে? 'চক্ষে না দেখিলে কিছুই বিশ্বাস করিব না,'—এ কথা মূর্খতার চরম সীমা। আমরা সেই সুবিজ্ঞ তার্কিককে জিজ্ঞাসা করি যে, তবে তিনি কেন তাঁহার পিতা ও গর্ভধারিণীকে জনক জননী সম্বোধন করিয়া থাকেন? যে হেতু, তিনি লোক-মুখে শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার পিতা মাতা। দূরে ধূম-রাশি অবলোকন করিলে, তবে ত তিনি বিশ্বাস করিবেন না যে, সেই স্থানে অগ্নি লাগা প্রযুক্ত ঐরূপ হইয়াছে? কারণ, তখন চক্ষে ত তিনি সেই

স্থান দেখিতে পাইতেছেন না। আসিয়ায় বসিয়া আমেরিকা হইতে তাঁহার বন্ধুর পত্র পাইয়া, তবে ত বিশ্বাস তিনি করিবেন না যে, তাঁহার বন্ধু জীবিত আছেন? যে হেতু. তিনি তাঁহার নয়নগোচর নহেন। দূর-দেশ-বাসী বন্ধুর হস্তাক্ষর দেখিয়া যদি তিনি তাঁহার বন্ধুর অস্তিত্বের বিষয় স্বীকার করেন, তবে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর—তাঁহার এই অসীম সৃষ্টি—দেখিয়া, কেন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবেন না?

নাস্তিকের মস্তিষ্ক হয় ত এমন ভ্রমময় কল্পনায় পরিপূর্ণ যে, পঞ্চভূত দ্বারায় আপনিই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—নর নারী, জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, নদ নদী, পাহাড় প্রভৃতি যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহাই অনন্তকাল হইতে পঞ্চভূত-যোগে সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং, আর উৎপাদনের কোন বিশৃঙ্খলা নাই; অর্থাৎ, স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমে সন্তানাদি জন্মিতেছে। সেইরূপ জীব জন্তু ও কীট পতঙ্গাদির জন্ম হইতেছে; বীজ ভূমে পতিত হইয়া, বৃক্ষ লতাদির উৎপাদন হইতেছে, ইত্যাদি।

এস্থলে আর একটি কথা বলিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইল। পদার্থ নির্জীব—কখনই সজীবের মত কার্য্যকারী হইতে পারে না। নাস্তিকের কথা মানিলাম যে, পদার্থ-যোগে অনেক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেও পারে;—কিন্তু, পদার্থ-যোগে জীবাত্মা-পরমাত্মা-সংযুক্ত হিতাহিত-জ্ঞান-বিশিষ্ট মনুষ্যের সৃষ্টি হইতে পারে, এ কথা আমরা কোন ক্রমেই স্বীকার করিতে পারিব না। সৃষ্ট বস্তু সমূহের আবশ্যকতার বিষয় যদ্যপি আমরা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখি, তখনই আমাদের হৃদয়ে উদিত হইবে যে, সর্ব্বশক্তিমান কল্যাণময় জগদীশ্বর জীবগণের সুখ সচ্ছন্দতার জন্যই ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, একটি বাটী (তাহার বৈঠক-খানা, শয়ন-গৃহ, রন্ধন-শালা প্রভৃতি) দেখিলে আমাদিগের মনে হয় যে, কোন ব্যক্তি ইহা আপনার সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন বা করাইয়াছেন; সেইরূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদিগের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। নাস্তিকের মতে পদার্থ-যোগে যদি জগতের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে, ইহাতে এত সুশৃঙ্খলা থাকিত না—এত ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও থাকিত না। তাহা হইলে, দিনমানে সূর্য্য উদিত হইয়া জগতকে আলোকিত করিতেন না এবং নিশাভাগে চন্দ্রও উদিত হইতেন না। অতএব, এখানে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন করুণা-সিন্ধু মঙ্গলময় জগদীশ্বর ভিন্ন, কাহারও দ্বারায় এমন শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইতে পারে না।

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মা ও হিতাহিত-জ্ঞান-বিশিষ্ট বলিয়াই, মনুষ্য-জাতি পশুজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। সেই জন্য শত সহস্রগুণে বলী কেশরী, কুঞ্জর, শার্দ্দূল, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতি পশুগণ মনুষ্যগণের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে। আমি "আত্মা-বিশিষ্ট নহি," এ কথা যিনি বলেন, "তাঁহার মহত্ব নাই," প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হয়। আত্মা

আমাদিগের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন। যদিও আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া দেহাভ্যন্তরে আমরা ইহার অবস্থিতির বিষয় অবগত হই। সেইরূপ, যদিও আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না বটে—কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি এবং কার্য্য দেখিয়া, তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে আর আমাদের অণুমাত্র সংশয় থাকে না।

নাস্তিকের এই উক্তিগুলি যে, "আমি কিছুই নহি,কোনও স্থান হইতে আসি নাই—এবং আমাতে কিছুরই দায়িত্ব নাই," শ্রবণ করিলে, বুধমাত্রেই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যে বিষয়গুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সে বিষয়গুলির প্রমাণ-প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করার কোন আবশ্যকতা দেখি না। তবে, একটি মাত্র কথা বলিতে চাই যে, যে ব্যক্তি সকালে এক বিষয় বিশ্বাস করেন এবং সন্ধ্যাকালে সেই বিষয় আর বিশ্বাস করেন না, সে ব্যক্তি বাতুলাশ্রমের যোগ্য কিনা, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার ভার, সুবিজ্ঞ পাঠকপুঞ্জের উপরেই নিয়োজিত করিলাম। নাস্তিক যখন বলে যে,—"যাহা চক্ষে দেখি নাই, তাহা বিশ্বাস করিব না"—যে জন্য সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না—ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে আপনার অস্তিত্ব ও স্বীকার করিতেছে না।

নাস্তিক যেরূপ অনুসন্ধান-পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে, সে যেরূপ নির্ভীকচিত্তে চিন্তা রাক্ষসীর পশ্চাদনুবর্ত্তী হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাহার ক্রিয়া উন্মাদ-মস্তিষ্ক-প্রসূত ফল বিশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। যে যে প্রকারের লোক, তাহার সেইরূপ থাকাই উচিত। মনুষ্য মনুষ্যেরই মত চিন্তাশীল ও কার্য্যকারী হইবে। কমঠ হইয়া 'ঈগলের' মত নভোভ্রমণে প্রয়াস করিলে, জগৎমাঝে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বায়স হইয়া শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলে, কে উপহাস না করিবে? কেশরী-চর্ম্মাবৃত-কায় রাসভকে অবলোকন করিয়া, কে হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিবে? মোট কথা, কোন বিষয়েরই আধিক্য ভাল নহে; যে যেমন সে সেইরূপই থাকিবে—তাহা হইলে কোন গোলযোগ ঘটিবে না।

ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখিয়া নাস্তিক চিন্তা করিতে বসিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ (অবশ্য বলিতে হইবে) ঈশ্বর আছেন, ইহা সে সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। নাস্তিকের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে দর্শন নাই, এমন নহে। সে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সাহায্যে বুঝিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাতুলতা মাত্র। তাহার পর সে প্রকৃতি লইয়া পড়িল এবং অনেক পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিল যে,—"ইহা নিঃসন্দেহই আপনা হইতেই হইয়াছে।" এখানে নাস্তিকের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া, আমরা স্থির থাকিতে পারিলাম না।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের বিচারে নাস্তিক এইরূপ স্থির করিল যে, যদ্যপি জগদীশ্বর (আস্তিকদিগের মতে) সৃষ্ট না হইয়া, অনন্ত কাল হইতে অবস্থিতি করিতে পারেন,—কেহ তাঁহাকে দেখে নাই, দেখিতে পাইতেছে না, এবং কখনও পাইবে না; যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে মনুষ্যের গোচরহীন—তবে কেন না এই জগৎ অনন্তকাল হইতে

সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্যতীত অবস্থিতি করিতে পারে? সুতরাং জগদীশ্বর—যাঁহার অস্তিত্বের বিষয় লোকে স্বীকার করে—কেবল কল্পনার ছবি-মাত্র। নাস্তিকের বিজ্ঞান-শাস্ত্র পাঠ, সে কেবল অন্যায় বলিবার ও কহিবার জন্য, একথা বলাই বাহুল্য।

নাস্তিকের এই অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যদিও আমরা এক্ষণে প্রস্তুত নহি বটে, কিন্তু, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে সকল প্রমাণ এবং অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি আছে, সেই গুলি বলিলে, নাস্তিকের মস্তিষ্কের রোগের অনেক পরিমাণে উপশম—বলা যায় না—আরোগ্য করিলেও করিতে পারে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, অসীম ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন মহাত্মা ভিন্ন এ জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না। দুইটি জিনিষের পরস্পর আঘাত বিনা যেমন শব্দোৎপাদনের সম্ভব হয় না, সেই রূপ সৃষ্টি-কর্ত্তা বিনা এ সৃষ্টিরও সম্ভব হইতে পারে না। কারণ না থাকিলে কোন্ কালে কার্য্য হইয়া থাকে?—এ কথা বালকেও বুঝিতে পারিবে। এই বিশ্ব-সংসারের কার্য্য অসাধারণ; সুতরাং, ইহার কারণও যে অসাধারণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

আমাদিগের যত বিদ্যা বুদ্ধি বল আছে, সব লইয়া যদি সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বধাম-রচয়িতার বিষয় ভাবিতে বসি, আমরা কখনই আমাদিগের হৃদয়-পটে, তাঁহার প্রকৃত ছবি তুলিতে পারিব না। অনশনে উপবিষ্ট—ধ্যানমগ্ন—যোগ-নিরত সিদ্ধ মুনি ঋষিগণ, যখন সেই অচিন্তনীয় ঈশ্বরের চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন সংসার-বাসী, বিলাসী, কলুষ-পরিপূর্ণ, মানবগণ একবার বিভু-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেই, ঈশ্বর তাহার মানস-মন্দিরে দর্শন দিবেন, একথা কথাই নহে। তবে, একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব যে, সহস্র পাপী হইলেও, সে যদি একবার বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, বিভু-চিন্তায় মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনুকম্পায় তাহার মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইয়া যায়—তাহার হৃদয় পাপ-শূন্য হয়—তাহার মন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে অভিষিক্ত হয়—তাহার আত্মা চরিতার্থ হয়। সংসার-আশ্রমে থাকিয়া, ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিয়া, বিভু-পদে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, যাঁহারা কালাতিপাত করেন, জগতে তাঁহারাই সাধু—তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। তাঁহাদিগের চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

ক্রমশঃ।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

বারি-বরিষণ।

—*—

ক্ষুদ্র জল-কণা আমরা সকলে,
আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ অতি—
পারি অকাতরে প্রাণ দিতে ঢেলে,
হয় কারু উপকার যদি।

হের চাতকেরা আসিতেছে ধেয়ে,
কোলাহল করিছে কেবল;
হ'য়ে তৃষাতুর ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে,
মাগিতেছে,—"দে জল, দে জল।"

আহা! কুঞ্জবনে কুসুম-কুমারী,
অবশ নয়ন—অচেতন—
হ'য়েছে বিবশা নবীনা বল্লরী,
বিষাদ-সাগরে নিমগন।

তবে কাদম্বিনি! কাঁপাও মেদিনী—
সুগভীর করি গরজন;
এস সুহাসিনি! তুমি সৌদামিনী,
চমকিত কর ত্রিভুবন।

চাঁদ-আঁকা পাখা করিয়া বিস্তার,
ময়ূর নাচিছে কেকা-রবে;
কিসের বিলম্ব?—চল এই বার
ধরাতল ভাসাইতে হ'বে।

দাও ক্ষুদ্র প্রাণ ঢাল অকাতরে,
আমাদের এ জীবন-ধারা;
লভুক জীবন সবে চরাচরে,
হাস্যময়ী হোক্ বসুন্ধরা।

চির সহচর বায়ু আমাদের
রহিয়াছে সহায় যখন;
ঝম্-ঝম্-রবে দেশ দেশান্তের
ভাসাও নগর, নদী, বন।

ভূধরে, নিঝুম পাদপ-নিকরে,
প্রফুল্ল অন্তরে করে স্নান;
নির্ঝরের হাসি ধরে না অধরে,
গাহিতেছে হরষের গান।

পুলকে তটিনী শিহরে শিহরে,
ধাইতেছে সাগর-সঙ্গমে—
উল্লাসে উথলি উঠি একেবারে,
আছাড়িয়া পড়ে তীর-ভূমে।

মরাল মরালী, মগন হরষে—
ভাসিতেছে সরসী-সলিলে;
আর্দ্র পাখাগুলি তরু-শাখে ব'সে,
মেলিতেছে বিহগ সকলে।

মরি কি বাহার! রজনীগন্ধার
দোলে কিবা আধ-ফোটা কলি!
নবকিশলয় জেগেছে এবার,—
পরস্পর করে কোলাকুলি।

কদম্ব, কেতকী কানন ব্যাপিয়া,
সৌরভ করিছে বিতরণ;—
নব-দূর্ব্বাদল হৃদয় পাতিয়া,
আমাদের করেছে ধারণ।

সুখী সকলেই আমাদের পেয়ে—
ভাসিছে আনন্দে চারি ধার;
অনিত্য সংসারে সুখ এর চেয়ে
বল দেখি, কিবা আছে আর?

সার্থক জনম দিয়েছি যখন
ক্ষুদ্র প্রাণ পর উপকারে;
সার্থক জনম, ঢেলেছি যখন
এ জীবন জন্ম-ভূমি তরে।

আমরা সকলে এই চরাচরে,
করিয়াছি জনম গ্রহণ;
তাই অকাতরে জন্মভূমি তরে,
এ জীবন দিনু বিসর্জ্জন।

সকলেই বটে জগৎ-ভিতরে
করিতেছে সুখে অবস্থান,
জন্ম-ভূমি তরে,—পর উপকারে
কয় জন দিতে পারে প্রাণ?



বলিদান।

পুরাকাল হইতে হিন্দুদিগের মধ্যে দেবদেবী পূজায় বলিদান-প্রথা প্রচলিত আছে এবং বর্ত্তমান সময়েও দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই পূজা-উপলক্ষে ছাগ, মহিষ, প্রভৃতি পশু-বধ করিয়া, বলিদান-কার্য্য সমাধা করেন। কিন্তু, বলিদান যে কি, কি প্রকারে ইহা সম্পন্ন করিতে হয় এবং কি জন্যই বা বলিদান-প্রথা বিধিবদ্ধ, তাহার প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে কেহই যত্নবান্ নহেন।

অগ্রে বলিদান করিয়া, তৎপরে নিবিষ্ট চিত্তে ও শুদ্ধান্তঃকরণে ঈশ্বরোপাসনা করা, শাস্ত্র-সম্মত; যেরূপ কোন খ্যাতনামা বা পূজনীয় ব্যক্তিকে আপন গৃহে আহ্বান করিতে হইলে, আমরা অগ্রে গৃহের আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া থাকি, তদ্রূপ ঈশ্বরকে হৃদয়-মন্দিরে আহ্বান করিতে হইলে, অগ্রে স্বীয় অন্তঃকরণের জঞ্জাল-রূপ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য,—এই ষড়্-রিপুকে দূরীকৃত করিয়া, পবিত্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সেই জন্যই বলিদান-প্রথা প্রচলিত।

যূপ-কাষ্ঠে ছাগ, মহিষ, মার্জ্জার, মেষ ও নর,—এই পঞ্চ প্রকার প্রাণীকে নিক্ষেপ করিয়া বলিদান করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রোল্লিখিত; কিন্তু, প্রকৃত পক্ষেই যে, যূপকাষ্ঠের ন্যায় কোন কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রে উক্ত পঞ্চ প্রাণীকে বধ করিতে হইবে, শাস্ত্রকারের এরূপ উদ্দেশ্য কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। সে স্থলে, অন্তঃকরণকে যূপ-কাষ্ঠ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য,—এই রিপুগণকে ছাগ, মহিষ, মার্জ্জার, মেষ ও নর-রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। অর্থাৎ, কামের পরিবর্ত্তে 'ছাগ', ক্রোধের পরিবর্ত্তে 'মহিষ', লোভের পরিবর্ত্তে 'মার্জ্জার', মোহের পরিবর্ত্তে 'মেষ' এবং মদ ও মাৎসর্য্যের পরিবর্ত্তে 'নর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ, অন্তঃকরণ-রূপ যূপ-কাষ্ঠে কাম-রূপ ছাগ, ক্রোধ-রূপ মহিষ, লোভ-রূপ মার্জ্জার, মোহ-রূপ মেষ এবং মদ ও মাৎসর্য্য-রূপ নরকে বলিদান দিয়া, নিশ্চিন্ত ও পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরোপাসনা করা বিধেয়। কিন্তু, ইদানিন্তন কালে লোকে ক্রমশঃ অধিকতর মাংসাশী হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং, এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া, স্বার্থ-বৃত্তি চরিতার্থের জন্য, দেব-দেবী পূজা উপলক্ষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, নিষ্ঠুর হৃদয়ে অকাতরে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর অমূল্য জীবন নষ্ট করিতেছে। যদি প্রাণী-বিনাশ করাই বলিদানের প্রকৃত অর্থ হয়, তাহা হইলে, মার্জ্জার, বলিদানোপযোগী প্রাণীদিগের মধ্যে পরিগণিত থাকিলেও, কাহাকেও মার্জ্জার বলিদান করিতে দেখা যায় না। ইহার প্রকৃত কারণ আর কিছুই নহে,—কেবল মার্জ্জারের মাংস ভক্ষণীয় নহে। মহিষ বলিদানও অপেক্ষাকৃত অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ, মহিষ-মাংসও সকলে ভক্ষণ করেন না। কিন্তু, ছাগ-মাংস প্রায়

সর্ব্বসাধারণের অতিশয় মুখ-প্রিয় ও উপাদেয় খাদ্য বলিয়া, ছাগ-বলিদানই প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

বলিদান করিবার পূর্ব্বে, যে পশুকে বধ করা হইবে, তাহাকে স্নান করাইয়া মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক, জীবন্ত অবস্থায় দেব-দেবী উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়; অতএব, যখন সেই জীবন্ত পশুকে দেবদেবী উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইল, তখন সে তাঁহাদেরই হইল, তাহাতে আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না; কিন্তু তাহাকে পুনরায় কোন্ প্রথামতে ও কাহার আজ্ঞানুসারে বধ করা হয়? তাঁহারা কি সম্বোধন করিয়া বলিয়া দেন যে,—"বাপু হে! তুমি এই পশুটিকে হত্যা করিয়া, ইহার মাংস দ্বারা আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবের সহিত পরম পরিতোষ-পূর্ব্বক উদরের চরিতার্থতা সম্পাদন কর।"

এরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রকৃত সময়ে ও প্রকৃত রূপে বলিদান করিতে পারিলে, যূপ-কাষ্ঠ স্বর্ণময় হয়। কিন্তু বলিদান-প্রথা বহু শতাব্দী হইতে প্রচলিত আছে; অথচ, যূপ-কাষ্ঠ স্বর্ণময় হইতে, এ পর্য্যন্ত কখনও শ্রবণ-গোচর হয় নাই। এই বহু শতাব্দীর মধ্যে, অন্ততঃ, এক বারের জন্যও কি কাহারও প্রকৃত সময়ে এবং প্রকৃত রূপে বলিদান করা হয় নাই? ইহা অতিশয় অসম্ভব।

ইহার প্রকৃত অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ, অন্তঃকরণ-রূপ যূপ-কাষ্ঠে, ষড়্রিপু-রূপ উক্ত পঞ্চ প্রাণীকে বলিদান-পূর্ব্বক এক মনে ও পবিত্র চিত্তে পূজা করিলে, অন্তঃকরণ-রূপ যূপকাষ্ঠ স্বর্ণময়, অর্থাৎ শান্তিময় হয়। তদ্ভিন্ন পশু-বধ করিয়া কখন বলিদান করা হয় না, এবং শত সহস্র যুগ ধরিয়া এরূপ বলি-প্রদান করিলে, যূপ-কাষ্ঠ কখনই স্বর্ণময় হইবেনা।

কোন সামান্য বস্তু প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার কল্পনা হইতে কত রূপ আয়োজন ও উপকরণের প্রয়োজন হয় এবং কতদূর নিবিষ্টচিত্তে যত্ন করিলে, তবে তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা যায়; কিন্তু জগদীশ্বরের আরাধনা করা,—যাহাতে সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া মনঃপ্রাণ শীতল হয়, হৃদয় পবিত্র হয় ও শান্তিলাভ করে, সেই মহৎকার্য্য, পশু-বধ ও অভ্যস্ত পক্ষীর ন্যায় মন্ত্র-পাঠ করিলে যদি সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে, ইহ জগতে আর কাহারো কিছুই অভাব থাকিত না এবং কাহাকেও দুঃখ জ্বালা ভোগ করিতে হইত না। আপনি ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন, কিন্তু আপনি একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি যে, এ উপলক্ষে একটি জীবন নষ্ট করা যুক্তি-সঙ্গত কি না? যিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী—যিনি সর্ব্বজনের অভয়-দায়িনী—যিনি অনন্ত জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী,—তাঁহার আরাধনায় পশুবধ করিতে হইবে, তাঁহার সৃজিত প্রাণী, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ এমন কি অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণা পর্য্যন্ত উপভোগ করিবে? ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি কি রক্ত-পিশাচী রাক্ষসী?—যে তাঁহাকে পশু-রক্ত দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হইবে? তাঁহাকে আহ্বান করিতে হইলে, জীব-হত্যা করিতে হইবে.? ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তির পাষাণ হৃদয়েও কখন ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া অনুমিত হয় না।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

পিপাসু।

ঘুরি দেশে দেশে,
কতই আয়াসে ধাই।
ধাই দুখে সদা,
সুখের স্বপন নাই।
নাই শান্তি-বারি,
বিকার-পূরিত মনে।
মনে কত সাধ,—
আশায় বিহ্বল প্রাণে।
প্রাণে হাসি নাই,
নাশিতে দুখের ভার।
ভারে ভারী বড়,
ভাবীর ভাবনা সার।
সার কোথা পাব,
সংসার অসার ভাই!
ভাই বন্ধু নাই,
কাহারে করুণা চাই?
চাই তাঁরে সদা;
সকলে খুঁজিছে যাঁরে।
যাঁরে প্রয়োজন,
কেবল যাইতে পারে।
পারে যেতে আশা,
দুরাশা—কুয়াসা ঘোর।
ঘোর ভাঙ্গে কিসে?
পাপেতে হয়েছি ভোর।
ভোর ছোটে কিসে?
তপন-কিরণ নাই।
নাই নিজ বল,
আয়াসে ঘুরি হে তাই।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ।

ক্রোধের পরিণাম।

পাণ্ডুয়ার সন্নিকট, গোদা ব'লে গ্রামে—
ব্রাহ্মণ কুমার ছিল মণিরাম নামে।
অকাল-কুষ্মাণ্ড সেই ব্রাহ্মণ তনয়,
নিবেদন করি তার ক্রোধের বিষয়।
ভরসন্ধ্যা হইয়াছে সন্ধ্যা যায় ব'য়ে,
প্রদীপ জ্বেলেছে দ্বিজ অতি ব্যগ্র হ'য়ে।
জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে করিয়া ব্রাহ্মণ,
বা'র দিয়া, অন্য ঘরে করেন গমন।
প্রদীপ বাতাস লাগি যাইল নিবিয়া,
পুনরপি জ্বালে দ্বিজ ব্যাকুল হইয়া।
সাবধানে—সন্তর্পণে—করেন গমন,
সে বারেও নিবে গেল লাগিয়া পবন।
"জ্বালাতন কল্লে ভারি পোড়া বাতাসেতে"—
ব'লে দ্বিজ ফিরে পুনঃ গেলেন ঘরেতে।
এবারে কোঁচার খুট গায়ে লাগাইয়া,
লইলেন মধ্যে তার প্রদীপ জ্বালিয়া।
আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সাবধানে যান,
তথাপি বাতাস লাগি প্রদীপ নির্ব্বাণ।
বারবার, তিন বার, হ'য়ে জ্বালাতন,
ক্রোধান্ধ হইল সেই ব্রাহ্মণ-নন্দন।
প্রদীপ রাখিয়া ঘরে (বাজারে যাইয়া)
পাকাটী, গন্ধক আর আনিল কিনিয়া।
দেশলাই শদাবধি প্রস্তুত করিল,
বড় এক হাঁড়ী ক'রে আগুন আনিল।
তদন্তে সে দেশলাই একটি লইয়া,
অগ্নির সংযোগে তাহা নিল ধরাইয়া।
দেশলাই দিয়া জ্বালি প্রদীপ তখন,
ফুঁ দিয়া নিবা'য়ে ফেলে, ক্রোধ-পূর্ণ মন।
একটি একটি ক'রে যত কাটী ছিল,
"কত নিব্বে নেব যাদু!" ব'লে সে জ্বালিল।

শেষেতে আছাড় মারি প্রদীপ ভাঙ্গিয়া,
অন্ধকারে দ্বিজ-সুত রহিল বসিয়া !!
কত দূর বোকা হ'তে পারে রুষ্ট জন,
ব্রাহ্মণের কার্য্য দেখে বুঝ, গুণিগণ !
কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য সেই পাগলের প্রায়,
পরের করিতে জব্দ নিজে কষ্ট পায়।
বুদ্ধির বলেতে যেই কার্য্য ক'রে থাকে—
সেজন কখন নাহি পড়য়ে বিপাকে।
বাতাস বহিছে বিপ্র দেখিল যখন,
বাহিরে প্রদীপ ল'য়ে এল কি কারণ ?
দেকাটী আনিয়া যদি সে ঘরে জ্বালিত,
তাহ'লে সকল লেঠা চুকিয়া যাইত।
নির্ব্বোধের মত যার হয় আচরণ,
তার কি নির্ব্বিঘ্নে হয় কার্য্য সম্পাদন ?
বুদ্ধি দোষে বিপদে সে পড়ে জড়াইয়া,
কার্য্য-হানি করে শেষ ক্রোধান্ধ হইয়া !
কার্য্য-কালে বিবেচনা ক'রে চলে যেই,
শ্রমের সুফল-ভাগ করিবেক সেই।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

সুখের রজনী।

"বলিব কেমনে ? আজি প্রনয়িনি !
কি যে সুখী হ'নু তোমায় হেরে।
ভুলনা সজনি ! এ সুখ-রজনী—
দেহ গো ! এখন বিদায় মোরে।"
"কি বলিলে ! হ'বে সুখের রজনী,
যাও যদি নাথ! আমায় ফেলে ?
জান না এখনি এই অভাগিনী
দহিবে তোমার বিরহানলে।
যেওনা, যেওনা ; —তোমার বিহনে
রহিবে কেমনে ? অধিনী দাসী।
তুমি না থাকিলে ভেবে দেখ মনে—
হইবে কেমনে সুখের নিশি ?
এস তবে নাথ ! আজি এ যামিনী
করিহে যাপন, তোমার সনে ;—
তবে ত হইবে সুখের রজনী
চির দিন র'বে, আমার মনে।
না বুঝে কখন বলনা প্রকাশি
ভুলেও কখন এমন ক'রে—"
'ভুলনা প্রেয়সি ! এ সুখের নিশি,
দেহ গো ! এখন বিদায় মোরে।'

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

ছিন্ন-আশা—কবিতা-পুস্তক, শ্রীযতীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত।

এই পুস্তক খানির অধিকাংশই গ্রন্থকারের স্বীয় অদৃষ্ট-ঘটনা-মূলক ; আমরা এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তরুণ-বয়স্ক নবীন লেখকের লেখনী-প্রসূত এরূপ পুস্তক যথার্থই অতিশয় প্রশংসার যোগ্য। আশা করি, যতীন্দ্রবাবু উত্তরোত্তর আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া, একজন সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

মুরলী—গীতি-কাব্য, প্রথম ভাগ, শ্রীপান্নালাল পাঠক-প্রণীত। ইহাতে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন কবিতা আছে ; অনেকগুলি কবিতা বেশ মিষ্ট এবং সুখ-পাঠ্য—স্থানে স্থানে কবিত্বের উচ্ছ্বাসও দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম খণ্ড।] ভাদ্র। [৫ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—তিন আনা

সুবোধিনী।

পূর্ণিমার রাতি, চাঁদনীর ভাতি,
লহরী দোলে, সরসী-জলে ;
শ্বেত শতদল, বিকচ বিমল,
সমীর খেলে, সুবাস তুলে।

ইন্দু কুন্দ জিনি, বিমল বরণী,
বসিয়া কেরে, কমল 'পরে ?
মায়ের মতন, স্নেহের বদন,
যাঁহারে হেরে, ভকতি ঝরে।

দেহের আভায়, দিক্ শোভা পায়,
জ্যোতিঃ বিতরে, চাঁদ নখরে ;
শ্বেত ভূষা-বাস, শ্বেত মৃদু-হাস,
মধুর স্বরে, বীণা ঝঙ্কারে।

কমল-আসনে, কমল-চরণে,
অলি বিরাজে, নূপুর গাজে ;
অধর কমল, শরীর কমল,
কমল সাজে, মৃণাল-ভুজে।

পুরাণের বাণী,—— "এই বীণাপাণি,
বিদ্যাজননী, মোহনাশিনী ;
সুবোধ-দায়িনী, দেবী সুবোধিনী,
গীতনাদিনী, বাক্যবাদিনী।"



শ্রীধূর্জ্জটী মুখোপাধ্যায়

বাল্য-বিবাহ।

সংস্কারকনামাভিধেয় ইংরাজী শিক্ষিত বাবুরা বাল্য বিবাহের উপর খড়্গা-হস্ত। তাঁহারা বাল্য-বিবাহকে আমাদিগের অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও বাল্য-বিবাহ আইনের দ্বারা বন্ধ করিতে চান। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্ট এ সকল বাতুলদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, করিবেনও না। ইহাঁরা ইংরাজীর দু'পাতা উল্‌টাইয়া, আপনাদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভ্রমময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ও ইউরোপীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতিতে মুগ্ধ হইয়া, সেই সকলের অনুকরণ করিতেছেন ও সেই সকল হিন্দু-সমাজে প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। হিন্দু ধর্ম্মের উপর এ পর্য্যন্ত অনেক ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে,—হিন্দুধর্ম্ম অচল অটল হিমালয়ের ন্যায় স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে—সমাজ সংস্কারকদিগের উৎপাতে কিছুই হইবেনা।

হরিমোহন মাইতির পশ্বাচারের কথা কাহারও অবিদিত নাই। "ধূনার গন্ধে মনসা নাচিয়া উঠে।" সমাজ সংস্কারকেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন,—ভাবী জয়ের আশায় উন্মত্ত হইয়া তাল ঠুকিতেছেন,—হরিমোহন মাইতির পশ্বাচারকে বাল্য-বিবাহের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইচ্ছা—বাল্য-বিবাহ উঠিয়া যায়; হিন্দু সমাজে হিন্দু-দিগের মধ্যে যৌবন বিবাহ প্রচলিত হয়। বাল্য-বিবাহ যে, যৌবন বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বাল্য-বিবাহ বশতঃ যে, হিন্দু সমাজে অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্ট হইতেছে, তাহা বিশদরূপে দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সর্ব্ব প্রথম, বাল্য-বিবাহের বিপক্ষদিগের মত সমূহ সমালোচনা করা যাউক।

তাঁহাদিগের অমতের প্রথম কারণ যে, বাল্য-বিবাহ আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান হেতু। তাঁহারা তাঁহাদিগের মত পরিপোষণার্থে বলেন যে, বিখ্যাত ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মত যে, সন্তান প্রসব করিবার সময় অল্পবয়স্কা স্ত্রীর মৃত্যু হইতে পারে। অষ্টাদশবর্ষের নিম্নে সন্তান হইলে, সেই সন্তান হয় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, নয় চিরকাল দুর্ব্বল হইয়া বাঁচিয়া থাকে।

আমরা ইহা আদৌ বিশ্বাস করি না। ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতের উপর আমাদিগের আস্থা নাই। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগের দেশের জল-বায়ুর গুণ ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের শারীরিক অবস্থা বিশেষরূপে বিদিত আছেন, তাহা স্বীকার করি। তাঁহাদিগের মত তাঁহাদিগের দেশে শিরোধার্য্য হইবে; আমাদিগের দেশের অবস্থা বিষয়ে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অল্প; সুতরাং, তাঁহাদিগের মতের উপর নির্ভর করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষপক্ষীয়েরা আরও বলেন যে, আয়ুর্ব্বেদে বাল্য-বিবাহের

বিপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং এই মত সমর্থণার্থে সুশ্রুতে লিখিত নিম্ন লিখিত শ্লোকটিতে, আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেন।

"ঊনষোড়শবর্ষায়াম্ প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সবিদ্যতে॥
জাতোবা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

শ্লোকটির অর্থ এই যে, পিতার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের ও মাতার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসরের নিম্নে হইলে, তাঁহাদিগের সন্তান মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, কিম্বা অল্প দিন জীবিত থাকে ও জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উপরোক্ত শ্লোকে বাল্য-বিবাহ নিষেধ-জনক কোন কথাই নাই,—কেবল কত বয়সে সন্তান হওয়া উচিত, তাহাই লিখিত আছে। অর্থাৎ, মাতার ষোড়শ বর্ষে ও পিতার পঞ্চবিংশতি বর্ষে সন্তান হওয়া প্রার্থনীয়,—এই মত প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা যে সময় রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে বর্ত্তমান সভ্যতা ও আনুষঙ্গিক ভোগবিলাস, আমাদিগের সমাজে প্রবেশ করে নাই। তৎকালে লোকদিগের মধ্যে সরলতা পবিত্রতা ও সাধুভাবের সমাবেশ ছিল। যদ্যপি তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে বলা যাইত যে, কালে পুরুষেরা বিংশতি দ্বাবিংশতি বর্ষে ও স্ত্রীলোকেরা দ্বাদশ ত্রয়োদশবর্ষে যৌবনলাভ করিবে, তাহা হইলে, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তখন পুরুষদিগের পঞ্চবিংশতি বর্ষের ও স্ত্রীলোকদিগের ষোড়শ বর্ষের নিম্নে প্রায় সন্তান হইত না। সুতরাং, প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসকেরা প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে, পুরুষদিগের পঞ্চবিংশতি বর্ষ ও স্ত্রীলোকদিগের ষোড়ষ বর্ষ,সন্তান হইবার উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে লোকদিগের মধ্যে সরলতা, পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব সকল ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল, স্ত্রী পুরুষেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সুতরাং, প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বাল্য-বিবাহ প্রচলন করিলেন ও যৌবন বিবাহ প্রায় রহিত হইয়া গেল। তাঁহাদিগের কার্য্য, তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। আর্য্য চিকিৎসকদিগের মত, আমাদিগের বর্ত্তমানাবস্থায় সকল বিষয়ে সম্যকরূপে খাটে না। যদি ইংলণ্ডের ন্যায় শীত প্রধান দেশে স্ত্রীলোকেরা অষ্টাদশ ঊনবিংশতি বর্ষে যৌবন লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, গ্রীষ্ম-প্রধান ভারতবর্ষে যে, স্ত্রীলোকেরা ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষে যৌবন লাভ করিবে, তাহা বিচিত্র কি? বরঞ্চ ইহা প্রকৃতি সঙ্গত। প্রকৃতির নিয়মানুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, শীতে ফল শীঘ্র পরিপক্ক হয় না, গ্রীষ্মে হয়। ইহা হইতেই আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি যে, শীতপ্রধান দেশের অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ত্রী পুরুষের যৌবন শীঘ্র উপস্থিত হয়। সুতরাং, আমাদিগের দেশের ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যারা শীত প্রধান দেশের অষ্টাদশ ঊনবিংশতি বর্ষীয়া কন্যাদিগের সমতুল্যা ও তাঁহাদিগের জননী হওয়া প্রকৃতি-সঙ্গত।

বাল্য-বিবাহদ্বেষিগণ আরও বলেন যে,

বাল্য-বিবাহ হেতু আমরা দুর্ব্বল ও অন্যান্য জাতির তুলনায় সামর্থ্যহীন হইতেছি। আমাদিগের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, কারণ তাঁহারা বাল্য বিবাহের ফল।

আমাদিগের বক্তব্য যে, বাল্য-বিবাহ আমাদিগের দুর্ব্বলতার কারণ নহে। সমাজের কৃতবিদ্য লোকদিগের অকাল মৃত্যুর নিমিত্ত বাল্য-বিবাহকে দোষী করাও ন্যায়-সঙ্গত নহে। বাল্য-বিবাহ শত শত বর্ষ ধরিয়া হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে। আমাদিগের পিতামহ প্রপিতামহেরা সবল ছিলেন। তাঁহারা সচরাচর ষষ্টি অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম লাভ করিতেন, তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থায় আমাদিগের আধুনিক যুবকদিগের ন্যায় আহার করিতে পারিতেন, ৭।৮ ক্রোশ ভ্রমণ তাঁহাদিগের নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বল ছিলেন না। ইহার কারণ কি? তাঁহারা কি বাল্য বিবাহের ফল ছিলেন না? গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে, পঞ্জাবের সাপুর, গুজরানওয়ালা, ঝিলম্ বিভাগে প্রতি ১০,০০০ হাজারে ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক বেশী। যে পাঞ্জাবে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেই পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগের জীবিতকাল, যৌবন-বিবাহ পক্ষপাতী ইংলণ্ডের লোকদিগের জীবিতকাল অপেক্ষা বেশী কেন? আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বাল্য-বিবাহ সত্ত্বেও দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন—পাঞ্জাবের অধিবাসীদিগের জীবিতকাল ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের জীবিতকাল অপেক্ষা দীর্ঘতর—এ সকল জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে, বাল্য-বিবাহকে শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা মূর্খতার পরিচয়।

ব্যায়ামের অভাব, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মদ্যপানের প্রচলন, কুনীতির আধিক্যতা, খাদ্য-দ্রব্যে অস্বাস্থ্যকর পদার্থের মিশ্রণ, ভোগ বিলাস, লাম্পট্য, ছাত্রগণের অবিচ্ছেদ মস্তিষ্ক চালনা,—এই সকলই আমাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অকাল মৃত্যুর কারণ—বাল্য-বিবাহ নহে।

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষপক্ষীয়দিগের অমতের দ্বিতীয় কারণ যে, বাল্য-বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক। তাঁহারা বলেন যে, বালকেরা অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া লেখা পড়া ছাড়িয়া দেয় ও পত্নী চিন্তায় সময় অতিবাহিত করে। বালিকারা বিবাহের পর বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না—অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে।

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষপক্ষীয়েরা যাঁহাদিগকে 'বালক' বলেন, আমরা তাঁহাদিগকে 'যুবক' বলি। সচরাচর অষ্টাদশ বৎসরের পরে আমাদিগের বালকদিগের বিবাহ হইয়া থাকে; সুতরাং, তাহাদিগকে আমরা বালক বলিতে পারি না। বাল্য-বিবাহ আমাদিগের যুবকদিগের শিক্ষায় প্রতিবন্ধকতা করেনা। আমরা আমাদিগের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, যে সকল যুবকদিগের বিদ্যা-শিক্ষায় আন্তরিক ইচ্ছা আছে, বিবাহ করিয়া তাঁহারা লেখাপড়া পরিত্যাগ করেন না। আমরা জানি অনেক বিবাহিত যুবা, তাঁহাদিগের অবিবাহিত বন্ধুদিগের ন্যায় বিশ্ব-বিদ্যলয়ের উচ্চতম সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন,—কেহ কেহ পরীক্ষায় তাঁহাদিগের অপেক্ষাও প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। যাঁহা-

দিগের বিদ্যাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা আছে, তাঁহারা বিবাহ করিয়া লেখা পড়া পরিত্যাগ করেন না; অপিচ স্ত্রীপ্রতিপালনরূপ কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় অধিকতর উৎসাহিত করে।

বালিকাদিগের বিদ্যলয়ে বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য যে, হিন্দু-সমাজ বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের বিদ্যা-শিক্ষার পক্ষপাতী নহে। অধিকাংশ বালিকা-বিদ্যালয়ই ইউরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল বিদ্যালয়ে হিন্দু বালিকাদিগের হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত শিক্ষা হয় না। বালিকাদিগের নিকট ধর্ম্মযাজকেরা হিন্দুধর্ম্মের নিম্নতা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ছল করিয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত অপূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনুবাদিত 'বাইবেল' পাঠ করান। বালিকারা সরলচিত্তা—তাহা-দিগের সম্মুখে যে চিত্র ধরা যায়, সেই চিত্রই তাহাদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। তাহা-দিগকে যাহা বলা যায়, তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং, খ্রীষ্টান গুরুর উপদেশ যে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুতা করিতে পারে, তাহাতে আশঙ্কা আছে। বিদ্যালয়ে বালিকা দিগকে পাঠাইবার অমতের আর একটি কারণ এই যে, বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার স্বভা-বের বালিকা গমণ করে। যে সকল বালি-কারা দুষ্টা, লজ্জাহীনা, তাহাদিগের সংসর্গে থাকিয়া, অন্যান্য বালিকারা তাহাদিগের স্বভাব পাইতে পারে। বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী বালিকারা পাঠ করিতে যায়। তাহাদিগের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, বেশভূষা দেখিয়া, হিন্দু বালিকার হিন্দু আচার ব্যবহার, রীতি নীতি বেশভূষায় অশ্রদ্ধা হইতে পারে ও হিন্দু ধর্ম্মে আস্থা লোপ হইতে পারে। এই সকল আশঙ্কা বশতঃ, প্রকৃত হিন্দুরা বালিকাদিগের বিদ্যা-লয়ে বিদ্যাভ্যাস মনোনীত করেন না। আমরা স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী, কিন্তু ইউ-রোপীয় স্ত্রীশিক্ষা আমাদিগের চক্ষের বিষ। স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা আমরা বুঝিতে পারি, তাই হিন্দু স্ত্রীকে হিন্দুমতে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। যে ইউরোপীয় স্ত্রী শিক্ষা ইংরাজি শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা আপন স্ত্রী কন্যাকে প্রদান করিতেছে, তাহা আমাদিগের শিক্ষা বলিয়াই বোধ হয় না—অপশিক্ষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হিন্দু বালিকাদিগকে এ প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। হিন্দু সমাজ হইতে বিতাড়িত ব্যক্তিরা, যে পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা আপনাদিগের মধ্যে প্রচলন করিতেছেন, তাহা দূর হইতেই চাক্‌চিক্যশালী ও মনোহর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা জল-বুদ্বুদের ন্যায় অসার পদার্থ। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ; কিন্তু পাশ্চাত্য স্ত্রী-শিক্ষা জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞানতা প্রদান করে—আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকার আনয়ন করে।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা দ্রৌপদী, খনা, লীলা, গার্গী ও অন্যান্য প্রাতঃ-স্মরণীয়া বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের নাম আমরা শুনিতে পাইতাম না। কি কারণে যে, হিন্দুদিগের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার অবনতি হইল, তাহা প্রকৃতরূপে

প্রকাশিত নাই। হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

স্ত্রীলোকদিগকে যত্ন-পূর্ব্বক লালন পালন করা ও শিক্ষা প্রদান করা উচিত্।

হিন্দু-স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে 'গৃহ'ই শিক্ষার উপযুক্ত স্থান। শিক্ষাভার তাঁহাদিগের পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং স্বামীর হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ন্যায় স্নেহময় ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষক আর কে হইতে পারিবে?

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষদিগের অমতের তৃতীয় কারণ যে, বাল্য-বিবাহ দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে। আমাদের বিশ্বাস—বিবাহ মাত্রই দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে। দরিদ্রতাকে পৃথিবী হইতে বিদূরিত করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত। যে ইংলণ্ডে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত, সেই ইংলণ্ডের অধিবাসীরা, কি সম্পূর্ণরূপে সুখী? তাঁহারা কি দারিদ্রের কবলে পতিত হন না? সেখানে অভিভাবকেরা তাঁহাদিগের কন্যাদিগের জন্য উপযুক্ত স্বামী অন্বেষণ করেন; কিন্তু সেই অভিভাবকদিগকে কি আমরা সময়ে সময়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে দেখিতে পাইনা? তাঁহাদিগের কন্যাদিগের স্বামীরা কুকার্য্যে আপনাদিগের সম্পত্তি নিঃশেষ করিয়া, আপনাদিগকে ও স্ত্রীদিগকে দারিদ্রগ্রস্ত করেন। এরূপ ঘটনা সুসভ্য ইংলণ্ডে প্রায়ই হইতেছে। এরূপ দুর্ঘটনার গতিরোধ করা কি আমাদিগের সাধ্য? যে ব্যক্তি আজ অসীম সম্পত্তির অধিপতি, যাঁহার সামান্য অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য শত শত ব্যক্তি লালায়িত, কালের কুটীল গতিতে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি কপর্দ্দকে পরিণত হইতে পারে! কাল তাঁহাকে ছিন্নবস্ত্র পরিধৃত ভিক্ষুকে পর্য্যবসিত করিতে পারে! হিন্দু স্ত্রী কিন্তু সে বিপদে অধীরা হন না—আশা ভরসা ছাড়েন না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুখানিচ সুখানিচ" ভাবিয়া, তিনি আপনাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন, মনকে প্রবোধিত করেন—ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া বিপদের সম্মুখীনা হন। স্বামীর ভালবাসা তাঁহার সান্ত্বনা-স্বরূপ—স্বামীর পবিত্র ভালবাসার তুলনায় অর্থ তখন তাঁহার নিকট পদ দলিত ধূলি মুষ্টির ন্যায় বোধ হয়। ধন্য হিন্দু স্ত্রী! তোমায় মানবী বলিব? না, দেবী বলিব? তুমি বিপদে ভরসা দাও, আপদে সান্ত্বনা দাও। তুমি না থাকিলে হিন্দু-গৃহ শ্মশানে পরিণত হইত! তুমি সংসার-রূপ মহামরুভূমিতে নবতৃণাচ্ছাদিত সরোবর-শোভিত শীতল আশ্রয় স্থান স্বরূপ। দেবি! তোমায় প্রণাম করি।

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষদিগের অমতের চতুর্থ কারণ যে, যে বয়সে আমাদিগের বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে, সে বয়সে তাহারা "বিবাহ কি" ও "বিবাহের গুরুত্ব ও দায়িত্ব" কিছুই বুঝিতে পারে না। বিবাহের উপর বালিকাদিগের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। বালিকাদিগের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, তাহাদিগকে অপরিচিত পুরুষের হস্তে চিরজীবনের জন্য অর্পণ করা, নিষ্ঠুরতার পরিচয়। তাহাদিগের যদি যৌবনাবস্থায় বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহারা মনোমত স্বামী নির্ব্বাচন করিতে পারে।

আমাদিগের বক্তব্য যে, হিন্দুরা ইউরোপীয় প্রণালী মতে স্বামী-নির্ব্বাচন-প্রথায় আদৌ

পক্ষপাতী নহে। বালিকাদিগের বিবাহ ভার সম্পূর্ণরূপে পিতামাতাদিগের হস্তে থাকা উচিত, কারণ বালিকারা সুমতি ও সরলা—সংসারের কুটিলতা, কপটতা কিছুই বিদিতা নহে। স্বামী মনোনয়নের ভার তাহাদের হস্তে দেওয়া, বাতুলতা মাত্র। গভর্ণমেণ্ট অপ্রাপ্ত বুদ্ধি ও অপ্রাপ্ত-বয়স্ক জমীদার সন্তান দিগের বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অভিভাবকেরা যে, অপ্রাপ্ত-বুদ্ধি ও অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের স্বামী মনোয়নের ভার স্বহস্তে করিবেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত ও ন্যায়ানুমোদনীয়। অভিভাবকেরা বালিকদিগের পতি নির্ব্বাচনে যেরূপ যোগ্যতা প্রকাশ করিবেন, সেরূপ যোগ্যতা বালিকাদিগের নিকট হইতে আশা করা অসম্ভব।

অভিভাবকেরা বালিকাদিগের জন্য স্বামী নির্ব্বাচন অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বরের জাতি,কুল শীল,বিদ্যা, বুদ্ধি, বিষয়, বৈভব, শারিরীক স্বাস্থ্য, চরিত্র, সকল বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন। বল দেখি অভিভাবকদিগের মত স্বামী নির্ব্বাচনে যোগ্যতা দেখান, বালিকাদিগের পক্ষে সম্ভব কি না? কখন কখন দেখা যায় যে, কোন কোন অভিভাবক স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া, বালিকাদিগকে অনুপযুক্ত বরে অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু, এ জন্য বাল্য-বিবাহকে দোষী করা যায় না। মনুষ্যদিগের দুর্ব্বলতাই দোষী। যে ইউরোপে যৌবন বিবাহ প্রচলিত, সেখানেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। সেখানে অভিভাবকেরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনুপযুক্ত বরে আপনাদিগের যুবতী কন্যাদিগের বিবাহ দেন। এ প্রকার ঘটনা সকল সমাজে, সর্ব্বপ্রকার বিবাহে ঘটিয়া থাকে। হিন্দু-সমাজে বাল্য-বিবাহ এ অনিষ্টের মূল নয়। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ প্রকার ঘটনা অন্যান্য সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজে অতি অল্প ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ, হিন্দু অভিভাবকেরা স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও বালিকাদিগকে উপযুক্ত পতি হস্তে সমর্পন করেন।

আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সমাজ-প্রচলিত স্বামী-নির্ব্বাচন-প্রথা, বালিকাদিগকে লজ্জাহীনা করে। লজ্জা স্ত্রীলোকদিগের ভূষণ—অঙ্গের সৌন্দর্য্য। হিন্দুর চক্ষে লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক সুন্দরী হইলেও কুৎসিতা। অন্য জাতির চক্ষে লজ্জাহীনতা সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে—কিন্তু হিন্দুর চক্ষে নয়।

যে সকল দেশে স্বামী-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে, সে সকল দেশে স্ত্রীলোকেরা প্রণয়ে অন্ধ হইয়া, সময়ে সময়ে সতীত্ব-রত্ন হারাইয়া থাকেন! পরিশেষে প্রণয়ী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন!! হিন্দু-সমাজে এ প্রকার ঘটনা হয় না, অভিভাবক কর্ত্তৃক স্বামী-নির্ব্বাচন প্রথাই তাহার কারণ। ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত স্বামী-নির্ব্বাচন প্রথায় একটি দোষ যে, যুবতীরা মনোনীত যুবকদিগের সৌন্দর্য্যে ও প্রণয়-পূর্ণ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে; নির্ব্বাচিত যুবকদিগের চরিত্র, বিদ্যা বুদ্ধি, এ সকল অন্ধপ্রণয় তাহাদিগকে ভাবিতে দেয় না। বিবাহ হইলে, তাহারা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি বুঝিতে পারেন।

আমাদিগের বিশ্বাস যে, ভালবাসা বিবাহের পরে হয়, পূর্ব্বে হয় না। ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত স্বাধীন নির্ব্বাচন প্রণালী মতে অগ্রে

ভালবাসা হয়, তৎপরে বিবাহ হয়। হিন্দু-সমাজে অগ্রে বিবাহ হয়, তৎপরে ভালবাসা হয়। শেষোক্তটিই আমাদিগের মতে স্বাভাবিক।

আমাদিগের বিশ্বাস যে, আমরা বাল্য-বিবাহের বিপক্ষদিগের প্রধান প্রধান অমতের কারণ সমূহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে দেখাইব যে, বাল্য-বিবাহ না থাকিলে, হিন্দু সমাজ থাকিতে পারে না। দেখাইব, বাল্য-বিবাহের সহিত হিন্দু দিগের ঘনিষ্ট সামাজিক সংস্রব আছে। দেখাইব যে, বাল্য-বিবাহের উপকারিতা ইউরোপীয় লোকেরাও বুঝিতে পারিতেছেন। দেখাইব, যৌবন-বিবাহের অনিষ্ট কি ভয়ঙ্কর— দেখাইব যৌবন-বিবাহ অপেক্ষা বাল্য-বিবাহ শত-গুণে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বসমাজে প্রার্থনীয়।

অতি প্রাচীন কালে যে, স্ত্রী পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ হইত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিক বয়সে বিবাহ তৎসাময়িক সমাজে প্রকৃতি সঙ্গত ছিল। কালের বিচিত্র গতিতে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে যৌবন-সীমায় পৌঁছিতে লাগিল; সুতরাং, মহামতি মনু সমাজের কল্যাণ-সাধনার্থে, বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম পরিবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে ত্রিংশ-বর্ষীয় পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পাণি-গ্রহণে উপযুক্ত ও চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় পুরুষ অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণি গ্রহণে যোগ্য, স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ের "একীকরণ" সম্পাদনার্থে, তিনি এই নিয়ম স্থাপন করেন? বাস্তবিক স্বামীর বয়ঃক্রম স্ত্রীর বয়ঃক্রম অপেক্ষা অধিক হইলে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যে কেবল ভালবাসার সঞ্চার হয় তাহা নহে—ভালবাসার সহিত ভক্তি, স্নেহ, সকলই একাধারে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে স্থান পায়। এখন দেখ যাক্, পুরুষদিগের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ নিয়মের ব্যতিক্রম হইল কেন? আমাদিগের অনুমান হয় যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের এত বিভিন্নতা প্রযুক্ত স্ত্রীরা অল্প বয়সে স্বামী-হীনা হইতে লাগিলেন ও পুরুষেরা ত্রিংশ বা অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আত্ম-সংযমে সম্পূর্ণরূপে কৃত কার্য্য না হওয়াতে, সমাজ পুরুষদিগের বিবাহ মনু-নির্দ্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা অল্প বয়সে দিতে লাগিলেন। সমাজ যে পুরুষের বিবাহের বয়ঃক্রম হ্রাস করিয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এসকল পরিবর্ত্তন একবারে হয় নাই; মনুষ্যের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে এ সকল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। বাল্য-বিবাহ আজ নূতন হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় নাই। বলিতে গেলে, আবহকাল হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় হিন্দু পণ্ডিতেরা এ প্রথায় দোষ দেখিতে পান নাই, আজ সংস্কারকেরা "বাল্য-বিবাহ সর্ব্ব দোষের আকর" বলিয়া বুঝিতে পারিতেছেন। বলি হারি! (ক্রমশঃ)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।



নিয়তি।

(১)

পিতামহ ব্রহ্মা কঠোর তপেতে,
নিমগ্ন আছেন বহুকাল হ'তে,
ত্যজি ব্রহ্মলোক কৈলাস-পর্ব্বতে,
নিস্পন্দ শরীরে, মুদিয়া আঁখি;

যুগ যুগান্তর হইয়াছে গত,
তবু সংজ্ঞা নাই তবু ধ্যানে রত,
আরো কত যুগ যাবে এই মত,
আরো কত যুগ না জানি বাকি!

ইষ্ট-কামনায় নগেন্দ্র-শিখরে,
বহুকোটিকাল ভাবিলেন তাঁরে;
শেষেতে যখন অতি ধীরে ধীরে
উন্মীলিত হ'ল নয়ন-তারা;

তখন বিস্ময়ে দেখিলেন দূরে,
সুবঙ্কিম ঠামে পর্ব্বত-কন্দরে,
অনেক রমণী দিক্‌ শোভা ক'রে,
র'য়েছে দাঁড়ায়ে বিজলী পারা।

দেখিলেন তাঁরে, চিনিলেন তাঁরে;
সহসা কি যেন উদিল অন্তরে,
কাঁপা'য়ে ধমনী জাগা'য়ে স্মৃতিরে,
সভয় নয়নে চাহিয়া ফিরি;

সে হেন সময়ে কন্দর-বাসিনী—
মধুরা ষোড়শী অপূর্ব্ব কামিনী,
আসি দাঁড়াইলা করি যোড়-পাণি
পিতামহ অগ্রে প্রণাম করি।

প্রভাত-নক্ষত্র-জিনি সে রূপসী,
জিনি তিলোত্তমা মেনকা উর্ব্বশী,
চির মন্দ হাস আলু'য়িতা-কেশী
গৈরিক বসনে তনু আবরি।

(২)

ক্ষণকাল পরে অঙ্গুলি হেলা'য়ে,
কহিলা কামিনী ভারত দেখা'য়ে,—
"দেখ দেখ তাতঃ, দেখ দেখ চেয়ে,
কি দশা ইহার হ'য়েছে এবে;

"পার কি চিনিতে সেই ভূমি বলি?
পার কি চিনিতে ও নর-মণ্ডলী?
বীরদর্পে যারা বেড়ায় আস্ফালি
করি তুচ্ছ জ্ঞান ভারতে সবে?

"বিজেতা উহারা বৃটন-নিবাসী,
বণিকের বেশে এদেশেতে আসি,—
ক্রমে বুদ্ধি-বলে যবন বিনাশি,
শাসিতেছে দেশ প্রবল দাপে;

"এখন ওদের ঐশ্বর্য্য দেখিলে,
এখন ওদের বিক্রম শুনিলে,
দেখা শুনা যাক্‌, নামটি হইলে—
স্থাবর জঙ্গম সকলি কাঁপে।

"কিন্তু উহাদের পারিনা দূষিতে,
ভারত-সন্তান আপনা হইতে,
এনেছে দারিদ্র্য সোণার ভারতে,
করেছে শ্রীহীন সোণার দেশ।

"তাই বলি তাতঃ, পার কি চিনিতে?
দেখ দেখ চেয়ে—পড়ে কি মনেতে?
পূর্ব্বকার কথা—কি ছিল পূর্ব্বেতে,
উপস্থিত হের নবীন বেশ!"

(৩)

এত বলি বামা লাগিলা ঢাকিতে,
পাছে পিতামহ চাহেন দেখিতে
কর ধৃত লিপি,—যাহার বশেতে,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু হ'তে—
কারণ-সলিলে ভাসিয়া যায়।

তুমি আমি ভাসি—কত কাঁদি হাসি,
কেনই বা ভাসি? কতদিন ভাসি,
কোথা যাব পুনঃ? কাহারে জিজ্ঞাসি,
কেবা এ সকল কহিতে পারে?

তাই গো নিয়তি! মিনতি তোমারে,
অদৃষ্ট মোদের বল কৃপা ক'রে;
কিম্বা কায নাই, দেখাও ব্রহ্মারে
ভারত-অদৃষ্টে কি আছে পরে।

(৪)

ভারতের সুখে বাঙ্গালীর সুখ,
সে ভারত-দুঃখে আমাদের দুখ,
হ'ও নাকো সতি! দেখা'তে বিমুখ,
ভবিষ্য-লিখন কি আছে শেষে;

যে লিখন-বশে, তুমিও সুন্দরী,
ভাস দিবারাতি কার্য্য-সূত্রোপরি;
মানব মানবী—কিন্নর কিন্নরী,
ফিরিছে সকলি যাহার বশে।

পূরিল না আশা আমাদের হায়!
লুকাইলা ধনী যত্ন করি তায়,—
অঞ্চল ভিতরে, যেথা পুনরায়,
ব্রহ্মার নয়ন পতিত হয়;

সুধীর গম্ভীরে দেখিতে দেখিতে,
কহিলেন ব্রহ্মা নিয়তি সাক্ষাতে,—
"হ'বে কি সৌভাগ্য পুনঃ এ ভারতে?
স্বরূপ বচন বল আমায়;

"হ'বে না কি হিন্দু পুনঃ একপ্রাণ?
হ'বেনা কি হিন্দু পুনঃ বলবান?
স্বাধীনতা তরে ঢালিবেনা প্রাণ?
চিরদিন র'বে বিজাতি-পায়?"

শুনিয়া এতেক, নিয়তি তখন
অবনত মুখে মৌনভাবে রন্।
ক্ষণকাল পরে ফিরা'য়ে বদন,
হেরি ভারতেরে বিলাপিয়া কন্,—
ফেলি দীর্ঘশ্বাস আবেগ ভরে;
"হায় সখি! তুই চির-পরাধীন,
আমি যে নিয়তি আমিও অধীন;
তা'না হ'লে আমি করিয়া স্বাধীন
পররাজ হ'তে দিতাম তোরে।

"কিন্তু পারিব না—শুন রে বচন
শুন পিতামহ ভবিষ্য-লিখন
যুগ মন্বন্তর পরে আরম্ভন,—
নূতন সৃজন তোমার করে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।



অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

ষড়-যন্ত্র।

কৃষ্ণপক্ষীয়া চতুর্দ্দশী,—রজনী ঘোর অন্ধকারে আবৃতা। তাহাতে আবার নভোমণ্ডল নিবীড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, প্রকৃতি কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। একটি তারকা নাই, যাহার ক্ষীণালোকে অতীব নিকটস্থ বস্তুও নয়ন-গোচর হইতে পারে। ভগবান্ চন্দ্রমার অদর্শনে, বিভাবরী মহা মান-ভরে অসিত বসনে অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া আছেন। বদনে হাস্য নাই, অঙ্গে লাবণ্য নাই। কেবল এক একবার তড়িন্ময়ী ভ্রুকুটি কুটিল সক্রোধ কটাক্ষ-বিক্ষেপে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদ্রিত করিয়া, বৃষ্টি-রূপ অবিরল অশ্রু-বারি মোচন করিতেছেন। বায়ু অতি বেগ-ভরে বহিতেছে না বটে, কিন্তু, এত শীতল যে, অধিকক্ষণ অঙ্গে লাগাইলে, অসহ্য জ্ঞান হয়। কেবল মুরজ-স্বন-সন্নিভ মধুর গম্ভীর জলদ-নির্ঘোষ ও কল্লোলিনীর কুল-কুল শব্দই শ্রবণ গোচর হইতেছে। পথে, জন প্রাণীর সমাগম নাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। আসুন, পাঠক মহাশয়! এই সময় আমরা হুগলীর প্রান্তবর্ত্তী ঐ জঙ্গল মধ্যে একবার প্রবেশ করি। প্রবেশ করা বড় কঠিন বটে, কেন না স্থান অতি ভয়ঙ্কর। এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন-বিভাগে সহস্র সহস্র ব্যক্তির কঙ্কাল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যাহা হউক, এই তামসী নিশার সাহায্যে ঐ বৃক্ষান্তরাল হইতে নিরীক্ষণ করুন, মহারাষ্ট্রীয় দস্যু-দলাধিপতি ধমুজী রাও, এক্ষণে কি করিতেছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মহারাষ্ট্রগণ পাণিপথের যুদ্ধের পর, প্রায় সাত বৎসরকাল নিতান্ত নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু এ সময় তাহারা নববলে বলীয়ান হইয়া, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, এই উর্ব্বরা বঙ্গভূমিও যে, তাহাদের পদাঙ্কিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে বঙ্গদেশ নিখিল ভূমণ্ডলের অন্নভার গ্রহণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—যে বঙ্গদেশ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান্, সকল জাতিরই ভরণ পোষণের একমাত্র উপায় বলিলেও বলা যায়,—সেই বঙ্গদেশ যে, লুব্ধ-প্রকৃতি মহারাষ্ট্রগণের নয়ন-পথ অতিক্রম করিবে, ইহা অতি অসম্ভব। তাহারা অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া, ভারতের অসংখ্য দেশ লুণ্ঠন ও অসংখ্য প্রাণীর প্রাণবধ করিয়া স্বীয় উদর ভরণে ব্যাপৃত হইয়াছিল, ইহারাই এককালে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট্ আরঙ্গজীবকে নিদ্রা যাইতে দেয় নাই। ইহারাই আবার এক্ষণে ইংরাজ-রাজ্যের শান্তি-ভঙ্গ করিতে বঙ্গদেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ধমুজী রাও এই বঙ্গদেশস্থ মহারাষ্ট্রীয় দস্যু-দলের অধিপতি। আসুন, একবার দেখা যাউক, তিনি এই তামসী রজনীতে কি কার্য্য করিতেছেন।

উল্লিখিত বন-বিভাগের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর। চতুর্দ্দিক দুর্ভেদ্য বৃক্ষ-প্রাচীরে বেষ্টিত। তন্মধ্যে বংশ-বিনির্ম্মিত সুপ্রশস্ত গৃহ সকল বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে কোনটি অশ্বশালা, কোনটি গোশালা,—কোনটি অস্ত্রাগার, কোনটি রমণিগণের বাসস্থান,—কোনটি বীরগণের বাসস্থান। গৃহ-বেষ্টিত সুবিস্তীর্ণ অঙ্গণে মল্ল-ভূমি শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত একত্র করিয়া,একটি বৃহৎ গ্রাম বলিলেও বলা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রহরিগণ,শাণিত তরবারি, ধনুর্ব্বাণ, বল্লম প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, শান্তি রক্ষা করিতেছে। কাহার সাধ্য সেই বৃক্ষ-প্রাচীরের নিকটস্থ হয়! ভীষণ যমালয়-সদৃশ সেই মহারাষ্ট্রীয় দুর্গ,দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ শুখাইয়া যায়, নিকটবর্ত্তী হওয়া ত দূরের কথা। পরিভ্রমণশীল পান্থগণ না জানিয়া ঐ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া, কি শোচনীয় দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে!

একটি বৃহৎ গৃহ,উপরিভাগ শুভ্রবর্ণ চন্দ্রাতপে মণ্ডিত, তন্নিম্নে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খট্টা,—গৃহটি দীপালোকে উদ্ভাসিত। দস্যুদলাধিপতি ধনুজী এক্ষণে পীড়িত অবস্থায় সেই খট্টার উপর শয়ন করিয়া, রজনী যাপন করিতেছেন। পার্শ্বদেশে এক বিশাল অসি নিরন্তর নিপতিত রহিয়াছে। পীড়া যদিও অতিশয় কঠিন, কিন্তু, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্য বশতঃ মুখ-মণ্ডলে কোন বিকৃতভাব লক্ষিত হইতেছে না। গৃহ বহির্ভাগেও গৃহাভ্যন্তরে প্রহরিগণ, নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। দুই পুত্র—আনন্দরাম ও মহাতপচাঁদ—পদ-প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, কখন বা গাত্রে করামর্ষণ, কখন বা পদ-সেবা করিতেছেন। তাঁহারা পিতার এই সাঙ্ঘাতিক পীড়া সন্দর্শন করিয়া, আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ম্লান-বদনে নিরন্তর পিতার মুখের দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন। একাদশ বর্ষীয়া কন্যা মতিয়া শিরোভাগে দণ্ডায়মানা হইয়া, কুসুম কোমল করতল দ্বারা, পিতার মস্তক-বেদনা প্রশমন করিতেছেন। সহধর্ম্মিণী মীরা ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া, অজস্র অশ্রু-বিমোচন ও সময়ে সময়ে স্বামীর মুখে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেছেন। কবে যে স্বামী আরোগ্য হইবেন, কবে যে তাঁহার মুখারবিন্দ পুনরায় প্রফুল্ল দেখিবেন, কবে যে তিনি অশ্বারোহণে মেদিনী কম্পমান করিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক বিদেশীয় অরাতিগণের ভয়োৎপাদন করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহার মুখ-পদ্ম অনবরত মলিন ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি কখন সখীর কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া নিঃশব্দে রোদন করেন, কখন বা সাহসে বুক বাঁধিয়া, অকাতরে স্বামীর পরিচর্য্যা করেন।

আনন্দরাম নিরাশ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! কেমন আছেন?" আনন্দরাম জানিতেন, পিতা আজ কয় দিবস হইল কথা কহেন না, ডাকিলে উত্তর দেন না; সুতরাং, আজ ও যে তিনি কথা কহিবেন, সে আশা তাঁহার অন্তরে স্থান পায় নাই।

ধনুজী জলদ-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,—"ভয় পাইও না, আমি অনেক ভাল আছি।"

পিতার মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, আশা-পবন তাঁহাদিগের বদন-সরোজ প্রস্ফুটিত করিল। মীরা অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া শশব্যস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং

স্বামীর মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

ধনুজী কথঞ্চিৎ তনুমোটন করিয়া কহিলেন, "আঃ! আজ আমি অনেক সুস্থ হইয়াছি, গীত-শ্রবণে স্পৃহা হইতেছে।"

আনন্দরাম বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

ধনুজী কহিলেন,—"আমার অসুখ দেখিয়া বীরগণ বিরস বদনে কালযাপন করিতেছে; মতিয়া! তোমার সেই গীতটি একবার গাও দেখি, শুনা যাউক।"

মতিয়া বালিকা-বয়সেই সুঙ্গীত-বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণা হইয়াছিলেন। তিনি পিতা মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট পুস্তকাদি অধ্যয়ন এবং মহারাষ্ট্রীয় প্রথানুসারে অশ্বচালনাদি কার্য্যেও বিশেষরূপ সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধ বা দেশ-লুণ্ঠনাদি কার্য্যে প্রস্তুত হইত, তিনি তখন স্বরচিত উৎসাহ-পরিপূর্ণ গাঁথা সকল গান করিয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেন। তাঁহার সেই তান-লয়-সম্বলিত মধুর কণ্ঠ-নিনাদ শ্রবণ করিয়া, বীরগণ বল্লম আস্ফালন-পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিত, অশ্বগণ হ্রেষা-রব করিয়া নৃত্য করিত। তিনি পিতার অনুজ্ঞাক্রমে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। পারিষদগণ সকলে একত্র সমবেত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যে গৃহ বিষণ্ণভাবে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাই আবার এক্ষণে মহানন্দে ভাসমান! ফলতঃ, অধ্যক্ষের সাঙ্ঘাতিক পীড়া অবলোকন করিয়া, সকলেই নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগের অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। মতিয়া বেহাগ রাগিণীতে গাহিলেন,—

কেন বিরস বদন?
অলসে অবশ-আঁখি দেখি বীরগণ?
গরজে গভীর ঘন, তাহে কি ব্যাকুল প্রাণ?
হাসে ত দামিনী ক্ষণ, ঝলসি' নয়ন?
প্রণমি পিণাকী-পদে, জয় জয় ঘোর নাদে
কাঁপাও ভুবন;—
তোদের কঠিন কাজ, সাজ রে সমরে সাজ,—
কেন কেন কালব্যাজ? ত্যজরে শয়ন।
স্মর' পূর্ব্ব পিতৃগণে, চল রে হরিষ মনে,
সমর প্রাঙ্গণ;—
শিবজী, শম্ভুজী বাজী, বালাজী, রঘুজী, সাজী,
কোথায় রহিলে আজি! দেহ দরশন।
নিস্তেজ বান্ধব, ভ্রাতা, মলিনা ভারত-মাতা—
করিছে রোদন;—
দুর্ব্বহ কলঙ্ক-ভার, সহিতে না পারি আর,
ঘুচাও বন্ধন তার, করি প্রাণপণ।

এই কোকিল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুমধুর গীত শ্রবণ করিয়া, ধনুজীর হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার সমস্ত পীড়া শান্তি হইয়া, বদন-মণ্ডল প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি নব বলে বলীয়ান হইয়া, শয্যার উপর উপবেশন করিলেন এবং মতিয়ার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া, গণ্ডদেশ চুম্বন করিলেন। ভৃত্য ও পারিষদ-বর্গ তাঁহার ঈদৃশ ভাব অবলোকন করিয়া, মহানন্দে ভাসমান হইল এবং কোষ-মুক্ত কৃপাণ লইয়া, আস্ফালন করিতে লাগিল। কেহ বা বাহ্বাস্ফোটন, কেহ বা কূর্দন, কেহ বা ধনুষ্টঙ্কারে ব্যাপৃত হইল। অশ্বগণ হ্রেষারব করিল। মহান্ কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া, তামসী রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। পতিব্রতা মীরার হৃদয় ভার অপনীত হইল, তিনি পতির

চরণ-যুগল আলিঙ্গন করিয়া, সপ্রেম কটাক্ষে তাঁহার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গীত সমাপনান্তে ধন্নুজী পুনরায় শয়ন করিলেন এবং পারিষদবর্গের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্র দুর্গের অবস্থা ত এইরূপ। পাঠক মহাশয়! একবার গঙ্গাতীরে আগমন করিয়া কর্ণপাত করুন, কোন্ দিক হইতে ক্ষেপনীর ঝপ্ ঝপ্ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এমন দুর্য্যোগ-সমন্বিত নিশীথকালে, ক্ষেপণী-শব্দ শ্রবণ করিয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী মহারাষ্ট্র প্রহরিগণ চমকিত হইল এবং সশস্ত্রে দলবদ্ধ হইয়া নীর সন্নিকটে অবতরণ-পূর্ব্বক,দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখিল—একখানি ভাউলে উত্তরাভিমুখে আগমন করিতেছে। নৌকাখানি নিরাতঙ্কে নিকটস্থ হইতেছে দেখিয়া, প্রহরিগণ সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল,—"এপথে কে যায়?" নৌকা হইতে উত্তর হইল,—"দুর্গাপদ।"প্রহরিগণ হাহা করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল এবং অস্ত্র নামাইল।

নৌকা ঘাটে লাগিল, দুর্গাপদ পোত হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক, দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রহরিগণ নমস্কার ও প্রণামাদি করিয়া, কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল, দুর্গাপদ তাহাদিগকে মহারাষ্ট্র দুর্গের মঙ্গল-সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুইজন প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহারা দ্বারস্থ হইলে, দ্বার রক্ষকদিগের মধ্যে একজন উঠিয়া গিয়া, প্রভুকে সংবাদ দিল। ধন্নুজী বলিলেন,—"বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।" দ্বার-রক্ষক বেগে ধাবমান হইয়া, দুর্গাপদকে সঙ্গে লইয়া, প্রভুর নিকট উপস্থিত করিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রহরিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কাষ্ঠাসন প্রদত্ত হইলে, দুর্গাপদ উপবেশন করিলেন এবং পরস্পর কুশল-প্রশ্ন আরম্ভ হইল।

ধন্নু। কি চণ্ডী বাবু! ভাল ত?

চণ্ডী। আজ্ঞে হাঁ—রাওজীর সমস্ত কুশল ত?

ধন্নু। অপরাপর সকলি মঙ্গল,—কেবল নিজ দেহেরই অমঙ্গল।

চণ্ডী। আশা করি, শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন্। আপনি ভাল থাক্‌লে, আমাদের কত ভরসা।

ধন্নু। ঘোষাল মহাশয় কেমন আছেন?

চণ্ডী। আজ্ঞে তিনি আছেন ভাল। তাঁর কথা আর আমায় জিজ্ঞাসা করেন কেন? তিনি যদি পিতার মত পিতা হ'তেন, তা' হ'লে কি আর এই দুর্য্যোগে আপনাকে কষ্ট দিতে আসি?

ধন্নু। কেন কেন—কি হয়েছে! এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?

চণ্ডী। বিষণ্ণ হ'বার কারণ হলেই বিষণ্ণ হয় লোক।

ধন্নু। তবু এত রাত্রে শুভাগমনের কারণ কি?

চণ্ডী। মশা মার্‌তে কামান পাতা।

ধন্নু। মশা টা কে?

চণ্ডী। প্রতাপ, প্রতাপ, — নৈহাটীর প্রতাপ।

ধন্নু। সে আর মশা কেমন ক'রে? তার ও লোক জন অনেক আছে। ও মাসে কার সঙ্গে একটা দাঙ্গা হয়, তা'তে সে তিন শ লাঠিয়াল বার করে, তার মধ্যে অনেকেই ভাল খেলোয়ার ছিল।

চণ্ডী। আজ্ঞে আপনার বাপ মার আশী-

র্ব্বাদে আমাদের পাল্লায় ও লোক অনেক আছে। তবে ঐ যে বল্লেম বাবা গা কল্লেন না, এত ক'রে বুঝালাম কিছুতেই গা কল্লেন না।

ধনু। ব্যাপারখানা বড় গুরুতর না কি?

চণ্ডী। আজ্ঞে হাঁ, গুরুতর না ত কি?

ধনু। শুন্‌তে পাইনে?

চণ্ডী। শোনা'বার জন্যই ত আসা। তবে, কিছু গোপনীয়—তাই কানে কানে বল্‌তে চাই।

ধনু। সচ্ছন্দে বলুন।

চণ্ডীচরণ কানে কানে সমস্তই বলিল। ধনুজী নিমরাজি হইলেন। ধনুজীর মুখে পরিস্কার উত্তর না পাইয়া,চণ্ডীচরণ কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়! আপনি সিংহ হইয়া শৃগালকে ভয় করিতেছেন?

কথাটা ধনুজীর বড় ভাল লাগিল না। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"চণ্ডী বাবু! না বুঝে সুঝে একটা কথা ফস্ করে ব'লে ফেল্‌লেন? এ জাতি ভয় কা'কে বলে তা'কি জানে? এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মা শিবজীর নাম শুনেছেন কি? অবশ্যই শুনেছেন। তিনি দিল্লির বাদসাহকে নাকে দড়ী দিয়ে ঘুরিয়েছিলেন, এরা শত্রুদমন কেমন ক'রে কর্ত্তে হয়, তা' ভালরূপ জানে। যদি মূলে চোপ দিলেই কায হয়, তবে ডাল পালা কাটে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আপনার পিতার এ বিষয়ে মত নাই কেন?"

চণ্ডীচরণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, অধোবদনে বলিতে লাগিল—"মহাশয়! না বুঝে একটা কথা ব'লে ফেলেছি, তা'তে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না, সুথার পুত্র বলিয়া অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

ধনুজী হা-হা-হা করিয়া হাস্য করিলেন এবং বলিলেন,—"তাই ত ঘোষাল মহাশয় এবিষয়ে সম্মত নন, এর কারণ কি?

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"মধ্যে একটা বড় গোলমাল হয়, তা'ত আপনি জানেন?"

ধনু। হাঁ হাঁ আর বল্‌তে হ'বে না। তাতেই বুঝি ভয় পেয়েছেন? আরে ও ত আমাদের অঙ্গের ভূষণ।

চণ্ডী। আজ্ঞে তা বৈ কি। তবে কবে আপনার যাওয়া হ'বে?

ধনু। আমার ত অবস্থা দেখ্‌ছেন। আমি আপনাকে একদল লোক দিব, তার মধ্যে ভাল ভাল খেলোয়ার থাকবে; আমার কনিষ্ঠ পুত্র মহাতাপচাঁদ তাদের অধ্যক্ষ থাক্‌বে।

চণ্ডী। যথেষ্ঠ—যথেষ্ট।

ধনু। কেমন, কি বলেন?

চণ্ডী। আজ্ঞে তা' হলেই হ'বে, তবে কবে আমার প্রতি অনুগ্রহ হ'বে?

ধনু। তা'ঠিক বল্‌তে পাচ্চি না। আপনি খবর পাবেন। কাল ত আমি গড়গোবিন্দপুর, জঙ্গলকাটি,ঐ সব অঞ্চলে এক দল লোক পাঠা'ব। সে দিন বেটারা আমাদের একটা লোককে ধ'রে পুলিশের হাতে সমর্পণ করে। আদালতে মোকদ্দমা হ'য়ে তার ফাঁসি হয়। তাতেই আমার ও অঞ্চলের উপর বড় রাগ। আর তাও বলি—এই জাতির কোন ব্যক্তি শত্রু হস্ত হইতে যদি পলাইতেই না পারিল, তবে তার মৃত্যুই ভাল।

চণ্ডী। তবে মহাশয়! এখন রাত অনেক হ'য়েছে, আপনার অসুখ শরীর, আপনি নিদ্রা যান, আমি এখন আসি।

ধনু। যে আজ্ঞা অপনি নিশ্চিন্ত থাক্-

বেন। আপনার নিকট যখন্ অঙ্গীকার কল্লেম, তখন আর এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ কর্‌বেন না।

চণ্ডী। যে আজ্ঞা আপনার কথাতেই কার্য্য অর্দ্ধেক হাসিল্। এখন বিদায় হই।

ধনুজীর দুই পুত্র গাত্রোত্থান করিয়া চণ্ডীচরণকে সাদর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। দুইজন দৌবারিক সঙ্গে চলিল, চণ্ডীচরণ নৌকায় আরোহণ করিলেন। ধনুজী শয়ন করিলেন।

এই তামসী নিশায় কত স্থানে কত প্রকার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, মনুষ্যগণ কেবল মনুষ্যের সর্ব্বনাশেই বিব্রত! জগতের গতিই এইরূপ।

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

রতনমণি ও হরিচরণ।

হরিচরণ একজন কৃষকের সন্তান;—বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৬।১৭ বৎসর। হরিচরণ পিতার সহিত মাঠে চাষ-বাস করিতে যায়, এক এক বার কি মনে ক'রে ছট্‌কে বেরিয়ে ও আসে। পথি মধ্যে কোন নীচ-জাতীয়া স্ত্রীলোক দেখিলে, হরিচরণ ঠাট্টা তামাসা করিতেও ছাড়ে না, তাহারা ও মুখ ভ্যাঙায় ও উল্টা লাথি দেখায়। হরিচরণ তাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া, বরং আহ্লাদিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে; ফলতঃ, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সকলেই তাহাকে জানিত। হরিচরণ তাহাদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করিত বটে, কিন্তু একদিন হরিচরণের দেখা না পাইলে, তাহাদের দিন আর ভাল যাইত না। রোজ দেখা পাওয়া চাই,—রোজ উপদ্রব সহাও চাই,—তা নইলে মজা কি?

রতনমণি ডোমের মেয়ে, চুপ্‌ড়ি বোনে, ভাত খায়। রতনমণি সধবা, বয়ঃক্রম আন্দাজ বিশ বাইশ বৎসর, চরিত্র নির্দ্দোষ।

একদিন হরিচরণ পিতার অনুমতি ক্রমে, ক্ষেত্র হইতে আগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে ছিল এবং তাহার পিতা অপর দিকে লাঙ্গল দিতেছিল। হরিচরণ ভাবিল—অনেকক্ষণ কায করা হইয়াছে, এক বার পাড়ায় গিয়া দেখি, কে কি করিতেছে। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল, রতনমণি আপনার দাওয়ায় বসিয়া, চুপ্‌ড়ি বুনিতেছে। হরিচরণ অমনি পশ্চাতে থাকিয়া, গা ঢাকা হইল। রতনমণি একটি চুপ্‌ড়ি সমাপ্ত করিয়া, তামাকু সাজিয়া, ধূম পান করিতে লাগিল। হরিচরণ এই বার মজা পাইল। একটি ঝোপের আড়ালে বসিয়া, বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল,—

আলুক্ মালুক্, শালুক রে
বড় শালুকের পাতা—
মেয়ে হ'য়ে তামুক্ খায়,
একি লাজের কথা!

রতনমণি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার তামাকু খাইতে লাগিল। হরিচরণ আবার বলিল,—

ও তার নাম্‌টি ভাল রঙ্‌টি কাল
যেমন মেঘের ঘটা—
আবার উচ্-কপালী চেরণ-দাঁতী
এম্‌নি রূপের ছটা!!

রতন বিরক্ত হইয়া হুঁকা হস্তে করিয়া,

দাওয়া হইতে নামিল এবং গালাগালি দিয়া বলিল,—"কেরে ড্যাক্‌রা ছোঁড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব, জানিস্‌নে?

হরিচরণ আবার নাকি-সুরে বলিল,—

আগ্ করোনি, আদামণি!
আমি ব্রজের কালা!
তোমার লেগে, এলেম্ ভেগে,
ঠিক্ দুক্ষুর বেলা।

রতনমণি আভাষে বুঝিল—হরিচরণ ভিন্ন আর কেহই নয়। এমন কথায় কথায় ছড়া কাট্‌তে আর কে আছে! আর এমন নির্ভয়ে স্ত্রীলোকদের সহিত তামাসা করিতেই বা কে আছে? তথাপি কপট ক্রোধে বলিল,—"দূর হ, হতচ্ছাড়া, উন্‌পাঁজুরে ছোঁড়া! কম্‌নেকার; কোত্থেকে মর্ত্তে এসেছে র‍্যা?"

হরিচরণ আবার বলিল,—

তুমি চিন্‌তে নার, বিন্দে দূতি!
কতই জান ছল!
গাছের গোড়ায় মেরে কোপ্—
আগায় ঢাল জল।

রতনমণি হাসি চাপিতে পারিল না। কপট ক্রোধ আর কতক্ষণ থাকিবে? হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেরে, হরে বুঝি? এতও জানিস? বলি এ দিকে আয় না,—শুনে যা'না। কাছে এসে ছড়া বল্, শোনা যাগ্।

হরিচরণ বলিল,—

কাছে যেতে বল, শুন্‌তে ভাল,
কাযে কিছু নয়।
তফাৎ থেকেই এত চোট—
সাম্‌নে বা কি হয়!
একটি কথা কইতে পারি,
কিন্তু মরি ভয়ে—
ঐ থাঁদা নাকের ভুরো জাঁক্
থাক্‌ব কত স'য়ে।

রতনমণি হরিচরণকে আন্তরিক ভাল বাসিত, তার জন্যে খাবার রাখিত। হরিচরণও রতনকে আন্তরিক ভাল বাসিত, সে সময়ে সময়ে আসিয়া, রতনের কত কায কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিত। রতন হাসিতে হাসিতে বলিল,—"না রে না, ভুরো জাঁক নয়, ভুরো জাঁক নয়, তোর জন্যে নার্‌কেল নাড়ু রেখেছি, খাবি আয়।"

খা'বার নামে হরিচরণ বড়ই সন্তোষ। মনে ভাবিল—সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, দেখা দিতে হলো। কাছে গেলে কিছু না কিছু হ'তেই পারে, না গেলে তাল ফস্‌কে যেতে পারে। সাত পাঁচ ভাবিয়া, ঝোপের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিল,—

হাঁ এই কথাটি কাযের কথা,
লাগছে মিঠে মিঠে;
(তবে) এক পা এগুই এক পা পেছুই,—
পেটে খাই কি পিঠে!

এই কথা বলিতে বলিতে হরিচরণ হাস্য-মুখে রতনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অধিক অগ্রসর হইল না। রতন দেখিল হরিচরণ ভয়ে অগ্রসর হইতেছে না। আদর করিয়া ডাকিল। হরিচরণ যেমন নিকটে আসিল, রতন অমনি তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া ঘাড় নামাইয়া, পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিল। হরিচরণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিচরণ কহিল,—"এই জন্যে বুঝি এত আদর?" রতন বলিল,—"তা নয় ত কি? আবার মারব।"

রতন বসিতে খুরসি দিল, হরিচরণ উপ-

বেশন করিল। রতন জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ রে হরে! তুই কাল এ দিকে আসিস্ নি কেন?"

হরিচরণ বল্লিল,—

কি করি ভাই! কোথায় বা যাই?
পাড়ায় বড় গোল।
পরের কোন ছিদ্র পেলে,
সবাই বাজায় ঢোল্!

রতনমণি বলিল,—"হাঁ রে হরে! তোর কি কথায় কথায় ছড়া? তুই কি সহজ কথা কইতে জানিস্‌নে? ছেলে ত নয়, যেন কল্পতরু!"

হরিচরণ বলিল,—"আর ভাই! ছড়া টড়া আর বড় কাটিনে, ছড়া গুলো লোকের বড় কড়া লাগে; আর সহজ কথা বল্‌ছ কি—

সহজের কাল্‌টি যে নাই, বাঁকা সিপাই;
সবাই রাগে ভরা!
দেমাকে মাটি ফাটে, কথার চোটে,
কাঁপায় বসুন্ধরা!!

রতন। কেন কেন কি হ'য়েছে? এত রাগ কেন—কে কি ক'রেছে তোর?

হরি। আরে এই দেখ না, হুদে বেটাকে বল্লেম খবরটা সত্যি, সে বেটা বিশ্বাস কর্ত্তে চায় না। আরে হরিচরণ শর্ম্মা পাড়ার কোন খবর টা না রাখে?

রতন। তোর কথা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; তুই কিসের কথা বল্‌চিস্, বল দেখি?

হরি। আঃ, নেকি আমার! ভাজা মাছ-খানা উল্টে খেতে জানেন না। কাল রাত্তিরে অত গোলমাল, কিছুই কানে যায় নি? একেবারে ম'রে ঘুমিয়েছিলি নাকি?

রতন। হ্যাঁ-হ্যাঁ কি একটা গোল উঠে ছিল বটে, তা' আমি ওঁকে জিগ্‌গেস কল্লুম, তা উনি বল্লেন,—"ও সব কথা তোমাদের শোন্‌বার আবশ্যক নেই।" আমি আর কি কর্‌ব? থেমে গেলুম্।

হরি চুপি চুপি বলিতে লাগিল,—"আরে" জান না? ঘোষাল ম'শায়ের বউ—তা সেই বউ, কাল খিড়্‌কি দিয়ে পালাচ্ছিল; ভাগ্যে বাড়ীর সবাই সজাগ ছিল, তাই ধরে ফেল্লে। এখন তার হাতে পায়ে দড়ী বেঁধে, একটা ঘরে পুরে, চাবি বন্ধ ক'রে রেখেছে। এখন কত কথাই উঠ্‌ছে। কেউ বল্‌ছে,—"আজ কত দিন ধ'রে বউটি প্রাণত্যাগ কর্‌ব, প্রাণ-ত্যাগ কর্‌ব বলে থাকে, তাই গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। কেউ বলে,—"বউটা সে দিন গলায় খুর দিয়ে, আত্মহত্যা কর্ত্তে গিয়ে ছিল, বাড়ীর কে কে দেখ্‌তে পেয়ে ছিল,—পেয়ে চণ্ডীবাবুকে বলে দেয়,—তাই শুনে চণ্ডী-বাবু তাকে এক চোট্ ঠ্যাঙ্গায়, তাতেই বউ পুকুরে ডুব্‌তে যাচ্ছিল।" কিন্তু, শর্ম্মা সকলই জানেন, শর্ম্মাকে কে কি না বলে? শর্ম্মা বাড়ীর ঝিকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে, সকলই আদায় করেছেন। জলে ঝাঁপ দেওয়াও নয়, গলায় ক্ষুর দেওয়াও নয়, মারও নয়, ধোর ও নয়—ছুঁড়ী বিয়ে হ'য়ে অবধিই এই রকম, উড়ুক্কু পাখীর মত কেবল পালাই পালাই করে। তবে চণ্ডী বাবুর স্বভাব টা বড় খারাপ—তিনি বড় বার-ফট্‌কা; সর্ব্বদাই মদ ভাং খান্, আর বেশ্যে-বাড়ী রাত্ কাটান্—সেই জন্যেই যা' বল।"

রতনমণি উত্তর করিল,—"তা ভাতার মন্দ-হোক্, ছোন্দ হোক্, মেয়ে মানুষ কি কখন ঠিক তার মতন হ'তে পারে? বড় ঘরের বড় কথা! বল্‌তে পারিনে তাঁদের কি রকম, আমাদের ছোট লোকের ঘরে, কিন্তু এমনটি

হ'বার যো নাই। তবে যে আমাদের ঘরে কেউ মন্দ পথে যায়, সে বেশিভাগ পেটের দায়ে। যার ভাতার দুবেলা দু'পাথর ভাত দিতে পাল্লে, এক থান রাঙা পেড়ে শাড়ী পর্‌তে দিতে পাল্লে, সিঁথি-ভরা সিঁদুর, আর দু'হাতে দু'গাছি রুলি দিতে পাল্লে, সে আর ও পথে যায় না। ভাতার যদি নিতান্ত মন্দ হয়, তবু সে দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খায়, আর দিন রাত চোখের জল ফেলে, তবু ওপথে যেতে চায় না। স্বোয়ামি মন্দ হ'ল বলেই কি মেয়ে মানুষ ও সেই রকম হ'বে? তাও কি কখন হতে পারে?"

এই কথায় আমাদের নব্য পাঠক-বৃন্দ যাহাই মনে করুন, কিন্তু আজ কাল অনেকের মুখে এরূপ শুনা যায় যে, 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' হওয়াই উচিত, তা' নইলে সিধে হয় না। আগে এরূপ শাসন ছিল যে, যদি কোন বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোকের চরিত্র-বিষয়ে কোন সন্দেহ হইত, তাহা হইলে, গ্রামস্থ সকলেই তাহাদের "এক ঘরে" করিত। তাহাদের সহিত কাহারও কোন করণ কারণ চলিত না, ক্রিয়ে কর্ম্মে সকলেই তাদের বাদ দিত, বাটীতে কোন কায কর্ম্ম হইলে, আত্মীয় কুটুম্ব দশজনকে খাওয়াইতে হইলে, অদ্যবধি এরূপ প্রথা আছে যে, রন্ধন-শালায় কোন কুচরিত্রা স্ত্রীলোক থাকিবার যো নাই। যাহাকে সকলে ভাল বলিয়া জানে—যাহার চরিত্রে কোন দোষ নাই—এমন স্ত্রীলোক বাছিয়া আনিয়া, রন্ধন করাইতে হয়—সতী-সমাজে ইহা একটি সামান্য উৎসাহ, সামান্য মান্যের বিষয় নহে। সমাজ-শাসন করিবার জন্য, আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ যে সকল সদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সভ্যগণের মার্জ্জিত বুদ্ধির অগম্য। ইঁহাদের অত্যাচারে আমাদের পুরাতন পবিত্র প্রথা সকল দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে; ইঁহারা যে সকল নূতন প্রথা—নূতন প্রণালী—সংস্থাপন করিতেছেন, সে সমস্তই আমাদের বিশেষ অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিতেছে। ইঁহাদের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ যতই আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভা বর্দ্ধন হইতেছে, ততই আমাদের সুখ শান্তি লোপ পাইতেছে। ইঁহারা একবারও ভাবেন না যে, সংসারীর সুখ শান্তির কারণই, স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং অধীনতাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম-রক্ষার এক মাত্র উপায় ও অবলম্বন। ইঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকে মনোনিবেশ করিয়া, সংসারীর সুখের পথ দিন দিন কণ্ঠকাকীর্ণ করিতেছেন; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দুঃখ ও অশান্তির বৃদ্ধি করিতেছেন, তথাপি পরাঙ্মুখ হইতে চান না! আজ কাল—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কথা বলিতেছি না—কত বড় ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাটীতে কোন ক্রিয়া-কাণ্ড হইলে, স্ত্রীলোক দ্বারা কোন কার্য্যই সমাধা হয় না! সকল কার্য্যই সূপকার ব্রাহ্মণ দ্বারা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সাটিনের বডিস্ পরিয়া, পায়ে মোজা দিয়া, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকেন। এমন ও শুনা গিয়াছে যে, কোন কোন বাটীতে লোক জন খাওয়াইবার জন্য 'কণ্ট্র্যাক্‌টর' নিযুক্তও হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম-রক্ষার বিষয়ে আমাদের দেশে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার কথা আর কি বলিব, স্থানে স্থানে নানা সমাজ, স্থানে স্থানে সখি-সমিতি, বিদ্যালয় ও কালেজ সংস্থাপন হইয়াছে, চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার

হইবার আর ভাবনা নাই! যাহাদিগকে ঈশ্বর পরাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের দেশের আধুনিক সভ্যগণ তাহাদিগকে স্বাধীন করিতে চাহেন, ইহা কি সামান্য অহঙ্কারের বিষয়। এ কথায় কেহ কেহ বলিবেন,—"পূর্ব্বে ত আর ও সব ছিল না, তবে ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র-বধূ কুপথ-গামিনী হইয়া ছিল কেন?" তাঁহাদের প্রতি ব্যক্তব্য এই যে, গৃহের এক কোণে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে জল না দিয়া, ঘৃত ঢালিয়া দাও, গৃহ ভস্মসাৎ হইয়া যাউক। এক দিকের বাঁধ একটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা সংস্কার না করিয়া, সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেল, দেশ প্লাবিত হইয়া যাউক। তাঁহারা সহজ জ্ঞানে বিবেচনা করিয়া দেখুন—রতনমণি যা' দুই চারিটি কথা বলিল, তাহা অন্যায় কি ন্যায়। রতনমণি ছোট লোকের মেয়ে,—তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে,—সে ত আর সহরের সুশিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদিগের ন্যায় কপটতা ও প্রবঞ্চনা শিক্ষাকরে নাই, তবে, তাহার মুখে যাহা বাহির হইল, তাহা সভ্য-সমাজে গ্রাহ্য হউক, বা নাই হউক, সরল স্বভাব ব্যক্তি মাত্রেরই গ্রাহ্য ও পূজ্য হইবে, সন্দেহ নাই। বলিতে কি, যাহাকে আধুনিকগণ প্রকৃত 'সভ্যতা' বলিয়া থাকেন, তাহাই প্রকৃত অসভ্যতা আর যাহাকে 'উন্নতির সোপান' বলেন, তাহাই অবনতির একমাত্র কারণ। অধুনা যদি কোন বিদেশীয় ভদ্রলোক আমাদের দেশীয় কোন মহাত্মার বিশেষ বিবরণ শুনিতে চাহেন, তখনই আমাদের মাথা হেঁট করিতে হইবে, কেন না সামাজিকতা সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি না। এই রূপ ঘরে ঘরে উচ্চ উচ্চ বর্ণ মধ্যে যথেচ্ছাচার! যথেচ্ছাচারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ সমস্ত বলিতে গেলে, অল্পে সমাপ্ত হইবে না। আসুন, পাঠক মহাশয়! রাগ করিবেন না—রতনমণি ও হরিচরণ আবার কি কথোপকথন করিতেছে শ্রবণ করুন।

রতন। হাঁরে হরে! চণ্ডীবাবুর বিয়ে হ'য়েছিল কোথা?

হরি। হাল্‌দারদের বাড়ী।

রতন। কোন্ হাল্‌দার?

হরি। ঐ লাও, কোন হাল্‌দার—তা আমি তোকে বল্‌তে গেলুম্ কেন?

রতন। তা বল্‌না—বল্‌তে দোষ কি?

হরি। ঐ, যে হাল্‌দারদের সকলেই জানে, সেই ভবানিপুরের ওদিকে—

রতন। ওহো! বুঝিচি, বুঝিচি। আর বল্‌তে হ'বে না। তা হ'বে না কেন? ও ঘরের মেয়ে কি কখন ভাল হয়?

হরি। তবেই বোঝ,—আকরে টানে কি না।

রতন। তা বৈ কি ভাই,—হাঁরে! এখন আর কর্ত্তাকে বড় দেখিতে পাইনে কেন? কোন বিয়ারাম সিয়ারাম হ'য়েছে না কি?

হরিচরণ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল,—"কে দেগো?"

রতনমণি বলিল,—"আরে অমন করে বলিস্, কেউ শুন্‌লে পরে অনর্থপাত হ'বে যে।

হরি। আরে রাখ্ রাখ্, দেমো এখন ভেমো হয়ে গেছে।

রত। আরে যাগ্ যাগ্—আমাদের ও কথায় কায নেই, বাপু!

হরি। আরে জানিস্‌নে? সে দিন যে কর্ত্তা আর কর্ত্তার জামাই, দুজনেই শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিল।

রতন। সে আবার কি ?

হরি। আরে শ্রীধরে, শ্রীধরে, নেকি আমার! কিছু বোঝেন না।

রতন। ওমা! তাই বল্— জেলে গিয়েছিল—তাই লজ্জায় আর বড় বেরোয় না বুঝি ?

হরি। হ্যাঁ। তবে এর মধ্যে একদিন বেরিয়েছিল। এক বেটা নেড়ে, সে দিন একটা কার গরু চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই কর্ত্তা ছাদের উপর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে নেমে এসে—বল্যে না প্রত্যয় যাবি—বেটাকে এমন খড়ম্ পেটা কল্লে যে, বেটা অম্‌নি গরু ছেড়ে দিয়ে বাপ্ বাপ্ ক'রে পালিয়ে গেল। গরুটা নেড়ের হাতে পড়ে এক পা চলতে চায় নি! কিন্তু ঘোষাল মশায় যেমন দড়ী গাচ্‌টি ধরেছেন, অমনি সুড় সুড় করে সঙ্গে সঙ্গে গেল। ঘোষাল মশায় গরুটিকে গোয়ালে নিয়ে বাঁধ্‌লেন, তার পর যার গরু সে এসে নিয়ে গেল। তা' ও সব বিষয়ে ঘোশাল মশায় খুব ভাল।

রতন। হাঁরে হরে! বউটা যে কাল বেরিয়ে যাচ্ছিল, তা চণ্ডীবাবু কোথায় ছিল ?

হরি। আরে! সে ত প্রায়ই বাইরে বাইরে রাত কাটায়। কিন্তু কাল রাত্তিরে নৌকা ক'রে আর এক জায়গায় গিয়েছিল।

রতন। সে আবার কোথায় ?

হরি। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি ভাই ? তবে শর্ম্মার কাছে সকলই ধরা পড়ে।

রতন। তুই জানিস্ যদি তবে বল না।

হরি। সে সব কথায় এখন কাজ নাই। মোদ্দা ও পারে একটা ভারি ডাকা'তি হ'বে।

রতন। সে কি! বলিস্ কিরে!! কবে ? তোর কাছে এত খবর ও আসে!

হরি। এই ১৫।১৬ দিনের ভিতর। আরে আমি কি আর জান্‌তে পাত্তুম ? আজ সকালে ঘোষাল পাড়ায় গিয়েছিলুম্, দেখ্‌লুম্ একটা হোম্‌রা চোম্‌রা, ঘোড়ায় চড়া, ওদের বাড়িতে এসে নাম্‌ল। চণ্ডীবাবুকে খবর হ'ল, চণ্ডী বাবু বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, তাকে কত আদর করে, চণ্ডী-মণ্ডপে নিয়ে গিয়ে বসালে। আমি মনে কল্লুম কি বলে শুন্‌তে হ'বে, বাড়ীতে ত আর ঢুক্‌তে পাব না, সেই চণ্ডী-মণ্ডপের পিছনে গিয়ে আড়ি পাতলেম্; সব কথা ভাল শোনা গেল না—কিন্তু যাও ছু' চারটে শুনলেম্, তাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। যা' হোক, তুই যেন আর কারোর কাছে গল্প করিস্‌নে; তোকে কত জায়গা থেকে কত খবর এনে দিই,—তা তোর ঐ গুণটি আছে, তুই আর কারোর কাছে বল্‌তে যাস্‌নে। এখন তুই আমায় কিছু খেতে দিবি বল্‌ছিলি, দেনা।

রতনমণি ঘরের ভিতর গিয়া হাঁড়ি হইতে দুইটি নারিকেল-লাড় আনিয়া দিল। হরিচরণ বেড়ার অন্তরালে গিয়া লাড়ু ভক্ষণ করিতে লাগিল, আহারান্তে বাহিরে আসিয়া রতনমণিকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ ভাই! আমি যে তোদের বাড়ী এসে জল টল খাই তা' কেউ টের পায় কি ?" রতনমণি বলিল, "তুই কি পাগল হ'য়েছিস্ ?" হরিচরণ বলিল,—"দেখিস্ ভাই! তা' হ'লে আর আমার বিয়ে হ'বে না।"

রতনমণি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুই খাস্ কেন ?

হরি। তুই দিস্ কেন ?

রতন। আমি দিলেই, তুই খাবি?

হরি। খাই কি আর সাধ ক'রে?

"মনে করি—হেন কর্ম্ম না করিব না আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম, কি দোষ আমার?"

রতন। ওরে! তুই এখন্ মাঠে যা; অনেক ক্ষণ এসেছিস্,—তোর বাপ্ আবার মারবে টারবে।

হরি। ঠিক বলিছিস্। কিন্তু দেখ্ তোর কাছে এসে বস্‌লে, আর আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

রতন। তা যাতে রোজ রোজ আস্‌তে পারিস, তাই কর।

হরি। ঠিক বলিছিস্, আসি তবে এখন।

এই বলিয়া হরিচরণ গীত গাইতে গাইতে দৌড় কসাইল:—

কি হ'ল দেশের দশা!
কালে কালে কতই হ'বে।
(কালে কালে কতই হ'বে)
ভেতুড়ে বাঙ্গালীর ছেলে,
টেবিলেতে খানা খাবে॥
কি হল দেশের দশা!

ক্রমশঃ।



প্রিয়তমার প্রতি।

(১)

প্রাণাধিকে প্রিয়তমে, জীবন-তোষিণী!
শিরীষ-প্রসুন প্রায়,
কোমল সুন্দর কায়,
রূপে বিমোহিনী—জিনি অনঙ্গ-মোহিনী,
মানস-সরসে মম ফুল্ল-কমলিনী।
হৃদয়-গগনে মম,
বিকাশি জোছনা-প্রেম,
তুমি রে প্রেয়সি-শশি! করিছ বিরাজ,
গগনের শশী পায় তোমা হেরি লাজ!

(২)

প্রেমের প্রতিমা তুমি—পবিত্রতাময়।
হেরিয়াছি সুধাকরে
নীল কাদম্বিনী' পরে;
নিরমল অম্বু-তলে দেখেছি গো তায়,
তব মুখ সনে প্রিয়ে! তুলনা কি হয়!
হেরি ও বদন-চাঁদে,—
মনোদুখে শশী কাঁদে!
অকলঙ্ক সুধাকর তোমার বদন,
ও যে রে কলঙ্কী চাঁদ তুলনা কখন?

(৩)

এ মুখের সমকক্ষ চন্দ্র কভু নয়।
তবু তাঁর দরশনে,
কেন তোমা' পড়ে মনে?
হেরিলে শশাঙ্কে কেন মানসে উদয়—
তোমার বদন-ইন্দু,—পবিত্রতাময়।
নিরখিলে সুধাকরে
কেন জাগে হৃদি'পরে?

পূর্ব্ব স্মৃতি সমুদয় ;—ভাবনা অপার,
গগন-শশীর পানে না চাহিব আর !

(৪)

মনে পড়ে কত দিন কৌতুকে চাহিয়া—
হেরিতাম কত সুখে,
তোমার কমল-মুখে,
চন্দ্রমা-কিরণ যবে পড়িত আসিয়া,
কহিতাম কত বার আমোদে মাতিয়া।
গগনেতে চন্দ্রোদয়,
প্রত্যয় নাহিক হয়,
র'য়েছে বসিয়া চাঁদ সম্মুখে আমার,
কেমনে উঠিল চাঁদ আকাশে আবার ?

(৫)

তোমার বিচ্ছেদে প্রিয়ে ! ছিলাম যখন,
একবার মনে মনে,
ভাব দেখি, চন্দ্রাননে !
মণি-হারা ফণী সম কিরূপ তখন,
দারুণ যাতনানলে, দহিত জীবন।
যেমতি তরঙ্গ সনে
নাচে তরী ক্ষণে ক্ষণে ;
তেমতি, তোমার প্রেমে যে হৃদি নাচিত,
তোমা বিনা সে হৃদয় কভু কি হাসিত ?

(৬)

কভু নয়, কভু নয়,—বিনা শশধর
চকোর নাহিক হয়,
অপার আনন্দময় ;
হেরিলে প্রফুল্ল পদ্ম প্রফুল্ল ভ্রমর,
তারে না হেরিলে তার বিষণ্ণ অন্তর।
মধু বিনা মধুকরে
কভু কি গুঞ্জন করে ?
বসন্ত বিহনে নাহি কোকিল-ঝঙ্কার ;—
তোমা বিনা প্রাণেশ্বরি ! কি সুখ আমার ?

(৭)

অতীত প্রণয়-কথা জাগিত হৃদয়ে।
নিত্য নব প্রেম-রসে,
চুমিয়ে অধর-দেশে,
খেলেছি যে সব খেলা পরাণ ভরিয়ে,
কতই নবীন প্রেমে সোহাগে মাতিয়ে।
প্রাণে প্রাণে মিলাইয়ে,
আমোদে বিভোল হ'য়ে,
কত সুখে কত দিন হ'য়েছে অতীত,—
স্বপ্ন সম সেই সব মানসে উদিত !

(৮)

জাগিত সে দিন মনে—যেই শুভ দিনে—
দোঁহে প্রারব্ধের বশে
পবিত্র প্রণয়-পাশে
আবদ্ধ হইনু যবে বিধির বিধানে ;
দোঁহে দোঁহা জানিলাম প্রথম জীবনে।
শুভ দৃষ্টি শুভ ক্ষণে
অপাঙ্গে সলজ্জ প্রাণে
ক্ষণ প্রভা সম হায় ! হেরিলাম ক্ষণে,
তীব্রভাব ধরি সব জাগিত পরাণে।

(৯)

বিভিন্ন পরাণ দুই—হইল মিলন।
ভবিষ্যৎ আশা কত,
সুখে হ'ল সমুদিত ;
কত আশা-বীজ হৃদে করিনু রোপণ,
জানি না তখন হায় ! বিচ্ছেদ কেমন !
তোমার প্রণয়-কথা,
পবিত্র প্রেমের গাঁথা—
সলজ্জ মধুর বাক্যে যা' কিছু কহিতে,
জাগিত কি অভাগারে মরমে জ্বালা'তে ?

(১০)

আবার তোমায় হেরে জুড়া'ল জীবন।
ঘুচিল সে সব জ্বালা,
বিষম বিচ্ছেদ-ছলা ;

নিভিল সে চিন্তানলে হৃদয়-দহন—
আনন্দে নাচিল মম সন্তাপিত মন।
অতীত যতেক ক্লেশ,
সকলি হইল শেষ;
নব সম্মীলন-সুখে পুর্ণিত মানস;
পরিপূর্ণ পরিতোষ—কত বা হরষ।

(১১)

পরিপূর্ণ হ'ল হৃদি কত সুখ-ভরে।
যেমতি ময়ূরগণে
নবঘন দরশনে,
আনন্দে অধীর, হাসি ধরেনা অধরে,
তেমতি হাসিনু আমি অন্তরে অন্তরে।
অথবা কোকিলগণ,
করে মিষ্ট আলাপন,
শীত ঋতু অন্তে যথা আইলে মাধব;
তেমনি হৃদয় পিক করে কুহু-রব।

(১২)

যেমতি বসন্তাগমে সজ্জিতা প্রকৃতি।
মৃদুল মলয়-বলে,
কুসুম সৌরভ ঢালে,
সাজিয়া নবীন সাজে হাসে বসুমতী—
বিকাশি কুসুম-দন্ত হরষিত অতি।
বিহগ মধুর গায়,
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়,
অপূর্ব্ব সুষমা মরি! ধরায় বিরাজ,
বসন্তের আগমনে ধরে নব সাজ।

(১৩)

তেমতি রে প্রাণেশ্বরি! তব সমাগমে,
নেহারিও শশী মুখ
কত হৃদে পাই সুখ,
কেমনে সে সব প্রিয়ে! বর্ণিব বচনে;
দোঁহার হৃদয় এক পবিত্র মিলনে।
আশা-স্তরে কুতুহলে
কত সুখে হাসে খেলে,
পরিমল-পূর্ণ হৃদি প্রেম-সুধাপানে,
কোকিল-কুজন তব অমিয়-বচনে।

(১৪)

হেরিলে তোমার প্রিয়ে! সহাস্য বদন,
নিরমল সুখ-সরে,
কতই সোহাগ-ভরে,
আনন্দেতে প্রিয়তমে! হই রে মগন;
সন্তোষেতে পরিপূর্ণ হৃদয় তখন।
যেন মম জ্ঞান হয়,
হাস্যময় সমুদয়,
'দুঃখ' বলি এ জগতে কিছু নাহি আছে—
হাস্য মুখে তালে তালে সকলি নাচিছে!

(১৫)

আবার হেরিলে তব মলিন বদন,
শিহরয় প্রাণ মন,
বিষাদেতে নিমগন;
অনন্ত তুহিন-রাশি হৃদয়ে পতন,
চেতনা-বিহিন হৃদি কি জানি কেমন!
হেন হয় অনুভব,
প্রলয়—পলক-লব,
অন্তরে গরল-ধারা কে দিল ঢালিয়া?
বৃশ্চিক-দংশনে যাই মরমে মরিয়া।

(১৬)

নিবীড় জলদ-জালে ঘেরিলে গগন,
যেমতি দুঃখের ভরে,
ধরা পরিধান করে,
আবরি অনন্ত কায় তিমির-বসন;
ভেসে যায় অশ্রু-জলে করিয়া রোদন।
তেমতি রে প্রাণধন!
শুষ্ক হেরি ও বদন,
মানস পরে রে দুঃখে কালিমা-বসন,
যে যাতনা হয় তাহা না যায় বর্ণন।

(১৭)
পুনঃ যবে যায় মেঘ অন্ধকার নাশি—
হ'য়ে অতিশয় সুখী,
হয় ধরা হাস্য-মুখী!
তেমতি বিষাদ গতে যবে রে প্রেয়সি!
পুনঃ বিধু-মুখে হাস সুমধুর হাসি।
কহ কথা পুনরায়,
হৃদি সুখে নাচে তায়,
অতুল সে সুখ তার নাহিক তুলনা,
না পারি সে সুখ প্রিয়ে! করিতে বর্ণনা।

(১৮)
বাসনা তোমার তরে সংসার আগারে—
তোমা বিনা এ সংসার,
মরু সম—শূন্যাকার,
তোমা বিনা কিবা সুখ জগত-মাঝার?
সকল সুখের মূল তুমি রে আমার।
কে বলে গগনোপর
নিত্য উঠে দিন কর
নিসর্গ নিয়ম বসে?—কখন তা' নয়,
হেরিবারে কমলিনী ভানুর উদয়।

(১৯)
কে বলে, কেমনে বলে চঞ্চলা দামিনী?
নিবিড় নীরদ-ক্রোড়ে,
চমকে ক্ষণেক তরে,
অতীব সুন্দর আহা! মানস-মোহিনী,
হেন কথা কেবা কয়? কেন বা না জানি!
আলম্বিত কেশ-মাঝে,
যবে তব মুখ সাজে,
সে মুখের ক্ষণ হাসি না দেখেছে যেই,
চপলা চঞ্চলা বলি জানে ত রে সেই।

(২০)
কে বলে অধিক শোভা সুদূর গগনে,
ঝিকি মিকি তারা-দলে,
মরি কি সুন্দর জ্বলে,
হেন কথা কোন্ জন কহে কোন্ প্রাণে?
বোধ হয়—সে অভাগা হেরে নি নয়নে।
তোমার কুন্তল-মাঝে
মুক্তা যবে ঘন সাজে,
সে শোভা তৃষিত প্রাণে যদি সে দেখিত,
অম্বরে নক্ষত্র-শোভা কভু না কহিত।

(২১)
তরুণ অরুণ-করে নিশার নীহার,
সরোজ-বদন প'রে,
অতিশয় শোভা করে;
হেন রূপ অনুমান হয় বা কাহার?
যদি হয় বুদ্ধি-ভ্রংশ নিশ্চয় তাহার।
যখন লজ্জার ভরে
আরক্তিম গণ্ড'পরে
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদ-বিন্দু শোভয়ে তোমার,
কি ছার ইহার কাছে সুষমা তাহার।

(২২)
জ্ঞান হয় এ জগতে সুখী মাত্র মোরা!
বিস্ফারি তরঙ্গ-মালা,
কত সুখে করি খেলা,
কত বা সোহাগ মনে প্রফুল্ল অন্তরা!
আনন্দে উন্মত্ত প্রাণ সুখে মাতোয়ারা।
অন্ধ প্রায় সুখে হই,
কিছু না দেখিতে পাই,
তব মুখ-পদ্ম হৃদে দেখি রে কেবল,—
তোমার প্রেমেতে প্রিয়ে! আমি রে পাগল।

(২৩)
হৃদি-মাঝে তুমি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।
তব রূপ করি ধ্যান,
সতত সন্তুষ্ট প্রাণ;
প্রফুল্ল মানস সদা তোমারে ভাবিয়ে,
সরস রসনা প্রিয়ে! তব গুণ গেয়ে।

যখনি মনেতে করি,
অন্য মনে কিছু করি,
কিন্তু হায়! কিবা দায় নহে অন্য মন—
পুনঃ পুনঃ জাগে হৃদে তোমারি বদন।

(২৪)

কত ভালবাসি তোমা' কেমনে জানিবে?
হৃদয়-দর্পণে মম
তব মূর্ত্তি প্রিয়তম,
সদাই র'য়েছে জাগি—সদা জেগে র'বে;
কখন ভ্রমেও তাহা কিছুতে না যা'বে।
জ্ঞান হয় মনে মনে,
তোমায়েত কোন দিনে,
না ভুলিব প্রিয়তমে! জীবনে কখন,
কিবা হয় জীবনান্তে—সে বড় ভীষণ।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৃষ্টি-কর্ত্তা বিনা জগতের সৃষ্টি হইতে পারে না,—এ কথা সুবিজ্ঞ পাঠকগণকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের শেষ মীমাংসা করিব।

কোন বস্তুর আপনা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা বলিতে হইলে, অনন্তকাল হইতে তাহার স্থিতি, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার করিলাম যে, পদার্থ সকল অনন্তকাল হইতে অবস্থিত এবং পরস্পর আকর্ষণ-শক্তির দ্বারা কমলালেবুর আকারে পরিণত হইয়া, এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে জগৎ যে এরূপ শৃঙ্খলা-বিশিষ্ট, (দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন মহাত্মা মতলব করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন বা করাইয়াছেন) তাহা কোনমতেই স্বীকার করা যায় না। 'চেষ্টা' এবং 'শক্তি'র দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। কোন শক্তিমান্ লোক চেষ্টাবান্ হইয়া, কোন পদার্থ লইয়া, কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং তাহা না হইলে আর এ জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। জড়-পদার্থ 'চেষ্টা এবং শক্তি-বিশিষ্ট,' সুবুদ্ধি নাস্তিক হয় ত এ কথাও বলিতে পারে!

মহামান্য গ্রীসের সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ—পিথ্যাগোরাস্, প্লেটো এবং মহামতি এরিস্টটল্, সকলেই একবাক্যে কহেন যে,—"আদিম অবস্থায় পদার্থের কোনরূপ আকৃতি থাকে না; গঠনে আকৃতি হয় এবং গঠনে শক্তিমান্ লোকের বুদ্ধিযোগ চাই।" কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। মনে করুন, মৃত্তিকার ত কোন আকার নাই; কিন্তু, যদ্যপি কোন শক্তিমান্ লোক চেষ্টাবান্ হইয়া, সেই মৃত্তিকা লইয়া, সলিল-সংযোগে গঠনোপযোগী করিয়া, কোন জিনিষ নির্ম্মাণ করেন, তবেই ত ইহা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং, জগৎ যে 'সৃষ্ট' এবং আপনা হইতে অবস্থিত নহে—এ কথায়, বোধ হয়, কাহারো আর সন্দেহ রহিল না।

আর একটি প্রমাণ দিতেছি। যখন একটি অট্টালিকা আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত

হয়, তখন আমাদিগের মনে উদয় হয় যে, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ইহার মালীক এবং তিনি বহু ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কখনই আমাদিগের মনে এরূপ উদয় হইবে না যে, জড়পদার্থ হইতে (ইট প্রভৃতি) মাল মসল্লা আপনা হইতে প্রস্তুত হইয়া, এই অট্টালিকাটি নির্ম্মিত হইয়াছে! সুবিজ্ঞ নাস্তিকের মনে, কিন্তু এরূপ ভাবের উদয় হওয়া—অধিকন্তু, ইহা অনন্তকাল হইতে সৃষ্টি হইয়াছে—বিচিত্র নহে!!

সকল সময়ে বুদ্ধির সিদ্ধান্তে কায চলে না—জ্ঞান বা ন্যায়ের সিদ্ধান্ত চাই। জ্ঞান বা ন্যায়ের সিদ্ধান্তে কখনই ভ্রম থাকিতে পারে না। সরল ক্ষেপণী জলে নিক্ষেপের কালে, বক্র বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। অন্ধকার রজনীতে পথে রজ্জু পড়িয়া থাকিলে, সর্প ভ্রম হয়! এখানে বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ফল-প্রদ নহে; জ্ঞান বা ন্যায়ের সিদ্ধান্তে এ ভ্রম দূর হয়। কেবল চক্ষের সাক্ষ্যে কায চলিবে না। বুদ্ধির সিদ্ধান্তে বুঝিলাম যে, "অট্টালিকার প্রভু বা কর্ত্তা আছে";—কিন্তু, জ্ঞান বা ন্যায়ের সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত হইল যে,—"নির্ম্মাণ-কর্ত্তা ব্যতীত অট্টালিকা হইতে পারে না।" সুতরাং, বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্ত অধিকতর উচ্চ এবং ফল-প্রদ, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

আর একটি কথা মনে পড়িল। নাস্তিক অনেক সময়ে দৈবের কথা বলিয়া থাকে। 'দৈববলের' কথা স্বীকার করিতে হইলে, অবশ্য ঈশ্বর মানিতে হইবে। কিন্তু কই, নাস্তিক ত তাহা করে না! "দৈবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে,"—এ কথা আমরা অনেক নাস্তিককে বলিতে শুনিয়াছি। নাস্তিকের নানারূপ বিচিত্র প্রশ্নের কে উত্তর দিয়া উঠিবে? সে কখন জিজ্ঞাসা করে যে,—"ঈশ্বরের থাকিবার প্রয়োজন কি?" কখন জিজ্ঞাসা করে যে,—"তিনিই বা জগদীশ্বর এবং আমরাই বা মনুষ্য কেন?" কখন জিজ্ঞাসা করে যে,—"যদি ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হয় এবং তিনি অন্তর্যামী হন, তবে কেন তিনি, আমাদিগের এই তর্ক বিতর্ক শুনিয়া, দর্শন দিয়া, আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করেন না?"

নাস্তিকের এ সকল প্রশ্ন গুলি বাতুলের মত। "ঈশ্বরের থাকিবার প্রয়োজন কি?" এ কথার উত্তর এই যে, ঈশ্বর না থাকিলে, এই বিশ্ব-সংসারের ভার কে গ্রহণ করিবে? অসংখ্য প্রাণিগণকে কে প্রতিপালন করিবে? তুমি আমি কি করিব? নাস্তিকের এ বিশ্বধামে থাকিয়া বসুমতীকে ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন কি? তিনি না থাকিলে ত পৃথিবীর অনেক ভার কমিয়া যায়—তবে কেন তিনি স্থানাধিকার করিয়া রহিয়াছেন? নাস্তিক হয় ত বলিতে প্রস্তুত হইবে যে,—"আমার পুত্র কন্যা পরিবার আছে,—জনক জননী, ভ্রাতা ভগিনী আছে,—আমি তাহাদিগের প্রতিপালনের জন্য রহিয়াছি।" নাস্তিক তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য রহিয়াছেন—জগদীশ্বর কি তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিবার জন্য থাকিতে পারেন না? আমরা তাঁহার সন্তান—আমরা কি তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে নহি? নাস্তিক লীলা-সম্বরণ করিলে, নাস্তিকের পরিবারবর্গ কি প্রতিপালিত হইবে না? যে সংসারের কর্ত্তা কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছেন, সে সংসার কি প্রতিপালন হইতেছে

না? মোট কথা এই, সহস্র নাস্তিক বা সংসারের কর্ত্তা বিনষ্ট হইলে, তাহাদিগের সংসারের পরিবারবর্গ প্রতিপালিত হইবে এবং পরমপিতা করুণানিদান বিপত্তি-নাশন অধমতারণ জগদীশ্বরই, সেই ভার গ্রহণ করিবেন; কিন্তু, বিশ্বপতি বিনা এ বিশ্ব-সংসার একদণ্ডও চলিতে পারে না, এ কথা আমরা অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারি।

"তিনিই বা জগদীশ্বর এবং আমরাই বা মনুষ্য কেন?"—নাস্তিকের এই প্রশ্নটি গভীর মূর্খতার পরিচায়ক। তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি তাঁহার পিতার ঔরসে না জন্মিয়া, তাঁহার ঔরসে তাঁহার পিতা জন্মিলেন না কেন? মূঢ় নাস্তিক! অগ্রে আমাদের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেহ—তবে আমরা তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত হইব।

"যদি ঈশ্বর আছেন, এ কথা সত্য হয় এবং তিনি অন্তর্যামী হন, তবে কেন তিনি আমাদিগের এই তর্ক বিতর্ক শুনিয়া, দর্শন দিয়া, আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করেন না?"

নাস্তিকের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে,—ঈশ্বর, ঈশ্বর। তিনি হীন মানবের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন না। নাস্তিকের বিশ্বাসের জন্য, যদ্যপি তিনি তাহাকে দর্শন দিতেন, নাস্তিক কি তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিত? কখনই নহে। যীশু-খ্রীষ্ট (ঈশ্বর নহে) "ঈশ্বরের সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন—যীহুদিগণ কি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল? তিনি কত অসম্ভব কার্য্য করিয়াছিলেন—কত লোকের কত উপকার করিয়াছিলেন—কিন্তু, যীহুদিগণ তাঁহাকে মানা দূরে থাকুক, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে, এমন কি, প্রাণে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। আপনার পরিচয় আপনিই প্রদান করিতে যাইলে, কেহই সম্ভ্রম করে না—যীশু-খ্রীষ্টের ইতিহাস তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

মূঢ় নাস্তিক! ঈশ্বরের সৃষ্টি কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব-পরিচায়ক নহে? নারী-গর্ভে যখন সন্তানের জন্ম হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বার-রুদ্ধ উদরে, কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে? মূঢ় নাস্তিক! জড় পদার্থের যোগে কি জীবের জন্ম হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি তোমার ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে জ্ঞান জন্মিতেছে না? ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়!

কথায় কথায় আর একটি আবশ্যকীয় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। নাস্তিক বলে যে,—"দৈবে 'জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।" নাস্তিকের এই কথাটি আমরা প্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করিয়া লইলাম। আমরা যত গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে মহামতি হিউম সাহেবই, তাহার প্রণীত গ্রন্থে দৈবের যথার্থ অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তিনি কহেন যে,—"যাহা অজানিত, গুপ্ত বা যাহার কারণ অজ্ঞাত," তাহাই দৈব। "দৈবে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে,"—অর্থাৎ, 'জগতের সৃষ্টি আমাদিগের পক্ষে অজানিত, গুপ্ত বা অজ্ঞাত-কারণ-বিশিষ্ট,'—এ কথা বলিলেও ভুল হয় না। কিন্তু ইহা যে কেহই সৃষ্টি করে নাই,—এ কথা, আমরা বলিতে পারি না। আমরা দেখি নাই, ইহা সত্য; কিন্তু ইহার সৃষ্টি-কর্ত্তা যে এক জন আছেন, তাহা, আমাদিগের দূরে থাকুক, নাস্তিককেও (ন্যায় শাস্ত্র মানিতে হইলে) স্বীকার করিতে হইবে।

নাস্তিকের আর একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াই, আমরা এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি শেষ

করিব। নাস্তিক বলে যে,—"যদ্যপি জগদীশ্বর (যিনি আস্তিকদিগের মতে আমাদিগের সৃষ্টি-কর্ত্তা) দয়ালু এবং ন্যায়বান্ হন, তবে তাঁহার রাজত্বে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কেন দুঃখ পাইয়া থাকে এবং অধার্ম্মিকেরা উন্নতি লাভ করে ?"

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, জগদীশ্বর কাহাকেও রাজা করেন নাই—পাপীকে ধনী করেন নাই এবং সাধুকে নির্ধন করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার-গৃহ অবারিত দ্বার। যাহার যেমন সাধন—তাহার তেমনি অদৃষ্টের যোগ, সে তেমনিই পাইয়া থাকে। তা' বলিয়া ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করা, কখনই যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

যদিও আমরা এ বিশ্ব-সংসারের শাসন-প্রণালীর বিষয় অবগত নহি, কিন্তু, এ কথায় আমাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস আছে যে,—মনুষ্য-জাতির আপন অদৃষ্টে সন্তুষ্ট থাকা অপেক্ষা আর সুখ নাই। এ সম্বন্ধে কোন ইংরাজ-কবি লিখিয়াছেন,—"To be content, is to be happy." অনেকানেক ভূপতি এবং সম্রান্ত ব্যক্তিগণের ইতিবৃত্ত পাঠে আমরা অবগত হই যে, মনুষ্য মনের সন্তোষ বিনা কখনই সুখী হইতে পারে না। আমরা অনেক নৃপতির বিষয় অবগত আছি, যাঁহারা রাজ্য, সম্মান ও নানাবিধ সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া বনবাসী হইয়াছেন!—যাহা নীচমন ক্ষুদ্র-প্রাণ মনুষ্যগণ প্রাণপণে লভিবার চেষ্টা করিতেছে। এক জন ধনাঢ্যের বিষয় ভাবিয়া দেখুন,—তিনি কি সুখী ? তাঁহার মন অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য্যে, উচ্চাশায়, চিন্তায়, শঙ্কায়, সন্দেহে, হিংসায়, (সকল গুলি স্মরণ করিয়া বলিতে পারিলাম না)—ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। সেরূপ ধনী হওয়া অপেক্ষা, বোধ হয়, নির্ধন হওয়া সহস্র-গুণে ভাল।

আমাদিগের প্রবন্ধের সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, আমরা একটি বিষয় পাঠক-পুঞ্জের নিকট বিবৃত করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছি। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক-গণ আমাদিগকে অনুমতি করিবেন।

অনেক পণ্ডিত কহেন যে,—"যাঁহারা ইহ-লোকে দুঃখ-ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা পর-লোকে সুখ-ভোগ করিবেন এবং যাঁহারা ইহলোকে সুখ-ভোগ করিতেছেন, পরলোকে তাঁহারা দুঃখ-ভোগ করিবেন।" এই অভি-নব কথাটি শুনিয়া অনেকেই হয় ত হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন ; কিন্তু কথাটি একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে—তাহা হইলে, সকলেই ইহার গূঢ়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ধনী, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যথেচ্ছাচারী, অহঙ্কারী, পীড়নকারী ও অর্থ-চিন্তায় নিমগ্ন ; সুতরাং, ভুলেও তাঁহাদিগের ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ হয় না, কাজেই পুণ্যের সঞ্চয় না হইয়া, কেবল পাপের সঞ্চয়ই হইয়া থাকে। অতএব, পরকালে তাঁহাদিগের জন্য যে দুঃখ ভোগ তোলা থাকে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নির্ধন ব্যক্তি কষ্টে-সৃষ্টে সংসার-পালন করিয়া, দুঃখের জ্বালায় দিবা নিশি জ্বলিয়া, ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং তাহাতেই তাহার পুণ্যের সঞ্চয় হয় ; সুতরাং, ইহলোকে তাহার দুঃখ অবসান হইয়া, পরলোকে সে সুখ ভোগ করে। কিন্তু, ধনাঢ্য হইয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া, ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করেন, তাঁহার উভয়কালেই

সুখ-ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র, তাঁহারাই জগতে নির্ধন হইয়া বাস করেন এবং তাঁহারাই তাঁহার 'ভক্ত-বৃন্দ', এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

পরলোকে মনুষ্য যে সুখ ভোগ করে, সেই সুখই সুখ এবং তাহারই প্রত্যাশী হওয়া সকলের উচিত; তা' বলিয়া ইহলোকে দুঃখ ভোগ করিতে বলিতেছি, ভ্রম বশতঃ কেহ যেন এমন বুঝেন না। সুবিখ্যাত সুকবি তুলসীদাস লিখিয়াছেন,—

"সুখ মে বাজ পড়ু,
দুখ্ কে বলিহারি যাই।
অ্যা'র্ সে দুখ্ আওয়ে, যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁরাই.॥"

ভাবার্থ। জগদীশ্বর হরিকে বিস্মৃত হইয়া যে সাংসারিক সুখ, তাহার উপর বজ্রাঘাত হউক; বরং দুঃখেরই ভূয়সি প্রশংসা করি, এমত দুঃখ আমাকে সর্ব্বদা আক্রমণ করুক, যাহাতে আমি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে পারি।

অতএব, আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, নির্ধন হইয়া যদি ঈশ্বরের নাম করিতে পারি, সেও পরম সুখের বিষয়; তবু ধনী হইয়া, তাঁহার নাম বিস্মরণ হওয়া, কখনই উচিত নহে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একটি সঙ্গীতে এই ভাবে লিখিয়াছেন,—

"যেন হেন বিপদ হয়।
যে বিপদে তব পদে মন বাঁধা রয়॥
বিপদে বেষ্টিত থাকি, তথাচ না ভয় রাখি,
শুধু মাত্র মুখে ডাকি, জয় শিব জয়।
* * * * "

ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিভু-চিন্তায় মনো-নিবেশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধনী ব্যক্তিগণ, যদ্যপি মনে করেন যে, ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহাদিগের এরূপ ঐশ্বর্য্য হইয়াছে এবং তাঁহারাই যথার্থ তাঁহার কৃপার পাত্র, তবে তাঁহারা যেন সেই অর্থের সৎব্যয় করেন এবং দিবানিশি সেই ঐশ্বর্য্য-দাতাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। নির্ধনদিগের দুঃখ-মোচন করা ধনীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য—বোধ হয়, জগদীশ্বর পরীক্ষা করিবার জন্যই, তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছেন এবং নির্ধনগণ সেই পরীক্ষার স্থল। তৎপ্রমাণার্থে পূজ্য-পাদ বিষ্ণুশর্ম্মা-বিরচিত সংস্কৃত-গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' হইতে, এই শ্লোকটি আমরা পাঠক-পুঞ্জের স্মরণার্থে উদ্ধৃত করিলাম:—

"দরিদ্রাণ্ ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং, নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥"

কিন্তু, অধুনা ধনাঢ্যদিগের সৎ বা উপযুক্ত পাত্রে ব্যয় নাই;—মদ্যপান করিয়া এবং বেশ্যাসক্ত হইয়া, তাঁহারা মাসে হাজার হাজার টাকা অপব্যয় করিতেছেন, কিন্তু, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি তণ্ডুল দিতে হইলে, তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! ইহার অপেক্ষা ভারতের আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে? যে ভারতে পুরাকালে হিন্দুগণ আতিথ্য-সৎকারকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিতেন—যে ভারতে গৃহস্থের বাটী হইতে অতিথি ফিরিয়া যাইলে, গৃহস্থের মহাপাপ বলিয়া গণনা করিতেন—সেই ভারতে আজি হিন্দুদিগের বাটী-দ্বারে, ভিক্ষুক ঢুকিবে বলিয়া, দ্বারবান সংরক্ষিত হইয়াছে! কালের কি বিচিত্র গতি!! কালে সকলই হইতে পারে।

হায়! ধন সম্বন্ধে ইংরাজ-কবি জন্ গে-

প্রণীত এই নীতি-পূর্ণ মধুময় কবিতাটির অর্থ বুঝিয়া যদি সকলেই কার্য্য করেন,—তাহা হইলে, কতই সুখের বিষয় হয়।

"But when to virtuous hands, 'tis given,
It blesses, like the dews of Heaven;
Like heaven, it hears the orphan's cries,
And wipes the tears from widow's eyes."

আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম। আশা করি, নাস্তিকগণ 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব' স্বীকার করিবেন—ধনিগণ ধর্ম্ম ভাবিয়া কার্য্য করিবেন এবং ঈশ্বরভক্তগণ ঈশ্বরকে মানস-মন্দিরে সংস্থাপন-পূর্ব্বক, ভক্তি-বিল্বদলে প্রেম-চন্দন মাখাইয়া, অধিকন্তর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজা করিবেন এবং ইহাই আমাদিগের একান্ত অনুরোধ।

শ্রীরাধাজীবন রায়।



ক।

—:*:—

কলিকাতা কাঁসারিপাড়ায় কোন কায়স্থ-কুমার, কৃষ্ণ কিশোর কর, কালাতিপাত করিতেন। কৃষ্ণ কিশোর "ক্যারেট কোম্পানির" কার্য্যালয়ে কেশিয়ারি-কর্ম্ম করিতেন। কৃষ্ণকিশোর, কাল্‌নার কালিকিঙ্করের কনিষ্ঠা কন্তা, কৈলাসকামিনীর করগ্রহণ করেন।

কিছু কাল কৃষ্ণকিশোর কসিত-কাঞ্চন-নিভ কোমল-কায়া, কান্তা কৈলাস কামিনীর কমনীয় কাম-কারাগারে কৌতূহলে কাল কাটান; ক্রমে কৃষ্ণ কিশোরের কামনানুযায়ীক কয়েকটি কুমার কুমারী, কৈলাসকামিনীর ক্রোড়শোভা করিল; কিন্তু কালান্তক কাল, কৈলাসকামিনীর কুমার কুমারীকুলকে কিছু কালেই কলেরায় করাল কবলে কবলিত করিল,—কেবল কমলিনী কন্তাটির কিছু করিল না।

কালক্রমে কৃষ্ণকিশোর কাশীপুরের কুমুদ-কুমারকে, কেবলমাত্র কন্তা কমলিনীর কর-প্রদান করেন। কুমুদকুমার কুলিন কায়স্থ, কাশীপুরে কণ্ট্রাক্টরের কার্য্য করিতেন।

কমলিনীর কর-গ্রহণ করিবার কিয়দ্দিবসান্তেই কুমুদকুমার কলিকাতায় কুমারটুলিতে কয়লার কারখানা করেন।

কোমল-প্রাণা কমলিনীর কিছুমাত্র কষ্টের কারণ, কোন কার্য্য কুমুদকুমার কখনও কোন ক্রমে করিতেন না। কমলিনীকে কুমুদকুমার কণ্ঠ-হার করিয়াছিলেন; কমলিনীর কমনীয় কান্তি—কোমল কর-পল্লব—কুঞ্চিত কেশ-দাম কোকিল-কূজনবৎ কণ্ঠ-স্বর—কুমুদকুমারকে কতই কৌতূহলাক্রান্ত করিত।

কিন্তু কপালের কথা কে কহিবে? কুক্ষণে কাশ-রোগে কুমুদকুমারকে কাতর করিল, কমলিনী কি করেন—কৃষ্ণকিশোরকে কান্তের কাশাশ্রয়ের কুসংবাদ কহিলেন।

কৃষ্ণকিশোর কুমুদ কুমারের কাশাশ্রয়ের কথা কর্ণগোচর করিয়া, কতিপয় কবিরাজকে, কুমুদকুমারকে কাশমুক্ত করিতে কহিলেন।

কবিরাজেরা কত কি করিলেন; কিন্তু, কাশ কিছুতেই কমিল না। ক্রমে কঠিন কাল,কোমলপ্রাণা—কণকলতা—কমলিনীকে কৈশোরে, কাতরা, কান্ত-হারা ও কাঙ্গালিনী করিয়া, কুমুদকুমারকে করাল কবলে কবলিত করিল!

শ্রীকালিদাস মিত্র।

সঙ্গীত।

টোরি-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কৃপা কর মা! কৃপাময়ি, এ অধমে তুমি তারা!
সংসার-সাগরে ডুবে,প্রাণে বুঝি হ'লেম সারা।
দারুণ প্রাণের ভার, সহিতে না পারি আর,
তুমি না নাশিলে ভার, কে নাশিবে বল তারা?
সংসারের সুখেদুখে ভুলে যাই মা ডাক্তে তোকে
কি হবে অন্তিমে গতি,ভেবে হই যে দিশাহারা।

শ্রীনিমাইচরণ পাঠক।

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

মানান্তে, মিলনে সুখ, যে জানে সে জানে;
সাধে কি হে থাকি সখা! ম'জে অভিমানে।
মান ভেঙ্গে, বাড়ে মান!
এমন কি আছে? প্রাণ!
সেই তুমি, সেই আমি,নূতন হ'য়েছি মানে!!

৺কৈলাসচন্দ্র রায়।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচন।

৩। দাতা-পরীক্ষা—(নাটক) মূল্য ।।৶০ আনা।

৪। ধর্ম্মপরীক্ষা—(দৃশ্যকাব্য) মূল্য ।।০ আনা।

"সিমুলিয়ার খ্যাতনামা ৺ কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত" ও প্রকাশিত।

এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিতে আমাদের বড় ভাল লাগিল না; তবে, নাট্যমন্দিরে কিরূপ শোভা পায় বলিতে পারিনা।

৫। মজলিস্—রং-তামাসা-পূর্ণ মাসিক পত্র। গত বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। কলিকাতা ৭৯ নং কর্ণ ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ষ্টার এজেন্সি হইতে শ্রীদুর্গাদাস দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ১।০ মাত্র।

বহুদিন হইতে হিন্দু সমাজে এরূপ এক খানি মাসিক পত্রের অভাব ছিল। আমরা ইহা পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ, ইহার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা দেখিযা, অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। "বিরাট বৃহস্পতি" অতীব সুন্দর রূপে ও অকুতোভয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ এবং "ভ্রাতা ভগ্নী" দিগের নিঃস্বার্থ প্রেমকে, মজলিস্ রং তামসার ছলে বেশ মিষ্ট মিষ্ট ঘা দিয়াছেন।

সঙ্গীতের ভাগ কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে এবং দু' একটি আবাল বৃদ্ধ-জানিত সঙ্গীত ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, মজলিসের অধ্যক্ষেরা ভবিষ্যতে সঙ্গীত নির্ব্বাচন-বিষয়ে একটু মনোযোগী হইবেন।

আমরা ইহার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

[১ম খণ্ড।] আশ্বিন। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—তিন আনা

একটি শিশুর প্রতি।

আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।
তোর বদন-শশী
—ভালবাসি,
যার নাইক হাসির অপ্রতুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর চটুল্ আঁখি
—চকোর পাখী,
তার নাইক দেখি সমতুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর লোহিত ঠোঁটে,
গোলাপ ফোটে,
তোর রংটি যেন চাঁপা ফুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর শরীরখানি
—যেন ননী,
তোর হাত দুখানি পদ্ম-ফুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর্ চরণ ছুটি—
হাঁটি হাঁটি,
অতি পরিপাটী নাইক তুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর বচন-সুধা,
হরে ক্ষুধা!
যেন গাইছে পাপিয়া বুলবুল্;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোরে করি মানা,
দুষ্টপনা
ক'রে বাধাস্‌নে আর হুলস্থুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তুই যাস্‌নে হোথা,
বস্‌না হেথা,
দেবে মৌমাছি শেষ বিঁধে হুল,
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তুই আয় না কাছে,
নেচে নেচে,—
মিছে কেঁদে কেন হ'স আকুল?
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোয় আঁট্‌তে নারি,
বংশীধারি!
সদা পড়িস্ কেন খেয়ে ঝুল্?
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর পিছে ধেয়ে,
ধরতে গিয়ে,
চেয়ে দেখ্‌না, খুলে গেল চুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

এই গেলেম্ চুমো,—
একটু ঘুমো,
তোর কচ্চে আঁখি ঢুলুঢুল্;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তোর হাত বুলা'য়ে
দিচ্চি গায়ে,
ওরে! করিস্ নে আর চুলবুল্;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

শোন্ ভাল কথা,
(বল্‌ছি বৃথা)
তুমি অশান্তের যে হচ্চ মূল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

কানে ফুলটি প'রে,
যাবি ঘরে,
খুকী থাক্‌বে চেয়ে জুলুজুল্;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

যার বাছা তুমি,
স্বর্গ ভূমি
তার হাতে হাতে, নাইক ভুল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

তুমি বেঁচে থাক,
বিদ্যা শেখ,
হও পিতা মাতায় অনুকূল;
আয় রে ছেলে!
তোর কানেতে পরিয়ে দিব ফুল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সতীত্ব।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের জগৎ-সৃষ্টি অতি আশ্চর্য্য। যতই আমাদের মন জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতেছে, ততই আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছি। অতি প্রাচীনকালে মনুষ্যের সুখ দুঃখ বোধ ছিল, এখনও আছে, কিন্তু কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! প্রাচীনাবস্থার সুখকে কেহ এখন আর সুখ বলিয়া মনে করেন না।

তখন, এখনকার ন্যায় বিবাহ-পদ্ধতি ছিল না। স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছাসহবাসই নিয়ম ছিল; সুতরাং, অতি প্রাচীন-কালীন মনুষ্যের, সতীত্বশব্দে কোন অর্থোপলব্ধি হইত না, অর্থাৎ তৎকালীন মনুষ্যগণ 'সতীত্ব' বলিলে, কিছুই বুঝিতেন না। প্রাচীন বাবিলোনিয়াতে বহু পুরুষ-সহবাস স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও এমন জাতি দেখা যায়, যাহারা অতিথিকে আপনাদিগের স্ত্রী দেওয়া, সৎকার্য্যের মধ্যে গণনা করে!

এখন মনুষ্য সভ্য হইয়াছে, প্রাচীনকালের যথেচ্ছা স্ত্রীপুরুষ সহবাস যে, পাপকর্ম্ম ও ব্যভিচার তাহা বুঝিতে পারিয়াছে এবং ঐ পাপস্রোত নিবারণ করিবার জন্যই, আমাদিগের মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং,

"সতীত্ব" শব্দের অর্থ এক্ষণে কাহাকেও বড় বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। তবে, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ব্যভিচারিতা নাই, বা অতি কম, সেই দেশ অন্য দেশ অপেক্ষা সভ্য হইয়াছে; অর্থাৎ, যে দেশে সতীত্বের মান্য বা আদর অধিক,সেই দেশই সভ্য। ফল কথা, সতীত্বের গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সতীত্বের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশে, স্ত্রীলোক এক মাত্র পতি-সহবাসিনী হইলে সতী হয়; ইউরোপে বিবাহিত স্বামী বর্ত্তমানে, অন্য পুরুষের সংসর্গ না করাই সতীত্বের অর্থ; কিন্তু এক স্বামী-বিয়োগে বা পরিত্যাগে (after death or divorce) অন্য স্বামী-গ্রহণে তাহাদের সতীত্বে দোষ স্পর্শে না। আমাদের দেশে ভ্রাতৃজায়া-গমন মহাপাপ; কিন্তু তির্ব্বতদেশে সকল ভ্রাতায় এক স্ত্রী বিবাহ করে। এখন দেখা যাউক, যথার্থ সতীর প্রকৃত লক্ষণ গুলি কি কি? সেই লক্ষণ গুলি বোধ হয় ভারতবাসী আমরা ভালরূপ দেখিয়াছি, সুতরাং বলিতেও পারিব।

প্রথমতঃ,অনন্যদেশ-সাধারণ 'পতিপ্রাণা'এই শব্দটিতেই সাধ্বীর লক্ষণ পাওয়া যায়। পতির মৃত্যুর পর, পাছে আমাকে জীবিত থাকিতে হয়, সতীর অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা স্বতঃই বিরাজমান। স্বামী পাছে না বাঁচেন, না ভাল থাকেন,না সুখী হন,—এই ভয়েই সতীর মলিনতা হয়।

স্বামীর ভাবনা ভিন্ন সতীর মনে অন্য কোন চিন্তাই ব্যাপককাল স্থান পায় না। আবার ঐ স্বামী-চিন্তা হইতেই সতীর হৃদয়ে নিরন্তর স্বামী-দর্শন-লালসা বলবতী থাকে, অর্থাৎ, সতীর মনের বাসনা,সর্ব্বদাই স্বামীকে দর্শন করেন; স্বামী চক্ষুর অন্তরাল হইলেই, তাঁহার জগৎ শূন্য বোধ হয়। এরূপ কেন হয়? সতী-ধর্ম্মের মূলীভূত স্বামীর অনিষ্টাশঙ্কাই তাহার প্রকৃত হেতু।

সতীধর্ম্মের মূলে যে, স্বামীর জীবন সম্বন্ধীয় গূঢ়শঙ্কাটি নিহিত থাকে, তাহা আমাদের সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা ভালরূপ জানিতেন। ভগবান্ বেদব্যাস্ অশ্বমেধ পর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন যে, অর্জ্জুন যখন নাগকন্যা উলূপীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন, উলূপী নিজ স্বামী অর্জ্জুনকে এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, "আমি যাহাতে সর্ব্বদা আপনার শুভাশুভ জানিতে পারি, এরূপ কোন উপায় করিবেন।" তখন অর্জ্জুন ঐ পতিপ্রাণার গৃহাঙ্গনে একটি দাড়িম্ব-বৃক্ষ রোপণ করিয়া বলিলেন,—"প্রিয়ে! যত দিন এই বৃক্ষটি সজীব থাকিবে, ততদিন আমিও কুশলে থাকিব।" ইহাতেই উলূপী সন্তুষ্টা হইলেন। কেনই বা না হইবেন, ইহাই সাধ্বীর লক্ষণ।

আমাদের দেশে সকল সময়েই কাব্যশাস্ত্রে সাধ্বী-চরিত্রের বিষয় বর্ণিত আছে। সাবিত্রী, সতী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সকল নায়িকার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলের আর কোনও দেশের কোনও সময়ের কাব্যে এরূপ স্ত্রীলোকের উল্লেখ দেখা যায় না। রাজস্থানের বীরপত্নী ও বীরপ্রসূদিগের সতীত্ব-গীত, আর সকল দেশের পক্ষে অত্যদ্ভুত। হীনাবস্থ, দুর্ব্বল, ভারতবর্ষের কাব্যবর্ণিত কামিনীকুল সতীধর্ম্মের আদর্শ। আমাদের দেশ যে, অন্য সকল দেশ অপেক্ষা সতীকুলের পবিত্র নিবাস-ভূমি, আমাদের প্রাচীন

দেশাচার তাহার একটি প্রমাণ-স্বরূপ। অপর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা কি পতির অনুমরণ করিয়াছে? অনুমরণের কথা দূরে থাকুক, কখন কি মরণের কথা মনে ভাবিতেও পারিয়াছে? ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "সতীত্ব" প্রকৃত নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম-ধর্ম্ম। বাস্তবিকই আমাদের দেশের মত যে, সকল স্ত্রীলোক সমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত স্বকীয়-স্বভাবদত্তা প্রবলা কামবৃত্তিকে দমিত রাখিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহাদের মত স্বার্থত্যাগী রমণী কোথায়?

আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নিকট সতীত্ব স্বীয় জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান। মুসলমান সম্রাট আলাউদ্দিন্ চিতোর আক্রমণ করিলে, পদ্মিনী স্বীয় সতীত্ব-রক্ষার জন্য চিতারোহণ-পূর্ব্বক,অনলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। আবার মিবারের রাঠোর বীর পৃথ্বীরাজ, যখন মোগল-সম্রাট আকবরের নিকট বন্দী ছিলেন, তখন তদীয় বনিতা স্বীয় সতীত্ব রক্ষার জন্য যেরূপ অলৌকিক তেজস্বীতা দেখাইয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মহাত্মা টড্ লিখিত রাজস্থানে বর্ণিত আছে যে,—দিল্লীশ্বর আকবর প্রতিষ্ঠিত খোস্‌রোজ বা আনন্দ বাসরে, রাজবাটী-সন্নিহিত একটি অবরুদ্ধ প্রদেশে স্ত্রীপ্রদর্শনী খোলা থাকিত—রাজ-পরিবার ভুক্ত' সীমন্তিনিগণ ও অন্যান্য কুলকামিনীরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। ঐ প্রদর্শনী মধ্যে পুরুষের গমনাগমন নিষেধ ছিল; কিন্তু যে আকবর জগদ্‌গুরু, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" প্রভৃতি উচ্চ সম্মানে বিভূষিত ছিলেন—ইতিহাস যাহাকে নিরপেক্ষ প্রজাপালক বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সেই 'ধর্ম্মপ্রিয়' আকবর উক্ত প্রদর্শনী মধ্যে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক, নিজ পাপ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন।

এক দিন দিল্লীশ্বর আকবর খোস্‌রোজের আনন্দবাসরে প্রচ্ছন্নভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় পৃথ্বীরাজ-বনিতার স্বর্গীয় রূপ-লাবণ্য তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হওয়াতে, তিনি অনিমিষনয়নে সেই সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে পাপ-প্রবৃত্তি দারুণ বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পৈশাচিক বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের জন্য, বিশ্রাম-কক্ষে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক, সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজ কাম-লালসার তৃপ্তিসাধন ও পবিত্র মিবার কুলে কলঙ্কার্পণ,—এই দুইটি জঘন্য কারণের বশীভূত হইয়া, নরাধম আকবর কৌশলক্রমে পৃথ্বীরাজ-পত্নীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাঁহার উপর সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই নির্ভর করিতেছে, তিনিই আজ নিষ্ঠুর হৃদয়ে পশুবৎ আচরণে ব্যাপৃত! এই বিষম সঙ্কটে, এই নিদারুণ দুর্ব্বিপাকে, এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায়, পতিব্রতার সতীত্ব কে রক্ষা করিবে? সরল-হৃদয়া পৃথ্বীরাজ-বনিতা গৃহে প্রত্যাগমন জন্য, উক্ত প্রদর্শনী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ, কোন দিকেরই পথ মুক্ত নাই। তিনি বিস্মিতা হইলেন, নানা প্রকার সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, এমন সময় অকস্মাৎ এক দিকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; সেই উন্মুক্ত দ্বার-পথে আকবর ধীরে ধীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক,কামোন্মত্তভাবে বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া, সতীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

নানাবিধ প্রলোভন বাক্যে, তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিদারুণ রোষ ও জিঘাংসায় সতীর অন্তঃকরণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সাধ্বী তখন ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় কটিদেশ হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া, পাপাত্মা আকবরের বক্ষোপরে সংস্থাপন করতঃ, রোষ-কষায়িত-লোচনে কঠোর স্বরে বলিলেন,—"ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বল যে, আর কোন রাজপুতকুলে কলঙ্কার্পণ করিতে প্রয়াস পাইবে না;—বল—শপথ কর—নতুবা এই তীক্ষ্ণ ছুরিকা তোমার হৃদয়-রক্তে স্নান করিবে।"

রাজপুত-সতীর অত্যদ্ভুত সাহস দেখিয়া, দিল্লীশ্বর স্তম্ভিত ও বজ্রাহত প্রায়। তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তি কোথায় পলাইয়া গেল। পাপ-কলুষিত কামান্ধ হৃদয়, জ্ঞানালোকে আলোকিত হইল। সতীর আদেশ পালন না করিয়া, তিনি থাকিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গেলে আর আসে না।

সে দিন আর কি হ'বে!
আসিবে শৈশব-কাল,
না র'বে জঞ্জাল-জাল,
উল্লাসে মানস মোর পুনঃ মাতাইবে,
সে দিন আর কি হ'বে!

আয় রে শৈশব-কাল!
আয় আয় ত্বরা করি,
সেই সুখ ছবি ধরি,
অশ্রু-পূর্ণ এ নয়নে হেরি ক্ষণকাল,
আয় রে শৈশব কাল!

নাহি হেরি এক দিন,
কোথায় যে গেল চ'লে!
খুঁজিয়ে নাহিক মিলে,
হৃদয়ে বিষাদ ঢেলে হইয়াছে লীন,
নাহি হেরি এক দিন।

যবে ছিল সেই কাল,
কতই উল্লাস মনে,
উঠিত যে ক্ষণে ক্ষণে,
তুলিত হৃদয়-তরী আনন্দের পাল,
যবে ছিল সেই কাল।

কেমনে ভুলিব হায়!
সেই যে আমোদে ভোলা,
ছিনু রে অজ্ঞান বালা,
মানস সদত ছিল সন্তোষ আলয়,
কেমনে ভুলিব হায়!

বিষাদে পূরিত হেরি,
সেই সুখময়ী ধরা,
ছিল যে আনন্দে ভরা,
এবে যেন রেখেছে কে আঁধারে আবরি!
বিষাদে পূরিত হেরি।

হায় জ্ঞানোদয়ে বুঝি,—
ঘটিল এ পরমাদ,
সাধিল সুখেতে বাদ,
মলিন হইল মন বিষাদেতে মজি!
হায় জ্ঞানোদয়ে বুঝি?

আর কি আসিবে ফিরে?
যে দিন গিয়াছে, হায়!
সেই দিন পুনরায়?
ভাসিবে অধীর চিত হরষ-সাগরে,
আর কি আসিবে ফিরে!

কেন স্মরি বারে বারে?—
সময় এমনি নিধি,
অবসান হয় যদি,
ফিরিবে না, যত ডাক আকুল অন্তরে,
কেন স্মরি বারে বারে?

স্মরি তাঁরে বার বার—
সর্ব্ব মূলাধার যিনি,
সবার শরণ্য তিনি,
সেই বিভু-পদে আমি করি নমস্কার,
স্মরি তাঁরে বার বার।

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী।

দার্জিলিং ভ্রমণ-কারীর পত্র।

(প্রথম পত্র)

লুইস্ জুবিলি সেনিটেরিয়ম্।
"দার্জিলিং, ১২ই অক্টোবর, ১২৮৯।"

বেলা ৩ টার সময় সিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম; গাড়ী হইতে নামিবামাত্র নীল-অঙ্গরাখাবৃত, কটিদেশে চাপরাশবেষ্টিত নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র, এক হৃষ্টপুষ্ট অপূর্ব্বমূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া আভূমি-লুণ্ঠিত সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে আমার পোর্টমেণ্ট গাড়ীর চাল হইতে নামাইয়া মাথায় করিল। সর্ব্বনাশ! চোর নাকি? লোকটিকে রেলগাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া আশঙ্কা দূর হইল। বুঝিলাম লোকটি মোট-বাহক—পরিধৃত চাপরাস 'রেলওয়ে-কোম্পানি'র বিশ্বাসের চিহ্ন।

জনতা ভেদ করিয়া, টিকিট ক্রয় করিয়া, ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে আসিলাম; আসিয়া দেখি মোট-বাহক আমার মোট লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নড়ন নাই চড়ন নাই—যেন কৃষ্ণনগরের পুতুল! আমার আগমনে মূর্ত্তির স্পন্দন দেখা গেল। আমি একটি কামরায় প্রবেশ করিলাম; মোট-বাহক আমার মনোনীত কামরায় আমার পোর্টমেণ্ট রাখিল

ও আবার আভূমিলুণ্ঠিত সেলাম করিল; এবারকার সেলাম পূর্ব্বেকার অপেক্ষা বেশী চটকের—কি-যেন কি-যেন মাখান। আমি মোটবাহকের সততা সম্বন্ধে কিছু প্রশংসাবাদ দিলাম—বলা বাহুল্য ইহার উপর আরও কিছু দিতে হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিংএর শীতের কথা শুনিয়া কতক গরম পোষাক পরিয়াছিলাম, কিন্তু গাড়ীতে উঠিয়া এত গ্রীষ্ম হইতে লাগিল যে, যন্ত্রণায় অস্থির হইলাম। সকল কষ্টেরই অবসান আছে। এক দুই করিয়া ঘণ্টা বাজিল—গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে করিয়াও ছাড়ে না। শেষ-ঘণ্টা বাজিল—গাড়ী ছাড়িল। প্রথমে গতি মন্থর, পরে ষ্টেশন ছাড়াইয়া হস্ হুস্ শব্দে মহাবেগে চতুর্দ্দিক ধূমময় করিয়া ধাবিত হইল; আমিও হাওয়া পাইয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম।

যখনই কোন পত্রে "ভ্রমনে"র বৃত্তান্ত বাহির হয়, তখনই লেখক স্বীয় কল্পনাবলে পাঠকদিগের প্রীতি-সম্পাদনার্থে দুই একটি সহযাত্রীর রহস্যজনক চিত্র সম্মুখে ধরেন, বলা বাহুল্য অনেক সময়ই সহযাত্রীদিগের প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে না—লেখকদিগের উদ্ভাবনী-শক্তিপূর্ণ মস্তিষ্ক, তাঁহাদিগের সহায়তা করে। পাঠকগণ! মাপ করিবেন, আমি সত্যের অপলাপ করিয়া কল্পনা-শক্তির আশ্রয় লইতে পারিব না।

যাই হোক—দুই ধারের মাঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, উড্ডীয়মান বিবিধ বর্ণের পক্ষী দেখিতে দেখিতে, ষ্টেসনের পানি পাঁড়েদিগের উঁচু নীচু কড়া মিঠা. রং বেরংএর কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে, দামুক দিয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেসনটি দার্জ্জিলিং ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের জন্য, পদ্মা নদীর তীরে খোলা হইয়াছে। যাত্রীদিগের পারাপারের নিমিত্ত তথায় এক বৃহৎ ষ্টীমার আছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া ঐ ষ্টিমারে উঠিলাম। ষ্টিমারটি দ্বিতল,—উপরের শীতল অংশটি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। বলা বাহুল্য, ঐ স্থানটি শ্বেতকায় মহাপুরুষদিগের একচেটে সত্ব—অধম ভারতবাসীর গমন নিষেধ। উপরের অন্য এক অংশে ২।৩ খানি বেঞ্চ আছে, কিন্তু এঞ্জিন নিকটে থাকায় সে স্থানটি এত উত্তপ্ত যে, তথায় বসিলে প্রায় ঝল্‌সাইয়া যাইতে হয়। একতলা মুটে ও মোটে পরিপূর্ণ।

পদ্মানদীর একুল ওকুল দেখা যায় না, বলিলেই হয়। যে দিকে নয়ন ফিরাও, দেখিবে অসীম বিস্তৃত জলরাশি। তরঙ্গগুলিও বড় কেও কেটা নয়—তাহাদিগের ঘাত প্রতিঘাতে যাত্রীদিগের হৃদয়ে এক এক বার ভয়ের সঞ্চার হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা নির্ব্বিঘ্নে পদ্মা পার হইয়া, সারা-ঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে নর্দ্দারন-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা রেল গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী ছাড়িল ও বেগে চলিতে লাগিল। খানিক দূর আসিয়াছি—এমন সময় গাড়ী হঠাৎ থামিয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! কোন দুর্ঘটনা হয় নাই ত? মহা গোল পড়িয়া গেল—সকলেই গাড়ীর জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—ব্যাপারটা কি। পরে প্রকাশ হইল যে, গাড়ীর "বাফার" অর্থাৎ এঞ্জিন ও পরবর্ত্তী গাড়ীর মধ্যস্থিত শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ অবস্থিতির পর, নূতন শৃঙ্খল যোগ করা হইল—গাড়ী পুনরায় পূর্ব্বের

ন্যায় সদর্পে চলিল। আমরাও পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইলাম। সমস্ত রাত্রি এই গাড়িতে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা ৯।১০ টার সময় শিলি-গুড়িতে আসিলাম ও দার্জ্জিলিং-রেলে চড়িলাম।

এখানকার গাড়ীগুলি এক নূতন রকমের, দেখিতে অনেকটা কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর ন্যায়। এই ছোট ছোট গাড়ী গুলি লৌহ-শৃঙ্খল দ্বারা সংলগ্ন। পাহাড়ে উঠিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়—যেন পিপীলিকার সার চলিতেছে। দুই তিনটি ষ্টেশন ছাড়াইয়া, প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে, অবশেষে হর গৌরীর লীলাস্থল অভ্রভেদী হিমালয়ের নিম্নে আসিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। তরুলতা নব-শ্যামল-কোমল-হরিৎ-নীল বর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া যেন হাস্য করিতেছে ও সেই হাসিতে সৃষ্টি-কর্ত্তা পরমেশ্বরের অনন্ত মহীমা, অনন্ত দয়া, অনন্ত বিশাল গভীর প্রেমের আভা খেলিতেছে। দূর হইতে বোধ হয়, কে যেন আকাশের গায়ে নীল রং ঢালিয়া দিয়াছে। সে সৌন্দর্য্য বর্ণন করা যায় না—কল্পনার চক্ষেও দেখা যায় না—দর্শনই সে শোভা অনুভবের এক মাত্র উপায়।

এইরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও চা-বাগান সকল দেখিতে দেখিতে, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই বোধ হইতে লাগিল—যেন সেই নীলবর্ণ, আকাশ ভেদ করিয়া স্বর্গাভি-মুখে উঠিয়াছে—পূজা করিবার জন্য জগদী-শ্বরের চরণ অন্বেষণ করিতেছে। এই সৌন্দর্য্য-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

পাঠক! একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া কল্পনাদেবীর আরাধনা কর। দেখিতে পাইবে এক অতি উচ্চ দেশ, হঠাৎ এক দিন মধ্যভাগ নামিয়া গেল—দুই পার্শ্বের ভূমি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কালে দুই পার্শ্বের ভূমি বৃক্ষলতায় শোভিত হইল। ঝরনা সকল উপরস্থ এক পাহাড় হইতে নিম্নস্থ অন্য পাহাড়ে লম্ফ দিয়া শব্দ করিতে করিতে দৌড়িল। এই কাল্পনিক চিত্রের সহিত এখানকার দৃশ্যের কোন-রূপ পার্থক্য নাই।

গরুর গাড়ীর যাতায়াতের জন্য পাহাড়ের ধারে রাস্তা কাটা আছে। যখন রেল হয় নাই, তখন লোকে সেই রাস্তা দিয়া দার্জ্জিলিং ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশে যাতায়াত করিত। স্থানে স্থানে বোধ হয় যে, গাড়ী যদি এক চুল এদিক্ ওদিক্ হয়, অথবা ট্রেনের ভারে রাস্তার এক খানা পাথর খসিয়া যায়—তাহ হইলে, আমাদিগকে আর বাটী ফিরিতে হইবে না—গাড়ীর সহিত ধূলায় পরিণত হইতে হইবে। এই সকল স্থান দিয়া যখন গাড়ী চলিতে থাকে, তখন হৃদয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে এবং সেই সকল স্থান অতিক্রম করিলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। অদ্য এই পর্য্যন্ত—পরবর্ত্তী পত্রে অন্য বিষয় লিখিব। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।



কেরাণী-কাহিনী।

সমভাবে দুঃখ যার, থাকে চিরদিন,
চিন্তায়, আহার বিনা, দেহ যার ক্ষীণ ;—
সাহেবের তিরস্কার, যার অলঙ্কার,
মাসে দুই দিন যার, টাকার সুসার—
সদা যার চিন্তা—কিসে বাড়িবে বেতন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

দরকারে, আপিসেতে, নাহি পায় ছুটী,
মৎস্য যার বাজারেতে, চুনা আর পুঁটি ;
মাহিয়ানা বাদ যায় করিলে কামাই,
বেলা হ'লে, লাঞ্ছনার সীমা যার নাই—
জরিমানা দেয় যেই ভুলের কারণ,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সেজন।

অর্থাভাবে, পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ বাদ যায়—
ভাঙ্গা ছাতা, ছেঁড়া জুতা, 'কেনা' জামা গায়,
মাসেক দু'মাস অন্তে আসে যার ধোবা,
গঞ্জিলে পাওনাদার, হয় যেই বোবা ;
"বেলা হ'ল,"—ব'লে পথে ছুটে ঘনেঘন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সেজন।

মনের বাসনা যার মনে পায় লয়,
সকল উদ্যমে যার হয় পরাজয়—
অন্য পূজা হোক, বা না হোক্ বড় ঘরে,
ষষ্ঠী-পূজা ঘটা কিন্তু, প্রত্যেক বৎসরে ;
সাহেব না গেলে, বাটী করে না গমন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সেজন।

সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে যে জন অক্ষম,
অল্পমূল্য দ্রব্যে যার, বোধ মনোরম ;
খেটে মরে, আর সহে, নারীর ঝঙ্কার,
কন্যার বিবাহে, বাটী বাঁধা যার যার ;—
নিদ্রা-যোগে, সদা যেই দেখে দুঃস্বপন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সেজন।

অবসর-দিনে যার অবসর নাই,
ছেঁড়া জামা বস্ত্র আদি করে যে সেলাই ;
কেবল সেলাই ক'রে নাহিক ছাড়ান,
ঘরেতে কাচিতে হয় লইয়া সাবান ;
দেরি-ভয়ে, অর্দ্ধ-সিদ্ধ অন্নের ভোজন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

দুরাবস্থা হোক্, কিন্তু পায় যেই ধার!
শ্রমাপেক্ষা অল্পাহার দেখিবে যাহার,—
যাহার নজর ছোট, দ্রব্যাদি কিনিতে,
'কৃপণ' বলিয়া নিন্দা কুটুম্ব-বাড়ীতে ;
খেটে মরে, অথচ যে অযশ-ভাজন!
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

সকল শাস্ত্রেই যেই সমান পণ্ডিত,
'মূর্খ' বলিলেই, কিন্তু, লোচন লোহিত !!
মেয়েদের নিমন্ত্রণে বাড়ী টেকা ভার—
কোন রূপ সখ্ প্রাণে নাহিক যাহার!
বনিতা-ব্যারামে খায় করিয়া রন্ধন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

দশ বর্ষে দশ টাকা ঋণ শোধা ভার,
ব্যবসায় নাহি যার দর্শে উপকার;
দেনা যেই আয় মধ্যে ক'রে থাকে গণ্য!
যে জন ফুরূশো খেটে মরি কার জন্য;
সংসার লইয়া ব্যস্ত—ধর্ম্মে নাহি মন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

মাস কাবারেতে যার অকূল ভাবনা,
বুলী যার মুখেতে,—'এ মাসে পারিব না;'
ধারে হাতী কিনিবারে যেই অগ্রগামী!
দেখিলে পরের সুখ হয় সদা কামী;—
মুখে বলে কাযে কভু নহেক তেমন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

বিদ্যা আছে জানাইলে ঘটে যার দোষ,
সদাই বিরাজমান হৃদে অসন্তোষ—
কর্ম্ম-স্থলে অপমান যার পদে পদে,
কখন জড়িত হয় বিষম বিপদে;
সাহেবের গালি, পরে কহে 'সম্ভাষণ,'
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

ঘরে ব'সে পুত্রগণ মূর্খ যার হয়,
বিবিধ চিন্তায় যার দেহ পায় ক্ষয়;
জলে ভিজা, রৌদ্রে পুড়া, প্রভু-গালাগালি,
এ সকল সহে সহে যার হাড় কালী;
ঋণ যার সহচর থাকে আজীবন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

বিদ্যা নাই, কিন্তু, বহু অর্থের প্রয়াস,
সাহেবে দেখায় সদা অনুগত দাস;
মূর্খতা-প্রকাশ-ভয়ে, সাহেব আজ্ঞায়,
না বুঝিয়া ভাল ক'রে, আগে পুরে সায়;
তাল ফস্‌কা'লে, খায় ভৎর্সনা, গঞ্জন—
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

যার বাটী কান্না-হাটী পূজার সময়,
সাগু খেয়ে, আপিষ করিতে যারে হয়;
জ্বর-যুক্ত হ'তে হয় একই দিবসে!
সদা যেই চলে থাকে সাহেবের বশে—
সাহেব আসিছে দেখে, সশঙ্কিত মন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

চিরদিন চলে যেই গরিবের চালে,—
ছেলে ধরে, রমণীর রান্ধিবার কালে;
বাটীতে কুটুম্ব এলে যাহার বিপদ,
দশ কথা মধ্যে যার নয় কথা 'রদ';
জায়ার অধীনে থাকে যাবত জীবন,
নিশ্চয় জানিবে ভাই! "কেরাণী" সে জন।

শ্রীরাধাজীবন রায়।



অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী কাত্যায়নী।

বেলা তিন প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রতাপ চন্দ্র শয়ন-কক্ষে বৈকালিক নিদ্রায় অভিভূত। বাহিরের প্রচণ্ড উত্তাপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার ভয়ে বাতায়ন ও দ্বার সমস্তই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভূমি-তলে একটি শীতল-পাটী বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন এবং একজন পরিচারক একখানি সুবৃহৎ তাল-বৃন্ত লইয়া অনবরত বীজন করিতেছে। নিদ্রা ভঙ্গের উপক্রম হইতেছে, এমন সময় বাহির হইতে গৃহ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। লৌহময় হাঁসকলের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে প্রতাপচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। প্রতাপচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষুদ্বয় মার্জ্জন করিলেন। একটি বৃদ্ধা রমণী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় অশীতি বৎসর,—কেশকলাপ শুভ্রবর্ণ,কপোল-দেশ লুলিত, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর বর্ণ। কিন্তু, নানাবিধ শোক দুঃখ এবং সাংসারিক ঝড় তুফানে দেহ মন জর্জ্জরিত হইয়াছে বলিয়া, লাবণ্যের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। নয়নে বিলক্ষণ জোতিঃ আছে এবং বদনে যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। বৃদ্ধার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা—একে একে সকলেই অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছে। কেবল সর্ব্ব কনিষ্ঠ এক মাত্র প্রতাপচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী নাম্নী এক বিধবা কন্যা, তাঁহার এই বৃদ্ধ দশার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছেন। রাজলক্ষ্মী প্রতাপচন্দ্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা ভগ্নী—ইনিও প্রৌঢ় দশা অতিক্রম করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর। রাজলক্ষ্মী এক দণ্ড ও মাতাকে চক্ষের অন্তরাল করেন না, নিরন্তর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া আছেন। এক্ষণে তিনিও মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপচন্দ্র শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে প্রণামাদি করিয়া, বসিবার আসন প্রদান করিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন। নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

কাত্যায়নী প্রতাপচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চুণিলাল! তুমি কি করিতে বসিয়াছ?"

বৃদ্ধার পাঁচ পুত্রের নাম ক্রমান্বয়ে—"হরচন্দ্র," "রামচন্দ্র," "কৃষ্ণচন্দ্র," "গৌরচন্দ্র" ও "প্রতাপচন্দ্র" সত্বেও তিনি তাঁহাদিগকে ক্রমান্বয়ে "হীরালাল," "মতিলাল," "পান্না-লাল," "জহরলাল" ও "চুণিলাল" বলিয়া ডাকিতেন।

প্রতাপচন্দ্র উত্তর করিলেন, "কেন মা, কি হয়েছে?"

কাত্যা। কি হ'য়েছে—আবার জিজ্ঞাসা করচ?

প্রভা। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য—আপনি যা' বল্‌চেন তাই হ'বে।

কাত্যা। বলি সে কথা নয়—আমি কি জানি নে যে, তুমি লক্ষ্মী ছেলে। আমি যা' বলি তাই শোন—

প্রভা। তবে কেন মা! এমন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন?

কাত্যা। বলি—এই যে ব্রাহ্মণের কন্যাকে—কন্যা না হোক্ পালন-কন্যা ও ত বটে—তা' তুমি যে তাঁকে বাড়ীতে পূরে রাখ্‌লে, আর তাঁরা যে রাগ করে চলে গেলেন্, এখন্ তার উপায় কি?

প্রভা। আপনি কি আজ্ঞা করেন?

কাত্যা। আমি বলি কি—তাঁদের ডাকিয়ে তাঁদের কন্যা তাঁদের হাতে হাতে সঁপে দাও, আর তাঁরা যাতে শাপ মন্যি না দেন, এমন ক'রে তাঁদের বুঝিয়ে পড়িয়ে বিদায় কর। কি বল? রাজলক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মি। এর ওপর আর কি কথা আছে?

প্রভা। ভাল কথা—কিন্তু আপনাদের পায়ে আমার একটি নিবেদন আছে। যদি সেই কন্যাটি তাঁদের অত্যাচারে কষ্ট পেয়ে, আমার নিকটে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তা'তে আমার কি করা উচিত?

কাত্যা। সেটি বড় বিষম সমস্যা।

প্রভা। তাই মা! আমি সাত পাঁচ ভেবে, কিছুই ঠিক্ করিতে না পেরে, শেষ এই বিবেচনা কর্‌লেম যে, শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়াই উচিত। আপনি বোধ হয় সকলই শুনে থাক্‌বেন—কেন মেয়েটি এখান থেকে যেতে চায় না?

কাত্যা। হাঁ আমি সব শুনেছি। দেখ রাজলক্ষ্মি! এ ঘটনাটি এমনি আশ্চর্য্য, যেন বিধাতা তাঁর দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে, স্বয়ং তাঁকে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রাজলক্ষ্মী। হাঁ মা! আমিও ত তাই ভাবি। তা' দেখ মা! তিনি এমনি দয়াল যে, তিনি নির্দ্দোষীর কান্নায় অবশ্যই কান দেবেন, আর রামায়ণেও পড়ে দেখেছি যে, রাবণ শুধু জানকীর কেশে ধ'রে সবংশে নিপাত গেল। তা'সতী যে হ'বে, তার উপর অত্যাচার হ'লে বিধাতা কখনই সহ্য করেন না।

কাত্যা। দেখ, রাজলক্ষ্মি! চুণিলাল আমার ছোট বেলাটি অবধি পরের দুঃখ দেখ্‌লে যেন কি করতে থাকে। চুণি আমার যখন পাঁচ বছরের, তখন একদিন আমাদের বাড়ীতে একটি কাণা এসেছিল দরওয়ানেরা বুঝি বলেছিল,—এখন পাবিনে চলে যা,—চুণি তাই শুনে দৌড়ে গিয়ে, কাণার কাপড় ধ'রে তাকে টেনে নিয়ে এল, এনে আমাকে এসে বল্‌লে—মা ওর চোখ্ নেই, ও কিছু দেখতে পায় না, ও কি ক'রে রাস্তায় চলে যায় মা? আমি বল্‌লেম্—ভগবান্ ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ান—সেই কথা শুনে চুণি বল্‌লে, তা' তুমি আমাকে একটি পয়সা দাও, আমি ওকে দিয়ে আসি, ও খাবার কিনে খাবে। আমি একটি পয়সা দিলেম্, দিতেই আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে গিয়ে, পয়সাটি কাণাকে দিয়ে এল। তা' চুণির স্বভাবটি বড় হয়েও কিন্তু সেই রকমই আছে। চুণির বয়স যখন ষোল বছর, তখন আমাদের খিড়্‌কির পুকুরে আমাদের রামা চাকর ডুবে যাচ্ছিল, রামা হাঁক্ পাঁক্ কর্‌চে, নাকে মুখে জল ঢুক্‌ছে,

কিন্তু, কারও এমন সাহস হ'ল না যে, তাকে তুলে নিয়ে আসে। চুণি আমার কর্‌লে কি—কোমরে ক'সে কাপড় বেঁধে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, প'ড়ে রামাকে বল্‌লে,—ধর বেটা! আমার কোমরের কাপড় ধর। রামা কাপড় ধর্‌লে, ধর্‌তেই চুণি অমনি সাঁতুরে তাকে ঘাটে এনে তুল্‌লে। তা' চুণির স্বভাবটাই এই রকম।

প্রতাপচন্দ্র নিজের সুখ্যাতি শুনিয়া, কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং মাতাকে বলিলেন,—"দেখুন মা! তাই আমি বল্‌ছিলেম যে, দেখাই যাক্ না কত দূরের জল কত দূরে দাঁড়ায়। মা দশভূজার মনে যা' আছে, তাই হ'বে।

কাত্যায়নীর পূর্ব্ব কথা সকল স্মরণ হইল—শোক-সাগর উথলিয়া উঠিল। অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—"বাবা! আমি যে ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয় পাই। চার দুষ্‌মন্ চারবার অন্তরে দাগা দিয়ে গেছে। এই বৃদ্ধ বয়সে এই 'অন্ধের নড়ি' তুমি আছ—তা' বাবা! তোমায় রেখে আমি মর্‌তে পারলেই হয়। বিধাতা তা' হলেই আমার সর্ব্ব দুঃখ ঘুচান। সবাই বলে–তোমার চুণি আছে তোমার ভাবনা কি? তুমি সাত বেটার মা—সাত রাজার ধন এক মাণিকে তোমার ঘর আলো। আমি বলি—বলোনা বলোনা,—ও কথ বলোনা। চুণি যখন হরিবোল দিতে দিতে আমায় গঙ্গায় নিয়ে যাবে, চুণি যখন আমার মুখে আগুন দেবে, তখন চুণি আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক, তা' নইলে আমি জানি চুণি আমার কালসাপ! ফণা ধরে আছে, কখন দংশা'বে তার ঠিক নাই। বল্‌তে কি, লক্ষ্মি! অন্তরে এমন ঘৃণা হয়—বলি ছিছি, আট্ আট্‌টাকে গর্ভে ধর্‌লেম—তা' সবই কি বৃথা হলো। এই কথা বলিয়া কাত্যায়নী রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজলক্ষ্মী ও মাতার ক্রন্দনে শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রতাপচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া, উভয়কে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় বস্ত্রে উভয়ের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"আপনারা কাঁদেন কেন? দশভূজা কি এমনিই কর্‌বেন।"

কাত্যায়নী বলিলেন,—"সকলই বুঝলেম্, কিন্তু মন যে কিছুতেই স্থির হচ্চে না, আজ ক'দিন ধরে ভোর বেলা কেবল দুঃস্বপ্নই দেখ্‌ছি। এমনি ভয়ের স্বপ্ন সব দেখছি যে, সে সব বল্‌তে গেলে গায়ে কাঁটাদেয়,—বুকের ভিতর গুর-গুরিয়ে উঠে। এত দিন্ ত এ সব বালাই ছিল না। আজ ভোরে স্বপ্ন দেখ্‌লেম—যেন একটা কেলে মাগী, (ঠিক যেন কয়লার মত রঙ) মাথার চুল গুলো যেন কাঁটার মত খাড়া হ'য়ে র'য়েছে, এক খানা কাণি পরা, ডান হাতে এক সরা আগুণ আর বাঁ হাতে এক গাছা ঝাঁটা—মাগী হিহি করে হাস্‌ছে, আর আমাদের উঠনের চার ধারে নেচে নেচে বেড়াচ্চে। মাগী আবার বল্‌চে কি—'সব খাব, সব খাব'! আমার অমনি ঝাঁৎ করে ঘুম্‌টা ভেঙ্গে গেল, বিছানায় বসে কতক্ষণ ভাবলেম্—কেন রোজ রোজ এমন স্বপ্ন দেখি! বাড়ীতে কি কোন অমঙ্গল ঘট্‌বে? তা বাবা! দেখ আমার মনে ত এক তিল সুখ নাই। তোমাকে আমি সব মনের কথা খুলে বল্‌

লেম, তুমি এখন বড় হ'য়েছ, বুঝে সুঝে কাজ কর। তোমার সঙ্গীরা সব কেও ছোট ঘরের ছেলে নয়—সকলেই বিদ্বান্, সকলেই বুদ্ধিমান্—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ কর, তাঁরা যা' বল্‌বেন, তাই কর্‌বে। যেন একটা বিপদ্ আপদ্ ঘটে না। আমার এই বৃদ্ধ বয়েস, কবে আছি কবে নেই, আমার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদেরই এই ঘর-কন্না, এখন কর্ত্তে হ'বে।"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"মা! তোমার পায়ের ধুলা আমার মাথায় দাও। আর আমি কিছু চাই নে। ঐ পায়ের ধুলা মাথায় করে যেখানে যাব, সেই খানেই জয়ী হব। স্বপ্নের কথা যা' বল্‌ছেন—ও সব কিছু নয়। মনের ভিতর যেটা সর্ব্বদা তোলা পাড়া করা যায়, সেইটেই স্বপ্নে দেখা যায়। আপনি দুর্গানাম জপ্ করুন, ও সব ভয় একবারে দূর হ'য়ে যাবে।

রাজলক্ষ্মী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"মা! দেখ আমাদের চুণিলালের কথা গুলি সব পাকা পাকা। এক একটি কথার দাম হাজার টাকা। মা! চুণির বয়স হলো কত।"

কাত্যায়নী বলিলেন,—"এই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আট গণ্ডা যাচ্চে। কোজাগর পূর্ণিমের রাত্তিরে চুণি হয়। বাড়ীর সকলে মিলে লক্ষ্মীর উপবাস ক'রে, রাত জেগে বসে আছি, এমন সময় ব্যথা হলো; আমি অম্‌নি তাড়া তাড়ি, সকলের পায়ের ধূলো নিয়ে, আঁতুড় ঘরে গিয়ে বস্‌লেম। দাই না আসতে আসতেই, চুণি ভুমিষ্ঠ হ'ল। সকলের আহ্লাদের আর সীমা রইল না। চার্ দিকে সবাই উলু দিতে লাগ্‌ল—শাঁখ বাজা'তে লাগ্‌ল। পূর্ণিমের রাত্‌টা বেশ সজাগে কেটে গেল। কিছুই ভুলিনি লক্ষ্মি! সকলই হুবাহুব্ মনে পড়ছে। এখন সেই চুণিকে আমার বাঁচিয়ে রেখে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে যেতে পারি, তবেই সব বজায় থাকে—তা' নইলে কিছুই কিছু নয়।

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"মা! একটি গোপনীয় কথা এখানে ভাঙ্‌ব। বোধ হয়, আপনি তার আভাষ পেয়ে থাক্‌বেন। যে মেয়েটি আপনার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন, সেটি বিধবা নন—সধবা। আপনার জমীদারীর নায়েব যদুনাথ, তাঁর স্বামী। যদুনাথ ১২ বৎসর কাল নিরুদ্দেশ হ'য়েছিল। জমীদারকে খাজনা দিতে পারে নাই ব'লে, জমীদার তাকে প্রাণে মারবার চেষ্টা করে; যদুনাথ আগে জান্‌তে পেরে, পলায়। যদুনাথ আগে এ সব ব্যাওরা আমাকে কিছুই বলে নাই; তার যে স্ত্রী এখানে এসে পড়েছিল, তাও সে জান্‌তে পারে নাই। এখন যদুনাথ মহেশপুরে গেছে। মেয়েটিকে আপনি সমস্ত ভেঙে চুরে বল্‌বেন। জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—তিনি তাঁর স্বামীকে চিন্‌তে পারেন কি না? যদি চিন্‌তে পারেন, তবে সব গোলই মিটে যাবে, না যদি চিন্‌তে পারেন—পরিচয় দিয়ে চিনিয়ে দিতে হ'বে। আহা! তিনি কত দিন স্বামী-ধনে বঞ্চিত হ'য়ে আছেন! তাঁর সকল কথা শুন্‌লে, আমার চোখে জল আসে। একে তাঁর এই দশা, তার উপর আবার এই অত্যাচার! পাপিষ্ঠ চণ্ডীচরণ! তোমার ক্ষমতায় যা' থাকে তা তুমি কর্‌বে, আমি প্রাণ-সত্ত্বে তোমায় সতীর সতীত্ব-নাশ করিতে দিব না। যথার্থ ধর্ম্ম-পথে যদি আমার মতি থাকে, তবে, আমি

যদুনাথকে তাঁর সহধর্ম্মিণীর সহিত মিলন করাইয়া দিব। প্রতাপচন্দ্রের এই অকাট্য প্রতিজ্ঞা।"

কাত্যায়নী ও রাজলক্ষ্মী উভয়েই অনুমোদন করিলেন। প্রতাপচন্দ্র সুস্থির হইলেন। কাত্যায়নী বলিলেন,—"বাবা! যাতে মানে মানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে গোল মিটে যায়, তাই ক'র। দাঙ্গা হাঙ্গামের দিকে যেওনা।"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"দুর্গার মনে যা' আছে তাই হ'বে, আমি সামান্য মানুষ, আমি কি বল্‌তে পারি ভবিষ্যতে কি ঘট্‌বে? কিন্তু মা! নিশ্চয় জানি—আপনার শ্রীচরণ-প্রসাদে সকল বিপদেই কেটে ছিঁড়ে উঠ্‌ব, তার আর সন্দেহ নাই।"

কাত্যায়নী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া গাত্রোত্থান করিলেন। রাজলক্ষ্মী মাতার হস্ত ধারণ করিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রতাপচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভাই চুণি! মা যা' বল্লেন সব শুন্‌লে ত ভাই?"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"আপনাদের আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" প্রতাপচন্দ্র উভয়কে প্রণাম করিলেন—কাত্যায়নী ও রাজলক্ষ্মী উভয়ে আপন কক্ষে গমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রৌদ্র-তেজঃ হ্রাস হইয়া আসিল। প্রতাপচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

গুপ্ত-লিপি।

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া অবধি অম্বিক বাবুর অন্তঃকরণের সুখ শান্তি একেবারে লোপ পাইয়াছে। যত দিন কারাগারে ছিলেন, তত দিন শারীরিক যন্ত্রণা এত দুর ভোগ করিতে হইয়াছিল যে, লোক-নিন্দা বা অপমান-ভয়, তাঁহার অন্তঃকরণকে অধিকার করিতে পারে নাই। তখন, কেবল একমাত্র মনে হইত—কেমন করিয়া এই দুঃসহ দেহ-যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব, কবে শমন সমান প্রহরিগণের নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত হইতে মুক্তি লাভ করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তিনি প্রাণে প্রাণে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন বটে, কিন্তু, অন্তরের মলিনতা আর কিছুতেই অপসৃত করিতে পারিতেছেন না। তিনি এক্ষণে অর্দ্ধ ভোজন ও অর্দ্ধ নিদ্রায় দিন যাপন করিতেছেন এবং ক্রীড়া ও আমোদ আহ্লাদে একেবারেই বিরত হইয়াছেন, বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট আর মুখ দেখান না; সদরে আসিয়া এক দণ্ড ও বসেন না। যখন একাকী থাকেন, তখন কেহ কেহ অন্তরাল হইতে দেখিয়াছেন যে, তিনি কখন বা রোষ কষায়িত লোচনে অধর দংশন করিতেছেন, কখন বা বাহু আস্ফালন করিয়া শূন্যে মুষ্টাঘাত করিতেছেন; ফলতঃ, অশান্তির অন্ধকার তাঁহার হৃদয়কে একান্ত সমাচ্ছন্ন করিয়াছে এবং বৈর-নির্য্যাতন-চেষ্টা, অন্তঃকরণ মধ্যে নিতান্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রিয়তমার সহিত আর বাক্যালাপ করেন না, চোখোচোখি হইলে বিরক্ত হইয়া বদন ফিরাইয়া লন, নিকটে আসিলে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া থাকেন। হিতাহিত বিবেচনা বা ললাট লিপির অনিবার্য্যতা, তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় না। তিনি সততই মনে করেন, গিরিবালা হইতেই তাঁহার

এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। গিরিবালা যদি সে দিন বাটীর বাহির না হইত, তাহা হইলে ত আর এত অনর্থ-পাত হইত না। গিরিবালা যদি ঘাটের দিকে দৌড়িয়া না গিয়া বাটীর দিকে দৌড়িয়া আসিত, তাহা হইলে ত আর এ বিপদ্ ঘটে না। মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া ক্রোধে তাঁহার বদন-মণ্ডল নিরন্তর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং অভিমানে নয়নদ্বয় অনবরত ছল্ ছল্ করে। তিনি অনেক সাধ্য সাধনার পর, বিরক্ত ভাবে উঠিয়া আহার করেন এবং অন্ন ব্যঞ্জনাদি থালের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া যান। রজনীতে কয়েক ঘণ্টা নিদ্রা গিয়া, অর্দ্ধরাত্রেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান।

তাঁহার এইরূপ ভাব অবলোকন করিয়া, কোমল-স্বভাবা গিরিবালা সদাই সশঙ্কিত এবং কখন কখন জননীর কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া রোদন করেন। জননী আর কি করিবেন—প্রবোধ ও আশ্বাস-প্রদানে তাঁহার হৃদয়-ভার অপনীত করিবার চেষ্টা করেন। গিরিবালা নিতান্ত অল্প বয়স্কা—শোক দুঃখের মুখ কখন দেখেন নাই। সম্প্রতি চির-সঙ্গিনী সহচরীকে হারাইয়া, তাঁহার অন্তঃকরণের সচ্ছন্দতা একবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। তাহাতে আবার অনুকূল স্বামীর এইরূপ অসম্ভব প্রতিকূলতাচরণ সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার মর্ম্ম স্থানে শেল বিদ্ধ হইতেছে, শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মণীর আর উদরে অন্ন যায় না—এমন সোণার জামাই কি হইয়া গেল! আমার মা লক্ষ্মীকে এমন করিয়া কাঁদাইতে লাগিল কেন? কৈ জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথাই কয় না—কেমন করিয়া জানিব কি হইয়াছে, এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্তের আর স্থিরতা নাই। স্বামী হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া আছেন,—পুত্রের মনে যাহা আসিতেছে তাহাই করিতেছে,—যে বউমাকে মাথায় রাখিলে উকুনে খাইবে, মাটিতে রাখিলে পিপীলিকায় খাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইত—যে বউমাকে ষোল আনা যত্ন করিয়া মনের আশা মিটিত না, সেই বউ মা আবার চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল! এমন সোণার সংসারে কালী ঢালিয়া দিল! অল্প দিনের মধ্যেই এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, ব্রাহ্মণী একেবারে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া আছেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিতেছেন বটে যে, এক কারাবরোধই জামাতার মনোমালিন্যের এক মাত্র কারণ, তথাপি স্ত্রী-স্বভাবসুলভ অস্থিরতা প্রযুক্ত, কখন বা দৈবজ্ঞ আনিয়া গণনা করিতে বলেন,—কখন বা গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করেন। কিন্তু, কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

যাহা হউক, ঘোষাল মহাশয়ের সংসারের অবস্থা অতিশয় মন্দ। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সমাধা হইতেছে—নিত্য দুবেলা যত গুলি পাত পড়ে, তাহা পড়িতেছে—নিত্য যিনি যাহা করিয়া থাকেন তিনি তাহা করিতেছেন—ঠাকুর ঘরে নিত্য কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া থাকে, তাহাও বাজিতেছে,—কিন্তু, সকলই যেন নিরুৎসাহ ও নিরানন্দে পরিপূর্ণ!

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর, সকলেই আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিয়াছে। সকল গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ। কেবল একটি

গৃহের কবাট অৰ্দ্ধেক উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে—তন্মধ্য দিয়া প্রদীপের আলোক দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। আসুন, পাঠক মহাশয়! নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আসিয়া কবাটের অন্তরাল হইতে অতি সংগোপনে নিরীক্ষণ করা যাউক, অম্বিকাচরণ এখন কি করিতেছেন।

অম্বিকাচরণ শয্যায় শয়ন করেন নাই—দুগ্ধ-ফেণ-নিভ কুসুম সুকোমল শয্যা প্রস্তুত, তথাপি তাহাতে শয়ন করেন নাই, নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। পাদদেশে গিরিবালা বসিয়া চরণ সেবা করিতেছেন, কিন্তু উভয়েরই মুখে কোন কথা নাই। পদসেবা করিতে করিতে, গিরিবালা মনে মনে এই ভাবিতে লাগিলেন,—"কতদিন আর এমন করিয়া থাকিব? এ যন্ত্রণা ত আর সহ্য হয় না। যে স্বামী অষ্ট প্রহর নানা উপায়ে আমার মনোরঞ্জন করিতেন, সর্ব্বদাই বচন-সুধায় শ্রবণ-বিবর পরিতৃপ্ত করিতেন—এক দণ্ড ও যিনি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেন না—সেই স্বামীর মুখে, আজ কয় দিবস হইল, কথা নাই। আমার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না, এ কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! যাহাই হউক, আর লজ্জায় কায নাই, পোড়া লজ্জায় আর কায নাই। আজ নিশ্চয়ই কথা কহিব,—মনের দুঃখ আজ সমস্তই জানাইব—তা'তেও না কথা কন, পায়ে মাথা কুটিব—মাথা কুটিয়া রক্তারক্তি করিব—তা'তেও কথা না কন, গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিব।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু-জল গিরিবালার চক্ষু হইতে অম্বিকা চরণের জানুদেশে নিপতিত হইল। পাষাণ-হৃদয় অম্বিক, ইহাতেও উপেক্ষা করিয়া, নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। গিরি-বালার আর সহ্য হইল না—এই বার মুখ ফুটিল। অজস্র অশ্রু-বারি বর্ষণ করিতে করিতে, স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন,—"ওগো! তোমার পায়ে পড়ি, বল না—তুমি আমার এমন হ'লে কেন? তোমার এক এক দিন, এক এক রকম দেখে আমার যে বুকের ভিতর শুকিয়ে যায়, আমি যে চারদিক অন্ধকার দেখি। আমি যে ছেলে মানুষ,—আমি কি অত বুঝ্‌তে পারি? আমায় এমন ক'রে দ'গ্ধে মারা কি তোমার উচিত হয়? তোমার পায়ে পড়ি বল না—আমার কি দোষ হ'য়েছে। যদি কিছু ক'রে থাকি, তবে, তোমার পায়ে মাথা কুটছি, তুমি আমায় মাপ কর। কেনই বা পোড়া চুল বাঁধলুম্, কেনই বা পান খেলুম্—কেনই বা গয়না পর্‌লুম্? তুমিই যদি চেয়ে দেখ্‌লে না—তুমি যদি সারাদিন চোখ্‌ বুজে রইলে, তবে আমার এ সবে আর দরকার কি? আমার মাথা খাও, আমার মরা মুখ দেখ, একটি কথা কও। আমার পেটের ভিতর যে কত কথা রয়েছে, তোমায় বল্‌ব বল্‌ব করি, বল্‌তে পাই নে। আমার সহচরী আমায় ফেলে কোথায় গেল? সহচরি! দিদি আমার! তুই যে সে রাত্তিরেও আমায় আগ্‌লে নিয়ে শুয়ে-ছিলি, আমি যে স্বপ্নেও জানি নে যে, তুই আমার চোখে ধুলো দিয়ে পলা'বি। আয় দিদি! আয়, একবার আয়, তোর সঙ্গে দুটো, মনের কথা কই। আমি যে আর ভাব্‌তে পারি নে—আমি যে আর কাঁদতে পারি নে; তোর সেই হাসি-হাসি মুখখানি আমার মনে সদাই জাগ্‌ছে। তোর সেই

ফুলের মতন নরম হাতটি ধ'রে আমার বেড়া'তে ইচ্ছে হচ্চে। আমি যে একটু কাঁদলেই তুই আমার চোখ মুছিয়ে দিতিস্, এখন যে এত কাঁদছি, একবার কি এসে দেখ্‌বি নে? মনের কথা আর কার কাছে কব? যার কাছে কব, সে যে আর আমার পানে ফিরে চায় না। আমার যে কপাল ভেঙ্গেছে! সে আনন্দের দিন যে আমার আর নাই! আয় দিদি! তুই ফিরে আয়, তা'হলেই আবার সব ভাল হ'বে। তুই যে আমার সুখের সুখী—দুখের দুখী; তোর কাছে খানিক কাঁদলেও আমি ঠাণ্ডা হব।"

গিরিবালা এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া উদ্ধত স্বভাব অম্বিকার মনে দয়ার সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না। গিরিবালা আবার বলিলেন,—"ওগো! তুমি এখন ও কথা কইলে না? আমি এত কাঁদছি তবু কথা কইবে না? তবে আর আমার বেঁচে সুখ কি? হে পৃথিবি! তুমি দু'ফাঁক হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি।" এই বলিয়া গিরিবালা সজোরে আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং অচেতন প্রায় হইলেন। তদ্দর্শনে অম্বিকাচরণ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে জানিতেন—গিরিবালা নিতান্ত নিরপরাধা ও সরল স্বভাবা। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, গিরিবালার মুখে জলসেচন করিলেন এবং বাতাস করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গিরিবালা চেতন পাইয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে অস্পষ্ট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"নিষ্ঠুর! পাষাণ হৃদয়! এই কি তোমার ভালবাসা? আমার প্রাণ যায়, তুমি রঙ্গ দেখ!"

অম্বিকাচরণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"না গিরিবালা! উঠ, উঠ, আর আমি তোমার প্রতি এমন আচরণ কর্‌বো না। তোমার কিছু দোষ নাই—আমারই কপালের দোষ।"

গিরিবালা তদবস্থায় আবার বলিলেন,—"আমি মরি,—তুমি আবার বিবাহ কর—কিন্তু, এমন ক'রে আর তা'কে জ্বালিও না"—

অম্বিক বলিলেন,—"না গিরিবালা! এমন কথা মুখে আনিও না। আমিই যেন নিষ্ঠুর, তুমি কেন নিষ্ঠুর হও? উঠ, উঠ, গিরিবালা! আর এমন ক'রে প'ড়ে থেকো না। আমি তোমার এমন দশা দেখ্‌তে পারি নে। মনে কিছুই সুখ পাই না, তাই এমন ক'রে থাকি।"

গিরিবালা গাত্রোত্থান করিলেন এবং অধোবদনে লজ্জিত ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"আমার বুকের ভিতর যেন পাঁজার আগুন জল্‌ছিল—তুমি কথা কইলে, আমার সে আগুনে জল পড়্‌লো। অমন অবস্থায় পড়েছিলুম্, তুমি ত একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌লে না, কেমন ক'রে বাঁচ্‌লুম। জমীদার বাবুর বাড়ী থেকে, কত জিনিষ পত্র আনলুম্, সকলই বোঁচকা বাঁধা রইল—তুমি একবারও ত খুলে দেখ্‌লে না। তুমি কি আর আমার ভালবাস্‌বে না? এখানে এসে সব কথা শুনে অবধি, আমাতে আর আমি নেই। আমাদের কপালে যে, এত ছিল তা' স্বপ্নেও জান্‌তেম্ না। বাবার মুখ দেখ্‌লে আর চোখের জল রাখ্‌তে পারি নে। মা যেন পাগল হয়ে আছেন। ঠাকুরের কাছে যে, কি অপরাধ কল্লেম, তা' ত বল্‌তে

পারি নে। এমন সুখের সংসার দু'দিনে যেন কি হ'য়ে গেল! যাই হোক্, একটি কথা আমার রাখ্‌তে হ'বে। সে কথাটি যদি না রাখ, তবে তোমার পায়ে মাথা কুটে রক্তারক্তি হ'য়ে মর্‌বো।

অম্বি। কি কথা—বলই না।

গিরি। বল্‌তে বড় ভয় হচ্চে—পাছে তুমি রাগ কর।

অম্বি। আচ্ছা আমি রাগ কর্‌ব না।

গিরি। একখানি পত্র—

অম্বি। লিখ্‌বে?

গিরি। লিখে রেখেছি।

অম্বি। কা'কে পাঠা'বে?

গিরি। সহচরীকে।

অম্বি। সে কোথায়? শুনেছি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

গিরি। সেই খানেই আছে।

অম্বি। সকলে ত তা' জানে না?

গিরি। প্রকাশ হ'লেই সর্ব্বনাশ।

অম্বি। সেখানে রইল কেন?

গিরি। দাদার কীর্ত্তি ত সব জান?

অম্বি। তা জানি বৈ কি।

গিরি। তবে, আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

অম্বি। পত্র লিখ্‌লে অনর্থ-পাত হ'বে যে?

গিরি। যাতে না হয়—তার উপায় কর্‌তে হ'বে।

অম্বি। পত্রে কি লিখেছ?

গিরি। ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশের উপায় হচ্চে তা' ত শুনেছ।

অম্বি। শুন্‌তে কিছুই বাকী নাই।

গিরি। তাই সহচরীকে পত্র লিখ্‌লে, সে তাঁদের সতর্ক ক'রে দেবে?

অম্বি। বড় ভাইকে রেখে প্রতাপ বাবু আপনার হ'ল?

গিরি। তিনি যে প্রাণ-দাতা—অতি সৎলোক।

অম্বি। তা'ত বুঝলেম্। পত্র পাঠা'বার উপায় কি?

গিরি। অন্য কারও হ'তে হ'বে না।

অম্বি। তবে?

গিরি। তুমি যদি ধর্ম্মের পক্ষ হও, তা'হলে পত্রের হাতুপ্রা হ'বে।

অম্বি। সে আবার কি?

গিরি। বুঝ্‌তে পার্‌লে না?

অম্বি। বুঝতে পেরেছি—আচ্ছা, পত্র পৌঁছে দিবার ভার আমার রইল।

গিরি। আমরও ধড়ে প্রাণ এল।

অম্বি। কৈ পত্রখানি দেখি।

গিরি। তোমায় না দেখা'লে আর কা'কে দেখা'ব?

এই বলিয়া গিরিবালা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া একটি সিন্ধুক খুলিলেন। সিন্ধুক খুলিয়া তন্মধ্যে হইতে একটি ছোট বাক্স বাহির করিয়া, সেটিও খুলিলেন। তন্মধ্যে ছিন্ন বস্ত্রাবৃত পত্র ছিল, তাহা বাহির করিয়া সচ্ছন্দভাবে অম্বিকের হস্তে প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন,—"মনে মনে পড়"—

অম্বিকাচরণ পত্র খুলিয়া বলিলেন,—"এত রাত্রে আর কে জেগে আছে যে, শুন্‌তে পাবে? ভাল আমি আস্তে আস্তেই পড়্‌ছি।" গিরিবালা দেখিলেন, কৌশল খাটিল না; কি করেন; অধোবদনে লজ্জিত ভাবে পত্র শুনিতে লাগিলেন। অম্বিক বাবু পাঠ করিলেনঃ—

"প্রিয় সখি!

অনেক দিন হইল তোমার মুখ-পদ্ম না দেখিয়া, আমার মন অতি ব্যাকুল হইয়াছে। বিধাতা কি এমনি করিবেন যে, তোমায় আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না। তুমি কি নিষ্ঠুর—আমাকে না তুমি বড় ভালবাস? এই বুঝি তোমার ভালবাসা? কোন্ প্রাণে আমায় ফেলে পলা'লে? যে আমি তোমা অন্ত প্রাণ। কিন্তু বোন্! তোমার উপর আর আমার রাগ নাই। তোমার কথা সেখানে বৌ মায়ের মুখে যা' শুনিয়া আসিয়াছি, আর যাহা কিছু আপন চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি—তা'তে আমি বড় খুশী আছি। যদি বিধাতা তাই করেন, তা'হলে আমি যে কত সুখী হব, তা' আর আমি এক মুখে কি বল্‌ব। তুমি স্বামী-সোহাগিনী হ'য়ে চির-কাল ঘর-কন্না কর—এই আমার অন্তরের বাসনা; কেন না, এ সংসারে স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম ধন ও পরম দেবতা। ভগবানের মনে যা' আছে তাই হ'বে।

এখন একটি মন্দ খবর তোমায় দিতেছি। দাদাও মহা গোলযোগ বাঁধাইয়াছেন। প্রতাপ বাবুর বাড়ীতে শীঘ্রই একটা ভয়ানক ডাকাতি হইবে। কেন তা' ত বুঝতেই পেরেছ? আমার কথাটি উপহাস জ্ঞান করিও না। এখন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তাঁদের এ বিষয়ের একটা আভাস দিবে। কবে যে এই সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহাও বলিতে পারি না। যাহা হউক, তুমি তাঁহাদিগকে সতর্ক রাখিবার একটা উপায় অবশ্য অবশ্য করিবে। প্রতাপ বাবু আমাদের প্রাণদাতা; তাঁর কোন অমঙ্গল হইবে, ইহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না—কাজে কাজেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলাম। পত্রখানি পাঠ করিয়াই কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, কিম্বা আগুনে ভস্ম করিয়া ফেলিবে; আর, আমি যে তোমায় এই বিষয়ে পত্র লিখিয়াছি, ইহা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিও না। আমরা সকলেই শারীরিক ভাল আছি জানিবে। পত্রের উত্তর পাঠাইও না। ইতি তারিখ ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১১৭৭সাল।

মঙ্গলাকাঙ্খিনী—

শ্রীমতী গিরিবালা দেবী।"

পত্র পাঠ করিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তৎপরে পত্রখানি আম্র-নির্যাসে দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া, তদুপরি সহচরীর নাম লিখিলেন এবং আর একখানি কাগজে উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আবৃত করিয়া, তদুপরি প্রাতাপ বাবুর নাম লিখি-লেন এবং গিরিবালাকে বলিলেন,—"এখানি যেরূপ ছিল, সেইরূপে লুকাইয়া রাখ; কালি উহা পাঠাইয়া দিবার উপায় করিব।" গিরি-বালা তাহাই করিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, অম্বিকাচরণ আর কোন কথার উত্থাপন না করিয়া, গিরি-বালাকে বলিলেন,—"শয়ন করা যাউক।" অম্বিকা শয্যায় শয়ন করিলেন এবং গিরিবালা পার্শ্বে বসিয়া তাল-বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন;—ক্রমে অম্বিকার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

আজি গিরিবালার মুখ-পদ্ম কেমন প্রফুল্ল! রাত্রি অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু, মনের উৎসাহে তাঁহার চক্ষে আর শীঘ্র ঘুম আসি-তেছে না—পতিপ্রাণা রমণীর এইরূপই হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

আগমনী।

কার্ত্তিকেতে দশ-ভূজা, কৈলাস-কামিনী,
বিশ্বানন্দময়ী মাতা, বিশ্ব-প্রসবিনী;
দেব ঋষি মুনিগণ যাঁহার চরণ—
হইয়া একাগ্রচিত্ত করেন বন্দন;
যাঁর চন্দ্রাধিক কান্তি নখর উপরে,
অপরূপ রূপ যাঁর বিশ্ব আলো করে;
মণি-মুক্তা হীরকাদি ভূষণে ভূষিতা,
দিব্যাম্বর পরিধানে বিশেষ শোভিতা;
বর্ষাবধি না হেরিয়া সে উমা-বদন,
মেনকার মন বড় হ'ল উচাটন।
গিরিরাজ প্রতি ধনী কহেন তখন,—
"উমার জন্যেতে প্রাণ করিছে কেমন।
গৌরী-বিনা এ সংসার দেখি অন্ধকার,
মধু-স্বরে 'মা' বলিয়া কে ডাকিবে আর?
হেরিলে উমার মুখ শোক তাপ যায়,
তাহার গুণের কথা বলিব কাহায়?
আনিতে পাঠা'য়ে লোক মনে ভয় পাই,
আমার কপাল গুণে পাগল জামাই।
এক বার উমা-ধনে পাই দেখিবারে,
নয়ন যুড়াই তবে, হেরিয়া বাছারে।
যে করে আমার মন সে যদি জানিত,
মাঝে মাঝে একবার দেখিয়া যাইত।
তারার সঙ্গিনী সব তারা ব'লে সারা,
সে তারা বিহনে সদা বহে অশ্রু-ধারা।
আকাশেতে শোভা পায় লক্ষ লক্ষ তারা,
সে তারা দেখিয়া তৃপ্ত নহে আঁখি-তারা।
উমা মোর স্বর্ণলতা—প্রাণের পুতলি,
গত বর্ষে ল'য়ে গেছে চোকে দিয়ে ঠুলী।"
গৌরী বিনা মেনকায় কাতর দেখিয়া,
প্রতিবেশী রামাগণ কন প্রবোধিয়া,—
"শুন গো মেনকা-রাণি! ধৈর্য্য ধর মনে,
অবিলম্বে হেরিবেন সে উমা-বদনে।
রাজ-রাণী হ'য়ে তুমি হ'লে জ্ঞান-হারা,
অকারণ মিছে কেন ভেবে হও সারা?
এই কন্যা পাইয়াছ বহু পুণ্য-বলে,
জগৎ-জননী হ'য়ে তোমা' 'মাতা' বলে।
জামাই মিলেছে ভাল দেব ত্রিলোচন,
'হর গৌরী' রূপে আলো করে ত্রিভুবন।"
হেনকালে শিব সহ হেরিয়া শিবারে,
নারী সব উচ্চ রবে কহে মেনকারে,—
"গা তোল,গা তোল, রাণি! ভবানী আসিছে,
জয়া ও বিজয়া দাসী ব্যজন করিছে।
গুহ, গণপতি, আর লক্ষ্মী, স্বরস্বতী—
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে রঙ্গে আসে পশুপতি।"
তা' শুনি মেনকা রাণী তাড়াতাড়ি যায়,
আসিছে প্রাণের উমা দেখিবারে পায়।
"এস মা! এস মা!"—ব'লে করেতে ধরিয়া,
অন্তঃপুরে ল'য়ে যান—পুলকিত হিয়া।
মনোহর রত্নাসনে তাঁরে বসাইল,
মায়ে ঝিয়ে কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল।
নাতি নাতিনীর সহ একত্রে বসিয়া,
গিরিরাজ কথা কন পুলকে ভাসিয়া।
তাঁহাদের খাদ্য জন্য নানা আয়োজন,
তৃপ্তি সহকারে সবে করেন ভোজন।
মাগো! দুর্গে, তব পদে এই ভিক্ষা চাই,—
অন্তিমে কৃপায় তব মোক্ষ যেন পাই।

শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত।



"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥"

মহাপূজা-আগমনে সবে উল্লসিত,
আপ্লুত ভকতি-রসে ভক্তের হৃদয়;
আনন্দ-সাগরে, সর্ব্ব হৃদি নিমজ্জিত—
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, সবে সম সুখী হয়।
বিশাল সমৃদ্ধিশালী—দরিদ্র হইতে,
আন্দোলিত আজি, ভাই! এক লহরীতে।

দুর্ব্বিষহ সংসারের যন্ত্রণা ভুলিয়া,
বিশ্ব-জননীর নাম জপিছে সবাই;
সবাই বিষয়-কার্য্য আছে তেয়াগিয়া,
দুঃখ-চিহ্ন কারো মুখে প্রকাশিত নাই!
দুর্গতি-নাশিনী কাছে জানা'তে দুর্গতি,
আর্য্যকুল হইয়াছে ব্যাকুলিত অতি।

পরিত্যাগ করি সবে বস্ত্র পুরাতন,—
নব বস্ত্রে বিভূষিত হ'য়েছে সকলে;
দর্শন করিতে আজি মায়ের চরণ,
চলিছে প্রফুল্ল মনে, সবে দলে দলে।
অঞ্জলি প্রদান করি পাদ-পদ্মে তাঁর,
আনন্দ-জলধি-জলে দিতেছে সাঁতার।

রোগী, শোকী, তাপী, আজি নিরানন্দ মুখে,
মহামায়া-শক্তিতে, আনন্দ-আবির্ভাব।
প্রতিমা দর্শন করি বেড়াইছে সুখে,
কারো মনে আজি আর নাহি অসদ্ভাব!
বাৎসরিক স্বস্ত্যয়ন এই মহাপূজা—
নাশেন দুর্গতি সব দুর্গা দশভূজা।

বিভূষিত বহুবিধ বস্ত্রে শিশুকুল,
কি সুন্দর শোভা মরি! ক'রেছে ধারণ;
প্রকৃতি-উদ্যানে যেন নানা-বর্ণ ফুল
ফুটিয়া, সবার করে আমোদিত মন।
অবোধ বালককুল—কোমল স্বভাবে—
জননী-চরণ বন্দে সবে ভক্তিভাবে।

দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ যা'দের চরণ,—
অবসর পেয়ে তারা আনন্দে মাতিছে;
স্বাধীনতা-সুখ-নীরে আজি নিমগন,
আত্মীয়-স্বজন-বাটী সবাই যাইছে;—
ফুরায় না যেন দিন—সবারি এ ভাব!
কি আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধ'রেছে স্বভাব।

সারারাত্র পথে ঘাটে, চলিতেছে লোক,
নব সাজে বিভূষিতা প্রকৃতি-সুন্দরী ;
জগৎ ছাড়িয়া যেন পলা'য়েছে শোক !
খেলিছে সবার হৃদে আনন্দ-লহরী।
ত্রিতাপ-হারিণী—যিনি শিব-সীমন্তিনী,
আর্য্যকুলে আশীর্ব্বাদে আসিলেন তিনি।

কবির লড়াই, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন,
মহা ধুম লাগিয়াছে ধনীর ভবনে ;
বার্ষিক-আদায়ে, কত ব্রাহ্মণ-নন্দন
ধনী-বাটী উপনীত, পুলকিত মনে—
সকলের ভবনেতে বসেছে ভিয়ান্,
লুচি মণ্ডা অনেকের, কারো অন্ন-দান।

ভিখারী-কুলের দ্বারে মহা কোলাহল,
অন্ন বস্ত্র-আকিঞ্চন করিছে সবাই ;
সবাই এসেছে ল'য়ে নিজ দল বল,
দীনবেশ—অনাহারী—তবু কষ্ট নাই !
দীন-তারিণীর পদে করি নমস্কার,
বস্ত্র খাদ্য পেয়ে, যায় আলয়ে যে যার।

শারদীয়া মহাপূজা, অকালে ঘটন,—
"বাসন্তী" যে পূজা—হয় যথাকালে তাই ;
রঘুকুল-চূড়ামণি, (নাশিতে রাবণ,)
বোধন * করিয়া পূজা করেছেন, ভাই !
রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ, বৈরিকুলনাশে,
শুক্ল-পক্ষে ষষ্ঠী, পূজা—আশ্বিনের মাসে।

কেশরী-বাহিনী সতী, ভীষণ মুরতি—
দক্ষিণেতে লক্ষ্মী-দেবী আর গজানন ;
বাম দিকে ষড়ানন, দেবী সরস্বতী—
অসুর-বিনাশ হেতু, এ মূর্ত্তি ধারণ।
নানা অস্ত্রে বিভূষিতা, দনুজ-দলিনী,
ভক্তি-রসে আর্দ্র হৃদি -হেরিবেন যিনি।

যে জন 'দুর্গা'র নাম করয়ে স্মরণ,
দৈত্য-ভয়, রোগ, পাপ, দূর তার হয় ;
সুখের সাগরে সদা থাকে নিমগন,
বিঘ্ন, ভীতি, শত্রু, তার কিছুই না রয় ;
ঐহিক কি পারত্রিক, সর্ব্ব বিঘ্ন নাশে,
সবারি উচিত পূজা,—বুঝহ আভাষে।

'ধন বিনা নাহি হয় দুর্গার পূজন',—
হেন কথা কেহ যেন না ভাবেন মনে ;
মানস-পূজায় রত হও, সুধীগণ !
ইহাতেই সবে প্রাপ্ত হ'বে মোক্ষ-ধনে।
'সনৎকুমারীয়' তন্ত্রে লিখিত আছয়ে,
সকলেই অবগত হও এ বিষয়ে।

ভক্তি-পূর্ণ অভিলাষে, "হৃৎপদ্মাসনে,"
ত্রিতাপ-হারিণী দুর্গে, করহ স্থাপন ;
চিত্ত, "পুষ্প ;" প্রাণ, "ধূপ" ; শুন সর্ব্বজনে,
"বসন" আকাশতত্ত্ব আর "অর্ঘ", মন।
ভূ-সুধা-অম্বুধি, সুধী ! "নৈবেদ্য" পূজার,
তেজস্তত্ত্ব,"দীপ"—বলি,"ষড়্ রিপু", আর।

* **বোধন**—শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থে অকালে মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, দক্ষিণায়ন, অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস, দেবতা দিগের রাত্রি কাল; এই সময়ে কোন দেবতার আরাধনা করিতে হইলে, তাঁহাদিগের বোধন (জাগরণ) করিতে হয়।

বিচিত্র পুষ্পাদি, সুধী! "ইন্দ্রিয়ের কার্য্য,"
শিরঃস্থ-সহস্র-দল-গলিত-অমৃত,—
"পাদ্যাচমনীয়" কিম্বা, "স্নান-জল" ধার্য্য;
বায়ুতত্ত্ব, "চামর" আছয়ে স্থিরীকৃত,
গন্ধতত্ত্ব, "চন্দন" জানিবে, সুধীগণ!
অনাহতনাদ, "ঘণ্টা",—স্থির নিরূপণ।

একশত অষ্ট—জপ—বর্ণের মালায়,
করিতে হইবে, সুধী! জানিবেন মনে;
'মানস-পূজা'ই শ্রেষ্ঠ, বিদিত ধরায়,
ইহাতেই মোক্ষ শুধু লভে নরগণে;
নিত্য প্রাতে, "দুর্গা, দুর্গা," বদনে যাঁহার,
সূর্য্যোদয়ে তমঃ যথা, বিঘ্ন দূর তাঁর।

আদ্যাশক্তি সতী-পদে থাকে যেন মতি,
দিবা নিশি বলি যেন, "দুর্গা" নাম মুখে;
অনিত্য সংসারে তবে হইবেক গতি,
ইহকাল পরকাল কাটাইব সুখে;
কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার নাহি অন্য বিধি,
হৃদয়-সিন্ধুকে পূর,—"দুর্গানাম-নিধি।"

শ্রীরাধাজীবন রায়।



উপদেশ।

ফুরাইয়ে যায় বেলা!
তোমার এ লীলা খেলা, সাঙ্গ কর এই বেলা,
দিন হ'লো শেষ;

জগতের জীবগণ,
জন্ম-অন্ধ, অচেতন; জানে না কে ত্রিলোচন,
কেবা পরমেশ।

ভুলা'তে তাদের সব,
ধর নিত্য অভিনব, কতই কপট ভাব,
দেখাও অশেষ—

কভু নেচে—কভু হেসে,
ভুলাইয়ে অবশেষে, সেবা চলে পরিতোষে,
নাহি দুঃখ-লেশ।

ধরেছ মস্তকে জটা,—
কিবা ত্রিবলীর ঘটা! গেরুয়া বসনে আঁটা
আছে কটিদেশ;

হ'য়ে মহা কুতুহলী,
দিতেছ যে পদ-ধূলী, সবার মস্তকে তুলি,
হইয়ে ভবেশ।

প্রভু হ'য়ে হেসে খেলে,
সুখে দিন যায় চ'লে; কিন্তু, যে মায়ার কলে,
হ'য়ে আছ মেষ!!

দেখেছ কি চক্ষুঃ মেলে?
ভেবেছ কি, কি কৌশলে, ভুলা'বে কৃতান্ত কালে,
হ'লে আয়ু শেষ।

চাও যদি পরিত্রাণ—
ত্যজ তবে অভিমান, শীঘ্র ছাড় মিথ্যা ভাণ,
ভণ্ডামীর বেশ ;

সদ্‌গুরু নিকটে গিয়ে,
তাঁর পদাশ্রিত হ'য়ে, কায় মনঃপ্রাণ দিয়ে,
শুন উপদেশ।

তা' হইলে অকাতরে,
ভব-সিন্ধু যাবে ত'রে, নহিলে শমন-করে,
পাবে বহু ক্লেশ ;

হ'য়ে আছ কেষ্ট বিষ্ট
হ'লে হ'তে পার রুষ্ট ; কিন্তু, ভাই! নজা সাষ্টি,
সব চেয়ে বেশ।

বাল্য-বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে দেখা যাক্ কি কারণে মনুর নিয়মানুসারে আমাদিগের বালিকাদিগের আজ কাল বিবাহ হয় না। মনু এক দিকে যেমন বালিকাদিগের বিবাহ দ্বাদশবর্ষের মধ্যে দেওয়া বিধেয়, নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি প্রথম রজোদর্শনের পর, বৎসরত্রয়ের মধ্যে বিবাহ দিতে ও উপযুক্ত পাত্রাভাবে যাবজ্জীবন অনূঢ়া রাখিতেও আদেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যাপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
[মনুসংহিতা,৯ম অ,৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ, ঋতুমতী কন্যা আমরণ পিতৃগৃহেও অবস্থান করিবে, তথাপি, ইচ্ছা-পূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।

"ত্রিণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥"
[মনুসংহিতা,৯ম অ, ৯০ শ্লোক।

অর্থাৎ, কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, এই কালের উর্দ্ধে সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

চিকিৎসকদিগের মত যাহাই হউক না কেন, ঋতুর দ্বারা যে স্ত্রীলোকদিগের যৌবনোদ্গম প্রকৃতি-দেবী আমাদিগকে দেখাইয়া দেন, তাহাতে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কন্যাদিগের প্রতি স্নেহবশতঃ অনেক পিতা মাতা তাহাদিগের রজোদর্শনের অনেক পরে বিবাহ দিতেন। সুতরাং, অনেক কন্যা রজোদর্শনের পর, প্রকৃতিদত্তপ্রবৃত্তি দমনে অসমর্থা হইয়া, গুপ্তপ্রণয়ে অঙ্গ ঢালিয়া দিত ও তাহাদিগের অবৈধপ্রণয়ের ফল-স্বরূপ জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমাদিগের পুরাণে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ধর্ম্মনীতির শৈথিল্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কলিযুগে মনুদত্তধর্ম্ম আচরিত হইলে, দুর্ব্বলান্তকরণ কলির লোক দিগের মধ্যে ধর্ম্মনীতির অস্তিত্ব একবারে বিলোপ হইবে

ও এই আশঙ্কা বশতঃ মনুদত্ত ধর্ম্ম আংশিকরূপে রহিত করিয়া, সমাজের কল্যাণ সাধনার্থে, পরাশর-লিখিত ধর্ম্ম কলিযুগের লোকদিগের আচরণীয়, এই বিধান করিলেন। যাঁহারা মনুর মতানুসারে বালিকাদিগের যৌবনে বিবাহ দেওয়া হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, মনু-সংহিতা কলিযুগের লোকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে—পরাশরসংহিতাই কলিযুগের ধর্ম্ম-শাস্ত্র। পরাশরসংহিতাই যে, কলির ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহার প্রমাণ আমরা নিম্নে দিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমূহের নাম উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ ॥"

[যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১ম অ,৪,৫,শ্লোক।

অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশন, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ—এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিদিগের দ্বারা প্রণীত। একণে দেখিতে হইবে যে, এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতে সকল যুগে চলিতে হইবে, না ভিন্ন ভিন্ন যুগের নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে? এই প্রশ্নের উত্তর পরাশর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যায়। যথা—

"অন্তেকৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্তে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ ॥"

[পরাশর সংহিতা,১ম,অ,২১ শ্লোক।

অর্থাৎ, সত্যযুগে মনুষ্যের এক প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে বিভিন্ন রকম, দ্বাপরে আর এক প্রকার ও কলিযুগে অন্য ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম কলিযুগে চলিবে না। ত্রেতা-যুগের লোকদিগের সত্যযুগের ধর্ম্মানুসারে চলিবার ক্ষমতা ছিল না ও দ্বাপরযুগের লোকেরা ত্রেতাযুগের ধর্ম্মানুসরণ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন বিভিন্ন যুগের উপযোগী বিভিন্ন বিভিন্ন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং কলির ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ও কলিযুগের লোকদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগত্রয়ে প্রচলিত ধর্ম্ম অনাচরণীয়। একণে দেখা যাক্, কোন ধর্ম্ম কলিযুগের লোকদিগের আচরণীয়। পরাশর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥"

[পরাসরসংহিতা,১ম,অ,২৩,শ্লোক।

সত্যযুগে মনুব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপর যুগে শঙ্খলিখিতব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম ও কলিযুগে পরাশরনিরূপিত ধর্ম্ম মানবদিগের আচরণীয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরাশর-সংহিতাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরাশরের মতেই আমাদিগের বালিকাদিগের বিবাহ হয় ও হওয়াও উচিত। যাঁহারা মনুর মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, যৌবন বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী, তাঁহাদিগের হিন্দুশাস্ত্রে আদৌ জ্ঞান নাই, কারণ মনুর সকল মতে হিন্দু সন্তানের চলা উচিত নয়—কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশরের মতেই উচিত।

পরাশর-সংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা পরাশর-সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়েও প্রকাশ পাইতেছে। পরাশর বলিতেছেন,—

"অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্ব্বণ্যাশ্রমাগতম্॥
সংপ্রবক্ষাম্যহং ভূয়ঃ পরাশরপ্রচোদিতঃ।
* * * * * *॥"

[পরাশরসংহিতা,২য় অ,১ম,২য়,শ্লোক।

অতঃপর আমি কলিযুগে চারি আশ্রম এবং চারিবর্ণের এবং অনায়াসসাধ্য গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম্মাচার পরাশর মতে বলিব। আমাদিগের বিশ্বাস পরাশরসংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে দেখা যাক্, পরাশর, বালিকাদিগের বিবাহোপযুক্ত বয়ঃক্রম সম্বন্ধে কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পরাশর বলিতেছেন,—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

[পরাশরসংহিতা,৭ম অ,৬ শ্লোক।

অষ্টমবর্ষীয়া বালিকাকে 'গৌরী' নবমবর্ষীয়াকে 'রোহিণী', দশমবর্ষীয়াকে কন্যা ও দশমবর্ষের পর বালিকাকে 'রজঃস্বলা', মহাত্মা পরাশর অভিহিতা করিয়াছেন। অতএব, মনুর মত— "ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম্," কলি যুগে চলে না—পরাশরের মতই গ্রাহ্য।

আমাদিগের বিশ্বাস, বাল্য-বিবাহ যে, হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছি। যাঁহারা বলেন যে, বাল্য-বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদনীয় নয়, তাঁহারা শাস্ত্রের "শ"ও জানেন না—মুখসর্ব্বস্বতাই সার!

শাস্ত্রানুসারে অষ্টমবর্ষ হইতে দশম বর্ষের মধ্যে, হিন্দু বালিকার বিবাহ হওয়া উচিত; কারণ দশমবর্ষের পর, যে কোন সময়ে কন্যা রজঃস্বলা হইতে পারে। পরাশর হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, অষ্টম বর্ষের নিম্নে বালিকাদিগের বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদনীয় নয়। এ প্রকার বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম বিগর্হিত। অষ্টমবর্ষের নিম্নে দুই একটি বিবাহ শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু এ প্রকার বিবাহ প্রধানতঃ নীচ শ্রেণীর মধ্যেই হইয়া থাকে—ও এরূপ বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রের সম্মতি নাই।

এক্ষণে দেখাইব যে, বাল্যবিবাহের সহিত হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ সামাজিক সংশ্রব আছে। হিন্দু একান্ন-ভুক্ত-পরিবার-প্রথার পরিপোষক। হিন্দু কেবল আপনার অন্নের জন্য ব্যস্ত নয়, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়-বর্গের প্রতিপালন ভারও তাঁহার হস্তে। ইংরাজ কেবল আপনার স্ত্রী পুত্রের প্রতিপালন ভার লইয়া থাকেন—হিন্দু সমস্ত পরিবারের ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজ স্বার্থ-পূর্ণ—হিন্দু স্বার্থ-ত্যাগী। ইংরাজ ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না—ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন। তাই, হিন্দু সমাজে, হিন্দুর মধ্যে একান্ন-ভুক্ত-পরিবার-প্রথার এত আদর। তুমি ইংরাজি-শিক্ষিত আলোড়িত-মস্তিষ্ক যুবা—তুমি বলিতে পার যে,একান্নভুক্ত-পরিবার প্রথা আলস্যের প্রশ্রয়দাত্রী। তুমি বাক্‌সর্ব্বস্ব-যুবা—রাজনীতিআলোচনশীল তুমি তোমার ইংরাজ-গুরুদত্ত উন্নত মতানুসারে কার্য্য করিবার জন্য মাতার প্রতিপালন ভার না লইতে পার—জননীকে নিরম্বু উপবাসিনী রাখিতে পার; কিন্তু হিন্দু—প্রকৃত হিন্দু—মূর্খ, অজ্ঞান—তাই, নিজে অর্দ্ধাহার

করিয়াও, পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করে ও প্রতিপালন-রূপ কার্য্যে অব্যক্তনীয় আনন্দ পায়। আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র দেশে প্রত্যেকেরই পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন ভার লওয়া উচিত। একান্নভুক্তপরিবারপ্রথা আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না। নিজে নিজের ভরণপোষণের ভার লইবার ক্ষমতা থাকিলে, কে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে?

যাক্, আমরা বলিতেছিলাম,—হিন্দুরা একান্নভুক্তপরিবারপ্রথার পক্ষপাতী। হিন্দু নিজের সুখ সচ্ছন্দের জন্য বিবাহ করেন না—সমস্ত পরিবারের সুখের জন্য বিবাহ করিয়া থাকেন। হিন্দু স্ত্রী কেবল স্বামীর সাহায্যকারিণী নহেন—শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, ভাজ্, সকলকেই তিনি সর্ব্ব কার্য্যে সহায়তা করেন। হিন্দু স্ত্রীর আগমনে শ্বশুরালয়ে শান্তির উদয় হয়—মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-দেবী আবির্ভূতা হন; তাই, হিন্দু স্ত্রী "গৃহ-লক্ষ্মী" নামে অভিহিতা। বল দেখি ভাই! এমন স্ত্রী কি কোনও দেশে কোনও জাতির ভিতর আছে? এমন স্বর্ণ-প্রতিমাকে যাঁহারা বিকৃতা করিতে চান্—গৃহলক্ষ্মীকে 'বাইজী' সাজাইতে চান্—তাঁহারা হিন্দুনামের অযোগ্য—হিন্দু-কুলের কুলাঙ্গার।

যদি বাল্যবিবাহের পরিবর্ত্তে হিন্দুসমাজে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে একান্নভুক্ত-পরিবার-প্রথার অস্তিত্ব কি আর আমরা দেখিতে পাইব? যুবতী স্ত্রীরা শান্তির পরিবর্ত্তে শ্বশুর-গৃহে অশান্তি লইয়া আসিবে—"লক্ষ্মী" মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গৃহে গৃহে "অলক্ষ্মী" মূর্ত্তির আবির্ভাব হইবে। এক কথায়, যুবতী স্ত্রী দ্বারা প্রতিগৃহ শ্মশানে পরিবর্ত্তিত হইবে—আমাদিগের গৌরবের—সাধের—একান্নভুক্তপরিবারপ্রথা বিলুপ্ত হইবে। অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে গুরুজনেরা "সহবৎ" শিখাইতে পারেন, কিন্তু যুবতী স্ত্রীরা, বাল্য-কাল হইতে "সহবৎ" অভাবে, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিবে—গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন করা দূরে থাকুক—তাঁহাদিগকে প্রতি পদে অপমান করিবে। বাস্তবিক, হিন্দু সমাজের অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, বাল্যবিবাহ জড়িত। বাল্য-বিবাহের পরিবর্ত্তে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দু সমাজ হিন্দু থাকিবে না—অহিন্দু হইয়া উঠিবে। এই কারণেই আমরা বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ও যৌবন-বিবাহ আমাদিগের ঘৃণার বস্তু।

অনেক হিন্দু বালিকার দশমবর্ষের পরই যৌবন-চিহ্ন সকল বিকশিত হয়। ঋতুর পরই স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিদত্তপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। বালিকাদিগের চরিত্র-দোষের আশঙ্কা-বশতঃ প্রাচীন ঋষিরা "অষ্টম হইতে দশমবর্ষের মধ্যে বিবাহ দেওয়া বিধেয়"—এই বিধান দিয়াছেন ও পাছে পিতা মাতারা স্নেহবশতঃ দশম বর্ষের মধ্যে বিবাহ দিতে না চান্, সেই জন্য নানাপ্রকার পাপের ভয় দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যে তাঁহাদিগের অভীষ্টবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বাল্য-বিবাহ যদি না থাকিত, তাহা হইলে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পাপের বিস্তার হইত, তাহা নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেহই অস্বীকার করিবে না। বাল্য-বিবাহের অভাববশতঃই ইয়োরোপে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ধর্ম্মনীতির অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। যদি বাল্য-বিবাহ

থাকিত, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যায় ইউরোপ উচ্ছন্ন যাইতে বসিত না—পথে পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য "আশ্রয়স্থানের"ও প্রয়োজন হইত না।

ইংলণ্ডের অভিজাত সন্তানেরা দশম একাদশ-বর্ষীয়া বালিকাদিগকে ভুলাইয়া আনিত ও তাহাদিগের ধর্ম্মনষ্ট করিত,—বিলাতের বিখ্যাত পত্রিকা "পলমল গেজেটে" ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। বল দেখি, ভাই! এই দশমএকাদশবর্ষীয়া বালিকাদিগের যদি স্বামী থাকিত, তাহা হইলে; দুরাচার নরাধম অভিজাত সন্তানেরা কি ইহাদের সতীত্বরত্ন অপহরণ করিতে পারিত? না ইহারা সতীত্ব বিসর্জ্জন করিত? দশম-একাদশবর্ষীয়া ইংলণ্ডীয়া বালিকারা প্রকৃতি-দত্ত প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া, প্রলো-ভনে পড়িয়া, সমাজ-কলঙ্ক অভিজাত সন্তান দিগকে আত্ম-সমর্পণ করিত। যদ্যপি তাহা-দিগের বিবাহ হইত, তাহা হইলে, তাহারা সতীত্ব-হীনা হইত না। বাল্য-বিবাহ বশতঃই আমাদিগের দেশে এ প্রকার দুর্ঘটনা হয় না। "সংস্কারক"দিগের এই সকল দেখিয়া ও যে, চক্ষু ফোটে না, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। যাঁহারা বলেন যে, বাল্য-বিবাহ বশতঃ বালিকাদিগের নৈতিক বল মলিন হয়, তাঁহাদিগের উপরোক্ত ঘটনা হইতে জানা উচিত যে, বাল্য-বিবাহ বশতঃ নৈতিকবল মলিন না হইয়া, বরং উজ্জ্বল হইতে থাকে। যদি বাল্য-বিবাহ না থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়া বালিকাদিগের দশা ইংলণ্ডীয়া বালিকাদিগের সমতুল্য হইত। বাল্য-বিবাহ বশতঃই ভারতবর্ষীয়া মহিলাদিগের সতীত্ব অতুলনীয়। যাঁহারা এই বাল্য-বিবাহ উঠাইতে চান্, তাঁহাদিগের আদৌ দূরদর্শিতা নাই ও তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত।

এই সকল অনিষ্টের আশঙ্কাবশতঃই প্রাচীন আর্য্যগণ মনুপ্রচলিত বালিকা-বিবাহ আরও কঠিন নিয়মের উপর স্থাপন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের অভীষ্ট সাধনে যে কৃত-কার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে "একীকরণ" সম্পাদনার্থে বাল্য-বিবাহ প্রচলন করিয়াছেন। স্ত্রীর আত্মা স্বামীর আত্মায় মিশিয়া যাইবে, কেবল শরীর পৃথক্ থাকিবে, এই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। বিবাহের এ প্রকার সুন্দর ভাব আর কোন্ জাতির ভিতর আছে? বাল্য-কালে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বয়সের সহিত স্বামী স্ত্রীর প্রণয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ক্রমে এমন একটি অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সে অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমা-দিগের দৃঢ় বিশ্বাস, যৌবন-বিবাহে দাম্পত্য-প্রণয়ে এ প্রকার সুন্দর—এ প্রকার উচ্চ স্বর্গীয় ভাব পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহারা বলেন,—বালিকারা বিবাহের সময় "বিবাহ কি" জানে না, তাঁহারা ভ্রান্ত। হাঁ, ইউরো-পীয় মহিলারা "বিবাহ" যে অর্থে বুঝেন তাহা আমাদিগের বালিকারা জানে না বটে। ইউরোপীয়মহিলারা বিবাহ অর্থে "কণ্ট্রাক্ট" অর্থাৎ "চুক্তি" বুঝেন—বুঝেন, স্বামী যত দিন বাঁচিয়া থাকিবেন, তত দিন তিনি আমার স্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর, সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়—বুঝেন, স্বামী যদি অসৎ ব্যবহার করেন—তাহা হইলে, আমি বিবাহ ভঙ্গ করিতে পারি ও অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারি। সৌভাগ্যের বিষয়, বিবাহের এরূপ অর্থ

আমাদিগের বালিকারা বুঝে না ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা—যেন বুঝিতেও হয় না। আমাদিগের বালিকাদিগের চক্ষে 'বিবাহ' পবিত্র বস্তু। বালিকা জানে—যাঁহারা হস্তে পিতা মাতা আমাকে অর্পণ করিতেছেন, তিনি আমার দেবতা। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই আমার এ জীবন। যদি তাঁর মৃত্যু হয়—তাহা হইলে, আমাকে বিধবা হইতে হইবে ও তাঁহার চিন্তায়—তাঁহার ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করা, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পতির মৃত্যু হইলে, বালিকা জানে যে, আমার পতির মৃত্যু হয় নাই—পতি মানব-দেহ ত্যাগ করিয়া, নূতন দেহ পাইয়া স্বর্গে গিয়াছেন—মৃত্যুর পর, আবার আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইব। পার্থিব মিলনের ন্যায় সে মিলনে বিচ্ছেদ নাই—দুঃখ নাই—শোক নাই—সে মিলন, অনন্ত মিলন। "বিবাহে"র এই অর্থই হিন্দু-বালিকা বুঝে। এস দেখি, শিক্ষিতা ইউরোপীয় মহিলা! সাহস থাকে ত একবার হিন্দু মহিলার পার্শ্বে দাঁড়াও দেখি? ও কি! চরণ-তলে বসিতেছ কেন—পার্শ্বে দাঁড়াইতে লজ্জা হয়, বুঝি?

বাল্য-বিবাহের অভাব ও যৌবন-বিবাহের প্রভাববশতঃ, ইংলণ্ডের যে কি ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে, তাহা এক্ষণে দেখাইব। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া'তে প্রমাণ সহিত লিখিত আছে যে, ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে জারজ সন্তানের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, নাবালক বালক-বালিকাদিগের বিবাহ দিতে হয় ও এই উপায় গ্রহণে জারজ-সন্তানের সংখ্যা কমিতে দেখা গেল। এ আমাদিগের মত নয়—"সংস্কারক"দিগের গুরুদিগের মত।

আমরা যথাসাধ্য বাল্য-বিবাহের উপকারিতা ও যৌবন বিবাহের অপকারিতা প্রতিপন্ন করিয়াছি; এক্ষণে যাঁহারা হরিমোহন মাইতির পশ্বাচারকে "বাল্য-বিবাহের ফল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ও বাল্য-বিবাহ আইনের দ্বারা উঠাইতে বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে।

হরিমোহন অপ্রাপ্ত-পুষ্পা স্ত্রীর উপর পশ্বাচার করিয়াছিল, তাহার দণ্ডও হইয়াছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা যদি এইরূপ পশ্বাচারে সম্মতি দিতেন, তাহা হইলে বাল্য-বিবাহকে দোষী করা যুক্তিসঙ্গত হইত। কিন্তু, আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা এ প্রকার কার্য্যে সম্মতি দেওয়া দূরে থাকুক—এ প্রকার পশ্বাচার যাহাতে না হইতে পারে, তজ্জন্য বিবিধ প্রকার পাপের ভয় দেখাইয়াছেন। অনাগতার্ত্তবা স্ত্রীর সহিত সহবাস করা, হিন্দু-ধর্ম্ম-বিগর্হিত। হরিমোহন হিন্দু-ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য করে নাই; সুতরাং, হিন্দু-শাস্ত্রকার-প্রচলিত বাল্য-বিবাহকে, হরিমোহনের ঘৃণিত পশ্বাচারের নিমিত্ত, দোষী করা অন্যায়।

সংস্কারকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাল্য-বিবাহ আইনের দ্বারা উঠাইতে গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতেছেন,—আবার কোন কোন চতুরচূড়ামণি 'সম্মতি'র বয়ঃক্রম বাড়াইতে বলিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিতে প্রতিশ্রুত। হিন্দু-ধর্ম্মে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না—করিবার ক্ষমতাও নাই। গভর্ণমেণ্ট যদি সম্মতির বয়ঃক্রম বৃদ্ধি করেন,—তাহা হইলে হিন্দু-ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবে। পরাশর বলেন,—

"ঋতুস্নাতাতু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥
ঋতুস্নাতান্ত যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
ঘোরায়াং ভ্রূণ হত্যায়াং যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"
[পরাশরসংহিতা ৪অ,১৩,১৪,শ্লোক।

অর্থাৎ, ঋতুস্নান করিয়া যে নারী স্বামীর নিকট উপগতা না হয়, সে মরণান্তে নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করে। স্ত্রী ঋতুস্নাতা হইলে, যে ভর্ত্তা তাহার নিকট উপগত না হয়, ঘোর ভ্রূণ-হত্যা-পাতকে সে পতিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি সম্মতির বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার রজোদর্শনের পর, স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না; সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় ও হিন্দু-ধর্ম্মে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট হিন্দুর ধর্ম্মে—হিন্দুর প্রাণে—আঘাত করিতে সাহস করিবেন কি?

ক্রমশঃ।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

সন্ধ্যা

দিনমণি অস্ত যায়, হ'ল সন্ধ্যা সমুদয়,—
আঁধার করিয়া এই নিখিল ভুবন;
সূর্য্যের বিরহে যেন হইয়ে বিষণ্ন মনঃ
পরিতে লাগিল ধরা তিমির বসন।

কমল মুদিল আঁখি; কুমুদিনী হ'য়ে সুখী,
হেরিবারে সুধাকরে তুলিল বদন—
যত বিহঙ্গমগণ করি দূর পর্য্যটন
আপন কুলায় সবে করিছে গমন।

উলূক বাদুড়গণ হ'য়ে অতি হৃষ্টমন
গুপ্ত বাস হ'তে সবে হইল বাহির;
কুসুম-সৌরভ মাখি, করি জীবে অতি সুখী,
বহিতেছে ধীরে ধীরে সুমন্দ সমীর।

গগনে তারকাগণ হেরি সন্ধ্যা-আগমন,
আপন কিরণ সব ক্রমশঃ বিস্তারে;
ধরায় খদ্যোত-পাঁতি প্রকাশিয়ে নিজ ভাতি
ব্যঙ্গ যেন করে তায়—বিটপি উপরে।

রজনীর নিস্তব্ধতা হরিতে, হরষ-যুতা
ঝিঁঝিঁ-পোকা অবিরত ঝিঁঝিঁ-রব করে;
কিন্তু, তার সমস্বর না হয় বিরক্তিকর
সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।

চক্রবাক চক্রবাকী হেরি সন্ধ্যা হ'য়ে দুখী,
অনিচ্ছায় পরস্পর মাগিছে বিদায়;
ল'য়ে নিজ পশুগণে রাখাল আনন্দ মনে
চলিছে, গৃহের পানে গোধূলি-সময়।

কায কর্ম্ম দিনগত সমাপি মানব যত,
শ্রান্ত হ'য়ে আসি সবে নিজ নিজ ধাম;
হেরি প্রিয়জন-মুখ পাশরি সকল দুখ
পরিজন মধ্যে বসি লভিছে আরাম।

দিবসের কোলাহল ক্রমে হ'ল হতবল;
আবৃতা হইল ধরা ঘোর তমোজালে;
যত জীবজন্তু সবে ক্রমশঃ নীরব এবে;
নিস্পন্দ, চঞ্চল শিশু জননীর কোলে।

শ্রান্ত ক্লান্ত গৃহিগণ হইয়া নিশ্চিন্ত মন,
নিজ নিজ বাসে সবে করিছে বিশ্রাম;
যাঁহার নিয়ম-বশে প্রাতঃ, সন্ধ্যা যায় আসে,
উদ্দেশে তাঁহার পদে করহ প্রণাম।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

সঙ্গীত।

(বাউলের স্থর।)

দৈন্য-দশা ঘুচ্‌লো না রে তোর !
তুই বিষয়-রসে হ'লি ভোর।
যদি চা'স্ রে মোক্ষ-ধন,
দিবা নিশি থাকিস্ চেয়ে, মুদিস্ না নয়ন,—
(রে ক্ষেপা মন ! মুদিস্ না নয়ন।)
নৈলে লুটে খা'বে কড়ি পাতি—
ঘরের মধ্যে ছ'টা চোর।
(ওরে) কি করিস্ রে ব'সে ?
এই বেলা ধন উপার্জ্জন ক'রে নে ক'সে ;
(রে ক্ষেপা মন ! ক'রে নে ক'সে।)
উঠে হেঁটে বেড়াও একটু—
ঘুচাও মিছে মায়া-ডোর।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বারোঁয়া—ঠুংরী।

(তুমি) যদি নিদয় জানিতাম।
তা' হ'লে কি মনঃ প্রাণ তোয় সঁপিতাম ?
বেসেছিনু ব'লে ভাল,
দিলে ভাল প্রতিফল ;—
সুধা-আশে হলাহল
শেষে লভিলাম !
প্রেম-শিক্ষা দিলে ভাল,—
না জেনে যে বাসে ভাল,
শেষে তার—এই হাল
সার জানিলাম।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচন।

৬। **শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত**—কলিকাতা রাম বাগান ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিমলাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

পুস্তকখানি আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনীয়।

৭। **যমুনা**—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কলিকাতা ৭৫ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট হইতে "যমুনা-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১৲ টাকা।

গত ভাদ্র মাসে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক গুলি কবিতা মিষ্ট ও সুখ-পাঠ্য এবং প্রবন্ধগুলি পাঠোপযোগী। আমরা ইহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি এবং নিয়মিত রূপে প্রতিমাসে প্রকাশিত হইলে আরও সুখী হইব।

৮। **শ্রীবৃদ্ধি**—শ্রীবিপিন বিহারী বসু প্রণীত। মূল্য ॥০ মাত্র। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময় ফল, অতি সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে। একটি দোষ দেখিলাম—একেবারে অনেকগুলি নায়ক নায়িকার অবতরণা করিয়া, গ্রন্থকার সকলের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পুস্তকখানি পাঠ করিলে আমোদ ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পাওয়া যায়।

১ম খণ্ড।] কার্ত্তিক। [৭ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

আনন্দোৎসব।

নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?
পল্লব কুসুম হারে,
কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে ;
মঙ্গল কদলী ঘটে,— চারু শোভা ধরিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

নানা সাজে হর্ম্ম্য সাজে,
নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে,
আবাল, বনিতা, বৃদ্ধ, সুখ নীরে ভাসিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

অধীনতা—হীনতায়,
যে বঙ্গ মৃতের প্রায়,
কোন্ সঞ্জীবনী মন্ত্রে,—সেই বঙ্গ নাচিল ?
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

চির দিন রিপু পদে,
যে বঙ্গ নিয়ত কাঁদে,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত,—আজীবন সহিল,
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

সুখ সূর্য্য চিরতরে,
ডুবিয়াছে অন্ধকারে,
বিষাদ কালিমা রেখা,—বঙ্গ ভালে আছিল,
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

ভুলিয়ে দাসত্ব দুখ,
সকলের হাসি মুখ ;
মধুর ললিত তানে,—সুললিত গাহিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

দুরিত হৃদয় ভার,
বহে সুখ পারাবার ;
নব রসে নব নারী,— নব বেশে সাজিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

বাজে বীণা সপ্তস্বরা,
তান লয় মান ভরা ;
মৃদঙ্গ জলদ রবে,—সুমধুর বাজিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

নবীন শশাঙ্ক জ্যোতি,
বিমল, রজত ভাতি,
ঘরে ঘরে দীপ মালা,—মরি কিবা শোভিল।
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল ?

আনন্দ দায়িনী মাতা,
আজি বঙ্গে উপনীতা ;
আনন্দ প্রবাহ তাই,—খর বেগে বহিল ;
নিরানন্দ বঙ্গ আজি কি আনন্দে মাতিল।

শ্রী কালিদাস মিত্র।

বনগ্রামে দুর্গোৎসব।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

শ্রীমতী মৃণালিনী কলিকাতা-নিবাসী কোন কায়স্থকুলপ্রদীপের কন্যা। বেথুন্ বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া, মৃণালিনী ইংরাজী, বাঙ্গালা ও শিল্প-বিদ্যায় বেশ সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। কন্যা যখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, কায়স্থবাবুর তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল—সেটা কেবল গৃহিণীর উপদ্রবে। পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পণ দিতে চাহিলেন, পাত্র আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেন না বিদ্যাবতী হইলে আর কি হইবে, মৃণালিনীর রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, কলিকাতার কোন পাত্রই তাহার পাণি-গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন না। পরিশেষে অনুপায় ভাবিয়া দুই হাজার টাকা পণে বনগ্রামের এক ভদ্র সন্তানের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ দিতে হইল।

বিবাহ দিয়া কায়স্থ বাবু কিছু মাত্র সুখী হইলেন না; কেন না তাঁহার চাল্ চুল্ সমস্তই বিলাতী ধরণের। কিন্তু, জামাতা ও বৈবাহিক অজ্ পাড়াগেঁয়ে। বাবু মনে করিলেন, জামাতাকে আপন গৃহে রাখিয়া ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়া, 'সহুরে' করিয়া তুলিবেন, ; কিন্তু সে আশা তাঁহার বিফল হইল। তাঁহাদের বেশ দশ টাকা সংস্থান আছে,—কেন তাঁহারা সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন? যাহা হউক, বাবু টানাটানি করিয়া কন্যাকে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহে রাখিলেন, কিন্তু আর চলে না। শ্বশুরালয়ে দুর্গোৎসব উপলক্ষে মৃণালিনীকে তথায় যাইতে হইবে। বাটীতে কান্নাহাটি পড়িয়া গেল। সকলেই ভাবিল—এইবার মৃণালিনীর পিতা-মাতা মৃণালিনীকে বনবাস দিতে চলিলেন। গ্রামের নামই ত বনগ্রাম! না জানি কত বন—জঙ্গল, কত বাঘ—ভাল্লুক সেখানে আছে!

দিন ত দেখা'বার ইচ্ছাই নাই, কি করেন, সকলের উপরোধে, বাবু একবার ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া একটা শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। আগামী সোমবার বেলা ৮টার পর মৃণালিনী শ্বশুর-বাড়ী যাইবে,—একথা পাড়াশুদ্ধ সকলেই জানিল। আত্মীয় কুটুম্ব ও বিদ্যালয়ের সঙ্গিনিগণ সকলেই একে একে দেখা করিতে আসিল এবং একটু একটু চোখের জল ফেলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। মৃণালিনীর কি হইল কেমন করিয়া বলিব, কিন্তু, তাহার পিতা মাতার মনে অসুখের আগুন জ্বলিতে লাগিল। কি করেন জ্বালা সহিয়াও, যাত্রা নিবন্ধন সমস্ত আয়োজনই করিতে হইল। রাইটিং-বাক্স (মায় সরঞ্জম) টানা আর্সি, আইভরির চিরুনি, হেয়ারব্রস্, 'নেপোলিয়ন প্রাইসে'র সাবান 'রিমলে'র ল্যাভেণ্ডার, পাউডার্ প্রভৃতি সমস্তই ক্রয় করা হইল, বস্ত্র সকল নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইল, মল্লিক নেফিউ কোম্পানির দোকান হইতে নানাবিধ জরি ও সাটিনের বডিস্ ও জ্যাকেট সকল খরিদ করিয়া, পোর্ট-

মেণ্ট সাজান হইল, অনুষ্ঠানের কোন ক্রটিই রহিল না।

দেখিতে দেখিতে সোমবার আসিয়া পুড়িল। প্রাতে উঠিয়া মৃণালিনীর মাতা মৃণালকে জাগাইলেন এবং স্বহস্তে স্নানাদি করাইয়া দিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন তৎপরে অশ্রু-পূর্ণ লোচনে কন্যার বেশ ভূষা সম্পাদন করিয়া দিতে লাগিলেন। অতি পরিপাটীরূপে এলো ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধিয়া, সুবর্ণের জাল দিয়া তাহা আবৃত করিলেন এবং দুই একটি অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প তদুপরি সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন; মস্তকে মুক্তার ঝাপ্‌টা, কর্ণে কান, নাসিকায় স্রেফ্‌ একটি নোলক, গলদেশে মুক্তার সরস্বতী-হার, ও অঙ্গে কিংখাপের বডিস্‌ পরাইয়া দিলেন এবং বাহু ও কটিদেশ নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত করিলেন; পদদ্বয় ষ্টকিং দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তদুপরি মল্‌ ও মণ্টিপের বাড়ীর ভাল বারনিস্‌ শ্লিপার্‌ পরাইয়া দিলেন,—বদন মণ্ডলে পাউডার্‌ মাখাইয়া ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ ঈষৎ অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিলেন। এই সকল বেশ ভূষা সমাপনান্তে সীমন্তে ধান্য-পরিমিত সিন্দুর-রেখা প্রদান করিলেন ও বারানসী শাড়ী পরাইয়া দিয়া, একখানি চেয়ার পাতিয়া বসাইলেন। অনেকে দেখিতে আসিলেন, মৃণালিনী কাহাকেও প্রণাম, কাহাকেও নমস্কার, কাহাকেও বা 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া, সকলেই একে একে বিদায় হইলেন।

যোড়াসাঁকো মল্লিক বাবুদের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল। একখানি ছকড় গাড়ী ঝন্‌ ঝন্‌ রবে পথিকগণকে বিরক্ত করিতে করিতে, কায়স্থ বাবুর দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তন্মধ্য হইতে মৃণালিনীর দেবর, ও পান সুপারি এবং মিষ্টান্নের থাল হস্তে লইয়া দুই একটি দাস দাসীও নামিল। শকট-চালককে ভাড়া দিয়া বিদায় করিয়া, মৃণালিনীর পিতা স্বীয় কোচ্‌ম্যানকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। বেলা—আট্‌টা বাজে বাজে, এমন সময় গাড়ী আসিল। সমস্ত জিনিষ পত্র একে একে গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে ফোঁপাইয়া ফোঁপা-ইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মৃণালিনীর পিতা মৃণালিনীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার একটি ভ্রাতা, দুই একটি পরিচারিকা এবং মৃণালিনীর শ্বশুর-বাড়ীর লোক জন সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল। অল্প ক্ষণের মধ্যেই গাড়ী শিয়ালদার ইষ্টেসনে গিয়া পঁহুছিল। টিকিট খরিদ হইলে, সকলেই রেল গাড়ীতে চড়িলেন,—বাটীর গাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ভায়া খুল্‌না সেক্‌সন্‌ গাড়ী যথাকালে বনগ্রামে গিয়া পঁহুছিল। সকলেই অবতীর্ণ হইলেন। মৃণালিনীকে পাল্‌কীতে উঠাইয়া সকলে বাটী-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পাল্‌কী হইতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃণালিনী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, কেন না দরজার সম্মুখেই এক হাঁটু কাদা; তাঁহার বয়ঃক্রম যদি এত অধিক না হইত, তাহা হইলে, কেহ না কেহ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন—কিন্তু, এখন আর তাহা কেমন করিয়া হইবে? মৃণালিনীকে অগত্যা

শ্লিপার ও ষ্টকিং খুলিয়া ফেলিতে হইল। তিনি নিতান্ত বিরক্তভাবে মুখখানি ভার করিয়া বাটী প্রবেশ করিলেন। দাস দাসিগণের মস্তকে জিনিষ পত্রাদি ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং পাল্‌কী বিদায় করিয়া সকলেই বাটীর মধ্যে গমন করিলেন।

মৃণালিনীর শ্বশুরের নাম হরিহর, শ্বাশুড়ীর নাম ভগবতী ও স্বামীর নাম গোবর্দ্ধন। ভগবতী বধূমাতা বাটী আসিবেন, এই আনন্দে গৃহদ্বারে পূর্ণ ঘট, ও গৃহমধ্যে বসিবার আসন পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃণালিনী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও প্রণামাদি করিলেন না; কেন না, মাটির মেঝে, কাপড় চোপড় ময়লা হইয়া যাইবে। যাহা হউক, সকলেই তাঁহাকে আদর করিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া বসাইলেন। সমবয়স্ক প্রতিবেশিনিগণ একে একে দেখা করিতে আসিলেন, মৃণালিনী 'সেকহ্যাণ্ড' করিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ করিলে, তাঁহারাও কর প্রসারণ করিলেন; কিন্তু পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া নাড়িতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, কাজে কাজেই একটা হাস্যের তুফান উঠিল। মৃণালিনী আন্তরিক অসন্তুষ্টা হইলেন। তিনি ত বাটীতে প্রবেশ করিতে না করিতেই অসন্তুষ্টা হইয়াছেন। সকলেই একে একে বিদায় হইলেন।

মৃণালিনী স্বীয় শয়ন গৃহের অবস্থা দেখিয়া অকুল পাথার ভাবিতে লাগিলেন—এ সব আসবাব্ রাখি কোথায়? ঘরে দেরাজ নাই, টেবিল নাই, গ্ল্যাস-আল্‌মায়রা নাই, ব্রাকেট নাই, হোয়াট্‌নট্ নাই; থাকিবার মধ্যে কেবল বড় বড় সিন্দুক ও জলচৌকী। এ সকল মূল্যবান্ জিনিষ পত্র রাখি কোথায়? অভিমানে মৃণালিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি সমস্তই গৃহের এক কোণে রাখিয়া, অতি বিষণ্ণমনে বসিয়া রহিলেন। অনেক সাধ্য সাধনায় আহারাদি সমাপন করিয়া শাশুড়ীর নিকট বাপের বাড়ী যাইবার পরামর্শ করিতে গেলেন। শাশুড়ী তখন গৃহ কর্ম্মে ব্যতিব্যস্ত, তথাপি, দুই এক কথায় বধূমাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"সে কি মা; এসেছ এখন দু'দিন থাক এখানে, বাড়িতে পূজো—পূজো দেখ—পূজো বাদ ভাল দিন দেখে পাঠিয়ে দিব।" মৃণালিনী দেখিলেন বিষম বিভ্রাট্।

হরিহর মৃণালিনীর বাপের বাড়ীর লোকজনকে বিশেষ যত্ন সহকারে আহারাদি করাইয়া, মহা সমাদরে বিদায় করিলেন। মৃণালিনী রোদন করিতে বসিলেন। মনে করিলেন—স্বর্গ হইতে পাতালে আসিলাম। বৃথা আমার পড়া শুনা, বৃথা আমার বাপ মার আদর, বৃথা আমার সাজ্ গোজ্! কোথায় সেই খড় খড়ে যুক্ত সুসজ্জিত সুন্দর গৃহ, কোথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ যুক্ত অন্ধকার ময় গোয়াল ঘর! এ সকল কি প্রাণে সয়? তাঁহার সেই বেথুন্ বিদ্যালয় মনে পড়িতে লাগিল। প্রাতঃ সন্ধ্যা নানাবিধ আমোদ প্রমোদ, টানা-পাখার হাওয়া খাওয়া, সকালে চা খাওয়া, ইত্যাদি সহরের সুখ স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। ভবিষ্য সুখের আশা ভরসায় এক কালীন জলাঞ্জলী দিয়া, তিনি গৃহের এক কোণে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে রজনী সমাগত হইল। সন্ধ্যা হইবার কিছুক্ষণ পরেই গ্রাম নিস্তব্ধ হইল,

ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল; কেবল ঝিল্লিগণের ঝিঁ ঝিঁ রব ও শিবাগণের বিকট চীৎকার শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। এই সময়ে ইডেন গার্ডেনের 'ভলণ্টিয়ার ব্যাণ্ড' মৃণালিনীর মনে পড়িতে লাগিল। গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মৃণালিনীর গণ্ডস্থল বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু-বারি বিগলিত হইতেছে, উষ্ণ নিশ্বাস প্রবল বেগে বহিতেছে। দেখিয়াই তটস্থ, প্রিয়াকে কি বলিয়া সম্বোধন করিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না, অতএব সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন। মৃণালিনী প্রাণনাথের বদন মণ্ডলে এক বার সজল কটাক্ষ পাত করিয়াই, নয়ন মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার সেই নিখুঁত অসিত বর্ণ, সজারু-কণ্টক-সন্নিভ সমুন্নত কেশকলাপ, গলদেশে তৈলাক্ত কাষ্ঠ-মাল্য এবং অষ্টহস্ত পরিমিত বস্ত্র পরিধান নিরীক্ষণ করিয়াই, তাঁহার আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া গেল। একবার মনে করিলেন—স্বামীকে ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না, কেন না 'ডাইভোর্স' প্রথা এখন ও ভাল রূপ প্রচলিত হয় নাই। একদা রজনী-যোগে তিনি পিতৃ সমভিব্যাহারে "রয়াল বেঙ্গল থিয়াটারে," সুরুচীর ধ্বজা অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন—সুরুচী দেবী কালাচাঁদকে ডাইভোর্স করিয়াছিলেন, তবে আমি ও কি আমার কালাচাঁদকে ডাইভোর্স করিতে পারি না? পোড়া দেশাচার আমাদিগকে 'কোর্টসিপ্' করিয়া বিবাহ করিতে দেয় না—ইহাই এক প্রধান অনর্থের মুল। আবার ভাবিলেন—এতদূর করা ভাল নয়, তাহা হইলে অপবাদ-ভাগিনী হইতে হইবে। এখন ইহার গলার মালা ছড়াটি কোন ক্রমে ছিঁড়িয়া দিয়া নিত্য নিত্য সাবান মাখিতে শিখাইলে অনেকটা মানুষের মত করিয়া আনিতে পারিব। গোবর্দ্ধন একটু একটু করিয়া নিকটে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া মৃণালিনী কিছু সুযোগ পাইলেন। ভাবিলেন আর কাঁদিয়া কাটিয়া কি হইবে? এই ঘরকন্নাই ত চিরকাল করিতে হইবে; তা' হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অগ্রেই মালা ছড়াটা ছিঁড়িয়া নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেওয়া যাগ্। এই ভাবিয়া শ্রীমতী শ্রীমানের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"তোমার গলায় এ আবার কি? এ সব কি মানুষকে পর্‌তে আছে? মানুষ ত আর গরু নয়, যে গলায় দড়ী বেঁধে রাখ্‌বে।" শ্রীমান দেখিলেন অনেকটা সুরাহা—প্রেয়সী কথা কহিয়াছেন। মালা ছিন্ন হইল—গোবর্দ্ধন আর কথাটি কহিলেন না। প্রেমের এই প্রথম সূত্রপাত।

মৃণালিনী দেখিলেন গোবর্দ্ধন ত আমার হাতের ভিতর, ইহাকে সংশোধন করিয়া লইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। অপর পক্ষগতে দেবী-পক্ষ আরম্ভ হইল। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রভৃতি গণনা করিতে করিতে, ষষ্ঠী আসিয়া পড়িল। ষষ্ঠীর দিন ভগবতী অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, ছড়া ঝাঁট প্রভৃতি সমাপনান্তে, পুত্র, কন্যা ও বধূমাতার কল্যাণ কামনায়, মাথা ঘষা ও হরিদ্রা পেষণ করিতে বসিলেন এবং বহু যত্নসহকারে, পেষণ কার্য্য সমাধা করিয়া পরমাহ্লাদে সকলকে নিকটে ডাকিয়া, তাহাদিগের মস্তকে মাথাঘসা দিবার উদ্যোগ

করিলেন, এমত সময়ে, মৃণালিনী অতিশয় বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"এমন ত কোথাও শুনি নি, মাথায় আবার লোক গোবর দিয়া থাকে!"

ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"না মা! ও ত গোবর নয়, ও যে মাথা ঘসা; আর তোমায় কি ও নাম ধর্‌তে আছে?"—

মৃণালিনী বলিলেন,—"ভাল তা'কেন ধর্‌তে নাই; কিন্তু, আপনাদের এখানে সকল কাজই কি ঐ দিয়ে কর্‌তে হয়? ঘরের মেঝেয় ঐ, দেওয়ালে ঐ, আবার গায়ে মাথায়ও কি ঐ দিতে হয়? একি অনাসৃষ্টি দাঁড়া! ও দেখিই যে আমার গা বমি বমি কর্‌ছে, ও আবার মাথায় দিব কেমন ক'রে?"

ভগবতী বলিলেন,—"সে কি মা! তোমার বাপের বাড়ী কি এসব মাথে না? ভাল, তুমি একটু মেখেই দেখ না, কেমন সুন্দর গন্ধ।"

মৃণালিনী বলিলেন,—"না না ও মেখে কাজ নাই; সোডা থাকে ত দিন, ও আমি বাপের জন্মে ও মাখি নে।"

ভগ। সোঁটা আবার কি মা?

মৃণা। সোঁটা নয় সোঁটা নয়;—সোডা—যা 'অ্যাসিডিটি' হলে খায়।

ভগ। আঁসবঁটি কি হ'বে মা?

মৃণা। তাই ত এখানে এসে যে মহা মুস্কিলে পড়লেম্ দেখ্‌তে পাই। কেউ একটি কথা বুঝ্‌তে পারে না! বলি সেই সাদা সাদা গুড়ো—যা অম্বলের বিয়ারাম হলে খায়; এখন বুঝ্‌লেন?

ভগ। ও মা ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে!—ও তোমার শত্তুরের হোক্।

মৃণা। ও এখানে নাই তা' আমি জানি, আমার জিজ্ঞাসা করাই অন্যায় হ'য়েছে। যাগ্ আমি পাউডার দিয়ে মাথা ঘস্‌ব এখন।

ভগ। আচ্ছা মা! ও যদি না মাখ তবে হলুদ মাখিয়ে দি এসো।

মৃণা। ও ত তরকারিতে দেয়, ও কি আবার মাখ্‌তে হয় না কি! ঠিক্ যেন 'নাইট্ সয়েল্।' এখনকার সকলি অনাসৃষ্টি।

ভগ। নাট্‌শালা কি মা?

মৃণা। ও কথার মানে আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন না,—ও সব অশ্লীল কথা আমি মুখে আনতে পারি না।

মৃণালিনীর কথা শুনিয়া ভগবতী নিতান্ত অপ্রস্তুত হইলেন। ভাবিলেন বাড়ীতে পা দিয়াই এত দুর, গোব্‌রা ছোঁড়ার কপালে যে কি আছে তা' বলা যায় না। মনে মনে সুখের আশায় জলাঞ্জলী দিয়া, তিনি পুত্র কন্যাদিগকে হরিদ্রাদি মাখাইয়া, স্নান করাইয়া দিলেন। মৃণালিনী বাক্স হইতে পাউডার বাহির করিয়া, মাথা ঘসিলেন এবং সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া উঠিলেন। সকলেই নীল বর্ণের কোরা কাপড় পরিল। ভগবতী এক খানি ভাল কালাপেড়ে কাপড় লইয়া কম্পিতকরে বধূমাতাকে পরাইয়া দিতে গেলেন। বধূ মাতা বস্ত্র দেখিয়াই বলিলেন,—"উহাতে গায়ে ছড় যায়। উহা পরিয়া কাজ নাই, আমার ফেরোজা রঙ্গের ফিতা বাঁধান কাপড় আছে, সে ও দেখিতে ঠিক ঐরূপ।" ভগবতী দেখিলেন—এ রোগের ঔষধ নাই, অতএব ক্ষান্ত হইলেন। মৃণালিনী স্বহস্তে ও স্বরুচিতে স্বীয় বেশ ভূষা সমাপন করিয়া, একটু সাবধান হইয়া অন্তরে

অন্তরে বেড়াইতে লাগিলেন। ভয়ের কারণ এই—পাছে তাঁহার হরিদ্রা রাগ রঞ্জিত, অবিন্যস্ত কেশ, নগ্ন কায় ছোট ছোট দেবর গুলি তাঁহার ক্রোড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এত সতর্ক হইয়াও কোন কাজ হইল না—কেন না কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর গোবর্দ্ধন আসিয়া মস্তকে মাথাঘসা ও গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিতে লাগিল। এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মৃণালিনী ঘৃণা ও রাগে দিগ্বিদিক্ শূন্য হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া বসিলেন। সকলেই সাধা সাধি করিলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। কিন্তু মৃণালিনীকে কেহই কথা কহাইতে পারিলেন না। শ্বশুর, শাশুড়ী স্বামী সকলেই মৃণালিনীকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত! সকলেই ভাবিলেন—এ বিবাহ দেওয়ায় কি ঝকমারি হইয়াছে! ষষ্ঠী এইরূপে সমাপ্ত হইল।

পর দিবস সপ্তমী। অতি প্রত্যূষে কলাবউ স্নান করান হইল। ঢুলিরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহা আড়ম্বরে নৃত্য সহকারে ঢাক ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিল। নৃত্যকালে তাহাদের দীর্ঘকেশ জাল ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে লাগিল। অঙ্গনে ও বাতায়নে সকলেই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মৃণালিনী এই সকল সমারোহ নিতান্ত লজ্জাকর ও অসভ্যতার চুড়ান্ত মনে করিয়া, লজ্জায় মৃত প্রায় ও মুখ আবৃত করিয়া ঘরের এক কোণে গিয়া বসিয়া রহিলেন। ঢাকের বাদ্য থামিলে তিনি কোণ হইতে বাহির হইলেন। পূজা সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হইল। তামাসা দেখিবার নিমিত্ত মৃণালিনী বাতায়ন সন্নিকটে দণ্ডায়মানা হইলেন; রাশী রাশী চিড়া মুড়কী, দধি ও লুচি মণ্ডা ভোজনের আড়ম্বর দেখিয়া মৃণালিনী অবাক্ হইয়া ভাবিলেন যে, এ সকল রাবিস্ কি কখন মনুষ্যে আহার করিয়া থাকে? ইহারা কি রাক্ষস না মনুষ্য। এ সকল ব্যাপার মৃণালিনী দেখিতে পারেন কিন্তু ঢুলিদিগের অসভ্য নৃত্য দেখিলে তিনি লজ্জায় মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যান। ক্রমে মৃনালিনী দেখিলেন কুটুম্বগণও ঐরূপ গুরুতর আহার করিয়া থাকেন। তিনি ভাবিলেন ঈশ্বর কি ইহাদিগকে কেবল আহার করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাদের পেট কি জালার মত, অথবা ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ফাঁপা। মৃণালিনী বাল্যাবস্থা অবধি জানিতেন, ভোজন করিতে বসিয়া কোন দ্রব্যটি দন্তে কাটিতে হয়, কোনটির বা আঘ্রাণ লইতে হয়। আর একটি ব্যাপার দেখিয়া মৃণালিনী বিস্মৃত হইলেন। ব্যাপারটি আর কিছুই নয়—ক্রিয়াবাড়িতে দিনের বেলা লোক খাওয়ান। ভাল তাহাই যেন হইল, কিন্তু রাত্রিতে বাই-নাচ কিম্বা থিয়েটার, নিদেন পক্ষে সখের যাত্রাও ত হইবে, কিন্তু তাহার কোন আয়োজনই নাই! ষ্টেজ নাই, বাঁস নাই, দেবদারু পাতা নাই, ঝাড় নাই; কেরোসিন ল্যাম্প নাই, বাটীর দরজায় পানের খিলির দোকান নাই, ছবি নাই, ফ্ল্যাগ নাই—কিছুই নাই—তবে কি হইবে? মৃণালিনী দেখিলেন যে, বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লোক খাওয়ান হইল। তাহার পর অঙ্গন পরিষ্কার হইলে তদুপরি দুই এক খানি সপ্ পাতিয়া দেওয়া হইল, চারিজন ঢুলী ও দুইজন কাঁসিওয়ালা আসরে নামিল, দুই ধারে দুইজন

দুইটি মসাল লইয়া দাঁড়াইল। ঢুলিরা নৃত্য সহকারে নানাবিধ রং বাজাইতে লাগিল। শ্রবণ কর্ত্তা দিগের মধ্যে কেবল মৃণালিনীর শ্বশুর, স্বামী, দুই একটি দেবর ও পূজারী ব্রাহ্মন এবং রামা চাঁকর ও বটে, কেন না সে মুহুর্মুহু তামাকু সাজিতেছিল। মৃণালিনী ভাবিলেন এমন অসভ্য দেশে বিবাহ দিয়া বাবা কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। সপ্তমী নিশি এইরূপে অতিবাহিত হইল।—

অষ্টমীর দিবস অতি প্রত্যুষে সমস্ত বাটী পরিস্কৃত হইল। ক্রমে পূজার সময় সমুপস্থিত। মহা ধুমে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। ধুপ ও ধুনার ধুমে সমস্ত চণ্ডিমণ্ডপ অন্ধকার হইয়া গেল। মৃণালিনী স্বহস্তে বেশ ভূষা সমাধা করিয়া একখানি ল্যাভেণ্ডার ভিজান রুমাল হস্তে লইয়া ইতঃস্ততঃ পায়চারি করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইল; আর আর সকলেই পর্য্যায় ক্রমে প্রতিমাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। মৃণালিনীকেও অনুরোধ করা হইল কিন্তু তিনি বলিলেন "এ সকল কেন ?— এ সকলের প্রয়োজন কি, এমন অনাসৃষ্টি দাঁড়া ত কোথাও দেখি নাই।" সকলে ক্ষান্ত হইলেন। এইবার ধুনা পোঁড়া আরম্ভ হইল। ভগবতী পট্টবসনে আবৃতা হইয়া ও মস্তকে এবং হস্তদ্বয়ে প্রজ্বলিত ধুনার মালসী লইয়া বসিলেন, এবং পুত্রগণকে নিকটে ডাকিয়া ক্রোড়ে বসিতে বলিলেন, প্রথমেই গোবর্দ্ধন মাতার ক্রোড়ে আসিয়া বসিলেন। বাতায়ন হইতে দেখিয়া মৃণালিনী লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া রুমাল মুখে দিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন এবং সমবয়স্কা দিগের নিকটে গিয়া উচ্চ হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "এ কি ভাই! তোমাদের দেশে এ কি রকম দাঁড়া,— বুড়ো হাতি ছেলে কখন মায়ের কোলে বসে?" তাঁহারা বলিলেন, "মায়ের কাছে ছেলে কি কখন বুড়ো হাতি হয়? তোমাদের বাড়ির ছেলেরা বুঝি মায়ের স্তন পান করে মানুষ হয় না তাই তুমি এমন কথা বলিলে?" মৃণালিনীর হাস্য তথাপি থামিল না। সারাদিন ঐ কথার আন্দোলন ঐ কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসী সামান্য-ব্যক্তিগণ খয়ে মুড়কী ও নারিকেল সন্দেশ লইয়া বিদায় হইল। ভোজনাদি তৎপরে পূর্ব্বকার দিনের মত চলিতে লাগিল। মৃণালিনী আর একটি ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। ব্যাপারটি এই—গাড়ি নাই, পালকী নাই কিছুই নাই, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই পদব্রজে নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিতেছে আর, এক বাটী হইতে একজন নয়—এমন কি পাঁচ সাত জন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের কি এতই পেটের জ্বালা? কিছু মাত্র লজ্জা ঘৃণা নাই! আরও ভাবিলেন যে বাড়ির মেয়েরাই বা কি! সেই ভোর হইতে সারাদিন-রাতই পরিশ্রম করিতেছে—ইহাদের কি একটু বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হয় না! কেবল খাও খাও নাও নাও শব্দ—নাচ তামাসার কথাই মুখে আনে না, এমন পোড়া দেশে কি মানুষে টেঁকৃতে পারে! মহামহা অষ্টমী নিশি সকলেই মহানন্দে অতিবাহিত করিল কিন্তু মৃণালিনীর মনে কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কাহাকেও এমন দেখিলেন না যে তাঁহার মত বাইজী সাজিয়া বেড়াইতেছে, সকলেই নববস্ত্র পরিধান, ভুজযুগে শঙ্খ ও সিঁথিভরা সিন্দুর ধারণ করিয়াছে, অলক্তক

রাগে তাঁহাদিগের চরণ-যুগল বিকসিত সরোজ সম প্রতীয়মান হইতেছে। এমন বৃহৎ ব্যাপারে মৃণালিনী একটি কুটাও নাড়েন নাই। মনে সুখ না থাকিলে, এক এক দিন এক এক যুগ সদৃশ অতিবাহিত হয়। মৃণালিনী দেখিলেন, অষ্টমী নিশিও ক্রমে বিগত-যামা হইল।

নবমীর দিবস প্রত্যুষে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল, সকলে জাগরিত হইল, কিন্তু, কাহারও মনে সুখ নাই,—পরিশ্রমে কাহারও যেন উৎসাহ নাই; কেন না নিশি প্রভাতে সকলই নিরানন্দে পরিপূর্ণ হইবে। স্ত্রীলোকেরা স্নান করিয়া, পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্য দেবী সম্মুখে ছাগ বলিদান হইবে শুনিয়া, মৃণালিনীর মহা আহ্লাদ; কারণ, বলিদান কিরূপ তাহা তিনি কখনই দেখেন নাই। পিতার বাবুরচি-খানায় তিনি মুরগী জবাই হইতে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু বলিদান কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা, এতাবৎ কাল তাঁহার নয়ন-গোচর হয় নাই। এ বিষয়ে মৃণালিনীর দোষ গুণ, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। পূজা, বলিদান সকলই সমাপ্ত হইল, ব্রাহ্মণ ও কুটুম্ব ভোজন মহা আড়ম্বরে আরম্ভ হইল। ভোজনাদি ব্যাপার দেখিয়া, মৃণালিনীর অরুচি হইয়া গিয়াছে, অতএব তদ্দর্শনে তাঁহার আর বড় স্পৃহা নাই। কাহারও কাহারও মুখে শুনিলেন—অদ্য রজনীযোগে 'কবি' হইবে। মনে ভাবিলেন—অদ্যকার পূজাই সার্থক; কারণ, তিনি আশা করিয়াছিলেন, অদ্য কত গান, কত নাচ, কত সং দেখিবেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিলে, এক দল লাল পোষাকপরা লোক আসরে নামিল, ক্রমে বিরক্তিজনক ঢোল ও কাঁসি-বাদন আরম্ভ হইল। মৃণালিনী দেখিলেন সমস্ত রাত্রিই তাহারা মহা চীৎকার করিয়া গান করিতে লাগিল; তাহাদিগের গান তাহারাই বুঝিল আর প্রতিবেশিগণ কেহ কেহ বুঝিলেন। মৃণালিনী বসিয়া বসিয়া মাটি—একটা সংও আসে না, কিম্বা একটি পোষাক পরা বালকও বাহির হয় না। ভাবিলেন এ দেশের গীত বাদ্যও এইরূপ কদর্য্য। হরিহরের যতই সুখ্যাতি শুনিতে লাগিলেন, মৃণালিনীর অন্তঃকরণ ততই বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, যে পূজায় আমোদ আহ্লাদ নাই, সে আবার পূজা কি?

নবমী নিশি প্রভাত হইল। বেলা অধিক হইলে, কবিওয়ালারা বিদায় হইল। দশমীর কার্য্য সকল সমাধা হইলে, বৈকালে পুরনারীগণ প্রতিমা বরণ করিতে আসিলেন। মৃণালিনীকেও সকলে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু মৃণালিনী এবম্বিধ কার্য্যে অনুমোদন করিলেন না। বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিল, সকলের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; কিন্তু মৃণালিনী ভাবিলেন, এইবার বাপের বাড়ী যাইবার সুবিধা হইল। বেহারাদিগের স্কন্ধে প্রতিমা বাহির হইল, ঢুলী ও কাঁসিওয়ালারা নৃত্য করিতে করিতে, অগ্রে অগ্রে বাজনা বাজাইয়া চলিল। হরিহর, পুত্রও বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে, সজল নয়নে প্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন। প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া, সন্ধ্যার পর সকলে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। সিদ্ধি-সেবন, প্রণাম নমস্কার ও কোলাকুলির ধুম পড়িয়া গেল। মৃণালিনী ভূমিষ্ঠা হইয়া কাহাকেও প্রণাম বা নমস্কার করিলেন না;

কেন না কাপড় চোপড়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন। তিনি বাতায়নের নিকটে গিয়া একটি ভয়ঙ্কর হাস্যজনক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিলেন—কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই পরস্পর সাম্না-সাম্নি দাঁড়াইয়া ঘড়ীর 'পেণ্ডুলমের' মত একবার এ দিক একবার ওদিক যাইতেছে এবং অবশেষে নমস্কার করিয়া, তফাৎ হইতেছে। তিনি মনে করিলেন, তিন চারি দিবস ধরিয়া, অসভ্যতার চূড়ান্ত দেখাইয়াও কি ইহারা ক্ষান্ত হইবে না? ইহার উপর আবার কোলাকুলি! ইহাই কি অসভ্যতা ব্রতের উদ্‌যাপন! রং তামাসা যত হউক বা নাই হউক, ইহাই এক অপূর্ব্ব তামাসা। রজনীযোগে মৃণালিনী তাঁহার পোষা পাখীটির গাত্রে হস্ত বুলাইয়া, বিদায় চাহিলেন। বলিলেন,—"কাল আমি বাপের বাড়ী যাইব, এখানে অনেক দিন আসিয়াছি আর ভাল লাগে না।" গোবর্দ্ধন অমনি তটস্থ। প্রিয়ার বাক্য লঙ্ঘন করা কি তাঁহার সাধ্য। মৃণালিনী গোবর্দ্ধনকে বলিলেন,—"বাবা বলিয়াছেন, তোমায় কলিকাতায় লইয়া গিয়া চাকরি করিয়া দিবেন; চাকরি হইতে বিলম্ব হয়, কিছু টাকা দিয়া সোণার সেয়ারের কারবার খুলিয়া দিবেন। আজ কাল কলিকাতায় এক টাকা করিয়া সোণার 'সেয়ার' পাওয়া যায়। রাঙ্কি, সোণাপেট্, প্যাট্ প্যাট্, সিংভূম, মানভূম, বেঙ্গল-গোল্ড এণ্ড সিলভার, প্যাট্কুন প্রভৃতি নানাবিধ সেয়ার বাহির হইয়াছে। এই বার সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে, সোণার বাসনে সকলেই আহার করিতে পারিবে, কলিকাতায় যে যা কামনা করিয়া আইসে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হয়, কলিকাতা জায়গা বড় ভাল। গোবর্দ্ধন ভাবিলেন, কলিকাতায় যদি এক টাকা করিয়া সোনার সের বিক্রয় হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? কল্যই পিতার আদেশ লইয়া মৃণালিনী সমভিব্যাহারে কলিকাতায় রওনা হইব।

প্রভাতে উঠিয়া মৃণালিনী বাপের বাড়ী যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন; দেখিয়া শুনিয়া ভগবতীর আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। গোবর্দ্ধন পিতার নিকট কলিকাতা গমনের প্রস্তাব করায়, তিনি বিরাশি সিক্কা ওজনের একটি ধমক দিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। গোবর্দ্ধন তিরস্কৃত হইয়া, কপাটের অন্তরালে গিয়া প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মৃণালিনী দুই এক দিবস পূর্ব্বে ডাকযোগে পিতাকে এক পত্র লিখিয়া ছিলেন। পিতাও একাদশীর দিবস যথাকালে দাস দাসী প্রেরণ করিলেন। হরিহর স্বীয় বুদ্ধিকে বারম্বার ধিক্কার দিয়া, বধূমাতাকে বিদায় করিয়া সুস্থির হইলেন।

পাঠক মহাশয়গণ! অদ্য আপনারা একটি মৃণালিনী ও একটি গোবর্দ্ধনের বিষয় পাঠ করিলেন; কিন্তু, এই বিশাল বঙ্গদেশে অন্বেষণ করিলে, এরূপ অনেক পাওয়া যাইতে পারে। ক্রমে এ দেশের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, যেরূপ জঘন্য হইয়া দাঁড়াইতেছে—তাহাতে সমাজের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ইহা যে ক্রমে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

অনিত্যতা।

(Translated from Shelley's Mutability)

আজ যে কুসুম র'য়েছে ফুটিয়ে,
কাল সে অমনি যায় যে ঝরিয়ে!
রাখিতে যাহারে বাসনা অন্তরে—
সে ও আশা দিয়ে পলা'য়ে যায়।
কি আনন্দ তবে আছে এ ধরায়?
করে যে চপলা ভ্রূকুটি নিশায়,
চমকি অমনি মিলা'য়ে যায়।
অতীব বিরল, ধর্ম্ম এ ধরায়;
প্রকৃত বন্ধুত্ব,—তাই বা কোথায়?
যদি হে প্রণয় কর বিনিময়,
হতাশে হৃদয় হুতাশে দহে!

পার্থিব আনন্দ ফুরায় নিমেষে,
দুঃখ ভোগ করি আমরাই শেষে—
আমাদের ব'লে কিছু না রহে।
কিবা সমুজ্জ্বল নীল নভস্তল,
কিবা শোভা পায় কুসুম কোমল!
নিশায় মলিন, নয়ন-নলিন,
দিবসে কেমন বিকাশ পায়;
আসি শান্তি-সুখ, কেমন গোপনে,
দেখায় স্বপন;—কিন্তু পরক্ষণে,
জাগিয়ে রোদন করিতে হয়!

শ্রীরসময় লাহা।

অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামার ঈর্ষা।

জগতে সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতেছে—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"। ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্টন্, তাঁহার মহাকাব্যের এক পংক্তিতে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"যে আশা প্রাণীমাত্রেরই মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে নরকে সে আশার সঞ্চার নাই।" নরক-যন্ত্রণা তবে কি ভয়ানক যন্ত্রণা! এই পৃথিবীতে যদি আশার সঞ্চার না থাকিত, তাহা হইলে, এই মানব-জীবন কি দুঃখের হইত! কেমন করিয়াই বা আমরা এই অনিত্য দেহ-ভার বহন করিয়া, নিরাশ অন্তঃকরণে সাংসারিক দুঃখ-রাশি ভোগ করিতে সমর্থ হইতাম, যে ব্যক্তি শৈশবাবস্থা হইতেই চির-জীবন কেবল নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণায় অতি-

বাহিত করিয়া আসিতেছে, তাঁহার ও কি এক বার মনে হয় না যে, এমন দিন আসিবে—যে দিন সুখ-সূর্য্য উদয় হইয়া তাঁহার হৃদয়-সরোজ প্রস্ফুটিত করিবে? অবশ্যই হয়। তাহা না হইলে যদি সে জানিত, নিশ্চয় জানিত যে তাহার দুঃখ-নিশা অবসান হইবে না, তাহা হইলে, সে অবশ্যই আত্মঘাতী হইয়া, এই দুর্ল্লভ জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিত,—সন্দেহ নাই। তবেই দেখ, আশায় মনুষ্য-জীবন ধারণ করিতেছে, আশাই স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদের অশ্রু-জল মুছাইয়া দিতেছে, আশাই ক্ষণে ক্ষণে আমাদের অন্ধকার কুটীরে আবির্ভূত হইয়া, আমাদের হৃদয়-ভার অপনয়ন করিতেছে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর, আমাদিগকে নৈরাশ্য-সাগরে নিক্ষেপ করেন নাই। আমরা যখনই বিষণ্ন হই, তখনই আশা-পথ নিরীক্ষণ করিয়া সুস্থির হইয়া থাকি। আশাই দুঃখ-মেঘাবৃত হৃদয়াকাশের ক্ষণপ্রভা, আশাই জীর্ণ জগদারণ্যের মুকুলিত লতা, আশাই ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুলিত সংসারার্ণবের গরুৎমতী তরণী।

সহচরী নৈরাশ্যপরবশ হইয়া, স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন দেন নাই,—এই সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষকাল আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াই জীবিত আছেন। লোকের গঞ্জনায় তিনি কোন বাহ্য শোভা ধারণ করেন না বটে, কিন্তু অন্তর তাঁহার অদ্যাবধি মলিন হয় নাই।

রজনী প্রভাত হইলে, প্রতাপ চন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া, সর্ব্বাগ্রে পুরোহিতকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজি শুভ দিন কি না?" পুরোহিত পাঁজি দেখিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আজিকার দিন বেশ ভাল আছে, যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে পক্ষে দিন বেশ প্রশস্ত বটে।" প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"যদুনাথ ও কাল রাত্রে মহেশপুর থেকে ফিরে এসেছে আর আজকার দিনও বেশ ভাল আছে; তবে, শুভদিনে শুভকার্য্যটা সম্পন্ন করা যাগ্—কি বলেন"? পুরোহিত বলিলেন,—"অবশ্য—অবশ্য।"

প্রতাপচন্দ্র তখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, মাতাঠাকুরাণীর নিকট গমন করিলেন। প্রতাপ চন্দ্র দেখিলেন, মাতা নয়ন মুদ্রিত করিয়া, ইষ্টদেবতার নাম করিতেছেন। তিনি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কাত্যায়নী প্রতাপচন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বাবা! সকাল বেলাই কি মনে ক'রে?" প্রতাপ চন্দ্র বলিলেন,—"মা! পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি দেখে বলেছেন—আজকের দিন বেশ ভাল আছে। আপনি একবার যদুনাথকে বাড়ীর ভিতর ডেকে, জিজ্ঞাসা করুন, সে তার পরিবারকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পারে কি না? আর ওঁকে ও জিজ্ঞাসা করুন তিনি তাঁর স্বামীকে চিন্‌তে পারেন কি না? আমি আর বিলম্ব কর্‌তে ইচ্ছা করি না, কেন না যদুনাথের হাতে আজ কাল অনেক কায, চার দিকে মকদ্দমা মামলা, যদুনাথ কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নাই। যদিও শীঘ্রই, এমন কি পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই, সমস্ত গোল মিটে যাবে, তবু কাজ কি? "শুভস্য শীঘ্রং"। শুভ কার্য্যটা সম্পন্ন হ'য়ে গেলেই আমি একটু সুস্থির হই।"

কাত্যায়নী হাস্য করিলেন এবং রাজ-

লক্ষ্মীকে বলিলেন,—"সহচরীকে আমার কাছে ডেকে আন।" রাজলক্ষ্মী মাতার আদেশ ক্রমে তৎক্ষণাং সহচরীকে ডাকিয়া আনিলেন। কাত্যায়নী বলিলেন,—"বস দিদি! বস; আজ তোমার বড় আনন্দের দিন,—তুমি বৌমায়ের কাছে বোধ হয় সব শুনেছ? সহচরী অধোবদনে বলিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ" কাত্যায়নী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি অনেক দিন ত কর্ত্তাটীকে দেখ নাই, এখন দেখ্‌লে চিনতে পার কি?" সহচরী লজ্জায় নিরব রহিলেন। কাত্যায়নী প্রতাপচন্দ্রকে বলিলেন,—"চুনিলাল, তুমি এখান থেকে সরে যাও, তুমি বরং একটু পরে যদুনাথকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও গে"।

প্রতাপচন্দ্র মাতার আজ্ঞাক্রমে তৎক্ষণাৎ সদর-মহলে গমন করিলেন। কাত্যায়ণী সহচরীকে আবার বলিলেন,—"চুনি ত এখন স'রে গেছে, এখন বল"। সহচরী কি করেন, অধোবদনে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"ঠাকুর মা! তাঁর অঙ্গে দুটি চিহ্ন আছে, সে দুটি আমার বেশ মনে আছে, সেই দুটি যদি আমার মনের সঙ্গে ঠিক ঐক্য হয় তবে তিনিই বটেন।" কাত্যায়নী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি চিহ্ন আছে বল দেখি"। সহচরী বলিলেন,—"তাঁর পিটের ডান দিকে এক খানি জরুল, আর বাঁ দিকে একটি ছোট আঁচিল আছে।" কাত্যায়নী বলিলেন,—"ভাল সে আসে এই, তা' হলেই সব গোল মিটে যাবে",—এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ যে যদুনাথ আস্‌ছে"।

এই কথা শুনিয়া, সহচরী অবগুণ্ঠন টানিয়া লজ্জিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যদুনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতেই নমস্কারাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি আজ্ঞা কর্‌ছেন?" কাত্যায়নী বলিলেন,—"আরে এই খানে স'রেই আয়, মহেশপুরের খবর জিজ্ঞাসা করি।"

যদুনাথ অতিশয় চতুর ব্যক্তি। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"আজ্ঞে এখন একটু ব্যস্ত আছি।"

কাত্যা। আরে বস্তুর এখন হ'য়েছে কি? এর পর আবার তোর টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না।

যদু। আজ্ঞে কি বল্‌ছিলেন—বলুন না?

কাত্যা। আরে বেটা দেখ্‌সে আয় কনে এসেছে।

যদু। কনে আবার কে?

কাত্যা। আরে বেটা বুঝ্‌তে পারে না! মাগ্ রে বেটা! মাগ্!

যদু। এই জন্যে ডাক্‌ছেন বুঝি? খুব লোক আপনি!

কাত্যা। তা'—এটা কি বড় ছোট কথা হল নাকি?

যদু। আজ্ঞে, আমি একটু পরেই আস্‌ছি।

কাত্যা। আর "একটু পরে" কাজ নাই—বলি তামাসা নয়—একটা কথা বলি শোন দেখি?

যদুনাথ কি করেন, অগত্যা নিকটে আসিলেন। কাত্যায়নী বলিলেন,—"যদু একবার পেছন ফিরে দাঁড়াও। যদুনাথ পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলে কাত্যায়নী সহচরীকে বলিলেন,—"দেখ ত দিদি পিঠে কি চিহ্ন আছে।

সহচরী অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে এক বার মাত্র কটাক্ষ পাত করিয়াই, মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে, ইনিই আমার স্বামী। ইতি পূর্ব্বে তিনি একদিন যদুনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া অনেক টা চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু স্বীয় অদৃষ্টের দিকে তাকাইয়া সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, ছিলেন। এক্ষণে উল্লিখিত চিহ্নদ্বয় অবলোকন করিয়া, তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল। আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল, অপাঙ্গে দুই একটি অশ্রু-বিন্দু ও দেখা দিল। কাত্যায়নী তাঁহাকে চক্ষু মার্জ্জন করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"আর কান্না কেন দিদি? বিধাতা তোমার দুঃখ দেখ্‌তে পেয়েছেন,—এই বার তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

সহচরী ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। কাত্যায়নী যদুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরে বাপু! তুই কি বলিস্? তোর কিছু চিহ্ন টিহ্ন দেখ্‌তে হবে না কি? যা হয় এই বেলা খুলে বল।" যদুনাথ বলিলেন,—"আজ্ঞে না আমার আর কিছু দেখ্‌তে হ'বেনা, আমি সকলেই পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছি।" কাত্যায়নী বলিলেন,—"দেখিস্ পরে যেন আবার গোলমাল করিস্ নে—ভাল একবার বৌয়ের মুখখানি দেখ্‌না,তা' হলেত অনেকটা চিন্‌তে পার্‌বি,ও মুখে গোঁফও ওঠে নি, আর দাড়িও ওঠে নি।" এই বলিয়া সহচরীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"দেখাও ত দিদি! একবার কনে মুখ খানি দেখাও ত। সহচরী লজ্জায় বিনম্রমুখী হইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। যদুনাথ একবার মাত্র কটাক্ষপাত করিয়া, ফাঁকি দিয়া দেখিয়া লইলেন; দেখিয়া চিনিতেও পারিলেন। আহা! সেই ফুল-শয্যা-রজনীতে যে চন্দন-চর্চ্চিত মুখ-পদ্ম—যে কজ্জল-রেখা শোভিত অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন-যুগল নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার মানস-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা লাবণ্য-বিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, অপর দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং অনেক কষ্টে ভাবগোপন করিয়া, তথা হইতে পালাইবার চেষ্টা করিলেন। হায়! এত দিনের পর, তাঁহার গৃহলক্ষ্মী তাঁহারই ক্রোড়ে আসিল, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং দুই এক বিন্দু অশ্রু-জল গণ্ডস্থল বহিয়া পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কাত্যায়নী ও রাজলক্ষ্মী উভয়েই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কাত্যায়নী যদুনাথকে বলিলেন,—"ভাল যদুনাথ তুই এখন আপনার কাযে যা, আমি আবার ডাকব এখন্।" তচ্ছ্রবণে যদুনাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া বাহিরে গমন করিলেন।

কাত্যায়নী রাজলক্ষ্মীকে আদেশ করিলেন—বউটিকে ভাল ক'রে মাথা টাথা ঘষিয়ে স্নান করিয়ে, নূতন কাপড় নূতন শাঁখা, সিন্দুর, ফুল চন্দন দিয়ে বেশ ক'রে সাজিয়ে দিতে বল। রাজ লক্ষ্মী গমনোদ্যতা হইতে না হইতেই, শ্যামা আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামার হস্তে একখানি ছোট থাল—তাহাতে মাথা ঘসা, হরিদ্রা প্রভৃতি অনুলেপন সামগ্রী। শ্যামার অন্তরে সুখ নাই, কেবল মৌখিক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"কি

সই! এখন ও ব'সে যে?—বেলা যে অনেক হলো—স্নান টান করবে ত এস।"

কাত্যায়ণীর অনুজ্ঞা-ক্রমে সহচরী লজ্জিত-ভাবে গাত্রোত্থান করিলেন এবং শ্যামার হস্ত ধরিয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্যামা বলিল,—"কেন, আজ এত লজ্জা কিসের?—সয়ের কাছে কি লজ্জা করতে আছে?" এই কথা বলিয়া সহচরীর হস্ত ধরিয়া খিড়্‌কির পুষ্করণী অভিমুখে গমন করিল।

শ্যামা একজন দরিদ্র কুটুম্বের কন্যা, অল্প বয়সে পিতা, মাতা ও স্বামীর মাথা খাইয়া-সমস্ত জঞ্জাল ঘুচাইয়া, প্রতাপ চন্দ্রের সংসারে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। শ্যামা অন্যান্য পরিচারিকাদিগের উপর। ইহার বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০।৩২ বৎসর। মাসেক কারণ সহ-চরীর সহিত একত্র ভোজন, এক ঘরে শয়ন ও একত্র সাংসারিক কাজ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে—কাজে কাজেই উভয়ের মধ্যে একটা ভালবাসা জন্মিয়াছে। শ্যামা মনে করিয়াছিল—আমিও বিধবা, সহচরীও বিধবা, পরস্পর মনের কথা কহিয়া, এক প্রকার সুখে দুখে দিন যাপন করিব—বিধাতা দয়া করিয়া একটি সই জুটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ একি বজ্রাঘাত হইল! সহচরী সধবা! একি বালাই!—তবে আর সহচরীর সহিত পোষাইবে কেন? সহচরী স্বামী সহবাসে পরম সুখে কাল যাপন করিবে, আর আমি অপর ঘরে একাকিনী রাত কাটাইব—তবে আর কি হইল? সহচরী সধবা,—এই কথা যত দিন ভালরূপ রাষ্ট্র না হইয়াছিল, ততদিন শ্যামা এক প্রকার ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল, কথাটা মিথ্যা বলিয়া মনকে এক প্রকার প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু অদ্য প্রাতে শারদা-সুন্দরী যখন তাহাকে ডাকিয়া সহচরীকে স্নান করাইয়া দিতে বলিলেন এবং গন্ধ দ্রব্যের থালখানি তাহার হস্তে তুলিয়া দিলেন, তখনই তাহার মুখ খানি শুখাইয়া গেল। শারদা-সুন্দরীর মুখের দিকে ভাল করিয়া নয়ন মেলিয়া চাহিতে পারিল না। শ্যামার ভাবগতিক দেখিয়া শারদা-সুন্দরী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগি-লেন,—"যমে নিলে,তার উপায় কি আছে?"

শ্যামা সহচরীর হস্ত ধারণ করিয়া পুষ্করণীর দিকে যাইতে যাইতে কহিতে লাগিল,—"বলি বাড়ীর লোক—সকলেই কি পগেল হ'য়েছে না কি?"

সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন সই! পাগল হ'বে কেন!"

শ্যামা বলিল,—"আর ভাই! পাগল নয় ত কি?—বলি সই! হারা নিধি পাওয়া গেলে আর ভাবনা কি? যা যায়, তা যে আবার আসে, সে বড় জোর কপালের কর্ম্ম—আমি সই! চৌদ্দ বৎসর কি হ'য়ে রয়েছি বল দেখি?

সহচরী বলিলেন,—"তা দেখ সই! আমারই কি আর আশা ছিল?" শ্যামা বলিল,—"তা সই! যা ভাল বোঝ কর—আমার ত মনে এক তিল বিশ্বাস হয় না।"

সহচরী বিলক্ষণ চতুরা, শ্যামার মুখ দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, কি দারুণ শেল তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে! অধিক আর কিছু না বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"তা দেখ সই! যার

জিনিষ সেই চিনে নেয়, অন্য লোকে কেমন করে চিনবে?"

শ্যামার মুখমণ্ডল আরও পরিম্লান হইয়া আসিল। সে সহচরীকে পুষ্করিণীর সোপানে পশ্চাৎ ফিরাইয়া বসাইয়া, তাহার কবরী-ভার উন্মোচন করিয়া দিল এবং মাথা ঘষা ও গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিল। তৎপরে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, যেমন জলে নামা-ইতে গেল, অমনি সহচরী মনের আবেগে অধৈর্য্য হইয়া,—"হা গিরিবালা! তুই এমন সময় কোথায় রইলি—বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সোপানের উপর বসিয়া পড়িলেন। শ্যামা এখন সহচরীর ক্রন্দন দেখিতে ভাল বাসে—হাসি দেখিতে ভাল বাসে না। সে সহচরীর ক্রন্দন দেখিয়া কপট হৃদয়ে বলিতে লাগিল,—"তাঁর জন্যে আর কাঁদ কেন? সই! তিনি সেখানে মায়ের কোলে কত সুখে রয়েছেন।

সহচরী বলিলেন,—"সই! কাঁদব না ত কি? জগতে যদি কেহ আমাকে আমার বলতে থাকে, তবে সেই গিরিবালা—জগতে যদি কেহ আমার দুঃখে কাঁদতে থাকে, তবে সেই গিরিবালা, জগতে যদি কেহ যথার্থ ভাল বাসা শিখে থাকে, তবে সেই গিরি-বালা। সই! সে যে আমার মাথার মাথা-ঘসা, গায়ের হলুদ—সে যে আমার চোখের কাজল, সিঁথির সিঁদুর—তাকে ভুলে কেমন করে থাকব সই? মাসেক কারণ তাকে দেখি নি, তার সঙ্গে কথা কই নি বোধ হচ্চে যেন কত যুগ যুগান্তর পার হয়ে গেল! সে বিহনে আমার সকলই যে অন্ধকার—সকলই যে কাঁকা কাঁকা ঠেকছে সই! তাকে পেয়ে আমি যে সব দুঃখ ভুলে ছিলেম্।"

লৌকতা রক্ষার জন্য, শ্যামা সহচরীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিল এবং তাঁহাকে ধীরে ধীরে জলে নামাইয়া স্নান করাইয়া দিল। তৎপরে সোপানে উঠিয়া মাথা মুছাইয়া দিতে দিতে, তাঁহার সীমন্তে এক ধান্য পরিমিত সিন্দুর-রেখা সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একি সই!"

সহচরী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"থাক্ সই! ঢাকা ছিল ঢেকেই রাখ—ওটি আমার মেঘের আড়ে সূর্য্য, ওটি আমার অন্ধকার রাত্রের জোনাক-পোকা, ওটি আমার শুখনো বনের পলাশ ফুল। থাক্, সই! ঢাকাই থাক্, নষ্ট হবে না।

লোকে বলে সহচরীর স্বামী আর নাই, কিন্তু সহচরীর মনে সেটি এক দিন ও গায় না। তিনি যেখানেই থাকুন, কোন উপায়ে নিত্য ঐ রেখাটি সীমন্তে ধারণ করিতেন এবং অতি যত্নে উহা কেশ জালে আবৃত করিতে ভুলিতেন না। ইহা গিরিবালা ভিন্ন আর কেহই জানে না।

শ্যামা বিস্মিত হইয়া আবার বলিল,—"তাই ত সই! এ যে তোমার "ধনুকভাঙ্গা পণ" দেখ্‌তে পাই। আমি ও যদি এই চৌদ্দ বৎসর এমন ক'রে বুক বেঁধে থাক্‌তুম তা' হ'লে, আমিও মরা স্বামী ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌তুম। অদৃষ্ট আমার!"

স্নানান্তে সহচরী আর্দ্র বসনেই গোলাপ কুঞ্জের শোভা দেখিতে লাগিলেন। শ্যামার উহা ভাল লাগিল না। সে মনে করিল—মানুষের মনে সুখ থাকিলে, তার সকলই ভাল লাগে। শ্যামা বলিল,—"তবে সই! তুমি একটু ফুল টুল দেখ, আমি এখন চল্লেম্, আমার ঢের কাজ।"

সহ। আমি তোমার সঙ্গে যাব না ?

শ্যামা। খুসি তোমার।

সহ। কেন সই! আজ সয়ের উপর এত নির্দ্দয় কেন ?

শ্যামা। নির্দ্দয় আর কেমন ক'রে হলুম ?

সহ। আমায় ফেলে যাচ্চ—নির্দ্দয় নও কেমন ক'রে ?

শ্যামা। আর ভাই! তুমি এখন হ'লে বড় মানুষ লোক, গরিবের সঙ্গে মিল্‌বে কেন ?

সহ। কেন, আমি কিসে বড় মানুষ—আমার কি ধন আছে ?

শ্যামা। যে ধন থাক্‌লে মেয়ে মানুষকে ধনী বলা যায়—স্বামী-ধন।

সহ। তা সই! দুঃখ কিসের? তোমায় আমায় ত আর ভিন্ন নয়।

শ্যামা। ঢের রঙ্গ হ'য়েছে—চল এখন্ বকুনি খেতে আমিই খাব—তোমার কি বল ?

সহ। সেই যা' বল, সই!—তা, সই না হ'লে সয়ের সওয়া সইবে কে সই ?

শ্যামা। বলি এখন যাবে না কি? বেলা হলো যে।

সই। চল সই!—চল, আমি হলুম ভারের কলসী—আমায় ফেলে কি যেতে পার ?

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, শারদা-সুন্দরীর নিকট গমন করিল। শারদা সুন্দরী শ্যামাকে কিঞ্চিৎ ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন,—"তোমাকে যে কাজে পাঠান যায়, তাতেই তুমি দেরি কর! অন্য দিন হইলে শ্যামা উত্তর করিত; কিন্তু, আজ শ্যামার উত্তর দিতে ইচ্ছাই হইল না। ঘোর আত্মগ্লানি তাহার কর্ণে এই পরামর্শ দিল যে,—"যত তিরস্কার করিতে পারেন, করুন—সকলই মাটি হইয়া সহিবে—উত্তর আর এ জন্মে দিবে না।"

শারদা-সুন্দরী দেখিলেন—শ্যামার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। বুঝাইয়া বলিলেন,—"ভাই! তোমার মত কাজের লোক আমি কোথায় পাব, দুই একটা কথা ব'লে ফেলেছি ব'লে, কিছু মনে করো না—তোমাদের কাছে আমার আব্‌দার খাটে, তাই বলেছি।" এই কথায় একটি ঈষৎ হাস্যছটা, শ্রাবণ মাসের রৌদ্রের ন্যায়, শ্যামার বদনে ক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইয়াই মিলাইয়া গেল। শারদাসুন্দরী ইঙ্গিত করিবামাত্র, সে অপর গৃহ হইতে এক খানি থালে করিয়া একখানি রক্ত বর্ণের পট্ট-বস্ত্র, দুইগাছি শঙ্খ, এক কৌটা সিন্দূর ও এক ছড়া পুষ্পহার লইয়া আসিল। শারদা-সুন্দরী স্বহস্তে সহচরীর বেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন এবং স্বীয় অঙ্গ হইতে এক ছড়া সুবর্ণ-হার ও দুই গাছি সুবর্ণ-বলয় তদীয় অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। এই সকল মাঙ্গলিক দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়া সহচরী কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিলেন!

এইরূপ বেশ ভূষা সমাধা হইলে, শারদা-সুন্দরী, সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কাত্যায়নী-সন্নিধানে গমন করিলেন। কাত্যায়নী, রাজলক্ষ্মী ও অপরাপর সকলে সহচরীর রূপ দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, "যদুনাথ যেমন সুশ্রী পুরুষ, বউটিও তার উপযুক্ত বটে; বউটি এত দিন যে অবস্থায় ছিল—সে অবস্থায় ওর পানে ফিরে তাকায় কে? এখন রূপসীর রূপের ডালি দেখা গেল। কাত্যায়নী রাজলক্ষ্মীকে আদেশ

করিলেন, রাজলক্ষ্মী সিন্দুক হইতে দুই এক খানি অলঙ্কার বাহির করিয়া সহচরীর অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। কাত্যায়নী যদুনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যদুনাথ নববস্ত্র পরিধান করিয়া, কাত্যায়নী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়কে রাজলক্ষ্মী সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রী৺ দশভুজার মন্দিরে প্রেরণ করিলেন। মন্দির মধ্যে তখন পূজা হইতেছিল। উভয়ে ভক্তি-ভরে গললগ্ন বাসে পূজা সন্দর্শন করিলেন এবং পূজা সমাপনান্তে প্রণামাদি করিলে পর, রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"ঠাকুর এদের শান্তি জল দিন।" উভয়ে ভক্তিভাবে উপবেশন করিলে, ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে মন্ত্রপূত শান্তিজল প্রদান করিলেন।

এই সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রাজলক্ষ্মী উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া মাতার নিকটে গমন করিলেন এবং তথায় মর্য্যাদানুসারে প্রণাম ও নমস্কারাদি করাইলেন। কাত্যায়নী যদুনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"কি রে! কি বলিস্? এখন ত হারানিধি ফিরে পেলি—এখন দুজনে সুখে সচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর্‌গে যা,—কেমন?

যদুনাথ বলিলেন,—"আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য,—কিন্তু এখনই আহারাদি ক'রে আমায় মহেশপুর যাত্রা কর্‌তে হ'বে। এই মাম্‌লা মকদ্দমা গুলো চুকে গেলেও আমি শীঘ্র ঘর-কন্না পাত্‌তে পাচ্চিনে—মনে মনে একটা সঙ্কল্প আছে। পরে বল্‌ব।

যদুনাথের কথা শুনিয়া সকলে সাত পাঁচ ভাবিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন। সহচরীর ত কথাই নাই। শ্যামা ও এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সেই কেবল মনে মনে একটু আহ্লাদিত হইল; যদুনাথ কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা এখন আপনাদের মানুষ আপনাদের কাছেই থাক্, আমায় এখন বিদায় দিন্।" এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। কাত্যায়নী "চিরজীবী হও", বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সহচরী ও অপরাপর সকলেই আপন আপন কার্য্যে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নসিরাম ভদ্র।

বর্ষাকাল—দিন নাই রাত নাই, অবিরত মূষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; পথে এক হাঁটু কাদা। পুষ্করণি, নদী, নালা, খাল, বিল সমস্তই ভরপূর। অম্বিকাচরণ এক দিন প্রভাতে উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন এবং এক এক বার আকাশ পানে তাকাইয়া দেখিতেছেন;—দেখিলেন মেঘ গুলি একে একে সরিয়া যাইতেছে, ধীর-স্বভাব দক্ষিণানিল যেন তাহাদিগের গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিতেছে,—"চল ভাই! চল যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দিনেক দু'দিন বিশ্রাম কর, এত করিয়া লোকের সঙ্গে লাগিলে কি হইবে?—তাহাদের যে কাপড় শুখায় না, কাদায় কাদায় তাহাদের যে পা হাজিয়া গেল,—তাই বলি একটু বিশ্রাম কর, সূর্য্য দেবকে একবার উদয় হইতে দাও।" দক্ষিণানিলের এই সান্ত্বনয় বচনে, মেঘ গুলি ক্রমে ক্রমে সরিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, সূর্য্যদেব

দেখা দিলেন। অম্বিকাচরণ ভাবিলেন, আজ তিন দিবস হইল বৃষ্টির জন্য গিরিবালার চিঠিখানি পাঠান হইতেছে না—কাহাকে দিয়াই বা পাঠাই—আপনাকেই যাইতে হইল। কালবিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গিরিবালাকে বলিলেন,—"কৈ দাও দেখি," গিরিবালা ইঙ্গিত বুঝিয়া গূঢ়তম স্থান হইতে পত্র খানি বাহির করিয়া স্বামী হস্তে প্রদান করিলেন। অম্বিকাচরণ সেইখানি একখানি চাদরের ভিতর রাখিয়া চাদর খানি বেশ করিয়া কটি-দেশে জড়াইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহির হইয়া, তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তীরে উপস্থিত হইয়া একজন নৌকা বাহককে ডাকিলেন। নৌকা বাহক আজ্ঞামাত্রেই নৌকা তীরে লাগাইল। অম্বিকাচরণ তদুপরি উঠিয়াই বলিলেন,—"পারে চল্, কোথায় লাগাতে হবে, পরে বল্‌ব।" মাঝিআজ্ঞামাত্রেই নৌকা ছাড়িল। গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া অম্বিকাচরণ মাঝিকে বলিলেন,—"নৈহাটীর বাঁধা ঘাটে নৌকা লাগা'বি।" মাঝি বলিল,—"আজ্ঞে আচ্ছা।" অম্বিকাচরণ ভাবিলেন এই গোলযোগের সময় যদি ইহা রাষ্ট্র হয় যে, আমি নৈহাটী গিয়াছিলাম, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! তিনি দাঁড়ীও মাঝিদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"বকৃসিস্ পাবি।" তাহারা অপ্যায়িত হইল এবং সজোরে ক্ষেপণি ক্ষেপণ করিতে লাগিল।

নৈহাটীর তীরে গিয়া নৌকা লাগিল। অম্বিকাচরণ দেখিলেন, কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। বিশেষতঃ, তিনি ছদ্মবেশী—অতি সামান্য বেশ ভূষায় সামান্য ব্যক্তির ন্যায় আসিয়াছেন; অতএব কাহারও দৃষ্টিকে আকর্ষন করেন নাই। পত্র খানি চাদরের সঙ্গে কটিদেশে জড়ান আছে। চিন্তাকুল হৃদয়ে পথি পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে করিতে, অম্বিকাচরণ হঠাৎ পদস্খলন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। উরুদেশে গুরুতর আঘাত লাগিয়া, তিনি কিয়ৎক্ষণের জন্য চলৎ-শক্তি-রহিত হইয়া, সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,—ভাবিলেন বিষম বিভ্রাট! পত্র খানি প্রতাপচন্দ্রের বাটীতে পৌঁছিয়া দিবার উপায় কি—এতদুর আসিয়া অনর্থক বাটী প্রত্যাগমন করাও শ্রেয়কল্প নহে।

এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে অদূরে দেখিতে পাইলেন—এক খানি শকট আসিতেছে। শকট-চালক প্রাণপণে চাবুক ঘুরাইতেছে ও অশ্বটিকে মুহুর্মুহু নির্দ্দম করিয়া প্রহার করিতেছে। অশ্বটির অবস্থা অতি শোচনীয়,—পঞ্জরের অস্থি কয়খানি গণা যাইতেছে। গ্রীবাদেশ এত অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে, গমন কালে নাসিকার নিশ্বাসে পথের ধূলা উড্ডীয়মান হইতে থাকে। অনেক ঘা চাবুক খাইয়াও "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি;" ফলতঃ, দেখিলেই বোধ হয়, অচিরে ঘোটক-লীলা সম্বরণ করিবে। যাহা হউক, অশ্ব চলিতেছে না বটে, কিন্তু চালকের পদদ্বয়ের বিরাম নাই, কারণ সে ক্রমাগত পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতেছে ও চাবুক উল্টাইয়া অশ্বটির জীর্ণ পঞ্জর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। গাড়ী খানির আবার এমন দুরবস্থা যে, আকাশ পাতাল ভাবিলেও স্থির হইবে না, উহা কি রঙে

রঞ্জিত ছিল; এমন এক খানিও কাষ্ঠ-ফলক তন্মধ্যে নাই, যাহা গমন কালে ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত হইবে না। গাড়ী খানি যখন বাটীতে থাকে, তখনই কেবল কবাট কয় খানি যথাস্থানে সন্নিবেশিত থাকে। এখন পথে বাহির হইয়াছে, অতএব উহাদিগকে চালের উপরেই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; কারণ, এক শত বার যদি উহারা রাস্তায় পড়িয়া যায়, তাহা হইলে, এক শত বার কে উহাদিগকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে? অম্বিকাচরণ দেখিলেন—একটা মাংস-পিণ্ড ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া চালকের উপর মহা তম্বি করিতেছে—বলিতেছে,—"জলদি হাঁকাও জল্‌দি হাঁকাও"। এরূপ করিবার কারণ এই যে, ঘোটকের গুণাগুণ তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঘোটকটি সারা দিন ফেন, আমানি, তরকারির খোসা, প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে; অতএব, পথিমধ্যে একবার মূত্র ত্যাগ করিলে, আর চলিতে পারে না। ক্রমে গাড়ী খানি, মন্থর গমনে, অম্বিকাচরণের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। অম্বিক দেখিলেন, তন্মধ্যে একটা প্রকাণ্ড মাংস-পিণ্ড বিরাজ করিতেছে, গণ্ডস্থল এত স্ফীত যে, চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত কি নিমীলিত কিছুই জানা যায় না। সমস্ত শরীরের সহিত তুলনা করিলে, বাহুদ্বয় অপেক্ষাকৃত অনেক সূক্ষ্ম। পরিধেয় বস্ত্র খানি দেখা যাইতেছে না। সর্ব্বজন পরিচিত শকট খানি পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতেছে দেখিয়া, পল্লীস্থ বালক-বৃন্দ মহানন্দে করতালী দিতে দিতে, তদভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। অম্বিক শুনিলেন তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন। তাহারা বলিতেছে—

"ও নসিরাম দানা খাবি?
পেট্‌ টা ফুলে মরে যাবি।
ও নসিরাম ছাড়ো গাড়ী;
নৈলে যাবে যমের বাড়ী।"

বালক দিগের মুখে এই ছড়াটি শ্রবণ করিয়া, অম্বিকাচরণ বুঝিতে পারিলেন যে, মাংস-পিণ্ডের নাম "নসিরাম"। নসিরাম বালক দিগকে শাসন করিবার জন্য নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে লাগিল এবং লাঠি উঁচাইতে লাগিল। কিছুতেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, শেষ তাহাদের গায়ে থু থু দিতে আরম্ভ করিল, তাহারাও কিছু দূরে গিয়া ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। বালকদিগকে আঁটা ভার, গাড়ী ও চলিতেছে না, নসিরাম কি করেন, মিনতি করিয়া,তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

নসিরাম অম্বিকাচরণকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! রাস্তায় এমন করে ব'সে রয়েছেন কেন?—আপনার কি হ'য়েছে?"

অম্বিক। পায়ে বড় চোট্‌ লেগেছে।

নসি। কি ক'রে?

অম্বি। পা হড়্‌কে পড়ে গিয়েছি।

নসি। আপনার নিবাস?

অম্বি। ও পারে।

নসি। এখানে আগমন হ'য়েছে কোথায়?

অম্বি। জমীদার বাবুর বাড়ী যেতে হ'বে।

নসি। আমিও সেখানে যাব, আপনি আমার গাড়ীতে আসুন্। আহা! ব্রাহ্মণ পায়ে চোট্‌ লেগেছে—আসুন।

অম্বি। আজ্ঞে না গাড়ীতে আর চড়্‌ব না। একে এই পায়ে চোট্‌ লেগেছে, আবার কি হ'তে কি হ'বে। আপনি সেখানে যাচ্ছেন, তবে আমার যদি একটু উপকার করেন—

নসি। কি কর্‌তে হ'বে বলুন?

অম্বি। এক খানি পত্র আছে তাঁর নামে,—যদি সেই খানি পৌঁছে দেন, তা' হলে আমাকে আর এ বেশে সেথায় যেতে হয় না।

নসি। তা বেশ—আপনি পত্র দিন্—পৌঁছে দিব।

অম্বিকাচরণ পত্র খানি বাহির করিয়া, নসিরামের হস্তে দিলেন এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নসিরাম অম্বিকাচরণকে প্রণাম করিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। অম্বিকাচরণ আশীর্ব্বাদ করিয়া ঘাটের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে গাড়ী পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই প্রতাপ চন্দ্রের তোরণ সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রতাপচন্দ্র তখন বাটীর সম্মুখেই পাদ-চারণ করিতেছিলেন। নসিরামকে দেখিয়া, নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদা কোথা থেকে?"

নসিরাম বলিল,—"নাতির কাছে আমার একটা কম্‌পিলিন্‌ আছে।"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"কি কম্‌প্লেন্‌ বলুন, আমি আপনার নাতি থাক্‌তে আপনার ভাবনা কি?"

নসিরাম বলিল,—"বলি আমি সকাল বেলা গাড়ী চ'ড়ে একটু মার্ণিংহোয়াক্‌ কর্‌তে যাই, তা' ছোঁড়া বেটারা আমায় এত বিরক্ত করে কেন বল দেখি? ঢিল্‌ ছোড়ে—আবার একটা কি ছড়া কাটে—কেন এমন করে, বল দেখি? তুমি একটু শাসন ক'রে দেবে না?"

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন—"অবশ্য শাসন করে দিব। তবে দাদা! জিজ্ঞাসা করি—আপনি মর্নিংওয়াক্‌ করেন কেন?

নসি। বলি এই শরীরটে বড় ভারি হ'য়ে পড়্‌ছে দিনকের দিন; তাই, কোবরেজকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম তিনি আমাকে দুধ্‌ খেতে বারণ করেছেন আর সকাল বেলা খানিক খাণিক বেড়া'তে ব'লেছেন।

প্রতা। তা—দাদা! আপনাকে কি গাড়ী চ'ড়ে বে'ড়াতে ব'লেছেন?

নসি। না,—না—পায়ে হেঁটেই বলেছেন—তবে আমি যে পেরে উঠিনে, তার কি বল?

প্রতা। চেষ্টা কর্‌তে হবে—তা' নইলে আপনার কোন উপকার হ'বে না।

নসি। কেন বল দেখি?

প্রতা। কেন, বুঝ্‌তে পাচ্চেন না? বলি আপনি যদি একটু চলে বেড়ান, তবে ত আপনার দেহের উপকার হবে, আর ঘোড়া চলে বেড়ালে, আপনার দেহের, উপকার হ'বে কেন? আপনি ত আর ঘোড়া নন।

নসি। হে—হে—হে নাতি আমার; এক কথা বলে নিলে।

প্রত। আর, আপনি হচ্চেন আমাদের দাদা মশায়,—আপনাকে দুই এক কথা বল্‌তে পারি আমরা।

নসি। অবিশ্যি—অবিশ্যি। আর দেখ দাদা! আবাগের বেটা ঘোড়ার জ্বালায় আমার রাস্তায় বেরিয়ে ও সুখ নাই—আরে ও বেটা যদি খুব দৌড় কসা'তে পারে, তা

হলে ত আর ছোঁড়া বেটারা কিছু কর্‌তে পারে না গো? তুমি যদি একটু শাসন ক'রে না দাও, তা' হ'লে আমি এক একটা কে ধর্‌ব আর আছাড় দোব, তা বল্‌ছি কিন্তু।

প্রতা। আচ্ছা তা' আমি দোব। আপনি ঘোড়াটির উপর একটু স্নেহ মমতা রাখ্‌বেন্; আর ওর ও বৃদ্ধ বয়েস।

নসি। সে কথা আর আমায় ব'লে দিতে হ'বে না।

প্রতাপ চন্দ্র নসিরামের হস্তে পত্র খানি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাদার হাতে কি?"

নসিরাম পত্রের কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। প্রতাপ চন্দ্র জিজ্ঞাসা করাতে বলিল,—"ও হো-হো! বটে বটে, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে তোমাকে এই পত্র খানি দিতে বলেছেন। তিনি তোমার কাছেই আসতেন্,—পা হড়কে প'ড়ে গিয়ে গায়ে কাদা টাদা লেগেছে, তাই এলেন্ না; আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।"

প্রতা। কৈ তিনি কোথায়?

নসি। তিনি বল্লেন—আমার বাড়ী ও পারে—এতক্ষণে তিনি নৌকা চ'ড়ে পার হচ্চেন।

প্রতা। দেখতে কেমন?—কালো না কি?

নসি। ফর্‌সা হেন।

প্রতা। আপনার অপেক্ষা একটু ফর্‌সা বলে, তাই ফর্‌সা বল্‌ছেন না কি?

নসি। না গো—ফুট গৌর বর্ণ—আমরা ত ভাজ্‌না হাঁড়ির তলা।

প্রতা। যা হোগ্ দেখা হ'লে ভাল হ'ত।

প্রতাপচন্দ্র পত্র খানি লইয়া নসিরামকে বিদায় দিলেন। গাড়ী খানি পুনরায় দুল্‌কি চালে রণবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, চলিতে আরম্ভ করিল।

আজ কাল কলিকাতা সহরে দেখিতে পাওয়া যায়—অনেক বাবু ভায়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, গাড়ী চড়িয়া মর্ণিংওয়াক করিতে যান। আমরা বোধ করি নসিরামই তাঁহাদের পূর্ব্ব পথ-প্রদর্শক। তার মধ্যে একটি কথা এই যে, নসিরামের গাড়ী যে রূপ, তাহাতে চড়িলে শরীরে যথেষ্ঠ নাড়া চাড়া পাইত; কিন্তু আজ কাল ডাইকের বাড়ীর ভাল "ফিটন্," ভাল "ব্রূহাম্" চড়িয়া মর্ণিং-ওয়াক্ করিলে, স্থল পথে ষ্টিমারে চড়িবার কার্য্য হয়। গাড়ী চড়িয়া ভ্রমণ করিলে, শরীরের কি উপকার হইল? তবে তাঁহারা যদি জানিয়া লন যে, ঘোটক চলিলেই তাঁহাদের চলা হইল, তাহা হইলে, নাচার্। বালকেরা যে ছড়া কাটিয়া ছিল,—"ও নসিরাম দানা খাবি, পেট্‌টা ফুলে মরে যাবি", তাহাতে কেবল নসিরামের ঘোটকত্ব প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। ক্রমে দেখিতেছি, শয্যায় শয়ন করিয়া সকল কার্য্য করিতে পারিলেই, বঙ্গবাসিগণের সকল আশা পরিপূর্ণ হয়।

নসিরাম বিদায় হইল। প্রতাপচন্দ্র সন্দিগ্ধ মনে পত্র খানির উপরের আবরণ খুলিলেন। দেখিলেন পত্র খানি সহচরীর নামে। মনে ভাবিলেন, গিরিবালাই লিখিয়াছেন; আবার ভাবিলেন, ইহা স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর নহে—তবে কি চণ্ডীচরণ লিখিয়াছেন, যাহাই হউক, যাহার পত্র তাহাকে দেওয়া উচিত, এই ভাবিয়া একটি পরিচারিকার হস্তে দিয়া পত্র খানি সহচরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ

কবরী-বন্ধন।

হের লো সজনি! অই
পছিম আকাশে,
ভানু তুরিত চলি যায়ে;
গাহে বিহগ চারু,
মধুর সুতানে,
হাসে কুসুম মৃদু বায়ে।

মুহু মুহু চুম্বই
কমল কপোলে,
মাগিছে ভ্রমর বিদায়;
তাপ দহন দুখ,
দূর পরাহত,
পলব দুলাইল কায়।

হের হের সুন্দরি!
আর নাহি বেলি,
ভায় গগন অভিরাম;
মরি কি মধুর সহি,
নিদয় নিদাঘে,
আয়ল দিবস বিরাম।

আও সজনি! আজি,
কবরী তোহারি
বাঁধব মোহন সুঠামে;
আঁচরি চাঁচর কেশ,
বেণী বিনাইব,
কাহে—বিলম কোন কামে?

তুয়া লাগি চম্পক,
তুয়া লাগি বেলা;
তুয়া লাগি যুঁথি, গোলাপ,
তুয়া লাগি মল্লিকা,
তুয়া লাগি জাঁতি,—
তুয়া লাগি বকুল-কলাপ

বিকচ কুসুমচয়,
চয়িনু সরাগে,
লায়িনু ভরত নিচোল;
ঘিরিব কবরী চারু,
অলকে দুলাইব,
শোভিবে ললিত কপোল।

চন্দ্র-বদন তেরি,
সুন্দর সাজত,
বাঁধি চিকুর ফুলদামে;
মৃদু মধু হাসত,
আধ মুহু ঝাপই,
বইঠ বইঠ বঁধু বামে।

সকলি সরস সখি!
নাথ সমাগম,
নাথ অবলা-জন-প্রাণ;
নাথ-চরণ বিনু,
সকলি অসার,
বেশ ভূষণ ম্রিয়মাণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

বাল্য-বিবাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"সম্মতির" বয়স ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষ করিলে, কি উপকার হইবে বলিতে পারি না। একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর সহিত স্বামীর সহবাস কথনই প্রকাশ পাইবে না। সম্মতির বয়ঃক্রম বাড়াইয়া, হিন্দুর ধর্ম্মে কেবল অনধিকার হস্তক্ষেপ করা হইবে—কার্য্যতঃ কিছুই হইবে না। এক বাল্য বিবাহ আইনের দ্বারা উঠাইয়া দিতে পার ;—কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "সিপাহী বিদ্রোহের" পর, লর্ড ক্যানিং-পঠিত মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের অবমাননা করিতে কি রাজপুরুষেরা সাহস করিবেন? আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ১৮৫৮সালের শিক্ষা, এখনও তাঁহাদিগের হৃদয়ে জাগরুক আছে।

অপ্রাপ্তপুষ্পা স্ত্রীর উপর হরিমোহন পশ্বাচার করিয়াছিল। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, ঋতুর পূর্ব্বে স্ত্রীর সহিত সহবাস হিন্দুসমাজে কোন কোন স্থলে হয়। এরূপ সহবাস হিন্দু-ধর্ম্ম-বিগর্হিত ;—কিন্তু এই অকাল সহবাসের জন্য বাল্য-বিবাহকে দোষী করা যায় না। ইউরোপে যৌবন বিবাহ প্রচলিত—এই জন্য অনেক ইউরোপীয় মহিলা, কুমারী অবস্থাতেই গর্ভবতী হন ও নানা উপায়ে গর্ভ নষ্ট করেন। ইউরোপে যৌবন-বিবাহ বশতঃ, কত রমণীর সতীত্ব নষ্ট হয়, কত রমণী অন্যায় উপায়ে গর্ভ নষ্ট করেন ;—কই এ জন্য ত যৌবন-বিবাহ বন্ধ করিবার আন্দোলন উঠে না! সর্ব্ব প্রকার বিবাহেই ইষ্টের সহিত অনিষ্ট অংশ মিশ্রিত আছে। ইউরোপে যৌবন-বিবাহ-বশতঃ যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইয়া থাকে—ভারতে বাল্য-বিবাহ বশতঃ তাহার এক শতাংশে ও অনিষ্ট হয় না। যদি এমন কোন বিবাহ-প্রথা দেখাইতে পার—যে বিবাহ হইতে কোনরূপ অনিষ্টের আদৌ আশঙ্কা নাই—তাহা হইলে, আমরা বাল্য-বিবাহ ঘৃণার চক্ষে দেখিব—ও সেই বিবাহ-প্রথা আমাদিগের মধ্যে প্রচলন করিব।

গবর্ণমেণ্ট সম্মতির বয়ঃক্রম বাড়াইতে পারেন না ;—কারণ, স্ত্রী ঋতুমতী হইলে, তাঁহার সহিত স্বামীর সহবাস করা শাস্ত্র-সঙ্গত। গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিতে পারেন যে, যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত-পুষ্পা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে, সে আইনানুসারে দণ্ডনীয়। এরূপ নিয়ম করিলে, কোন হিন্দুই অসন্তুষ্ট হইবেন না। যদি সম্মতির বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বিধিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া স্ত্রী অপ্রাপ্তপুষ্পা হইলেও, স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিবে। এরূপ সহবাসে রাজ-বিধি-ভঙ্গ হইবে না বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রকার-প্রদত্ত বিধির অবমাননা হইবে। কিন্তু "ঋতুর পূর্ব্বে সহবাস দণ্ডনীয়",—এই নিয়ম বিধিবদ্ধ রাজ নিয়ম ও হিন্দুশাস্ত্রকার প্রদত্ত নিয়ম, উভয় নিয়মই রক্ষিত হইবে ও হিন্দু মাত্রেই এরূপ নিয়মে কোন রূপ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

অকাল সহবাসের একটি প্রধান কারণ,—হিন্দু সন্তানের হিন্দুমতে শিক্ষার অভাব। যদি অকাল সহবাস নিবারণ করিতে ইচ্ছুক হও—যদি হিন্দুর বাল্য-বিবাহকে পূর্ব্বকার পবিত্র ভাবে আনয়ন করিতে ইচ্ছা কর—তাহা হইলে, আপন আপন পুত্র কন্যার হৃদয়ে ধর্ম্ম-বীজ রোপন কর—হিন্দু মতে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে, আর কেহই বিবাহ-প্রথা লইয়া, তোমাদিগকে ব্যঙ্গ করিতে পারিবে না।

যাঁহারা বাল্য-বিবাহ উঠাইতে বলিতেছেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, বাল্য-বিবাহ নাই বলিয়াই, ইউরোপে পাপের এত আধিপত্য। যদি বাল্য-বিবাহ থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপে এত ভ্রূণহত্যা হইত না। যদি বাল্য বিবাহ থাকিত, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইত—'ডাইভোর্স' ইউরোপীয় সমাজ উচ্ছন্ন যাইতে বসিত না।

সংস্কারক দিগকে প্রধানতঃ চারি দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—পার্সি-সংস্কারক, ইংরাজ-সংস্কারক, ব্রাহ্ম-সংস্কারক ও বাবু সংস্কারক। এই চারি শ্রেণীর সহিত হিন্দু সমাজের কোন সংশ্রব নাই। বাবু-সংস্কারক দিগের দ্বারাই আমাদিগের বেশি ক্ষতি হইতেছে। ইহাঁরা না খ্রীষ্টান না ব্রাহ্ম। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু হিন্দু নন,—কারণ ইহাঁরা শাস্ত্র মানিয়া চলেন না। এই বাবু-সংস্কারক দিগকে হিন্দু-সমাজ হইতে দূরীকরণ করা, হিন্দু সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। 'মলবাহী' হিন্দু নন, জাতিতে পার্সি; কিন্তু হিন্দু-সমাজ-সংস্কারের জন্য, ইনি মহা আন্দোলন করিতেছেন। বলা বাহুল্য, গলা বাজিই সার,—"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হইবে। পার্সি মলবাহী আগে বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে ও বিধবা-বিবাহের স্বাপক্ষে আন্দোলন করিতেছিলেন—এখন কিন্তু, হিন্দুর "বিবাহ ভঙ্গের" নিমিত্ত ও আইন করিবার চেষ্টায় আছেন। বিবাহ বোধ হয় পার্সি মলবাহী খেলার জিনিষ বলিয়া মনে করেন—কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে, হিন্দুর চক্ষে বিবাহ অতি পবিত্র বস্তু—অচ্ছেদ্য। মলবাহী কেবল হিন্দু-সমাজ সংস্কারে ব্যস্ত। মুসলমান সমাজেও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে;—কিন্তু মলবাহী মুসলমান-সমাজের কথা তুলেন না—মুসলমানের ছোরাই বোধ হয় তাহার কারণ।

বারত্রয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি লাভে অকৃতকার্য্য হইয়া, এই উদ্ধত পার্সী যুবা হিন্দু দিগের সামাজিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। আপনার নাম জগদ্বিখ্যাত হইবে ও ইংরাজের প্রসাদ-লাভে সমর্থ হইব, এই আশাতেই পার্সী মলবাহী হিন্দু রমণীর দুঃখ দূর করিতে ব্যস্ত। আহা! হিন্দু রমণী নির্ব্বাচন-প্রথাবলম্বনে বিবাহ করিতে পারে না—হিন্দু বিধবারা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে না—বিবাহ ভঙ্গ করিয়া আবার পতিগ্রহণে সমর্থ নয়—হিন্দু রমণী দিগের অন্তঃপুর-রূপ কারাগারে থাকিতে হয়—এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে! বাল্য-বিবাহ বন্ধ কর—বিধবা-বিবাহ প্রচলন কর—বিবাহ-ভঙ্গে হিন্দু রমণীদিগকে স্বাধীনতা দাও—অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেল, এক দিনেই ভারত স্বর্গ হইয়া উঠিবে। মরি মরি! পার্শী মলবাহী হিন্দু-সমাজের কি হিতৈষী! মলবাহী যাই করুন না কেন—হিন্দু সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তির এক খানি ইষ্টক ও খুলিতে পারিবেন না। মলবাহী স্বধর্ম্ম-

বশতঃ পূতি-গন্ধময় ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণ করিতেছেন মাত্র।

ইংরাজ-সংস্কারক দিগকে আমাদিগের গললগ্নী কৃতবাসে নিবেদন যে, তোমাদিগের নিজের সমাজ সংস্কার কর, আমাদিগের সমাজ লইয়া মাথা ঘামাইও না। তোমাদের সমাজে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, আমাদিগের সমাজে তাহা ঘোর পাপ। তোমাদিগের সমাজের সমস্তই আমরা জানি—বাহ্য ঝক্‌মকানিতে ভুলি না। তোমাদিগের হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে কথা কহাই অনধিকার-চর্চ্চা।

দশম বর্ষীয়া স্ত্রীর উপর হরিমোহন পশ্বাচার করিয়াছে বলিয়া, বাল্য বিবাহ উঠাইতে বলিতেছ। বলি, তোমাদের নিজের সমাজের কথা একবারও ভাব কি? তোমাদিগের দেশের অভিজাত সন্তানেরা দশম একাদশ বর্ষীয়া বালিকা দিগকে ভুলাইয়া আনিত ও তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিত। বল দেখি, তোমাদিগের শিক্ষিত অভিজাত সন্তানেরা বেশি দোষী, না হরিচরণ বেশি দোষী? তোমাদের অভিজাত সন্তানেরা শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেন—সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেন। তাঁহাদের দোষ গুরুতর, না মূর্খ অগণ্য অহিন্দু হরিচরণের দোষ বেশি গুরুতর? ইংরাজ-সংস্কারকগণ! আমাদিগের এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কি?

একাদশ বর্ষীয়া স্ত্রীর উপর পশ্বাচার শুনিয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, ঘৃণাকর ভ্রুকুটী করিতেছ; হিন্দু-সমাজে এরূপ দুর্ঘটনা, বোধ হয় এই নূতন। তোমাদিগের নিজের সমাজের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি। ১৩৬টী বলাৎকার ডাক্তার ক্যাসপারকে একবার পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষার ফল—

২॥ বৎসরের শিশু হইতে ১২ বৎসরের বালিকা		৯৯টী
১২ বৎসর হইতে	১৪ বৎসরের যুবতী	২০
১৫ " "	১৮ বৎসরের " "	৭
১৯ " "	২৫ বৎসরের " "	৮
	৪৮ বৎসর বয়স্কা রমণী	১
	৬৮ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা	১

পাঠকগণ! একবার দেখুন! যে সমাজে বাল্যবিবাহ নাই ও যৌবন-বিবাহের ছড়াছড়ি, একবার সেই সমাজের দিকে নেত্রপাত করুন। হরিমোহন একাদশ বর্ষীয়া বালিকা স্ত্রীর উপর "অত্যাচার" করিয়াছে; কিন্তু যে ইউরোপীয় সমাজের অনুকরণে সমাজ সংস্কারকেরা চলিতেছেন ও আমাদিগকে চলিতে বলিতেছেন—সেই সমাজে বলাৎকার পাপের কি ভয়ঙ্কর বিস্তার দেখুন। ১৩৬টী বলাৎকারের মধ্যে ৯৯টী বলাৎকার, ২॥ বৎসরের শিশু হইতে ১২ বৎসরের বালিকার উপর! কি ভয়ানক! যে সমাজে পাপের এত আধিপত্য, যে সমাজে ২।৩ বর্ষের শিশু হইতে ১২ বৎসরের বালিকার উপর বলাৎকার হয়, যে সমাজ সভ্যতার নামে পাপের প্রশ্রয় দেয়, সে সমাজ যে কেন এখনও উচ্ছন্ন যায় নাই—ঈশ্বরের কোপানলে ভস্মীভূত হয় নাই, বলিতে পারি না।

ব্রাহ্ম-সংস্কারকদিগের নিকট আমাদিগের বক্তব্য এই—বাপু! তোমরা হিন্দু সমাজের কে? যে তোমরা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি লইয়া আলোচনা করিতেছ? তোমাদিগের হিন্দু সমাজের সহিত কোন সংস্রব নাই। যদি কোন সংস্রব থাকে, তাহা এই যে, তোমাদিগের পিতা পিতামহ হিন্দু ছিলেন—হিন্দু ধর্ম্ম সঙ্গত হিন্দুশাস্ত্র

মতে কার্য্য করিতেন,—তোমরা মিল স্পেন্সারের দু'পাতা উল্টাইয়া, পৈতৃক ধর্ম্ম, পৈতৃক আচার ব্যবহার রীতিনীতি,কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ ও এক অদ্ভুত ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া, সেই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—দু'পাতা ইংরাজি পড়িয়া, ইংরাজ সমাজের অনুকরণ করিতেছ। ভাল, বাল্যবিবাহে হিন্দু সমাজের যদি ক্ষতি হয়, হিন্দু সমাজ বুঝিবে—তোমাদের কি ? জানিতাম তোমাদিগের প্রেম "ভ্রাতা ভগ্নী" দিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল—সে প্রেমের ফোয়ারা যে হিন্দু সমাজের দিকে ছুটাইবে—প্রেম বশতঃ, যে হিন্দু রমণীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা স্বপ্নে ও ভাবি নাই। হিন্দু রমণীরা তোমাদিগের সহানুভূতির—তোমাদিগের প্রেমের প্রত্যাশিনী নহেন। রক্ষা কর, প্রেমের ফোয়ারা বন্ধ কর। ঘরের ভাত হজম করিবার, ও সংবাদপত্রে লিখিবার সাধ, পূরণ করিবার উপযুক্ত আলোচ্য বিষয় কি আর নাই ? বাল্য-বিবাহ হেতু যদি অনিষ্ট হয়—হিন্দু সমাজের হইতেছে, তোমাদের ত হইতেছে না। তোমরা তোমাদিগের রমণী দিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতেছ—তোমরা তোমাদিগের রমণীদিগেকে যৌবনের পূর্ণাবস্থায়, বিবাহ দিতেছ! সামাজিক সদ্ভাব রক্ষার নিমিত্ত স্ত্রী পুরুষে অবাধে মিশিতেছ। দাড়ি রাখিতেছ—সখের জন্য চসমা ধরিয়াছ, খ্রীষ্ট-হীন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পাইয়াছ,—এক কথায় তোমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অপভ্রংশ গুলির অবিকল অনুকরণ করিয়াছ। তোমাদের ভাবনা কি! রক্ষা কর, হিন্দু সমাজের সামাজিক প্রথা লইয়া মস্তিষ্ক চঞ্চল করিও না।

সমাজ সংস্কারকগণ!, আর আমাদিগকে জ্বালাইও না। তোমরা তোমাদের মধ্যে যুবতী-বিবাহ, প্রৌঢ়া-বিবাহ, বৃদ্ধা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, অন্তিম বিবাহ, যাই কেন প্রচলন কর না—অন্যকে তোমাদিগের অনুকরণ করিতে বলিও না। তোমরা যে সমাজের অনুকরণ করিতেছ, সে সমাজের সমস্তই আমরা জানি। তোমাদিগের আদর্শ সমাজ, বাহিরে চাক-চিক্যশালী—ভিতরে নরক। তোমরা নিজে "লাঙ্গুল-হীন শৃগালে"র দল। নিজেদের অবস্থান্তর দেখিয়া, দল পুরাইবার জন্য অন্যকে ফুসলাইতেছ। তোমাদিগের গলায় দড়ি !!

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

প্রহেলিকা।

(১)

তিনাক্ষরে নাম তার, অবস্থিতি ঘরে;
নরের যাহাতে প্রাণ, তাই দান করে।
প্রথম অক্ষর তার, ছেড়ে দেহ যদি,
"মৃত্তিকায় জলাশয়,"—কিন্তু নহে নদী।
মধ্যম অক্ষর তার, যদি ছাড়া হয়,
প্রথম অক্ষর-হীনে, যা'হয় তা'রয়।
অন্তের অক্ষর তার করিলে বর্জ্জন,
"অবগতি" অর্থ হয়, জ্ঞাত সর্ব্বজন।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রভাত।

নিশি শেষে পূব্ আকাশে ভাস্‌ছে লোহিত ছবি।
আঁধার দূরি আলো করি উঠ্‌লো নবীন রবি ॥
হরিৎ মাঠে ঘাসের পিঠে শিশির-কণা সাজে।
সবুজ্ বরণ সাটিন্ যেমন শোভে হীরার কাযে ॥
গিরি তরু হর্ম্ম্যচারু নবীন রবির করে।
সাজ্‌লো কেমন বিনোদবরণ সোণার বসন প'রে ॥
বইছে কেমন শীতল পবন ফুট্‌ছে কত ফুল।
গন্ধ পেয়ে আস্‌ছে ধেয়ে যত অলিকুল ॥
গুন্ গুনায়ে কুসুম ছেঁয়ে ভ্রমর মাগে মধু।
মাথা নাড়ি তায় নিবারি বল্‌ছে কুসুম-বধূ।
"মধু খেতে কোন মতে দিব না আর তোরে।"
এত বলি পড়্‌ছে ঢলি এ ওর গায়ের' পরে ॥
কমল সতী ছিল অতি সারা নিশি দুঃখী।
চন্দ্র হেরে লজ্জা-ভরে হ'য়ে মলিনমুখী ॥
প্রভাত কালে গগন-তলে হেরি প্রাণেশ্বরে।
মনের সুখে হাস্য-মুখে ফুট্‌লো সরোবরে ॥
ঘুমের কোলে ছিল ভুলে শোকী, তাপী, দুখী।
প্রাণের জ্বালা মনের মলা ঘুচিয়ে, ক্ষণেক সুখী।
প্রভাত হ'ল ঘুম ভাঙিল আবার নয়ন ঝরে।
শোকের আগুন জ্বল্‌লো দ্বিগুণ নিভায় কেবা তারে ॥
প্রভাত দেখি যত পাখী গাইছে মধুর গান।
জাগ্‌লো এবে মানব সবে পেয়ে নবীন প্রাণ ॥
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি চল্‌লো সবাই সেজে।
হ'ল মগন সবাই এখন আপন আপন কাযে ॥
ল'য়ে ধেনু বাজিয়ে বেণু রাখাল মাঠে চলে।
স্তব্ধ ধরা হ'ল ভরা ক্রমে কোলাহলে ॥
যাঁহার বশে গগন-দেশে নিত্য রবি উঠে।
তাঁহার চরণ কর স্মরণ সদাই হৃদয়-পটে ॥

শ্রীকালিদাস মিত্র।

সতীত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এদেশে সতীত্বের পরিচয়, পুরাবৃত্ত ইতিহাসের অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের মতে—স্ত্রীলোকদিগের অন্য পুরুষ গমন দূরে থাকুক, অন্য পুরুষের উপর কামদৃষ্টিতে দর্শনেই তাহার সতীত্বের উপর আঘাত পড়ে। গাম্ভীর্য্য সাধ্বীর একটি প্রধান লক্ষণ।

বর্ত্তমান কালে সুসভ্য ইউরোপ ও সভ্যতম আমেরিকা-খণ্ডে সতীত্বের আদর ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। স্ত্রীলোকের সতীত্ব যে বিশেষ আবশ্যক, সে ধারণা ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী যাবজ্জীবন পরস্পরকে, লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, ইহা তাঁহাদের মতে একান্ত অস্বাভাবিক। পাশ্চাত্য সভ্যতার এইরূপ মতের পোষকতা করিবার কারণ ও আছে। কারণ ইউরোপীয় জাতি কেবল মাত্র ঐহিক সুখের নিমিত্ত উন্মত্ত। সুতরাং, উহাদিগের বিবাহ পদ্ধতির সহিত কিছু মাত্র ধর্ম্মের সংস্রব নাই; বোধ করি কেবলমাত্র পাশব-বৃত্তি চরিতার্থই উহাদিগের বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু, আমাদের দেশীয়েরা ইউরোপীয় দিগের বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মকে মুল-মন্ত্র করিয়াছে। কারণ দেখ—হিন্দুদিগের সর্ব্বদাই ধর্ম্মচিন্তা; ইহাঁদের অতি সামান্য কার্য্যে বা কথাতে ধর্ম্মের সংস্রব দেখা যায়; এই ধর্ম্মভাব মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকাতেই, অতি-অল্প বয়স্কা বালিকাকেও পতির প্রতি কিরূপ মান্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে হয়, তাহা বড় শিখাইতে হয় না। পতিভক্তি ও সতীধর্ম্ম, হিন্দু স্ত্রীর মনে স্বতঃই উপস্থিত হয়। ইহাই আমাদের বালিকা-বিবাহের শুভ ফল। যৌবন আবির্ভাবের পূর্ব্বে, আমাদিগের বালিকাগণের বিবাহ হওয়াতে, ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার অতি কম। আমাদের বালিকা-বিবাহ যে, পাশ্চাত্য যুবতী-বিবাহ অপেক্ষা শত গুণে শ্রেয়ঃ, তাহা বোধ হয় সহজ মস্তিকে কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পাশ্চাত্য দিগের যুবতী-বিবাহ-প্রথার উপর আমাদের দোষারোপের কারণ নাই। কারণ, যাহাদের যেমন দেশ, যেমন মনের গতি, তাহারা সেই রূপ করিবে। আমাদিগের সহিত পাশ্চাত্যদিগের কোন বিষয়ে ঐক্য হয়ও না, হইবার কথাও নয়। উহারা স্বেচ্ছাপরবশ, উহাদের স্ত্রীও স্বাধীন পুরুষও স্বাধীন; আর আমরা ধর্ম্মাধীন। আমাদের শাস্ত্র-কার দিগের মত এই যে, স্ত্রীলোকেরা কখনই স্বাধীন হইতে পারে না, স্ত্রী, পুরুষের আশ্রিত এবং সকল সময়েই সকল অবস্থাতেই পুরুষের অধীন। এ সম্বন্ধে মহামতি মনু বলিয়াছেন;—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তারক্ষতি যৌবনে।
পুত্রোরক্ষতি বার্দ্ধক্যে নভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

অর্থাৎ, স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার রক্ষণাধীনে, যৌবনে স্বামীর রক্ষণাধীনে এবং

বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের রক্ষণাধীনে থাকেন; স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীন নহে।

আমরা হিন্দু হইয়া কখনই পাশ্চাত্য সভ্যতা অবলম্বন করিয়া আমাদের স্ত্রীলোকের ইউরোপীয় স্বাধীনতা ইচ্ছা করি না। ওরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা শুনিলে, আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু, কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমাদের মধ্যে অনেকে আবার পূর্ব্বতন অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ধাবমান হইতেছে। ম্লেচ্ছ ইংরাজ আমাদের পদে পদে শিক্ষা দিতেছে। আমাদের জাতীয় ভাষার গৌরব নাই; বিজাতীয় ভাষাই আমাদের রাজ-ভাষা। শিক্ষার অভাবেই ক্রমে ক্রমে আমরা জাতীয় মান, মর্য্যাদা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, ভুলিয়া যাইতেছি। বর্ত্তমান শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দুজাতি কলুষিত হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আধুনিক নব্যগণ, তাঁহাদের পিতৃপুরুষ গণের অনুমোদিত ব্যবস্থায় বিবাহ করিতে চাহেন না; কারণ তাঁহাদের পিতৃ পুরুষগণ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কর্ম্ম করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের সভ্য নব্য বংশধরগণ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়ই চান, অতএব কিরূপে অপরানুমোদিত বিবাহে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন?

এই রূপে দেখা যাইতেছে যে, অল্পে অল্পে বিদেশীয় রীতি নীতি আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার বিষময় ফলও ফলিতেছে। এখন মেডিকেল কলেজে পাশ করা ডিপ্লোমা প্রাপ্তা সাইনবোর্ডওয়ালী ধাত্রী ভিন্ন অনেক হিন্দু স্ত্রীর প্রসব সম্পাদন হয় না। আবার, অনেকে হিন্দু থাকিয়া ব্রাহ্ম হইতেছেন —অর্থাৎ, একান্ত মনে ব্রহ্মোপসনায় তৎপর হইতেছেন, ইহা অতি প্রশংসার কথা। কিন্তু তাঁহাদের বিবাহ প্রথাটি আশ্চর্য্য—তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া যখন গৃহিনী হন, তখন বিবাহ করেন; সুতরাং বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা পাশ্চাত্য বিবাহ-পদ্ধতির অনুকরণ করিতেছেন এবং আশা করি, ইউরোপীয়গণের ন্যায় "কোর্টসিপ্" প্রথাটি তাঁহাদের মধ্যে শীঘ্রই প্রচলিত হইবে। ইহাই কেবল কাল মাহাত্ম্য। এখনকার স্ত্রীলোকেরা আর পরপুরুষের সম্মুখে বিশেষ লজ্জা বোধ করেন না। কিন্তু এইরূপ সমুদয় ব্যভিচারের মধ্যেও আমরা অহঙ্কারের সহিত বলিতে পারি যে, এখন ও আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোক গণের ন্যায় সতী আর কোন দেশে দেখা যায় না এবং ইউরোপীয় মহাত্মাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



সঙ্গ-দোষ।

অজা ও বানর।

পশুকুলে শিখা'লে যে নকল করয়ে,—
সবকার জানা দেশে আছে এবিষয়ে।
নরোত্তম নামে কোন নিষাদ-নন্দন,
বানর, অজারে আর, শিখায় এমন।
অজা আর কপিরে সুন্দর নাচাইয়া,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায় নলিয়া।
এই উপজীবিকায়, পালে সে সংসার,
সন্তুষ্ট দর্শকবৃন্দ,—বেশ রোজকার।
কেহ ঘটী, কেহ বাটি, থালা কোন জন
দেয়, কেহ পয়সা, বসন পুরাতন।
চাল, দাল দেয় কেহ পটল, বেগুন,
কেহ আলু, কেহ মূলা, কেহ তেল, নূণ।
প্রয়োজন-দ্রব্য যদি হলো আহরণ,
মহাসুখে নিষাদের জীবন যাপন।
একদা কিরাত-সুত, বেলা দ্বিপ্রহরে,
দধি, চিঁড়া, মুড়্কি, সন্দেশ, ক্রয় করে।
(মুণ্ড বিনা দেহ যথা শোভমান নয়,
রম্ভাহীন-ফলার তেমনি ভাই, হয়।)
সুখেতে ভোজন হ'বে কিরাত ভাবিয়া,
মর্ত্তমান রম্ভা কিছু নিলেক কিনিয়া।
পথ-শ্রমে ক্লান্ত সে হইয়া অতিশয়,
ঘনপত্রবৃক্ষ-তলে, লইল আশ্রয়।
তরুর অনতি দূরে ছিল সরোবর,
জল লাগি, ভাঁড় ল'য়ে, গেল সে সত্বর।
খাদ্য গুলি রাখে ফেলি কিরাত-তনয়,
নিকটেই, অজা কপি, দুই জনে রয়।
লালন পালনে হেন সুবিশ্বাস মনে,—
বিশ্বাস-ঘাতক নাহি হইবে দু'জনে।
খাদ্য দেখি কিন্তু, লোভে পড়িল বানর,
বিশেষ রম্ভার প্রতি তাহার নজর।
ব্যাধজন, যেমন নামিল সরোবরে,
অমনি আসিল কপি ভোজনের তরে।
চিঁড়া আর মুড়্কিতে দধি মাখাইয়া,
ঘন ঘন খায় কপি শঙ্কিত থাকিয়া।
খোসা ছাড়াইয়া, রম্ভা পূরিল বদনে—
সন্দেশ টাক্না দেয় পুলকিত মনে।
ক্ষুধার নিবৃত্তি মত খাইয়া সে কপি,
স্বস্থানেতে যাইয়া বসিল পুনরপি।
যাইবার কালে, কিছু দধি হাতে নিয়া,
অজার আননে সুখে দিল লাগাইয়া।
হাত মুখ পুঁছি পরে, বৃক্ষ-পত্র ল'য়ে,
খেলা করে খল কপি প্রফুল্ল হৃদয়ে।
হেনকালে (জল-পূর্ণ সে ভাঁড় লইয়া)
ছুটে ছুটে আসিতেছে, ক্ষুধার্ত্ত নলিয়া।
কপি হানা দেছে তার সাধের ভোজনে,
ক্ষুধাতৃষ্ণাকুল ব্যাধ নাহি জানে মনে।
ক্রমে আসি সেই কাণ্ড, হেরিল নিষাদ,
মনেতে জন্মিল তার দারুণ বিষাদ।
অজা মুখে দধি, ব্যাধ দেখিতে পাইল,
অজা সে কাযের কাজী—সহজে বুঝিল।
রুষ্টমনে যষ্টি ল'য়ে নিষাদ তখন
অজারে প্রদান করে, শাস্তি বিলক্ষণ।
বানর যথার্থ দোষী গেল এড়াইয়া!
অসৎ সঙ্গের দোষ দেখহ বুঝিয়া।
সাধুসঙ্গে থাকি হয় নিরয়ে বসতি,
তথাপি তাহাতে সবে দিবে হে সম্মতি।
অসতের সহবাসে নানা বিঘ্ন ঘটে,
ভুলে ও না যা'বে কেহ অসৎ নিকটে।
কপির ব্যাভার সবে পাইলে দেখিতে—
জ্ঞানিগণে বেশী কথা হ'বে না বলিতে।

৺কৈলাশচন্দ্র রায়।



বৃক্ষ-পত্র।

—•—

সুকোমল পাতাগুলি তরুর ভূষণ;
মন্দ সমীরণ-ভরে,
সর্ সর্ শব্দ ক'রে
দোলে যবে, আহা মরি সুন্দর কেমন!
হেরিলে প্রফুল্ল হয় মানবের মন।
দিনেক দু'দিন পরে হের গে যাইয়া,
সেই সব পাতাগুলি,
শুকাইয়া বোঁটা খুলি,
তলায় পড়িয়া আছে ধরণী ছাইয়া;
সুকোমল অঙ্গে ধূলি র'য়েছে লাগিয়া।
নাহি সে কোমলকান্তি হরিত বরণ,
নাহি সে লাবণ্য ছটা,—
নাহি সে রূপের ঘটা!
জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে শেষে হ'য়েছে পতন,
চরণে সকলে তারে করিছে দলন!
পরিণামে—এই রূপ মানবের গতি!
যৌবন দু'দিন তরে;
কালরূপ-রবি-করে
অবশেষে হয় তার, এমনি দুর্গতি—
বুঝিয়া বুঝেনা নর এত ভ্রান্তমতি।
মাটীর শরীর পুনঃ মাটী হ'য়ে যায়,
অতএব বলি শুন—
ত্যজ ভাই! তমোগুণ;
যে দিলা যৌবন-ধন, ভজ তুমি তাঁয়,
তিনি বি'না আমাদের নাহিক উপায়।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

সঙ্গীত।

সিন্ধু—মধ্যমান।

সংসার-মায়ায় মনঃ কেন মোর মজিল?
বিষয়-বাসনা-বনে,—পথ হারা হইল।
কেবা কার পিতা মাতা?
কেবা জায়া, সুত, ভ্রাতা—
সকলি মায়ার খেলা, কিছু নাহি বুঝিল?
মোক্ষলাভ হ'বে যাতে,
মন ত যায় না তাতে;
পোড়া বিধি মোর সনে, কেন বাধ সাধিল?
ভক্ত-বাঞ্ছা-পূর্ণকারি,
ওহে দীনবন্ধু হরি!
'তব পদে দেহ মতি,'—দাস ভিক্ষা মাগিল।
এই করো দয়াময়!
আর জন্ম নাহি হয়;
ভবের কুহক-জালে, বড় ভয় রহিল।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচন।

১। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ।—

"শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আদেশে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ ও শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ন্যায়রত্নের সহকারিতায় সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত।"

৩নং বীডন স্কোয়ার,"নূতন কলিকাতা যন্ত্রে" শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৯৭ সাল ১লা আশ্বিন, লিখিত মূল্য ১০৲ বিক্রয় ২৲ টাকা।

মূলের সহিত বিশেষ ঐক্য এবং ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এই রামায়ণ খানি অনুবাদিত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নহে; বিক্রয়ের মূল্যও অতিশয় অল্প হইয়াছে।

সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আদি রামায়ণ পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা তাঁহাদিগকে উপেন্দ্র বাবুর রামায়ণ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

১ম খণ্ড।] অগ্রহায়ণ। [৮ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

নবান্ন।

বঙ্গের বিপুল অঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে,
কেন আজি ভাসে সবে হরিষ অন্তরে?
সুখী, দুখী, যুবা, জরা, ধনী, কি নির্ধন,—
স্বাধীন, অধীন আর সুজন, কুজন;
স্নেহময়ী জননী সন্তান-শোকাতুরা,
অথবা রমণী পতি-বিয়োগ-বিধুরা,
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, সমভাবে সবে,
আনন্দেতে মাতিয়াছে এ কোন্ উৎসবে?
প্রফুল্ল বদন কিবা, বিকাশে বিমল বিভা,
ভুলিয়াছে শোক তাপ ক্ষণেকের তরে,
পড়ে গেছে ধুম ধাম নগরে নগরে।

আইল হেমন্ত কাল—পাকিয়াছে ধান,
বহিল চাষার মনে আনন্দের বান;
ফসলের অগ্রভাগ দেবসেবা তরে,
আনিল গৃহস্থ কিনি, আপনার ঘরে;
গব্য-রসে মিলাইয়ে আতপ তণ্ডুল,
তাহাতে নূতন গুড় সৌরভ অতুল।
অপক্ক পায়স যথা,—মিষ্ট আস্বাদন,
ভক্তিভাবে ইষ্টদেবে করে নিবেদন;
ফল মূল আদি যত, মিলাইল কতমত,
হেমন্তের নানাবিধ সামগ্রী-সম্ভার,
নব নব আস্বাদন—নূতন ব্যাপার।

ইক্ষুদণ্ড খণ্ড খণ্ড, শশা আর কলা,
তাহাতে মিলায় কিবা নারাঙ্গী কমলা;
সুস্বাদ শাঁখালু, মুলা, নারিকেল কুচি,
নূতন কলাই-সুঁটি—অরুচির রুচি।
সবার উপর তাহে মিলায় আবার,
নূতন গুড়ের মণ্ডা—সুধার সুতার।
সকলি লাগিল—আজি দেবের সেবায়,
সকলে প্রসাদ পেয়ে মোক্ষপদ পায়।
প্রসাদের অগ্রভাগে, কাক বকে দেয় আগে,
হিন্দুর সুন্দর প্রথা;—অতিথি সেবন
অগ্রে করি, করে পরে আপনি ভোজন।

হিন্দুর উৎসব যত মধুরতাময়,
অপার ভকতি, স্তুতি—পবিত্র আলয়,
পরাসর, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস মহামতি,
মনেতে অশেষবিধ ভাবিয়ে যুকতি,
ক'রেছেন নানাবিধ পর্ব্বের নির্ণয়,
তাই দেখ বঙ্গভূমি সদা সুখময়,
'তুলসীর ঝারা' হ'তে—'চড়ক-সন্ন্যাস,'
নানা পর্ব্ব সমারোহে যায় বার মাস।
নিত্য নব নব কত, মহোৎসব বার, ব্রত,—
দেখিয়ে বিদেশিগণে লাগে চমৎকার,
ভাবে মনে হেন দেশ না দেখিব আর।

আজিকে নবান্ন-দিনে, বঙ্গ নারীগণ
রান্ধিছে, নূতন অন্ন, নূতন ব্যঞ্জন।
নূতন চালের ভাত লাগে আঠা আঠা,
আঙ্গুলে লাগিলে উষ্ণ জিবে যায় চাটা,
বর্ণ হেরি মল্লিকার মনে হয় ক্ষোভ,
সঘৃত পলান্ন ছাড়ি খেতে হয় লোভ,
কি ছার বিদেশী খানা গন্ধে ভূত ভাগে;
স্বদেশী সুরভি অন্ন শুধু বেশ লাগে।
নব রীতি নবাচারে, যায় বঙ্গ ছার খারে,
দেখেও দেখনা কেন মেলিয়ে নয়ন!
বল দেখি, নবান্নের রন্ধন কেমন?

নূতন পালম শাকে মটরের বড়ি,
রসাল ক'রেছে তায় মিশাল চিঙ্গড়ি,
সুগন্ধি মশালা-মিশ্র অরহর দাল,
নানাবিধ ভাজা ভুজি—খাইতে রসাল;
নূতন গোলালু সহ ভেকুটের ঝোল—
সুরস রসনে তার রসনা বিভোল।
সুমিষ্ট শর্করা মিশ্র সুস্বাদ অম্বল,—
খাইতে না হয় দেখে মুখে আসে জল।
পায়স, কামিনী চেলে, দেবরাজ খাম পেলে
ছাড়িয়ে সুধার ভাণ্ড, এমনি সুতার,
এলা, তেজপত্র, মেওয়া সুগন্ধ বিস্তার।

ওই শুন, উড়িয়ার শব্দ কাঁই মাই,
বৃথা আজি ট্রাম্‌-গাড়ী ভরসা রে ভাই!
হাসিমুখে নানা বেশ ভূষণ পরিয়া,
বাপ-ঘরে কন্যা যায় পাল্‌কী চড়িয়া।
নানা রস-ভুঞ্জি তথা নানা সুখময়,
আবার বিকালে যায় শ্বশুর আলয়।
এ সব উৎসবে ভাই! কি হেতু বিমুখ?
নিতান্ত নীরস নববিধানে কি সুখ?
এখনি হতাশ হয়ে, কেন ভাই! যাও বয়ে?
ধান্য-ধন পরিপূর্ণ বঙ্গ নিকেতন,
কি হেতু থাকিব সবে বিরস বদন?

কি হেতু অখাদ্য খাও কোন অনুরাগে?
স্বদেশী সুখাদ্য কাছে কোন্‌ খাদ্য লাগে?
'আপ্‌রুচি খানা, পর রুচি পরিধান,'—
ভাল শিখিয়াছ ভাই, বঙ্গের সন্তান!
তোমরা এ রাজভোগ ঠেলিয়াছ পায়,
বিদেশী এ দেশে এসে খেয়ে বেঁচে যায়।
ত্যজিয়ে সুস্বাদ অন্ন সুমিষ্ট ব্যঞ্জন,
এত কি লেগেছে ভাল গোহাড় চর্ব্বন?
বিজাতি কলঙ্ক-রেখা, চারু অঙ্গে যায় দেখা,
জননী-পীযূষ কি রে অযত্নের ধন?
স্বপথে স্বধর্ম্মে চল থাকিতে জীবন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

সত্য ও মনুষ্য-জীবন।

বালক খেলিয়া বেড়ায়। তাহারা খেলা-কেই সত্য বলিয়া জানে। যুবক সংসারের আমোদ প্রমোদেই সময় কাটায়। তাহারা জানে, আমোদ প্রমোদই জীবনের সার। বৃদ্ধ খেলায় উন্মত্ত হয় না, আমোদ প্রমোদে কাল-ক্ষেপ করে না। এ সকল তাহার নিকট অলীক। যাহাতে তাহার বংশ রক্ষা হয়, বংশ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধ সেই চিন্তাতেই মগ্ন। কিরূপে অর্থ সঞ্চয় করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবে, কিরূপে অর্থ রক্ষা করিবে, কিরূপে তাহার এবং বংশের সন্মান হইবে, এই ভাবনায় বৃদ্ধ ব্যাকুল। যে কালে, যে অবস্থায় যাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, লোকে তাহাতেই উন্মত্ত হয়। কিন্তু এ সকল সত্য, আপেক্ষিক সত্য। বাল-কের খেলা যুবককে আমোদিত করিতে পারে না এবং যৌবনের খেলা বৃদ্ধের আনন্দদায়ক হয় না। এবং জগতে এরূপ মনুষ্য আছে, যাহারা বৃদ্ধের চিন্তাকেও অলীক জ্ঞান করে। সংসারের মধ্যে যাহা সার ও স্থায়ী পদার্থ, বৃদ্ধের তাহাই সার। কিন্তু যাঁহাদের জ্ঞান, সংসারের সীমা অতিক্রম করে, যাঁহারা জগৎ সংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া জানেন এবং এই আপেক্ষিক সত্যের অন্তর্লীন নিরপেক্ষ সত্যকে জ্ঞানচক্ষুর বিষয়ীভূত করেন, তাঁহারা সংসারিক চিন্তা মাত্রকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গম্ভীর স্বরে বলেন, "সত্যং পরং ধীমহি।" কিন্তু বালক ইচ্ছা করিলে, যৌবনের সুখ অনুভব করিতে পারে না এবং তরুণবয়স্ক ইচ্ছা করিলে, প্রৌঢ়ের সুখ অনুভব করে না। ইন্দ্রিয়-শক্তি ও মানোবৃত্তির তারতম্যে সত্যের অনুভব হয়। মনুষ্য, যখন এক সত্য হইতে অন্য সত্যে আরূঢ় হয়, তখন পূর্ব্ব সত্য তাহার নিকট

অসত্য বলিয়া বোধ হয়। যদিও অভ্যাসের দোষে এবং বৃত্তির মন্দতা নিবন্ধন সে পূর্ব্ব সত্যকে ত্যাগ করিতে না পারে, তথাপি, তাহার নিকট পূর্ব্ব সত্য হেয় ও অপ্রীতিকর হয়। যত দিন নিরপেক্ষ সত্যের দৃঢ় অনুভব না হয়, ততদিন একমাত্র আপেক্ষিক সত্যই মনুষ্য-জীবন অধিকার করিয়া থাকে। কিন্তু যে মনুষ্য নিরপেক্ষ সত্যের আনন্দ অনুভব করিয়াছে, তাহার নিকট জগৎ-সংসার তুচ্ছ। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখেন যে, জগতের লোক ভ্রমে পতিত রহিয়াছে এবং অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তিনি তখন মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ধিক্কার পূর্ব্বক বলেন,—

"বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিন লগ্নঃ ॥"

কেবল জানিলে হইবে না যে, এই জগৎ নশ্বর এবং ঈশ্বর নিত্য, কিম্বা জগৎ নিত্য এবং ঈশ্বর নিত্য। বলিলে হইবে না,—"আহা ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব লীলা! কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তিনিই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু, কিরূপে কি হইতেছে, কিরূপে কি হইয়াছে, কিছুই জানিনা।" শাস্ত্রকার বলেন, এরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিলে চলিবে না। তত্ত্ব জানিতে হইবে। তত্ত্ব না জানিলে বুদ্ধির স্থিরতা নাই। দেখ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ ॥"

আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের হস্তে ঈশ্বরবাদীর কি দুর্গতি হইতেছে, দেখ। ঈশ্বরের তত্ত্ব না জানিয়া কেবল ঈশ্বর নিত্য পদার্থ বলিলে হইবে না। ঈশ্বরের তত্ত্ব জানি না, তবে ঈশ্বর দূরে থাকুন। যাহার তত্ত্ব জানি, তাহাই অবলম্বন করিব। আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব। আজ প্রকৃতিই রাজা। কিন্তু তাহা বলিলে, চলে কই? যখন জানিলাম প্রকৃতির সত্যতা আপেক্ষিক সত্যতা, তখন সেই আপেক্ষিক সত্য অবলম্বন করাই কি মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য? পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনেক লিখিলেন, অনেক বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মনের শান্তি হইল না। অনিত্য বস্তুতে শান্তি কোথায়? মনের তীব্র উদ্বেগে ইংলণ্ডীয় দার্শনিক কেশরী লিখিলেন—

"Hereafter as heretofore higher faculty and deeper insight will raise rather than lower this sentiment. At present the most powerful and most instructed mind has neither the knowledge nor the capacity required for symbolising in thought the totality of things. Occupied with one or other division of Nature, the man of science usually does not know enough of the other divisions even rudely to conceive the extent and complexity of their phenomena; and supposing him to have adequate knowledge of each, yet he is unable to think of them as a whole. Wider and stronger intellect may hereafter

help him to form a vague consciousness of them in their totality.

We may say that just as an undeveloped musical faculty, able only to appreciate a simple melody, can not grasp the variously-entangled passages and harmony of a symphony, which in the minds of composer and conductor are unified into involved musical effects awakening far greater feeling than is possible to the musically uncultured ; so by future, more evolved intelligences, the course of things, now apprehensible only in parts may be apprehensible all together, with an accompanying feeling as much beyond that of the present cultured man, as his feeling is beyond that of the savage.

And this feeling is not likely to be decreased but to be increased by that analysis of knowledge which, while forcing him to agnosticism, yet continuually prompts him to imagine some solution of the Great Enigma which he knows can not be solved. Especially must this be so when he remembers that the very notions, beginning and end, cause and purpose, are relative notions belonging to human thought which are probably irrelevant to the Ultimate Reality transcending human thought ; and when, though suspecting that explanation is a word without meaning when applied to this Ultimate Reality, he yet feels compelled to think there must be an explanation.

But amid the mysteries which become the more mysterious the more they are thought about, there will remain the one absolute certainty that he is ever in presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

[Herbert Spencer's Religion a Retrospect and prospect]

ছয় বৎসর অতীত হইল, হার্বার্ট স্পেন্সার সাহেব বলিয়াছেন যে, এখন ও আমাদের সেরূপ বৃত্তির প্রাবল্য হয় নাই যে, সতত সেই নিত্য ও নিরপেক্ষ চরম সত্যের অনুভব করি। আর বৃত্তির প্রাবল্যই বা হয় নাই কেন? শুন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহার কি উত্তর দিতেছেন। প্রাকৃতিক ভেদে আমাদের মন অতিশয় ব্যাপৃত। এখন আমাদের সমগ্র প্রকৃতির এক কালীন অনুভব হইতে পারে না। যদিও সকল জ্ঞানই অনিশ্চিত, তথাপি মনুষ্য কেবল এইমাত্র নিশ্চিত জ্ঞানে শান্তি লাভ করিবে, যে সকল অনিত্য পদার্থের অন্তর্লীন এক নিত্যসত্য পদার্থ রহিয়াছে, এবং সেই সত্যের স্বরূপ জানিতে মনুষ্য যত্নবান্ হইবে।

ভারতবাসি! তোমার কি মনে গৌরবের সাধ নাই? একবার চাহিয়া দেখ, পাশ্চাত্য

জ্ঞানের চরম সীমা কত দূরে। আজ ইংলণ্ডীয় দর্শন শাস্ত্রের সিংহাসনে যিনি অবস্থিত, যাঁহার তীব্র দৃষ্টি ও বুদ্ধি-চাতুর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত, তিনি যাহা মনুষ্যজীবনে সুদূর কল্পনা করেন, ভারতীয় মনুষ্যজীবনে তাহাই সত্য। কে বলিতে পারে কত দিন হইতে এই সত্য-স্রোত ভারতে প্রবাহিত হইতেছে, কত দিন হইতে এই সত্য অবলম্বন করিয়া ভারত শান্তিলাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান! কিছুকাল দূরে অবস্থিতি কর। এত দিন যাহা অনাদরে দূরে ফেলিয়াছিলাম, এক বার সেই ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ ভারত-কোহিনূরকে মস্তকে রাখিয়া নৃত্য করি।

যে সত্যের নিকটে, সকল বস্তুই অলীক ও তুচ্ছ, যাহার সত্যে জগৎ সত্য, যাহা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র সত্য, সেই সত্যের জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। এবং সেই সত্যে যিনি নিত্য অবস্থিত, তাঁহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞানী। যিনি যত পণ্ডিত হউন, শত রাজ্যের অধীশ্বর হউন, বা ত্রিভুবনের একাধিপতি হউন, ভারত-খণ্ডে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীর পদতলে অবনত।

স্পেন্সার সাহেব বলেন, প্রাকৃতিক ভেদের সমগ্র চিন্তন, এক্ষণে সম্ভবযোগ্য নহে। দুই শ্লোকে ভগবান্ সেই সমগ্রচিন্তন কল্পনা করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কি সুন্দর কল্পনা!

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ সবেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণ প্রবৃদ্ধা
বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি
মনুষ্যলোকে॥"

স্পেন্সার সাহেব বলেন, সেই সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে মনুষ্য ভবিষ্যতে চেষ্টা করিবে। বেদান্ত শাস্ত্রের তিন মহা প্রস্থান (উপনিষৎ বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতা) ভাষ্য, বার্ত্তিক, এবং শত শত প্রবন্ধ, এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছে, ইহা জানিলে স্পেন্সার সাহেব এরূপ বলিতেন না।

যদি বল সত্য জানিয়া কি প্রয়োজন? মনুষ্য জীবন এই সত্য জ্ঞানেই সংগঠিত। যখন ঈশ্বর ও জগৎ দুই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তখন মনুষ্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। যখন ঈশ্বর জ্ঞানের উপলব্ধি না হয়, কিম্বা ঈশ্বরের বিশেষ জ্ঞান না হয়, তখন প্রাকৃতিক চিন্তা ও প্রাকৃতিক জ্ঞানই মনুষ্যের প্রবল হয়। ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং রাজনীতি, ক্রমশঃ ঐশ্বরিক ধর্ম্মের ভিত্তি ত্যাগ করিয়া, আপেক্ষিক সত্যতার ভিত্তির উপরে সংগঠিত হইতেছে। ইউরোপের অত্যুন্নত শাস্ত্রকারের মতানুসারে চরম উদ্দেশ্য তিন—(১) সম্পূর্ণ জীবন, (২) বংশরক্ষা, (৩) অস্তিত্বের ও প্রাদুর্ভাবের চেষ্টা (Spencer's Data on Ethics) এই তিনটিই প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় সভ্যতার চরম সীমা আপেক্ষিক সত্যতা; আর্য্য মহর্ষিরা ঈশ্বরবাদ ও প্রকৃতিবাদ এই দুয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া নিরপেক্ষ সত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্র, তাঁহাদের রাজনীতি, নিরপেক্ষ সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংগঠিত। ভগবান্ মনু ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—'কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।" ফলাভিলাষ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করা প্রশস্ত নহে। কারণ ফল সকল

আপেক্ষিক সত্য এবং অনিত্য।' আর ইহ সংসারের যে কিছু কর্ম্ম আছে, ফলাভিলাষ পূর্ব্বকই সম্পন্ন হয়। এই জন্য যদি স্বর্গাদি অনিত্য ফলের প্রার্থী হও, তাহা হইলে, ফলাভিলাষ পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিবে। তাহা হইলে, যে রূপ সঙ্কল্প করিবে, তাহাই প্রাপ্ত হইবে। আর যদি নিত্য ফলের প্রার্থী হও, তাহা হইলে, ফলাভিলাষশূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর।

"তেষু সম্যগ্বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্
যথা সংকল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যৌবনের সুখ অনুভব না করিয়া লোকে বৃদ্ধের সুখ অনুভব করিতে পারে না। বালক ইচ্ছা করিলেই প্রৌঢ় হয় না। আপেক্ষিক সত্যের পরপর যেরূপ ক্রম আছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য অবলম্বন করা সম্ভব নহে। এই জন্য সাংসারিক কামনা করিতে হয়। এই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র, এই জন্যই নীতিশাস্ত্র, এই জন্যই ব্যবহার শাস্ত্র। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য "তৎসৎ", সেই সত্য বস্তুর অবলম্বন জন্য মনুষ্যকে উপযোগী করা। সত্ব গুণের বিবৃদ্ধি হইলেই মন স্বচ্ছ হয়, সত্যের অনুভব হয়। সত্বগুণের বৃদ্ধি করাই এবং অন্তঃকরণের বিক্ষেপ দুর করাই, সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নিষ্কামকর্ম্ম, পরোপকার, দান প্রভৃতি, যাহাকে শাস্ত্রকারেরা এক কথায় 'যজ্ঞ' বলেন—চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। এবং অন্তঃকরণের বিক্ষেপ নাশের জন্য উপাসনার আবশ্যক। সাংসারিক ধর্ম্ম ও সাংসারিক ব্যবহার এই কর্ম্ম এবং উপাসনার অন্তর্গত এবং সমগ্র পাশ্চাত্য শাস্ত্রও এই ধর্ম্ম এবং উপাসনার একাংশমাত্র।

কর্ম্ম এবং উপাসনা পাশ্চাত্য শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে ইহা কেবল অবান্তর উদ্দেশ্য। কেবল মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্যের সাধন মাত্র।

বেন্থাম সাহেব সাধারণের অতিশয় উন্নতির জন্য যাহা করিতে বলেন, আমাদের শাস্ত্রকারেরা চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহাই করিতে বলেন। স্পেন্সার সাহেব Altruism and Egoism লইয়া যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, আমাদের চিত্তশুদ্ধি অনুসারে সে বিবাদের খণ্ডন হয়। বিষয় লইয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদির পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সহিত বিভেদ নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য দুয়ের ভিন্ন। এ বিভেদ সভ্যতা ভেদের পরিচায়ক। এই বিভেদের জন্য আমাদের সহিত পাশ্চাত্য জাতির ব্যক্তিগত সমাজগত ও জাতিগত ভিন্নতা। আমরা প্রাকৃতিক বলে বলী নহি, কিন্তু সত্যের বলে বলী; যা হ'বার তাই হউক, সত্য ছাড়িব কেন? আজি জগতের সর্ব্বোচ্চ আসনে অবস্থিত হইয়া, সকলের পূজাস্পদ হইয়া, প্রকৃতির বিড়ম্বনায় কেন ভুলিব? প্রকৃতির যাহারা বশীভূত, তাহারা কি আমাদের অগ্রণী হইতে পারে? কালে সত্যই প্রবল হইবে। "সত্যাৎ পরতরং নাস্তি।" তাই বলি, সত্য ত্যাগ করিব না। মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য সত্য এবং মানব ইতিহাসের চরম উদ্দেশ্য সত্যের অবলম্বন।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ,
এম,এ,বি,এল।

দেবী না মানবী।

কে তুমি কে তুমি মম হৃদয়-কন্দরে
ঢালিছ চন্দ্রিকা-রাশি ?—পরশে যাহার,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে শতেক কুসুম
বিকাসিয়া, সৌরভেতে আকুল পরাণ
করিছে আমার ! বসন্তের সমাগমে
প্রকৃতি যেমতি ধরে, শ্যামল বিমল—
শোভা উজলিয়া দিশি—সেইরূপ
তুমি সতি ! বসন্ত বিকাশি, স্নিগ্ধ করি
রাখিয়াছ হৃদয় আমার ! শুনি যেন
সুললিত বাঁশরীর গান দূর হ'তে ;
বিমুক্ত বিমান-পথে শ্যামা দেয় শিশ্‌,
মাতাইয়া বনস্থলী ; প্রতিধ্বনি তা'র
পশিছে শ্রবণে। সন্তোস-সরসে মম
রজতের ধারা শুভ্র সুনির্ম্মল জলে
সারল্য মাধুর্য্যময় মোহিনী প্রতিমা
পড়িয়া, শোভিছে তব বিমল আনন।
রঞ্জিত অধর-প্রান্তে—মৃদু হাসি টুকু,
স্থির সৌদামিনী প্রায় করিছে বিরাজ।
আধ-নিমীলিত নয়ন-পল্লবে যেন
সুখ-স্বপ্ন স্মৃতি মাখা ! বাহু-লতা দু'টি
কোমল লাবণ্যময়। খসিয়া পড়েছে
বামে—সুবর্ণ রাগ-রঞ্জিত প্রাসাদের
চূর্ণকায় মেঘ সম—অঞ্চল তোমার।
বসায়েছ হৃদে মম প্রেম-প্রস্রবণ।
পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম-ধারা অনিবার
বহিয়া, হৃদয়ে মম করিছে প্রদান—
শান্তি-সুখ-বারি ; তাই বলি, বিধুমুখি!
বল সত্য ক'রে—দেবী না মানবী তুমি ?

শ্রীকালিদাস মিত্র।

শিশুকাল।

কিবা সুখময় ! শৈশব সময়—
বিকার-বিহীন মন ;
দ্বেষ হিংসা নাই প্রফুল্ল সদাই,
লভি শান্তি অনুক্ষণ।

কোন চিন্তা নাই সুখে নিদ্রা যাই,
সদাই বিরাম পাই ;
সংসার-বন্ধন প্রেম-আলাপন,—
কিছুতে প্রয়াস নাই।

অমৃত—গরল সমান সকল,
ভেদাভেদ জ্ঞান নাই ;
সদা সুখময় এ হেন সময়
আর আছে কি হে ভাই ?

সংসার-গহনে ভ্রান্ত নরগণে
কত যে যাতনা সয় ;
জীবন উষায় শৈশব সময়—
সে সব কিছু না রয়।

কিন্তু শিশুকাল র'বে কতকাল ?
ভাব দেখি একবার ;
নদী যথা ধায়— এ সময় যায়,
ফিরিবে না কভু আর !

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।

দার্জ্জিলিং ভ্রমণকারীর পত্র।

(দ্বিতীয় পত্র)।

লুইস্ জুবিলি সেনিটেরিয়ম্, দার্জ্জিলিং, ১৩ অক্টোবর, ১৮৮৯।

প্রথম পত্রে দার্জ্জিলিং গমনের পার্ব্বত্য পথ বর্ণনায় লিখিয়াছি যে, এ প্রদেশ মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। যতই উপরে উঠা যায় ততই বোধ হয়—যেন নিম্ন প্রদেশ পাতালে গিয়া মিশিয়াছে। নিম্ন স্থানের অন্তঃপ্রদেশকে "চিরাই" অথবা "খাড়" কহে। নিম্ন প্রদেশ কুয়াশায় আচ্ছন্ন—যেন প্রজ্জ্বলিত ঘুঁটের গাদা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। কুয়াশার মৃদুমন্দ হিল্লোল, আমাদিগের মুখস্পর্শ করিয়া সমুদয় অঙ্গ শীতল করিতেছে। উপর পাহাড়ে উঠিবার জন্য, স্থানে স্থানে গাড়ী পশ্চাৎ হটিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। যাইতে যাইতে উভয় পার্শ্বে অসংখ্য জলের ঝরণা দেখা যায়। সূর্য্য-কিরণ সেই সকল ঝরণা-নিঃসৃত জল-কণার উপর পতিত হইলে, কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করে! এখানকার জলের একটি বিশেষত্ব এই যে, জল যতই স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হউক না কেন, একত্রে স্তূপাকারে থাকিলে, অস্বচ্ছ ও কর্দ্দমাক্ত বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মোহিত হইতে হয়—প্রকৃতির অসীমত্ব ও সৌন্দর্য্য হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ ভয়-রসে আপ্লুত করে—ঈশ্বর-বন্দনা প্রাণে জাগাইয়া দেয়।

প্রকৃতির নানারূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বৃহৎ উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ট্রেনের গমন দেখিলে বোধ হয়—যেন ক্ষুদ্র ইন্দুর উচ্চ গৃহের ভিতর দৌড়াইতেছে। ট্রেনের ও ষ্টীমারের কষ্ট ভুলিয়া যাইলাম—ইচ্ছা হইতে লাগিল রেলের গতি যেন শীঘ্র না থামে, নয়ন তৃপ্ত করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে থাকি!

বৈকাল, সাড়ে চারি ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে বাহির হইলেই জুবিলি সেনিটেরিয়মে যাইবার পথ পাওয়া যায়। ঐ স্বাস্থ্য-নিবাস ষ্টেসন অথবা গরুর গাড়ীর রাস্তা হইতে আটতলা পরিমাণ নীচের পাহাড়ে অবস্থিত। বাটীটি দ্বিতল ও কাষ্টনির্ম্মিত। আলোক প্রবেশের অপ্রতিবন্ধকতা এবং কুয়াশা ও বৃষ্টি প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা সম্পাদনার্থে, উহার দ্বার ও গবাক্ষ সকল কাচ-নির্ম্মিত। উপরের ঘরগুলি ক্ষুদ্র—এক জনের শয়ন করিবার উপযুক্ত ছোট খাট দুই খানা ধরিবার স্থান আছে। প্রত্যেক ঘরের পশ্চাতে নিজ ব্যবহারের ক্ষুদ্র জল-গৃহ আছে।

এখানে কলিকাতার ন্যায় দিবসে আলোকের জ্যোতিঃ নাই। স্বাস্থ্য-নিবাসের পার্শ্ব দিয়া দুইটি ঝরণা সুশ্রাব্য সুললিত সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে, এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে পড়িতেছে; এক দিগের পাহাড় নানাবিধ তরু লতায় সমাচ্ছাদিত।

এখানকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মোট বহে;

এবং মস্তকে দড়ি বাঁধিয়া তদ্দ্বারা মোট পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া লয়। ছোট ছোট ছেলে গুলিকে একটা লম্বা ঝুলীতে করিয়া ঐরূপে বহন করে।

এখানকার স্ত্রী পুরুষের গঠন খর্ব্বাকার—মুখ ও বুক প্রশস্ত, নাক ও চোখ ছোট; পরিধান—মোটা কাপড়ের পিরিহানের ন্যায় এক প্রকার গাত্রাবরণ ও ইজার। ইহাদের পোষাক অত্যন্ত অপরিষ্কার—গাত্র ও সেইরূপ; দেখিলে বোধ হয়, ইহাদের শরীরে বেশ বল আছে। কোন কোন স্ত্রীলোক গালে খয়েরের প্রলেপ দেয়; কারণ ইহাদের ধারণা—খয়ের মাখাইলে, গালের রং ভাল থাকে। ইহাদিগের ঘর অত্যন্ত ছোট ও নীচু—পাতার ছাওনি ছাদের কার্য্য করে। ইহাদিগের কথাবার্ত্তা অনেকটা চীনদেশীয়দিগের মত। লোক সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

ছোট লাট সাহেবের ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাড়ী, "লুইস্ জুবিলি সেনিটেরিয়মে"র ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত ও আকারে ছোট। ছাদ্ গড়ান ও লাল রঙে রঞ্জিত, দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। বাড়ীগুলি সারি সারি বা কাছাকাছি নহে। এ পাহাড়ে এক খানা ও পাহাড়ে এক খানা, অর্থাৎ পাহাড়ের এক একটি শৃঙ্গ কাটিয়া চৌরশ করিয়া, তদুপরি এক একটি বাটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অধিকাংশ বাটীর প্রাচীর কাষ্ঠনির্ম্মিত, কতকগুলি পাথরের; ছাদ্ করোগেটেড্ লৌহের।

কোন কোন বাড়ীতে আসিতে হইলে, রেলওয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া পাহাড়ের ঢালু পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। যাইবার সময় বোধ হয়, যেন আমরা ভাটা—ঢালু জায়গার উপর গড়াইয়া যাইতেছি। লুইস সেনিটেরিয়াম হইতে নামিবার সময় কোন কষ্ট বোধ হয় না—কিন্তু উপরে উঠিতে হইলে, "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে হয়। কলিকাতায় এক ক্রোশ হাঁটিতে আমার যত কষ্ট না হয়, বোধ হয়—প্রথম দিন উপরে উঠিতে তাহার দ্বিগুণ কষ্ট হইয়াছিল। কথায় বলে,—

"শরীরের নাম মহাশয়,
যা' সহা'বে তাই সয়।"

অভ্যাস বশতঃ এখন আর তত কষ্ট বোধ হয় না।

আবার কতকগুলি বাড়ী আছে, তাহাতে যাইতে হইলে, ঐরূপ নীচের পাহাড় হইতে উপরের পাহাড়ে উঠিতে হয়। এখানকার সকল সাহেবের বাড়ীর এক একটি নাম আছে। অমুক সাহেবের নিকট যাইব, না বলিয়া, অমুক বাটীতে যাইব, বা গিয়াছিলাম, এই রূপই সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে। বাজার এক জায়গায় রাস্তার দুই পার্শ্বে বসে। তরিতরকারি অনেক রকম বিক্রয় হয়। অধিকাংশ দ্রব্যই রেলযোগে আসে। রবিবারে রবিবারে হাট বসে ও সেই দিন নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায় ও লোকে বেশি করিয়া জিনিষপত্র কিনিয়া রাখে। অদ্য এইখানেই ইতি করিলাম।

কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।



বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল।

"বিশ্বাস ধর্ম্মমূলংহি প্রীতি পরম সাধনম্"

বিশ্বাস সবার মূল ভজনের কাযে,
বিশ্বাসে রহেন হর—পাথরের মাঝে।
'স্তম্ভে হরি',—প্রহ্লাদের আছিল বিশ্বাস,
নরহরি-মূর্ত্তি তাই তা' হ'তে প্রকাশ।
বিশ্বাস যাহাতে যার, মুক্তি তার তায়,
বলি কিছু শুন তবে বিশ্বাসে কি হয়।

কান্তিপুর-সন্নিকট কপিগঞ্জ-গ্রামে,
বাস করে চাষা এক, হারাধন নামে।
উদার-চরিত্র চাষা, সুবোধ, সুজন,
কুমতে, কুপথে কভু করে না গমন।
বিবাদ বিরোধ কভু নাহি কারো সনে,
জীবন যাপন করে পুলকিত মনে।
দশ বিঘা জমী জমা আছিল তাহার,
তাহাতেই চাষ ক'রে চালায় সংসার।
পালিতে সংসার মাত্র ভরসা—ফসল,
একক কৃষক তার নাই অন্য বল।
জমীদারে কর দিয়ে যাহা কিছু থাকে,
তা'তেই কাটায় কাল চাষা দুখে সুখে।

এক দিন মনে ভাবে কৃষক-তনয়,—
"দিন দিন পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়;
শেষ-দিন প্রতি দিন আসিতেছে কাছে,
সে দিনের তরে মোর সম্বল কি আছে?
হ'য়ে ছিনু এত দিন বড় বিস্মরণ,
এক দিন হ'বে মোর অবশ্য মরণ।
অসার সংসার-কাযে সারা দিন যায়,
দারা, পুত্র, পরিবার,—কেহ কারো নয়।
সম্বন্ধ জীবনাবধি সকলের সনে,
ফুরাইবে যত কিছু শেষের সে দিনে।
তবে কেন, হেন ছার সংসারের তরে,
পরমার্থ-চিন্তা আমি ছাড়ি একেবারে?
এবার হইতে আমি বুঝিলাম সার,
করিব সে কায—যা'তে পাইব নিস্তার।
কিন্তু, 'গুরু বিনা কোন কার্য্য নাহি হয়',
শুনিয়াছি,—এই কথা সকলেই কয়।
এবার আইলে গুরু ভুলিয়া না র'ব,
গুরুর নিকট হ'তে ইষ্ট-মন্ত্র ল'ব।
বলিব, আমারে প্রভু! দাও উপদেশ,
নিস্তারের পথ কহ বিস্তারি বিশেষ।"
ভাবে চাষা—এই মত আপন উপায়,
হেনকালে গুরু তার আইল তথায়।
প্রকাণ্ড শরীর তাঁর, দেখে লাগে ডর,
ঠিক্ যেন মূর্ত্তিমান্ যমের কিঙ্কর!
ভয়েতে বালকগণ না যায় নিকটে,
দেখিলে সে গুরু-মূর্ত্তি গুরু-ভক্তি চটে।
বড় দাঁত, ছোট চোখ্, ভীষণ আকার,
(যেমন হউন তিনি—গুরু সে চাষার।)
গুরু দরশনে চাষা অতি হৃষ্টমন,
পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়া, দিল বসিতে আসন।
সময় বুঝিয়া চাষা বসিয়া নিকটে,
মনোগত কথা যত, কহে করপুটে।
বলে,—"প্রভু! মোর প্রতি হও কৃপাবান্,
পবিত্র করহ মোরে করি মন্ত্রদান।
বুঝিয়াছি, এ সংসারে সকলি অসার,
উপদেশ দাও, যা'তে হইব উদ্ধার।
শুনিয়া চাষার কথা গুরু মহাশয়,
উত্তর না করি কিছু চুপ করি রয়।
ভাবে মনে—"বেটা বড় বাধাইল গোল,

কোথা থেকে শিখে এল সর্ব্বনেশে বোল!
এ বড় বিপদ্—বেটা কার মন্ত্রণায়—
এত দিন পরে আজ মন্ত্র নিতে চায়।
কারে বলে 'গুরু-মন্ত্র' নাই মোর জ্ঞান,
বেটা বুঝি তার কিছু পেয়েছে সন্ধান।
ভাল শিষ্য এই বেটা—বুঝি বয়ে যায়,
আসিলে, দু'পাঁচ টাকা হইত আদায়।
এবারে যা হ'বে, ভাল বুঝিলাম তাহা,
ফিরা'য়ে বা চায়, আগে দিয়াছিল যাহা।
যা হ'বে তা হ'বে পরে এত কি সে ভয়,
বাতাস দেখিয়া, হাল ছাড়া ভাল নয়।
কত বুদ্ধি ধরে জেতে চাষা হলধর!
নারিকেল-তেল দিয়া বলিব আতর।
এত ভাবি প্রকাশিয়া বলে,—"হারাধন!
মন্ত্র যদি ল'বে বাপু! কর আয়োজন।
মন্ত্র-বলে ভব-সিন্ধু পার যদি হ'বে,
পূজা লাগি পাঁচ টাকা শীঘ্র আন তবে।"
গুরু-বাক্যে হৃষ্টমনে কৃষক তখন
কর্জ্জ করি আনে—যাহা ছিল অনাটন।
আজ্ঞা মতে দ্রব্য যত করিল মজুত,
মন্ত্র লইবার জন্য হইল প্রস্তুত।
গুরুর নিকটে বসে, করি যোড়পাণি;
কাণে কাণে গুরু তার কন মন্ত্র-বাণী।
"ঢেঁকী, ঢেঁকী," বল বাপু! জন্ম কর সার,
অধিক না পার, জপ দিনে বারো বার।
শিষ্য মধ্যে প্রিয় তুমি বড় জ্ঞানবান্,
তাই এই মন্ত্র করি তোমারে প্রদান।
নতুবা, এ মহামন্ত্র কা'রে না শুনাই,
বিদায় করহ এবে বাটী চ'লে যাই।"
গুরুরে বিদায় করি কৃষক-নন্দন,
মন্ত্র জপি সদা রহে আনন্দিত মন।
গুরু-বাক্যে, মুক্তি-লাভে পাইয়া আশ্বাস,
ভক্তি-সহকারে মন্ত্রে করিল বিশ্বাস।
ভক্তিভাবে "ঢেঁকী ঢেঁকী" বলে সর্ব্বক্ষণ,
সংসারের কোন কাযে নাহি আর মন।
ছাড়িল সকল কায নাহি করে চাস,
জনমিল ক্ষেত্রময়—শ্যাল-কাঁটা, ঘাস।
খেতে,শুতে,নিদ্রা যেতে,"ঢেঁকী ঢেঁকী"বোল,
জানিল সকল লোকে হ'য়েছে পাগল।
হেথায়, অমর-পুরে নারদ-ভবনে,
নারদ-বাহন—ঢেঁকি ভাবে মনে মনে;
"মর্ত্ত্য লোকে ডাকে মোরে ভক্ত কোন জন—
নতুবা আমার কেন বিচলিত মন?
দিব্য চক্ষে তবে ঢেঁকী দেখে, চক্ষু মুদি,
"কপিগঞ্জ-গ্রামে এক চাষা নিরবধি,
কায়মনোবাক্যে মোরে ডাকে ভক্তিভাবে,
সত্বরে সে ভক্ত তরে যেতে হ'বে ভবে।
কিন্তু, এই কথা যদি শুনে ঋষিবর,
কখন দিবে না মোরে হইতে অন্তর।
লুকাইয়া যা'ব তথা করিনু নিশ্চয়—"
এত ভাবি একদিন ঢেঁকী মহাশয়,
(আকৃশলী মুষলি আদি অঙ্গের সহিত)
কৃষক-ভবনে আসি হন উপনীত।
চাষাজন হেরিয়া সে অদ্ভুত আকার,
'ভূত ভূত,'—বলি ভয়ে ছাড়িল চীৎকার।
ঢেঁকী বলে,—"স্থির হও, ভূত নহি আমি,
নারদ বাহন হই—তুমি যার কামী।
তব ইষ্টদেব আমি 'ঢেঁকী' মোর নাম,
অমর-নগরে থাকি নারদের ধাম।
তুষ্ট হইয়াছি দেখে তোমার ভজন,
তব বাসে আসি তাই দিতে দরশন।
বর মাগ, বাপু! তুমি যাহা মনে লয়,
তোমারে তুষিয়া যাব আপন আলয়।"
শুনিয়া ঢেঁকীর বাণী বিস্ময়-অন্তরে,
গলে বস্ত্র দিয়া চাষা দণ্ডবৎ করে।
বলে,—"প্রভু! যদি মোরে হইলে সদয়,

আমার আলয়ে তবে থাক, দয়াময়!
এই বর, প্রভু! আমি মাগি তব ঠাঁই,
সতত চরণ দু'টি সেবিব, গোঁসাই।"
"তথাস্তু" বলিয়া ঢেঁকী রহিল তথায়,
নারদ-ভবনে গোল বাধিল হেথায়।
প্রভাতে উঠিয়া মুনি, বীণা ল'য়ে করে,
সাজিলেন, যাইবারে কৈলাস-শিখরে।
কত দিন দেখা নাই শঙ্করের সঙ্গে,
যাইবারে অভিলাষ; ডাকেন বাহনে।
চাষা-বাড়ী, চাষা-গুরু, সে ঢেঁকী—বাহন,
কে আর তাঁহার কথা করিবে শ্রবণ!
কত বার ডাকি (শেষ না পেয়ে উত্তর)
ক্রোধে ঢেঁকীশালে নিজে চলেন সত্বর।
ঢেঁকী-শূন্য আগার করিয়া দরশন,
মহাক্রোধে ঋষিবর কহেন তখন;—
"এ ত বড় গোলে মোরে ফেলাইল আজি,
ঢেঁকী চুরি করিলেক কোন্ বেটা পাজী?
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে সদা প্রয়োজন,
ঢেঁকী বিনা করি কিসে গমনাগমন।"
ব্যস্ত হ'য়ে মুনিবর খুজি চারি ভিতে,
না পেয়ে সন্ধান শেষ দেখেন ধ্যানেতে—
চাষাবাসে. ভক্তিপাশে ঢেঁকী বাঁধা আছে,
একেবারে স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্ত্যলোকে গেছে।
জানিয়া ঢেঁকীর তত্ত্ব কৃষক-ভবন,
সেই দণ্ডে ঋষিবর করেন গমন।
ঢেঁকীরে দেখিয়া মুনি মহাকোপ করি,
কন,—"বেটা! মোর সঙ্গে কর জুয়াচুরি!
এই ক্ষণে 'উদুখল' হউক সৃজন,
যত কিছু কার্য্য তব করুক সে জন।
বাহনের পদে তোরে না রাখিব আর,
আজ্ঞা বিনা এসেছিস্—প্রতিফল তার।"
শুনিয়া মুনির কথা ব্যথিত অন্তরে,
বহু স্তুতি করে ঢেঁকী দেব ঋষিবরে।
বলে,—"আমি অবোধ, অজ্ঞান, দুরাচার,—
অপরাধ ক্ষমা প্রভু! করুন আমার।"
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে কন দেবর্ষি নারদ,—
"আমার বচন কভু না হইবে রদ।
আজি হ'তে উদুখল হইবে সৃজন,
পূর্ব্বমত কিন্তু তুমি রহিবে বাহন।"
ঢেঁকী বলে,—"প্রভু! মোর বড় ভয় হয়,
উদুখল হ'য়ে পাছে বাহনত্ব লয়।
এই বর দেহ প্রভু! এ অধম জনে,
মম পৃষ্ঠে চড়ি র'বে কৃষক-ভবনে।"
নারদের প্রাণ ঢালা ঢেঁকীর উপরে,
ক্ষমিলেন দোষ তার প্রফুল্ল অন্তরে।
"তথাস্তু" বলিয়া মুনি দয়ার সাগর,
বসিলেন, সেইক্ষণে ঢেঁকী-পৃষ্ঠ'পর।
ক্ষণপরে চাষা আসি—খুলিয়া দুয়ার,—
চমকিল দেখি ঘরে অপূর্ব্ব আকার।
ঢেঁকীরে জিজ্ঞাসে চাষা যোড়হাত করি,—
"কহ গুরু! কেবা বসি তব পৃষ্ঠোপরি?
লম্বা দাড়ী, শাদা চুল, করেতে সেতার,
তোমার উপরে বসে, কেমন ব্যাভার?"
ঢেঁকি বলে,—"পৃষ্ঠে মোর অন্য কেহ নাই,
দেব-ঋষি 'গুরু' মোর,—নারদ গোঁসাই।"
চাষা বলে,—"ইনি তব 'গুরু' যদি হন,
আমারো 'পরম গুরু' বুঝিনু এখন।"
এই রূপ হর্ষ-পূর্ণ চাষর আলয়,
অতঃপর, ব্রহ্মলোকে শুন কিবা হয়।
একদিন, চতুর্মুখ, বড় প্রয়োজনে,
বার বার ডাকেন, নারদ তপোধনে।
না দেখিয়া হাজির, ভাবেন প্রজাপতি,
না পালে আমার আজ্ঞা—কেন হেন মতি?
পরম ধার্ম্মিক মোর পুত্র সে নারদ,
কোথা গেল, কিম্বা তার হ'ল কি বিপদ?"
যোগ-বলে অবগত হইয়া তখন—

হংস-পৃষ্ঠে যান ব্রহ্মা কৃষক-ভবন।
নারদে নিরখি তথা করেন জিজ্ঞাসা,—
"চাষা-বাড়ী কি কারণে করিয়াছ বাসা?
প্রিয় পুত্র তুমি মোর সাধু চূড়ামণি,
না দেখে তোমারে হেথা আইনু আপনি।"
পিতারে প্রণাম করি দেব তপোধন
কহিলেন, আগাগোড়া সব বিবরণ।
নারদের কথা শুনি কন প্রজাপতি,—
"তুমি যদি এই স্থানে করিবে বসতি;
কেমনে ছাড়িয়া তোমার'ব ব্রহ্মলোকে?
সৃষ্টি-কার্য্যে যুক্তি আমি সুধাইব কা'কে?
সুবুদ্ধি, তুমি যে সর্ব্ব গুণ-নিকেতন—
তোমারে সকল কাযে মোর প্রয়োজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্যে যাতায়াত কত বা করিব?
কাযে কাযে, এই স্থানে আমিও থাকিব।"
এত বলি র'ন ব্রহ্মা কৃষক-ভবন,
চাষা আসি যথাকালে দিল দরশন।
দেখিল অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ঘরের ভিতরে,
চারি মুখ— চারি কর—হংসের উপরে।
মূর্ত্তি দেখি, ভয়ে চাষা শিহরিয়া উঠে,
ধীরি ধীরি কহে, গিয়া ঢেঁকির নিকটে,—
"বল প্রভু! কেবা ইনি? লোহিত বরণ।
না দেখি কখন পূর্ব্বে চেহারা এমন!"
ঢেঁকী বলে,—"উনি দেব বড় দয়াময়,
আমার 'গুরুর গুরু' ব্রহ্মা মহাশয়।
শুনিয়া আনন্দে চাষা হইল বিভোর,
বুঝিল অন্তরে—ইনি 'মহাগুরু' মোর।
স্থির বুঝিয়াছে চাষা মুক্তি ইথে পা'বে
"ঢেঁকী-মন্ত্র" জপে চাষা আরো ভক্তিভাবে।
এইরূপে রহে চাষা প্রফুল্ল অন্তর,
শুন সবে কহি যাহা ঘটে অতঃপর।
একদিন, মহামুনি বীণা-বাদ্য ক'রে,
মহানন্দে কৃষ্ণগুণ, গান পঞ্চস্বরে।
চারি হাতে তালি দেন নিজে পদ্মযোনি,
গগন ভেদিয়া উঠে সেই মহাধ্বনি।
শব্দ শুনি হরষিত হ'য়ে রমাপতি
কহেন মধুর স্বরে পদ্মালয়া প্রতি,—
"চল লক্ষ্মি! ত্বরা করি যাই ধরাধাম,
কেবা গায়, দেখি চল এই হরিনাম?
কেবা দেয় করতালি কে বাজায় বীণা;
আওয়াজ লাগিছে কাণে—যেন চেনা চেনা।
যে জন হউক সেই, করিনু স্বিকার—
কিছু দিন র'ব আমি তাহার আগার।"
এত বলি গরুড়ে চড়িয়া নারায়ণ,
শব্দানুসরণে যান চাষার ভবন।
ব্রহ্মারে হেরিয়া তথা সন্তান সংহতি,
হেতু জিজ্ঞাসেন তার দেব লক্ষ্মীপতি।
প্রজাপতি-মুখে সব শুনি বিবরণ,
হরষিত হন অতি দেব নারায়ণ।
কহিলেন,—"বিষ্ণুলোকে আমি না যাইব,
তোমরা যথায় র'বে তথায় রহিব।
তোমাদের সঙ্কীর্ত্তন শুনিনু যখন,
এই মত অঙ্গীকার ক'রেছি তখন।"
এত বলি পক্ষী'পরে লক্ষ্মী নারায়ণ
বসিলেন, সেই ঘরে হ'য়ে হৃষ্টমন।
নিয়মিত কালে চাষা, দুয়ার খুলিয়া,
হেরিল, যুগল-মূর্ত্তি বিহঙ্গে চড়িয়া।
সবিস্ময়ে করপুটে ঢেঁকীরে জিজ্ঞাসে,—
"আজি প্রভু! কোন্ দেব আমার আবাসে?
ঢেঁকী বলে,—"বিষ্ণু উনি গুরু বিধাতার—
জগতের যত জীবে যোগান আহার।"
শুনিয়া সন্তুষ্ট অতি চাষা মনে মনে,
মহা মহা গুরু বলি জানে জনার্দ্দনে।
প্রাণপণে দিবারাত্র "ঢেঁকী-মন্ত্র" জপে,
কিছুদিন কাল তার কাটে এই রূপে।
ধনে ধানে উথলিল তাহার সংসার,

সবাকার কাছে বাড়ে চাষার পসার।
এ দিকে মথুরাপুরে, কংস দুরাচার,
সবারে পীড়ন করে—যথেচ্ছ আচার।
ভাঙ্গিল যতেক ছিল হরির মন্দির,
'হরে কৃষ্ণ' নাম যার কাটে তার শির।
কৃষ্ণনাম প্রতি যার আছয়ে ভকতি,
কংসের নিকটে তার নাই অব্যাহতি।
হরি'লুটে'যে পোয়াতি প্রসব হইল,
কংস তার বংস ধ্বংস করিতে লাগিল।
এই রূপে মহাপাপ করে বহুতর,
মেদিনী বেদনা ইথে পান নিরন্তর।
দুষ্ট কংস-ভার আর না পারি বহিতে,
ত্বরা করি যান ধরা অমর-পুরীতে।
পুরন্দরে কন মহী,—"শুন সুরনাথ!
সহিতে না পারি আর কংসের উৎপাত।
শীঘ্র কর দেবরাজ! উপায় ইহার,
দুরন্ত পাপিষ্ঠ কংসে করহ সংহার।"
এত শুনি, বজ্রপাণি, ডাকি দেবগণে,
তখনি চলেন সবে বিষ্ণুর সদনে।
বিষ্ণুলোকে, শূন্য দেখি বিষ্ণুর আসন,
যোগ-বলে দেখিলেন সহস্র লোচন—
"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, তপোধন, (তিনেতে মিলিয়া)
চাষার বাটীতে বাসা করেছেন গিয়া।
তত্ত্ব জানি সত্বরেতে যত দেবগণ,
ধরাতলে কুতুহলে, করেন গমন।
চন্দ্র. সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, যম, বজ্রধারী,—
চাষা-বাড়ী উপনীত, সবে সারি সারি।
বিধাতা, নারদ আর লক্ষ্মী নারায়ণ,
একত্রে দেখিয়া তথা, সবে হৃষ্টমন।
প্রণমেন সবাকারে অমর-মণ্ডলী,
নানা কথা অতঃপর হয় বলাবলি।
হেনকালে, চাষা আসি (খুলি গৃহদ্বার)
দেখিল, ঘরের মধ্যে স্থান নাহি আর।
নানা মূর্ত্তি চারি ধারে দেখে ঘুরে ফিরে,
"এঁরা কাঁরা?" ঢেঁকীরে জিজ্ঞাসে ধীরে ধীরে;
ঢেঁকীর নিকট সব শুনি সমাচার,
হইল চাষার মনে হরষ অপার।
দ্বিতীয় অমরপুরী—কৃষক-ভবন!
শুভক্ষণে "ঢেঁকী-মন্ত্র" পায় হারাধন।
দেবগুরু বৃহস্পতি, জানি এ বারতা,
আইলেন চাষা-বাড়ী,—দেবগণ যথা।
সম্বোধিয়া সবাকারে বলেন বচন,—
"একি কার্য্য! স্বর্গপুরী ছাড় সর্ব্বজন?
সুরপুর চারি দিক শূন্যময় সব,
একি বিবেচনা, ওহে কেশব, বাসব!
প্রিয় পাত্র এত যদি চাষা এই ভবে,
স্বর্গে ল'য়ে চল এরে সব দিক র'বে।"
উপযুক্ত যুক্তি বলি সকলে মানিয়া,
স্বর্গে যান দেবগণ চাষারে লইয়া।
ফল কথা,—বিশ্বাসেতে মুক্তিলাভ হয়,
বিজ্ঞমাত্রে এ কথায় নাহিক সংশয়।
'ভগবানে ভক্তি কর, মোক্ষলাভ হ'বে,'
বেদের বচন ইহা মনে রেখো সবে।
কৃষক-কাহিনী মোর হ'ল সমাপন,
পাঠক বৃন্দের কাছে, বিদায় এখন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র সিংহ।



ভালবাসা কি পাপ !

"বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শশ্মানে।
লাজ মুক্ত বাস মুক্ত দুটী নগ্ন প্রাণে॥
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোকে লুপ্ত চরাচর।
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর॥"

রবীন্দ্রনাথ।

ভালবাসা কি পাপ! ভাল বাসিলেই কি হৃদয়ে চিরকাল রাবণের চিতা জ্বলিবে? ভালবাসিলেই কি হৃদয়ে চিরকাল অশান্তি বিরাজ করিবে? এই কি ভালবাসার শাস্ত্র? এই কি ভালবাসার রীতি? ঈশ্বর কি মানুষকে কাঁদাইবার জন্যই ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন? যাকে ভালবাসিব তার জন্য প্রাণ কাঁদে কেন? তাকে দেখিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয় কেন? দিন রাত দেখিলেও আবার তৃপ্তি হয় না কেন? আশা মিটে না কেন? ভালবাসার বস্তু নিত্য নূতন বোধ হয় কেন? জগদীশ! এ কি তোমারই লীলা? যাহাকে পাইবার আশা নাই, তাকে ভালবাসিতে দাও কেন? মানুষকে কাঁদাইবার জন্য তোমার এ ফাঁদ কেন জগদীশ? আবার যার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হই না, সে কেন তাহা বুঝে না? যার জন্য কাঁদি, সে কেন কাঁদে না?

এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই; দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ, যদি এ রীতি না থাকিত, তবে আমরা সুখের আস্বাদ পাইতাম না—জগতে মায়া মমতা থাকিত না, ঐ জগৎ নূতন রকমের হইত। সৃষ্টির এই এক অনির্ব্বচনীয় কৌশল—জগতে চিরকাল কাহারও সুখ নাই, আবার চিরকাল কাহারও দুঃখ নাই; তাই বলি, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। আজ যে সুখের অন্বেষণে ঘুরিতেছে, কাল হয় ত সে ঘোরতর দুঃখে পতিত হইল। আবার আজ হয় ত দুঃখে নিমগ্ন, কাল আবার সুখে ভাসমান! তাই বলিতে ছিলাম, এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও নাই।

জাগতিক পারম্পর্য্যে সুখ দুঃখের মিলন। কিন্তু এ জগতে ভালবাসিলেও সুখ নাই, ভাল না বাসিলেও সুখ নাই—ভালবাসাই চিরকাল দুঃখপূর্ণ। আবার ভালবাসা হইতে উচ্চতর পদার্থ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। আবার ইহার ন্যায় অধস্তন পদার্থ ও কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না? তাই বলিতেছিলাম, ভালবাসা মহাপাপ! দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, এমন হৃদয় দেখিলাম না। স্বার্থ-শূন্য হৃদয় খুঁজিয়া পাইলাম না। যেখানে দেখি ভালবাসা সেখানেই স্বার্থপরতা। আজ কত বৎসর ধরিয়া একটি হৃদয়কে ভালবাসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভাল বাসা এ জীবনে পাইলাম না, আর পাইবারও আশা নাই। যাহার পায়

আজ কয় বৎসর ধরিয়া জীবনের সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি, সে একবার ফিরিয়াও তাকায় না! যে টুকু দেখিতে পাই সে টুকু স্বার্থপূর্ণ। জগদীশ! যাহাকে ভাল বাসিব তাহাকে পাইব না, এ কি তোমার জগতের পুস্তকে উজ্জল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এর কি আর ব্যতিক্রম নাই, এর কি আর পরিবর্ত্তন নাই? তাঁহাকে পাইতে চাহি না, তার কি একটু ভালবাসাও পাইব না? জগদীশ! তোমায় দয়াময় কে বলে? তুমি পাষাণময় !!

এতদিন হৃদয়ে যে আশা পুষিয়া রাখিয়া ছিলাম, তাহার শেষ হইয়াছে; সাধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবুও কেন প্রাণ তাকে চায়? তবুও কেন তাহাকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হয়? কমল! জানি তোমার তুল্‌তে গেলে কাঁটার ঘা সইতে হ'বে—তোমার ঘ্রাণ নিতে হ'লে, হুলের দংশন সহ্য কর্‌তে হবে; কিন্তু জেনেও জানি নাই, এ কষ্ট সহ্য করিতেও পরাঙ্মুখ হইতাম না যদি তোমায় তুল্‌তে পারিতাম; কিন্তু কেমন করিয়া বলিব সেই দিন—যে দিন সাধের হাট ভাঙ্গিয়া গেল—সে দিন মনে হইলে মাথা ঘুরে, অধৈর্য্য হই, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আমি কত দিন কাঁদিয়াছি, তোমার সেই হাসিভরা মুখখানি দেখিয়া, কতদিন গোপনে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি, আজও করিতেছি—জানি না কবে এ অশ্রু-বর্ষণ নিবারণ হইবে? তুমি চখের উপরে আছ, তাই এখনও তোমায় দেখে কাঁদিতেছি। কিন্তু, যখন তুমি চখের বাহিরে যাইবে, তখন এ হতভাগ্যের হৃদয়-তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যাইবে। জগতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, কত শত লোক এই আগুনে পুড়িয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন! আমি ত কীটানুকীট, তাই বলিতেছিলাম,—ভালবাসা এক মহাপাপ!

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বট-নিন্দা।

রবিতাপে তাপিত, পথিক কতিপয়,
বটবৃক্ষ-তলে গিয়া লইল আশ্রয়।
বৃক্ষ-তলে নিজ নিজ পাতিয়া চাদর,
ব'সে গেল পান্থগণ—প্রফুল্ল অন্তর।
নড়িছে বৃক্ষের পত্র সুমন্দ পবনে,
পুলকিত হয় মনঃ যার পরশনে।
স্নিগ্ধকরী সে ছায়ায় বসি কিছুক্ষণ,
মনঃপ্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল সবার তখন।
কথায় কথায়, তর্ক উপস্থিত হয়—
বটবৃক্ষ-গুণাগুণ সবে মিলে কয়।
কেহ বলে,—"ঐ গাছের নাহি কোন গুণ,"
কেহ বলে,—"এ গাছের মুখেতে আগুন।
এর মত লক্ষ্মীছাড়া গাছ আর নাই,
বিস্তারিয়া দোষ এর, কহি শুন, ভাই!
গৃহ-ছাদে যদি কভু লয় হে আশ্রয়,
একেবারে সে ঘরের দফা রফা হয়।"
কোন জন বলে,—"এর আরো দোষ আছে,
অন্য বৃক্ষ মারা যায় যদি থাকে কাছে।
বহু দূর ব্যাপিয়া, শিকড় এর যায়,
সব রস টেনে নিয়ে নিজে বৃদ্ধি পায়।

"অন্য বৃক্ষ বলবান্ নহে এর মত,
রসহীন হ'য়ে সবে, ক্রমে হয় হত।"
এইরূপ পরস্পর সবাই নিন্দিল,
শীতল ছায়ায় কথা, কেহ না বলিল!!
খলজন যদি কভু উপকৃত হয়,
তথাপি কৃতজ্ঞ সেই থাকিবার নয়!
শঠজন কারো কাছে পেলে উপকার,
এ বড় আশ্চর্য্য—সেই নিন্দা করে তার।
কৃতজ্ঞ না থাকে যদি কিবা ক্ষতি তায়?
মিছামিছি নিন্দা করে—লাগে বড় গায়।
এ জগতে, খলের চরিত্র বুঝা ভার,
কিছুতে তাহার হাতে নাহি দেখি পার।
মৌনভাবে তার কাছে যদ্যপি থাকিবে,
"মূক" ব'লে তোমারে সে নির্দ্দিষ্ট করিবে;
যদ্যপি বচন-পটু হও অতিশয়—
"বাতুল" বা "গল্পে" তবে কহিবে নিশ্চয়;
"ভীরু" কহিবেক, যদি, ক্ষমাশীল হ'বে!
না হ'লে তা "নীচবংশজাত" সেই ক'বে;
"অসভ্য" কহিবে, যদি দাঁড়াইবে পাশে,
দূরে দাঁড়াইলে, সেই "মৃদু" তারে ভাবে।
জিজ্ঞাসা করহ যদি—"আছেন কেমন?"
"তোষামোদ" করিতেছে, ভাবিবে তখন!
না করিলে জিজ্ঞাসা, বলিবে,—"অহঙ্কারী,"
"অমানুষ" ক'বে কিম্বা "ছোট লোক" ভারি।
যদ্যপি তাহার কোন কর উপকার,
সে ভাবিবে স্বার্থ কোন আছয়ে তোমার!
প্রশংসা করিলে সেই না হইবে বশ!
মহীশক্র হইবেক গাহিলে অযশ।
বিশেষ যদ্যাপি কোন কর উপকার,
প্রতিদান দিবে, করি অনিষ্ট তোমার!
যদি তুমি তার চেয়ে হও বলবান্,
গুপ্ত চক্রে, অনিষ্ট করিবে সমাধান।
ঘাড়ে চেপে বসিবেক হ'লে হীনবল,
সাধ্যমতে সাধিবেক অনিষ্ট কেবল।
'কুলাঙ্গার—নরাধম হেন খলজনে
তেয়াগিবে,'—শাস্ত্র-কথা কহি সুধীগণে।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রহেলিকা।

(২)

জল-তলে স্থিতি,—পদ্ম কুমুদ-জীবন,
রাধিকা-রমণ সম তাহার বরণ;
ভারত-ভূষণ যিনি, রত্নাকর পরে,
জগতে বিখ্যাত এত স্পর্শ তাঁরে ক'রে।
বল দেখি, বুধগণ! হইয়া সত্বর—
কোন্ রত্ন আছে হেন ভুবন ভিতর?

(৩)

তিনাক্ষরে নাম তার, ডাকা'তি'তে চা'ই;
প্রথম অক্ষর-হীনে,—গরিবের নাই।
অন্তের অক্ষর-হীনে, শয়ন-কণ্টক।
মধ্যম অক্ষর-হীনে—ত্যাগ আবশ্যক।
মধ্যম অক্ষর-হীনে আরো অর্থ হয়,
নারী-পাদ-আভরণ সর্ব্বজন কয়।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

অন্তিম মিলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শিবালয়ে।

কি ভয়ানক রাত্রি! একে কৃষ্ণপক্ষ, তাহাতে আবার চারি দিক মেঘাচ্ছন্ন! পশ্চিম গগন এক একবার চকমক্ করিতেছে। প্রকৃতির ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে, আর দেরি নাই। রাত্রি যে বড় অধিক হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু পথিমধ্যে মনুষ্য-সমাগম না থাকায়,চতুর্দ্দিক যেন নিস্তব্ধ প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। পাঠক মহাশয়! এই সময়ে একবার আসুন, ঐ সুবিশাল বটবৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান হইয়া, ঐ অর্দ্ধোদ্ঘাটিত মন্দির দ্বারে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া, দেখুন, চণ্ডীচরণ কি কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

চণ্ডীচরণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সমস্ত দিন অনাহারে শিব-পূজা, গালবাদ্য ডমরু-ধ্বনি ও বীণাযন্ত্রে ভজনগান করিয়া, ভূতভাবন ভবানিপতির তুষ্টিসাধন করিতেছেন। রজনীর মধ্যভাগে পূজা সমাপ্ত করিয়া, কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি আহার করেন এবং কুশাসনে শয়ন করিয়া নিদ্রা যান। অকস্মাৎ এমন ভাব কেন হইল,—অপর সাধারণ কেহই তাহা জ্ঞাত নহেন। দেখুন পাঠক মহাশয়! শিবলিঙ্গের অতি অল্প মাত্রই নয়ন গোচর হইতেছে; কারণ চণ্ডীচরণ অসংখ্য অসংখ্য বিল্বদলে উঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। চণ্ডীচরণকে আর চিনিতে পারা যায় না। কটিদেশে গৈরিক বসন, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি বিলেপন, ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্রক এবং কণ্ঠ ও বাহুদেশে রুদ্রাক্ষ। একজনের জন্য বাটীশুদ্ধ সকলেই যে সমস্ত দিন অনাহারে কালযাপন করিতেছেন—চণ্ডীচরণ সে বিষয়ে অন্ধ। কেমন করিয়া বৈর-নির্যাতনে কৃতকার্য্য হইব—কেমন করিয়া "হারানিধি" পুনরায় হস্তগত করিব, এই চিন্তাতেই চণ্ডীচরণ সমস্ত দিন মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

মহারাষ্ট্র দলাধিপতি ধন্মুজীর নিকট মধ্যে মধ্যে স্বীয় ব্যয়ে নানাবিধ উপঢৌকনাদি প্রেরণ করা হইতেছে। পিতা মাতা বুঝাইয়া পারিলেন না,পরিবারও পরিত্যক্ত—তাহার ত কথাই নাই। দামোদর বাবু এখন চৈতন্যবান্ পুরুষ। তিনি এক দিন সজলনয়নে পুত্রকে অশেষ বিধানে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। পুত্র তাঁহাকে বাতুল ও জেলের আসামী বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করিলেন, দামোদর নিরস্ত হইলেন। মাতা প্রতিদিনই বলিয়া থাকেন,—"দেখ দেখি চণ্ডি! তোর জন্যে সোণার সংসার দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে—তুই বাপ্ আমার মাথা খা আর কুপথে যাস্‌নে—আমি আর তোকে কত বুঝা'ব বল্ দেখি।" মাতার বাক্যে চণ্ডীচরণ দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দেন,—

"আঃ কেন আর জ্বালাও—তোমার কায তুমি দেখ গিয়ে—আমি যা ভাল বুঝ্‌ব, তাই কর্‌ব—তোমাদের না সহ্য হয়, তোমরা আমাকে কোম্পানির ঘরে বাঁধিয়ে দাও—সকল জ্বালা মিটে যাবে।"—এ সকল কথার আর উত্তর কি আছে? সুতরাং, তিনিও প্রবোধ প্রদানে নিরস্ত হইলেন। গিরিবালাও ভয়ে নিকটেই অগ্রসর হইতে পারেন না। অম্বিকাচরণ ত চণ্ডীচরণের কথায় থাকিতেই চান না। তাহা হইলেই চণ্ডীচরণের পথের ব্যাঘাত কণ্টক সকলই অপসৃত হইল। এখন নির্ব্বিঘ্নে স্বাভীষ্ট সম্পাদনে যত্নবান্‌ হইয়াছেন।

মাতার মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানে না। হৈমবতী ভাবিলেন—অদ্য যেমন করিয়া হউক পুত্রকে ফিরাইব। পুত্রই যদি এমন হইয়া গেল, তাহা হইলে আর আমার বাঁচিয়া সুখ কি? চণ্ডী আমার কত কষ্টের ধন। যে পথে গমন করিলে মানুষ মারা পড়িয়া থাকে, বাছা যদি আমার সেই পথেই যায়, তবে ত অবশ্যই আত্মঘাতিনী হইব। মায়ের সমান ব্যথার ব্যথি কে আছে? আমি তার মা, আমি কাঁদিলে কাটিলে, অবশ্যই সে কথা রাখিবে।"

দুর্নিবার্য্য অপত্য-স্নেহবশে এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে, তিনি হঠাৎ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে দ্রুত-পদ-সঞ্চারে ইতস্ততঃ যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একখান নারিকেল ছুলিবার সুতীক্ষ্ণ কাটারি দেখিতে পাইয়া, উহা হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং আস্ফালন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন,—"আয়, আয় চণ্ডে! আয়—আজ তুই আছিস্‌ আর আমি আছি—আজ আমার কথা রাখ্‌লি ত রাখ্‌লি, তা' না হ'লে এই কাটারিতে আজ তোর সাম্‌নে রক্তারক্তি হ'য়ে মর্‌ব।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি আলুলায়িতকেশে মহাবেগে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

হৈমবতীর অকস্মাৎ এই নিদারুণভাব সন্দর্শন করিয়া, পরিচারিকা উজ্জ্বলা অমনি গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সভয়ান্তঃকরণে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। দামোদর বাবু বাটীর বাহিরে অশ্বত্থতলে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। হঠাৎ গৃহিণীকে এইরূপ উন্মত্তার ন্যায় কাটারি হস্তে ধাবিতা হইতে দেখিয়া, তিনি অমনি হুঁকা ফেলিয়া, "আরে! কোথা যাও কোথা যাও?—যেওনা যেওনা—একটু দাঁড়াও দাঁড়াও," বলিয়া, তৎপশ্চাতে দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে বিপরীত কাদা, শরীরও তাঁহার ভারি, কাজেকাজেই জগদীশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিরস্ত হইলেন এবং মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—"ও মাঝে মাঝে এমন ক'রে থাকে—এখনই আবার ফিরে আস্‌বে; এখন এই অন্ধকারে আমি আর দৌড়তে পারিনে বাপু!"—এই ভাবিয়া তিনি অশ্বত্থতলে পুনরায় উপবেশন করিয়া পূর্ব্ববৎ তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন।

আলুলায়িত-কেশা হৈমবতী মন্দিরাভিমুখে গমন করিতে করিতে, হঠাৎ গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উজ্জ্বলা কোথা থেকে এ গানের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে?"

উজ্জ্ব। মা! আমার বোধ হচ্চে, দাদা বাবু গাইছেন—

হৈম। আহা! চণ্ডী ত আমার গায় বেশ—

উজ্জ। হ্যাঁ মা।

হৈম। ভাল উজ্জলা! বাছা আমার এমন হ'ল কেন বল্ দেখি?

উজ্জ। তাইত মা! ভেবে চিন্তে ত কিছু ঠিক পাইনে।

হৈম। ঐ শোন্ উজ্জলা! কেমন গাইছে শোন্—

উভয়ে কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। বেশ বুঝিতে পারিল চণ্ডীচরণ মহাদেবের নিকট স্তুতি-গান করিতেছেন। একে রজনী ঘোর অন্ধকারে আবৃত, তাহাতে স্থানটি অতি নিস্তব্ধ। সুতরাং, গীতটি বিলক্ষণ প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিল। হৈমবতী উন্মত্তভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ ঝিঁঝিট রাগিণীতে গাহিতেছেন—

তার হে পশুপতি শিব শঙ্কর!
বিঘ্ন বিনাশন, কারণ, সুন্দর!
ত্বংহি দেব! শাশ্বত ভবতারণ,
ত্বংহি নাথ! মন্মথ দর্পনাশন,
রজত গিরিনিভ পিণাকধারী,
গৌরি-নিষাদ শ্মশান-বিহারী,
ব্যোমকেশ ভালে আধ চাঁদ-আসা,
বিষধর অঙ্গে, গলে হাড়-মালা,
ভাসে হৃদয় প্রবল আঁখি-নীরে,
দেহি দেহি নাথ! বিজয় অচিরে।

এই গীত শ্রবণ করিতে করিতে হৈমবতী, উজ্জলা সমভিব্যাহারে মন্দির-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সোপানমার্গে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিলে, জনৈক সন্ন্যাসী হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন। হৈমবতী দেখিলেন—মহা বিপদ্। তিনি সন্ন্যাসীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী দ্রবীভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন?"

হৈম। আমার বাছাকে।

সন্ন্যা। আপনার পুত্রের নাম কি?

হৈম। চণ্ডীচরণ।

সন্ন্যা। তিনি এখন পূজা করিতেছেন।

হৈম। তার কি সমস্ত দিনে পূজা শেষ হয় না প্রভু?

সন্ন্যা। আচ্ছা মা! আপনি একটু বসুন, আমি তাঁকে খবর দিতেছি।

হৈম। হাঁ প্রভু! আপনি দয়া ক'রে তাকে বলুন—তোমার মা এসেছে।

সন্ন্যাসী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চণ্ডীচরণকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করিলেন। চণ্ডীচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া জলন্ত পাবকের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং রোষকষায়িত লোচনে কহিতে লাগিলেন—"আঃ এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! এই অন্ধকারে এই কাদায় কে তোমায় এত দূর আস্তে ব'লেছে?—উজ্জলা! যাও, এখনি হাত ধ'রে বাড়ী নিয়ে যাও—বলি ঐ যেন পাগল হ'য়েছে, তুমি কি ব'লে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলে?"

উজ্জলা ভয়ে নীরব রহিল। হৈমবতী বলিলেন,—"চল বাবা! ঘরে চল—পূজা ত সাঙ্গ হ'য়েছে।

চণ্ডী। তুমি ঘরে যাও বল্‌ছি—আমার এখনও দেরি আছে।

হৈম। আমি ও এই ব'সে রইলেম—তোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব।

চণ্ডী। তোমার এখানে বসা হ'বে না।

হৈম। তোর ক্ষমতা হয় তাড়িয়ে দে।

চণ্ডী। দেখ্‌বে তবে?

হৈম। হাঁ দেখ্‌ব।

চণ্ডীচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া দ্রুত পদ-সঞ্চারে যেমন তাঁহার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবে, ধীর-স্বভাব সন্ন্যাসী অমনি সম্মুখে পড়িয়া বাধা দিলেন। চণ্ডীচরণ নিরস্ত হইল।

পুত্রের এইরূপ আচরণে অভিমানও মর্ম্ম বেদনায় অধীরা হইয়া, হৈমবতী পুনরায় উন্মত্তার ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"দেখ্‌ উজ্জলা! বিকারী রোগী যেমন ঔষধ খেতে চায় না, এও সেই রকম হ'য়েছে; মাথায় যার সর্পাঘাত হ'য়েছে, তার আর উপায় কি আছে?—দেখ উজ্জলা! দেখ ও আমার কি পর্য্যন্ত না কর্‌লে! উজ্জলা! আমি আর এ প্রাণ রাখ্‌ব না—আমি আজ ওর সাম্‌নে রক্তারক্তি হ'য়ে মরব,—"

এই বলিয়া বস্ত্রাবৃত্ত কাটারি খান বাহির করিয়া যেমন স্বীয় মস্তকে আঘাত করিবার নিমিত্ত হস্ত উত্তোলন করিবেন, অমনি উজ্জলা দ্রুতগতি পশ্চাতে গিয়া তাঁহাকে সাপটিয়া ধরিল। চণ্ডীচরণ এই মহা বিপৎপাত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে কাটারি খান কাড়িয়া লইয়া দুরে নিক্ষেপ করিল।

হৈমবতী কহিলেন,—"তুমি কাটারিই ফেলে দাও, আর যাই ক'র, কাল তুমি আর আমায় দেখ্‌তে পাবে না। এত সহ্য ক'রে আমায় এ সংসারে থাকৃতে হ'বে! ধিক্‌ জীবনে আমার শত ধিক! আমি তীর্থ-স্থানে কত মহাপাতক ক'রে ছিলেম, তাই এমন কুসন্তান গর্ভে ধ'রেছি। পৃথিবি! তুমি দু'ফাল্‌ হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

হৈমবতীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে অশেষ বিধানে বুঝাইলেন এবং চণ্ডীচরণকে নানাবিধ মধুর বাক্যে প্রবোধ দিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন।

চণ্ডীচরণ ভাবিল মাতা এরূপ উপদ্রব করিলে, কেমন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। যাহা হউক, এখন উহাঁকে কোন মতে বুঝাইয়া বাটী লইয়া যাই, নচেৎ উপায় নাই।

এই ভাবিয়া মাতাকে বলিল,—"মা! চল আমরা বাড়ী যাই চল; তুমি এত অন্ধকারে এই কাদায় এসেছ, তাই আমার রাগ হ'য়েছিল—তোমার চণ্ডীত আর কোথাও যায় নি, শিব পূজা কর্‌ছিল—তা'ভাল কাজই কর্‌ছিল, তা'তে তোমার বাধা দিবার আবশ্যক কি?"

হৈমবতী বলিলেন,—"যা আর তোর ন্যাকামি কর্‌তে হ'বে না—তুই যে ছেলে তা আমি বুঝেছি; আজ যদি তোর সাম্‌নে মর্‌তুম্‌, তা হলে আর কা'কে মা বল্‌তিস্‌?"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"না মা! তা কি হয়—মা তুমি ম'লে আমি, কি করব, আমি কার কাছে দাঁড়া'ব? কা'কে মা বল্‌ব? "মরব মরব" বলো না মা!—তা'হলে আমিও গলায় দড়ি দিয়ে, কিম্বা গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে, মর্‌ব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলেই বাটী প্রত্যাগমন করিল। ঘোষাল মহাশয় সেই অশ্বত্থতলায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। সকলে বাটী আসিল দেখিয়া, তাঁহার মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি ভয়ে আর চণ্ডীর সহিত কথা কহিলেন না। চণ্ডী মাতার পশ্চাতে পশ্চাতে

আসিয়া বাটী প্রবেশ করিল। ঘোষাল মহাশয়ও আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে রাত্রে চণ্ডীচরণ মাতার কোন কথা লঙ্ঘন করিল না। মনে যাহা আছে, তাহা ত আছেই—তাহারত আর অন্যথা হইবার নহে। মাতাও বুঝিলেন, চণ্ডী ছেলে ভাল, তবে ঐ বৌ মাঝে মাঝে একটু তেরিয়া হয়ে দাঁড়ায়। যাহা হউক হৈমবতী যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সিদ্ধ হইল—ইহাই তাঁহার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ইহাও তাঁহাকে ভাবিতে হইবে—সর্প কখন পোষ মানে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কুসুম-চয়ন।

বেলা অবসান প্রায়। সৌধ-শিখরে সুবর্ণাভ কিরণ-জাল সন্দর্শন করিয়া, সহচরী ও শ্যামা কলসী কক্ষে বাটীর পশ্চাৎবর্ত্তী সরোবরে গমন করিলেন। সহচরীর মুখে হাসি নাই, হৃদয় গুরুভারে আক্রান্ত। প্রাতে তিনি যে নির্ঘাত দারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের স্থিরতা কোথায়? অদ্য আর তিনি কবরী বন্ধন করেন নাই, কেবল দেবী-পূজার প্রসাদী সিন্দুর তাঁহার ললাটদেশে বালার্ক শোভা ধারণ করিয়াছে। শ্যামা যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"সই! আজ তোমায় এমন দেখ্ছি কেন?"

সহ। অভাগিনীর কপালে কি সুখ আছে।

শ্যামা। কেন সই! আর তোমার কিসের দুঃখ?

সহ। যে সুখের নিধি কাছে পেয়ে কুড়িয়ে নিতে পেলে না, তার মত দুর্ভাগা কি আর আছে?

শ্যামা। কেন সই! কাছের জিনিষ কাছেই ত আছে, কুড়িয়ে নিলেই ত নিতে পার?

সহ। সই! আমি ত বলি কুড়িয়ে নি, বিধাতা নিতে দেয় কই? সই! বার বৎসর অদর্শন ছিল, ছিলাম ভাল; ভাব্তেম্, আমার হৃদয়-পিঞ্জরের পোষা পাখী উড়ে গিয়েছে, কত দূরে, কোন্ আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার কাছেই আসে না। কিন্তু সই! এত দিনের পর, সেই পোষা পাখী কাছে এল। ধর্ব ধর্ব মনে করি—মনে করি দগ্ধ অন্তঃকরণটা একবার খুলে দেখাই; তা'সই! আমার পোড়া ভাগ্যে পাখী কেবল পেছিয়ে পেছিয়ে যায়, ধরা দেয় না।

শ্যামা। এবার কাছে এলেই পায়ে শিকলি বাঁধ্বে।

সহ। ধর্তে পেলে, তবে ত যা' বল সাজে।

শ্যামা। যদুনাথ বুঝি কাল রাত্তিরে এসেছেন?

সহ। হ্যাঁ এসেছেন্ বটে—

শ্যামা। এখন তিনি কোথায়?

সহ। নানা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি যদি কেঁদে মরি তা' কি তিনি দেখ্তে পান?

শ্যামা। সই! তোমার যে রূপ,—সে রূপের ফাঁদে তাঁকে পড়্তেই হ'বে।

সহ। এ রূপ নিয়ে কি হ'বে সই? যার রূপে রূপ, সে রূপ ত কাছে পাইনে।

শ্যামা। ভাল সই! যদুনাথ অত বোচ্‌কা বুঁচকি বাঁধ্‌ছিলেন্ কেন?

সহ। কাল ভোরে উঠে গয়া যাত্রা করিবেন্।

শ্যামা। সে কি! সে ত বড় সহজ কথা নয়।

সহ। তবে আর তোমায় বল্‌ছি কি সই? এ রকম চোখের দেখায় কেবল অন্তর্দাহ বই আর কিছুই নয়। তা' সই! আমি এখন স্থির জেনেছি—এ জগতে আমি জ্বল্‌তে এসেছি, জ্বলে জ্বলেই যাব। ভয় ডর আমাকে অনেক দিন পরিত্যাগ ক'রেছে।

যে ঘাটে সহচরী ও শ্যামা কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে একটি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। কিন্তু কে গাহিতেছে কিছুই বুঝা গেল না। যাহা হউক, কণ্ঠধ্বনিতে বোধ হইল কোন পুরুষ মানুষ গাহিতেছেন। শ্যামা ও সহচরী লজ্জাবনত মুখে দ্রুত পদ-সঞ্চারে একটি সহকার বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া, শুনিতে লাগিলেন। গীতটি সরোবরের উত্তর দিকস্থিত লতাগৃহ ভেদ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

কিবা চাঁচর কুন্তল,
চিকণ মনোরম—
নিতম্ব লম্বিত শোভে;
কিবা ললাট সুন্দর,
সিন্দুর-শোভিত,
তরুণ অরুণ মরে ক্ষোভে।
কিবা নীল নলিনীনিভ
লোচন চঞ্চল,
হেরি, হরিণী মরে লাজে;
কিবা ভুরু যুগ সুন্দর,
অসিত সুবঙ্কিম,
কাম শরাসন সাজে।

গীত থামিল, কিন্তু সহচরী ও শ্যামার শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহাদিগের ভ্রম হইতে লাগিল—আবার গায় ত শুনা যায়। সহচরী শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"দেখ সই! কোন ভাগ্যবতীর স্বামী, তাঁর রূপ বর্ণনা ক'রে এই গীতটি গাইছিল, বোধ হয় আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে চুপ্ কর্‌লে—"

শ্যামা কহিল,—"ভাল আমরা একটু স'রে যাই না কেন? তা'হলে আবার গাইবে এখন্। আজকালের ভাগ্যবতী ত তুমিই সই! তোমার যদুনাথ গাইছেন কি না, তা দেখ!"

সহচরী কহিলেন,—"হায়! হায়! আমার মত ভাগ্যবতী কি আর আছে! সে দিন আমার আস্‌বে,—আমার স্বামী আমার রূপ বর্ণনা ক'রে গীত গাইবেন!"

গীত আবার আরম্ভ হইল। শ্যামা কহিল, "হয় কি নয়, ঐ শোন।"

কিবা কপোল সুকোমল,
সরোজ সন্নিভ,
লোলুপ অলিকুল আশা;
কিবা শ্রবণ সুসুন্দর,
গিরিধিনী-গঞ্জিত
বেণু সরল চারু নাসা।
কিবা শ্বাসম্বিধাকৃত
বিম্ব-কলাধর,
কণ্ঠ সুগোল বিরাজে;

কিবা পীন পয়োধর—
শোভে উরস পরি,
মেরু বিদারিত লাজে।

গায়ক একজন রসিক লোক। এই কয়েক পংক্তি গাইয়াই আবার চুপ্ করিলেন। শ্যামা সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আজ তোমার ফুল তোলা ঘুরিয়ে দেছে, সই! ওঁদের গান তুমি শোন দাঁড়িয়ে, আমি আমার কাজে যাই। তিরস্কার যা কিছু আমাকেই ত খেতে হ'বে—তোমার ত আর কিছু নয়।"

শ্যামা গমনোদ্যত হইলে, সহচরী তাহার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও সই! একটু দাঁড়াও, গানটি আমার বড় মিষ্ট লেগেছে। যার স্বামী গাইছে, সে যে ভাগ্যবতী তার-আর আর সন্দেহ কি?

গীত পুনরায় আরম্ভ হইল। উভয়ে ঔৎসুক্য-সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিবা মৃণাল-সন্নিভ
বাহু সুকোমল
অঙ্গুলী চম্পক শোভে;
কিবা নাভী সুগম্ভীর
ক্ষীণ মেখলা চারু,
নিরখি, কেশরী মরে ক্ষোভে।
কিবা চারু কদলী উরু,
নিতম্ব নিবীড়,
চরণ লীলাঞ্চিত ভায়ে;
কিবা মরাল-নিন্দিত,
গমন মনোরম,
মৃদুল কদম চলি যায়ে।

গীত আবার থামিল। সহচরী শেষ পংক্তিটি শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্যামাকে কহিলেন,—"সই! এবার ত ধরা পড়েছ, কে চলে যাচ্ছে?—তুমি চলে যাচ্ছ তোমার কথাই হচ্চে। আর কেন? বোঝা গেছে—"

শ্যামা কহিল,—"মরা মানুষ যদি ফিরে আসে তা বরলেও বা এক দিন সম্ভব। তা হ'লে আর জগতে অসম্ভব কি আছে? আমি তোমায় মিনতি করি, ফুল তুলে যাওয়া যাগ্ চল, এ দিকে, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। ও দিকে পূজার অয়োজন কর্‌তে হ'বে।"

গীত আবর আরম্ভ হইল। শ্যামা সহচরীকে বলিল,—"ঐ শোন সই! কার কথা হচ্চে—"

কিবা বরণ কনক-নিভ
কুসুম সুকোমল,
অঙ্গ মদন হেরি কাঁদে;
কিবা আধ নিমীল আঁখি
হাস মৃদুল মধু,
বিনত বদন কোটী চাঁদে।

শ্যামা কহিল,—"সই! এবার কি শুন্‌লে?" সহচরী কহিলেন,—"সই! গীত শুন্‌লে আর কি হ'বে? ফুল তোলা হচ্চে না—আমরা এখনে এত দেরি কর্‌চি, মা কি মনে কর্‌বেন?"

শ্যামা কহিল,—"কথা পাল্‌টালে আর কি হ'বে? এই বার মনের মতন কথাটি হ'য়েছে, আর কেন? এই বার ফুল তোল। তোমায় চেনা ভার!"

গীতের কঠোর অংশ আরম্ভ হইল;—

মরি এমন সুষমা শশী
কত দিন রাজিবে?
ঢাকিবে কুরূপ মেঘ-মালে।
মরি দিন ফুরাইলে,
শেষ হইলে আয়ু,
গ্রাসিবে কাল করালে।

গীত শুনিয়া সহচরী শ্যামাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন,—"সই! এতক্ষণে সার কথা শুন্‌লে? এর বাড়া কথা কি আছে? এস, এখন ফুল তোলা যাগ্‌।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উল্লিখিত লতা-গৃহ হইতে যত্নাথ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মত্ত করীর ন্যায় উত্তর দিকের দ্বার দিয়া উদ্যানের বাহিরে গমন করিলেন। দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া ও দেখিলেন না। উভয়ে বিস্মিত হইয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং জল-পূর্ণ কলসী ঘাটে রাখিয়া অঞ্চল ভরিয়া নানাবিধ কুসুম চয়ন করিলেন; তৎপরে উভয়ে কলসী কক্ষে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সহচরী নিতান্ত বিষণ্ন বদনে অস্তগমনোন্মুখ মরীচিমালীকে সন্দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"সূর্য্য! তোমার কাজ সাঙ্গ হ'ল, তুমি বাড়া যাও, রজনীকে একবার আস্‌তে দাও। অন্ধকার ক্ষণিক এসে রাজত্ব করুক্‌। কিন্তু কাল আবার তুমি উদয় হ'বে। তখন আবার অন্ধকার ঘুচে আলো হ'বে। কিন্তু আমার এই হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচে, আমার এই হৃদয়াকাশের সূর্য্য কবে যে আবার উদয় হ'বে, তার ত কোন ঠিক নাই। হা বিধাতা! আমি কি কেবল দুঃখের অন্ধকারে চিরকাল থাক্‌ব। তাই যদি তোমার মনে আছে, তবে আমায় এই দিনেক দু'দিন বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক সুখের আশা দিয়ে, আবার কেড়ে নিলে কেন? বিধাতা! তোমার দয়া নাই। তুমি কেবল জ্বালা'বার জন্য জীবদের সৃষ্টি ক'রেছ। জ্বালাও, জ্বালাও—বিধিমতে জ্বালাও। আমার ত এ বয়সে বাকি কিছুই রইল না।"

এই বলিয়া সহচরী অঞ্চলে চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে বাটী গমন করিলেন। শ্যামার অন্তরে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। কেবল বাহ্যিক বিষণ্নভাব প্রকাশ করিয়া সহচরীকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

একে গিরিবালার পত্র পাইয়া অবধি সহচরীর মনে কিছুমাত্র সুখ নাই, তাহাতে আবার এই বিষম দায় সমুপস্থিত। তিনি পত্র খানি পাঠ করিয়াই, খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই বলেন,—"দেবানন্দপুরে আমার এক সই আছে, সেই পত্র লিখেছে। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই কোথা থেকে শুনেছে যে, আমি এখানে আছি, তাই কেমন আছি জিজ্ঞাসা ক'রেছে। তাঁহার মনোকষ্টের বিশেষ কারণ এই যে, তাহাকে গৃহে রাখিয়া প্রতাপচন্দ্রকে মাথার উপর অনেক বিপদ্‌ লইতে হইল। প্রতাপচন্দ্র পূর্ব্বেই এ কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। কেমন করিয়া বাটীর সকলকে সতর্ক করিবেন, কেমন করিয়াই বা স্বীয় প্রাণদাতাকে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিবেন,—এই সকল চিন্তায় তিনি দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। শয়নে, ভোজনে কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা নাই। একদিন মনে ভাবিলেন প্রতাপচন্দ্রকে গোপনে এ বিষয়ের আভাস দিবেন; আবার ভাবিলেন, না, তাহা কেমন কইয়া হইবে? তাহা হইলে ত তিনি বাটীশুদ্ধ সকলেরই অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইবেন। সহচরী নিতান্ত ধৈর্য্যশীলা ও প্রগাঢ় বুদ্ধিমতী; তিনি কাহারও নিকট রহস্যভেদ না করিয়া কার্য্য-সিদ্ধির উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। মনে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, "ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হইবে।" ক্রমশঃ

যৌবন ও জরা।

—*—

অসন্তোষময়—বার্দ্ধক্য-সময় ;
সতত প্রফুল্ল যুবা-বয়স ;
দুয়ে সমাবেশ কভু নাহি হয়,
যেমতি পৃথক নিশি, দিবস।

যৌবনে, জীবন সদা প্রমোদিত,
নিদাঘ উষায় আরাম প্রায় ;
চিন্তা-জর্জ্জরিত প্রবীণের চিত,
জড়তা, যেমতি শিশির-বায়।

যেমতি নিদাঘ হয় দ্যুতিমান,
শীর্ণ, সঙ্কুচিত শীত-সময় ;
তেমতি, যৌবন তেজে তেজীয়ান্,
জীর্ণ, অবসন্ন প্রবীণ রয়।

যৌবন-সময় সদা সমুদ্যত,
পরিশ্রমে রত সতত রয় ;
প্রবীণ বয়স—এ সবে বঞ্চিত,
সাহস উদ্যম সকলি যায়।

যৌবন—উত্তাপ, সাহসে পূরিত,
প্রবীণ—শীতল, নিস্তেজ, ক্ষীণ ;
যৌবন—উদ্দাম, না হয় শাসিত,
জরা শান্ত-মূর্ত্তি যেন অধীন !

ঘৃণা করি জরা ! যাও চলি দূরে,
আয় রে যৌবন ! আদরি তোরে।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

শেষ নিশায়।

—*—

জ্যোতির্ম্ময় পাখা
করিয়া বিস্তার,
আলোময় পথে
ঘোর অনিবার ;
মুদিবে সে পাখা,
তারকা তোমার
রজনীর কোন্ নিভৃত ঘরে ?

বল হে সুধাংশু !
পাংশুল বরণ
অসীম আকাশে
কর যে ভ্রমণ,
বিরাম কোথায়
কর অন্বেষণ—
দিবস, অথবা যামিনী-ক্রোড়ে ?

শ্রান্ত সমীরণ
কর বিচরণ-
আশ্রয়-বিহীন
অতিথি যেমন ;
আছে কি তোমার
শান্তি-নিকেতন,
বিটপী অথবা তরঙ্গ' পরে ?

শ্রীরসময় লাহা

হিন্দু-শাস্ত্রে হস্তক্ষেপ।

ত্রাণোদয়—খ্রীষ্টীয়ান সমাজের সাপ্তাহিক পত্র। "শ্রীল অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়" ইহার সম্পাদক।

বলা বাহুল্য, হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালীরাই ইহার দেহ-পোষক; নতুবা তাঁহারা 'খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজক' নামের পরিবর্ত্তে 'হিন্দুধর্ম্ম নিন্দুক' নাম গ্রহণে অভিলাষী হইবেন কেন? এবং অন্যান্য সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এত আক্রোশ কেন?

২৬শে নভেম্বর তারিখের ত্রাণোদয়, "হিন্দুর সাক্ষ্য", "মহাভারত কল্পনা" ও "আবার কৃষ্ণ রহস্য" শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের তেজস্বীতা, মহাভারত বাইবেলের অনুকরণ এবং কৃষ্ণ মিথ্যা ও খ্রীষ্ট হইতে কল্পিত, ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া অযথা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া, মূর্খতা ও বাতুলতার পরিচয় দিয়াছেন।

এই পত্র খানি পাঠ করিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার সম্পাদক ও লেখক মহোদয়গণ বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তবে যে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহাদের মাতৃ-ভাষা বলিয়া; সুতরাং, তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি, হিন্দু শাস্ত্রের তিলার্দ্ধও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম নহে। ত্রাণোদয়ের বিজ্ঞাপন মধ্যে লিখিত আছে—"যে তারিখে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবেন, আগত বৎসর সেই তারিখ পর্য্যন্ত ত্রাণোদয় পাইবেন।" এই "আগত বৎসর"ই সম্পাদক মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ইঁহারাই আবার হিন্দু-শাস্ত্র-সমূহ ভ্রমময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, মহাভারত নূতন রূপে ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন এবং মহর্ষি বেদব্যাসের মূর্খতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান!

তাঁহারা যে প্রলোভনে পড়িয়াই হউক, আপনাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন এবং উহা পুনঃপ্রাপ্তির আশয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া, নানা রূপ বেশ ভূষা ধারণ করতঃ উদরান্নের প্রত্যাশায়, লোক ভুলাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহারা পাদ্রিপুঙ্গব দিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত যতই চেষ্টা করুন না কেন, স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশে সত্যের ভাণ করিয়া যতই মিথ্যার বিস্তার করুন না কেন, হিন্দু ধর্ম্মের তাহাতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। অতএব, তাঁহাদের প্রতি এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন বারম্বার এরূপ অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত না হন।

তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক—খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যের বিষয় যাহা বলিতে হয়, যাহা লিখিতে হয়, যাহা ভাবিতে হয় তাহা করুন, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহি না; কিন্তু, কিছুমাত্র না জানিয়া শুনিয়া, অনর্থক হিন্দুশাস্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া, আপনাদের মূর্খতা ও মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? যদি ভবিষ্যতে তাঁহাদের এরূপ আচরণ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমরাও কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তাঁহাদের ধর্ম্ম-পুস্তকের অসারতা জন-সমাজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

আর একটি কথা—ত্রাণোদয় একস্থলে গৌরবের সহিত বলিতেছেন "আমরা ত হিন্দুর গৃহে এতাবৎ কাল কাটাইয়াছি; এতদিন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গোময় ভক্ষণ করিয়াছি, শাস্ত্র জানি না এমন কথাও বলিতে পারি না,—কিন্তু এ সমস্যা ত ভঞ্জন হয় নাই! যদি খ্রীষ্টিয়ান না হইতাম, খ্রীষ্টের অপার মহিমা ও শক্তি নিজ জীবনে অনুভব না করিতাম, তবে কখন যে এ সমস্যা ভঞ্জন হইত এমন ও বোধ হয় না।"

ইহাতে স্পষ্টই বলা হইল যে, হিন্দু শাস্ত্রের সমস্যা ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছি বলিয়াই, এ সকল সমস্যার অর্থ জ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছি। যাহা হউক, এখন ত আর গোময় ভক্ষণ করিতে হইতেছে না, এখন ত দুগ্ধ পান করিতেছেন; কিন্তু সেই দুগ্ধের আস্বাদন কিরূপ তাহা কিছু জানিয়াছেন কি? যে বাইবেল লইয়া এত বড়াই করিতেছেন, সেই বাইবেলে কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে কি? এবং আমরা বাইবেল সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে ইচ্ছা করিব তাহার উত্তর দিতে অগ্রসর হইবেন কি? হিন্দুশাস্ত্র ত দূরের কথা!

উপসংহারে—খ্রীষ্ট সমাজের প্রতি জিজ্ঞাস্য যে, তাঁহারা ত এক কথায় মহাভারত বাইবেলের অনুকরণ, কৃষ্ণ খ্রীষ্ট হইতে কল্পিত, ইত্যাদি প্রতিপন্ন করিলেন; কিন্তু এসকল শাস্ত্রালোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, সচরাচর যাহা চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাহার কোন উত্তর দিবেন কি? তাঁহারা বাইবেলের কোন্ প্রথানুসারে গৈরিক বসন পরিধান ও বাদ্য যন্ত্রের সহিত কীর্ত্তন করিয়া পথে পথে পরিভ্রমণ করেন? ইহা কি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রদর্শিত, হিন্দু-আচরিত "নগর-সংকীর্ত্তনে"র অনুকরণ নহে? সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ত্রাণোদয়! ইহার উত্তর দিবেন কি?

আমরা আরো জানিতে ইচ্ছা করি যে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম যাজকেরা যে প্রকার একত্রে সমবেত হইয়া ভজনালয়ে প্রার্থনা করেন, তাহা কি খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মের অনুমোদিত?

যীশু খ্রীষ্ট বলিতেছেন;——

"And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward,

But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly"

[Mathew, Chapt 6,
Para 5&6.

যাঁহারা রাজপথের উপর সংকীর্ত্তন করিয়া আপনাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অবমাননা করিতেছেন, তাঁহারা আবার কোন্ সাহসে 'খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজক' বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হন? অতএব তাঁহাদের বাক্য প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাঁহাদের কথায় আমাদের কর্ণপাত না করাই উচিত, কারণ তাঁহারা যে সকল প্রমাণ লইয়া হিন্দুধর্ম্মের

নিয়তা,প্রদর্শন করিতেছেন,সে সকল অতিশয় অসার ও ভিত্তিহীন ; এবং এরূপ হইবারই কথা, কারণ তাঁহারা যদি সামান্য পরিমাণেও হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে, আর খ্রীষ্টীয়ান্ হইতেন না, তবে যাহা কিছু বলিলাম তাহার কারণ এই যে, ইহাতেও যদি ত্রাণোদয়ের চৈতন্যোদয় হয় এবং ত্রাণোদয় ত্রাণের চেষ্টা দেখেন।

আমি কার মেসো ?

নাড়িচা-নিবাসী কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান,
কোন কার্য্য-উপলক্ষে কলিকাতা যান।
যে সময় নৌকা আসি ঘাটেতে লাগিল,
তখন আন্দাজ—এই দুপুর বাজিল।
উত্তীর্ণ পঞ্চাশ বর্ষ বিপ্রের বয়েস,
বাতরোগে জড়ীভূত ক'রেছে বিশেষ।
সহরে কখন তিনি আসেন্ নি আর,
নূতন হইল দেখা কলিকাতা তাঁর।
টাকাকড়ি, বস্ত্র যাহা সঙ্গে তাঁর ছিল,
পুঁটলী বাঁধিয়া দ্বিজ কোমরে বাঁধিল।
বাম হস্তে ছেঁড়া চটি,—লাঠি ডান হাতে,
সোজা হ'য়ে দাঁড়াইতে নারে দ্বিজ বাতে।
ছাতা না খুলিতে পেরে গুঁজি বাঁ বগলে,
ঢুকাইয়া দিয়া ভাড়া যান দ্বিজ চ'লে।
কিছু দূর সে ব্রাহ্মণ গেছেন যেমন,
"মেসো" ব'লে সম্বোধন করে কোনজন।
সে বলিছে,—"আপনার নাহি মোরে মনে,
কত কাল দেখা নাই আপনার সনে।
বাড়ী থেকে কবে আসা হ'ল আপনার ?
কে কেমন আছে মেসো ! শুনি সমাচার।"
সে কথা শুনিয়া মনে ভাবিল ব্রাহ্মণ—
"মেসো ব'লে লোকটি করিছে সম্ভাষণ।
অবশ্য সম্বন্ধ আছে আমার সহিত,
স্নেহ-সম্ভাষণ করা আমারো উচিত।
হ'লে হ'তে পারে মোর মনে নাই ওরে,
সে কথা বলিলে ফুটে লজ্জা দেবে মোরে।
কি সম্বন্ধে মেসো ওর জান্তে যদি যাই,
লজ্জায় পড়িব তাহে সন্দেহ ত নাই।
পাতানে 'ঠাকুর দাদা' সম্বন্ধ ত নয়,
তা'হ'লে সন্দেহ মনে অনেকটা হয়।"
এরূপ বিতর্ক মনে করি সে ব্রাহ্মণ।
আগন্তুকে জিজ্ঞাসেন,—"আছ হে কেমন ?"
আগন্তুক কহে,—"ভাল আছি মহাশয়,
যা'বার বরাত কোথা আপনার হয় ?
আগে আসি মোর বাড়ী দিন্ পদ-ধূলী,"
এত বলি সেই জন করে ঝুলাঝুলি।
দ্বিজ ভাবে—প্রয়োজন আছিল বাসার,
ভগবান্ করিলেন যোজনা তাহার।
আপনার চাড়ে দ্বিজ কহেন তখন,—
"স্নান করি তবে বাবা ! করিব গমন।"
সে কহে,—"জিনিষ গুলি আগলাই,মেসো !
টপ্ ক'রে তবে তুমি ডুব্ দিয়ে এসো।"
পাণ্ডাদের কাছ থেকে তেল নিয়ে, মেখে,
স্নানার্থে গেলেন দ্বিজ দ্রব্যগুলি রেখে।
ব্রাহ্মণের শাদা মন,—গঙ্গায় নামিয়া—
স্নান করিছেন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া।
এদিকেতে শালী-সুত দিয়া চক্ষুদান,
সটু করে তথা হ'তে ক'রেছে প্রস্থান।

নেমে উঠে সে ব্রাহ্মণ দেখেন তখন,
শালী-সুত কোথা তাঁর ক'রেছে গমন।
পাণ্ডারে দেখেন তবে জিজ্ঞাসা করিয়া,
সে বলে,—"সে ব'সে ছিল,গেল যে উঠিয়া।"
সে কথায় ব্রাহ্মণের উড়ে গেল প্রাণ,
"আমি কার মেসো? ব'লে সবারে সুধান।
ছেলে, বুড়া, নারীগণ, যে আসে নিকটে,
সবারে জিজ্ঞাসে দ্বিজ—বিষম শঙ্কটে।
দেখিতে দেখিতে লোক জ'মে গেল এসে,
"ব্রাহ্মণ খেপেছে" ব'লে সবে খুন হেসে।
ক্রমে, শান্তি-রক্ষকেরা জুটিল আসিয়া,
ব্রাহ্মণের শালী-সুতে বেড়ায় খুঁজিয়া।
বলা এ বাহুল্য, ধূর্ত্ত নাহি-সেই স্থানে,
ফল না ফলিল কিছু তা'দের সন্ধানে।
জুয়াচোরে ছলিয়াছে বুঝিয়া তখন,
কাঁদিয়া আকুল হন ব্রাহ্মণ-নন্দন।
সাধুদের প্রাণ খোলা দেখি এ সংসারে,
আপনার মত তিনি দেখেন সবারে।
ফেরঘোর বুঝেন্ না, সোজা কথা কন,
সকলের সঙ্গেতে সরল আচরণ।
শঠ ব্যাধ, বাগজাল করিয়া বিস্তার,
ধরিয়া সাধব-পাখী করয়ে সংহার।
না বুঝিয়া বিশ্বাসের ফল দেখ সবে,
"হুঁসিয়ার" লোক বল কষ্ট পায় কবে?
যদ্যপি সহস্র বুদ্ধি ধরেন সাধব,
শঠের নিকটে তবু হ'ন পরাভব।
শঠের হাতেতে নাহি সাধুর এড়ান,
জগতে অসংখ্য এর আছয়ে প্রমাণ।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচন।

১০। Mookerjee's English and Bengali Dictionary, Printed and published by J E Dixon, at the Post Despatch Press, Calcutta 1890. Price annas 4.

এই ক্ষুদ্র অভিধান খানিতে সচরাচর প্রয়োজনীয় অধিকাংশ ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পকেট অভিধানের পক্ষে এখানি বিশেষ উপযোগী।

১১। **মহা প্রস্থান** বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য, কলিকাতা ১৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণা যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৩ সাল।

প্রণেতার নাম নাই, না থাকিবারই কথা; কারণ, শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র বিরচিত "ধর্ম্ম-পরীক্ষা" নামক দৃশ্যকাব্য হইতে ইহার অধিকাংশ ভাবার্থ এবং স্থানে স্থানে শব্দবিন্যাস পর্য্যন্ত ও অবিকল গৃহীত। যাহা হউক, গ্রন্থকার এক জন চতুর ব্যক্তি এবং বেমালুম অনুকরণ করিতে বিশেষ পারদর্শী; কারণ অবিকল নকল করিয়াছেন—অথচ ধর্ত্তে ছুঁতে নাই।

ইহার উপর আবার ঠিকে ভুল। গ্রন্থকার এক স্থলে লিখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নিষাদ কর্ত্তৃক

বাণবিদ্ধ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বিলাপ করিতেছেন এবং কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন যথা—

"অর্জ্জুন।— একি—একি হেরি!
সখা কেন পড়ি' ধরাসনে!
* * * *
কৃষ্ণ—উঁহু, মরি মরি! দেহ আঁলিঙ্গন, সখে!
অর্জ্জুন—ওহো!
কেরে নির্দ্দয় এমন,
* * *
কহ, সখা, প্রকাশিয়ে কে হেন নিষ্ঠুর?
* * *
কহ, সখে! এখনি নাশিব তারে
কৃষ্ণ।—পার্থ ত্যজ রোষ, নহে কার দোষ।
অর্জ্জুন।—কেন সখে! করহ ছলনা?
কিবা দোষে দোষী দাস ও পদ-রাজীবে!
কৃষ্ণ।—কেন, সখে! করহ সন্তাপ?
পূর্ব্ব জন্মে সত্যপাশে ছিনুবদ্ধ,
আজি সত্যমুক্ত আমি।
যাহ হস্তিনায় ব'লো ধর্ম্মরাজে;—
স্বর্গে-স-বে-ক-রে-ন-গ-ম-ন।"
(মৃত্যু)

কিন্তু কৃষ্ণের মুমূর্ষু সময়ে যে তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তিনি দেহত্যাগ করিলে পর অর্জ্জুন প্রভাসে উপস্থিত হন ও তাঁহার মৃত দেহের সৎকার করেন, ইহা বোধ হয় তাঁহার জ্ঞান ছিল না; তবে বলিতে পারি না গ্রন্থকার যদি সেই সময়ে ইহ জগতে উপস্থিত থাকিয়া, এ সকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, নচেৎ এ ধারণা তাঁহার কিরূপে হইল? আমরা ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না।

অভিনয় সম্বন্ধে।

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার "বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে শ্রীনৃত্যগোপাল কবিরত্ন বিরচিত সংস্কৃত ভাষায় "শাপবসান" বা "অভিমন্যুবধ" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এক থানি নূতন নাটক প্রণয়ন করিয়া তাহার অভিনয় করা বর্ত্তমান সময়ে, এই প্রথম।

অভিনয় অতীব সুন্দর হইয়াছিল, আমরা ইহা দর্শন করিয়া আশাতিরিক্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি।

অভিমন্যু, ভীম, জয়দ্রথ, শকুনি, ও সুলোচনার অভিনয় অতিশয় প্রশংসনীয়। কেবল সঙ্গীত বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল।

সঙ্গীত।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কলঙ্ক সার সই! আমার হ'ল যে পিরীতে;
ছুঁয়ে আঁদি ক'রে গেল, না এল পুন দেখিতে।
এত ছিল তার মনে, হাসা'বে বিপক্ষগণে!
গঞ্জনা দেয় গুরুজনে, পারিনে প্রাণে সহিতে।

৺কৈলাশচন্দ্র রায়।

মূলতান—আড়াঠেকা।

ভালবেসে, ভালবাসা, আশা করা অকারণ;
যে যারে যেমন দেখে— সে তারে দেখে তেমন।
ভালবাসা উভয়তঃ, মুকুরে মুখ দেখা মত,
তা' যদি নাহিক হ'ত, তবে কি তায় চায় মন?

৺কৈলাশচন্দ্র রায়।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

স্মর শ্রীমধুসূদন।
পতিত-পাবন হরি, কলুষ নাশন ;
থাক কুজনের সনে
পাপ কর সঙ্গোপনে ;
সর্ব্বময়-সন্নিধানে,
র'বে না গোপন।

কার ধন কেবা ল'বে,
সকলি পড়িয়া র'বে,
যম গৃহে যেতে হ'বে,
কি হ'বে তখন ?—

মুক্তি-পথে কাঁটা দিয়ে,
মিথ্যা সুখে সুখী হ'য়ে,
বৃথা পরিজন ল'য়ে,
র'য়েছ এখন।

আমি ব'লে আঁটাআঁটি,
আমি যবে হ'বে মাটী,
কোথা র'বে ধন, বাটী—
আত্মপরিজন ?—

যে জন্য এখানে এলে,
ধন পেয়ে ভুলে গেলে,
"আমার, আমার" ব'লে,
হারা'লে সে ধন।

ধন, জন, পরিবার—
ভাব সব আপনার ;
এ জগতে কেবা কার ?
ভাব দেখি মন !—

অভীষ্ট সাধন কর,
নিজ ইষ্ট দেবে স্মর,—
একচিত্তে ধ্যান কর
হরির চরণ।

যাঁরে ডাকি প্রহ্লাদাদি,
তরিয়াছে ভব নদী,
ডাক তাঁরে নিরবধি,
ওরে মূঢ় মন !—

ডাকিলে সে দয়াময়ে,
এড়াইবে ভব ভয়ে,
সব বাধা কাটাইয়ে,
করিবে গমন।

ভব ভার ঘুচাইতে,
মোক্ষধামে ল'য়ে যেতে,
'হরিনাম' এ মহীতে,"
বেদের বচন ;—

জঠর-যন্ত্রণা যা'বে,
কোন দুঃখ না রহিবে,
এই বেলা সে কেশবে
কর রে সাধন ;
শ্রীব্রজবল্লভ রায়।



১ম খণ্ড।]　　পৌষ।　　[৯ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—তিন আনা।

অমৃতে গরল।

কাঁলি নিদয় বঁধু!
বিহান বিকালে,
কাহে ন পেখনু তোয ?
ফিরি ফিরি ঢুঁড়নু,
কুসুম-কানন মে,
কোহি দিনু ছোড়বি মোয।

যতনে আঁচবি কেশ,
বেণী বিনাইনু,
বাঁধন অবসর নাহি ;
নীল বসন পিনি,
কাঁচলি না আঁটনু,
আইনু ওহি মুখু চাহি।

হেরি বিলম্ব তেরি,
সবরা টুটাইনু,
গাহনু মধুর সুতান ;
দূর সে দূরে
অনিমিক চা'হনু,
কাঁহা সো কঠোর পাষাণ ?

তুলসীকো পুছনু,
পুছনু গুলাবে ;
পুছনু তাল তমালে,—
পঙ্কজে পুছনু
পুছনু পলাশে
পুছনু পনস পিয়ালে।

পুছইতে মাধবী,
"স্বর সব" নাদিল,
ধীর সমীরণ-বোলে ;
পুছনু ভ্রমর দলে,
গুণ্ গুণ্ গাহিল,
কোহি কুছু ত নেহি বোলে।

ধীরি ধীরি আয়নু,
যমনাকো তীরে,
বইঠিনু বকুলকি ছাযে ;
নিরখি কুসুমচয,
ফুনি ফুনি রোয়িনু
কাঁপনু মলযকি বাযে।

বিরহ বারিধি ঘোর,
হৃদয আকাশে,
তাপ বিজলী খর জ্বালা ;
বরখা নযন জল,
অঞ্চলে বারনু,
গাঁথনু ফুলদল মালা।

কাল কোহেলা কিবা
'কুহু কুহু' গাহিল,
কানন বল্লরী বিতানে ;
বিকসিল মল্লিকা,
বাস বিতারিল,
কাম কুসুম শর হানে।

নিতি নিতি আয়কে,
কুঞ্জকানন মে,
দুহুঁ জন বালক বালা
খেলনু বহুতর,
কৌতিন পহছিনু,
দুহুঁ দুহুঁ বাসিনু ভালা।

মঙ্গল পেখন
বিচমেহি ঠারই
বাঁধল দুহুঁ প্রেম-ফাঁসে;
কাশ কুসুম কিবা
দশন বিকাশত
হেরি মিলন-মৃদু হাসে।

শ্রবণ শুনল আঁখি—
অঞ্জন পাশ,
কোহি শুনল নহি আর;
ধরিনু রতন সম,
হৃদয় পেটারি,
গুপত সো প্রেম হামার।

গুরুজন-গঞ্জন,
বরখিল বাজ—
আইনু শরণ তোহারি
পাপ পিরীতি মেরি,
লাজ টুটায়ল,
মানস মানল হারি।

তুঁহু মুহু একহি
বরখা নিদাঘে
একহি শিশির বসন্তে;
দেহ দুঁহুকো দুঁহু
প্রাণহি এক
একহি মরণ জীয়ন্তে।

ঠার নিদয় বঁধু!
দিব তোয় সাজা;
আবহি বহুত বিধানে,
দিবস বরষ সম,
মরম দুখায়ল,
ডালিল গরল পরাণে।

আগে যদি জানই,
প্রেম অমিয়ে,
বিরহ-হলাহল রাজে;
কাহে নিঠুর বঁধু!
হাঁত লাগায়িমু
এমন কঠিন কুকাজে?

শিখনু শিখনু আজু
কমল মৃণালে
কাহেকো কণ্টক সাজে;
শিখনু শিখনু আজু
চাঁদ-উরস' পরি
কাহে কলঙ্ক বিরাজে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।



অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রাজা সিতাব রায়।

এ জগতে কাহার সাধ্য দুর্নিবার্য্য কাল-গতি রোধ করিতে পারে? এমন কে আছে তাহার আরম্ভ বা শেষ কোথায় বলিতে পারে? যে প্রবল বাত্যা ভীম প্রতাপে সমুত্থিত হইয়া বিশাল মহীরুহগণকে সমূলোৎপাটন-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়, কোন উত্তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গে প্রতিহত হইয়া, তাহারও গতি রোধ হইতে পারে; অথবা যে মহার্ণব উত্তাল তরঙ্গমালা বিকীর্ণ করিয়া, মহাগর্ব্বে ফেণ-রাজী উদ্গার করিতেছে, বেলাবপ্রে প্রতি-হত হইয়া, তাহারও প্রবল প্রতাপ প্রশ-মিত হইয়া থাকে; কিন্তু কালের অনন্ত গতি রোধ করে কাহার সাধ্য। এই বিশাল জগৎ যাহার অনন্ত গর্ব্ভে নিহীত রহিয়াছে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাহার নিত্যলীলা, প্রতি পদক্ষেপে যাহার মহা মহা কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহার বিচিত্র অনন্ত স্রোত নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। অদ্য যে স্থানে পর্ব্বত-শ্রেণী বিরাজ মান, কালে তাহা মহা সমুদ্রে পরিণত হইতে পারে; অদ্য যে স্থানে স্রোতস্বতী প্রবাহিতা, কালে সে স্থান হইতে মেরু-শৃঙ্গ সমুত্থিত হইতে পারে; অদ্য যে ব্যক্তি পথের ভিখারী, কালি সে রাজা হইতে পারে; অদ্য যিনি রাজ-চক্রবর্ত্তী, কল্য তিনি ভিক্ষোপজীবী হইয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কালের অত্যাশ্চর্য্য—অসীম ক্ষমতা!!

রাজনী অবসান হইল,—কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল,—গন্ধবহ কুসুমগণের পরিমল-ধন অপহরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিতরণ করিতে লাগিল, এমন সময় দ্বার-দেশে মৃদু করা-ঘাত-শব্দে ছেদী পাইক জাগরিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি।" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার করাঘাত হইল। ছেদী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—তখনও উত্তর নাই। তখন সে সন্দিহান চিত্তে ভাবিল, যখন উত্তর নাই, দ্বার খোলা হইবে না। আবার ভাবিল—রজনী প্রভাত হইয়াছে, এ সময় দ্বারোদ্ঘাটন করিতে ভয় কি? এই ভাবিয়া যষ্টি গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিল—একটি সুন্দর পুরুষ সামান্য বেশ ভূষায় দণ্ডায়মান, সরোজ সন্নিভ বদন-মণ্ডলে আকর্ণ বিস্তৃত নীল নয়ন যুগল শোভা পাইতেছে; গণ্ড-দেশে কাক-পক্ষ বিরাজমান, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত,—ভাব অতি প্রশান্ত, গম্ভীর।

রূপ-দর্শনে বিস্মিত ও স্বীয় আচরণে লজ্জিত হইয়া ছেদী করপুটে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহা-শয়! আপনি কোথা থেকে এসেছেন্?" উত্তর হইল,—"আমি অনেক দূর হইতে

আসিয়াছি।" ছেদী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি প্রয়োজন?" উত্তর হইল,—"দামোদর বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ছেদী তৎক্ষণাৎ বিশ্রাম-গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। আগন্তুক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উপবেশন করিলেন। ছেদী দামোদর বাবুকে জাগাইবার জন্য শশব্যস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখিল—দামোদর বাবু গাত্রোত্থান করিয়া ইষ্ট-দেবতার নাম করিতেছেন। ছেদী সমস্ত সমাচার অবগত করিলে, দামোদর বাবু অতিশয় ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন চিরপরিচিত পূর্ব্ব প্রভু রাজা সিতাব রায় আগমন করিয়াছেন।

দামোদর মহারাজের শুভাগমনে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া, কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বহু দিবসের পর পরস্পর দর্শনলাভ ও স্ব স্ব ভাগ্য-বিপর্য্যয় নিবন্ধন অন্তঃকরণে বিষম নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

রাজা সিতাব রায় বিহার-প্রদেশে নবাবের নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা উক্তপদে অধিরূঢ় হইতেন, তাঁহারা রাজ প্রতিনিধি স্বরূপ সমস্ত রাজকার্য্যই স্বহস্তে সমাধা করিতেন। ক্ষমতাও তাঁহাদিগের অসীম। নায়েব দেওয়ান দিগের বেতন, বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি ঐ বেতনের প্রায় চতুর্থাংশেই রাজ-প্রতিনিধির কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। সুবাদার দিগের রাজত্বকালে, হিন্দুগণ সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় ও মহাসমাদরে গৃহীত হইতেন। রাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা নন্দকুমার, রাজা গুরুদাস,—প্রভৃতি হিন্দুগণ নবাব-সরকারে বড় বড় পদে অভিষিক্ত ছিলেন। জাত্যাভিমানের বশীভূত হইয়া, নবাবগণ উপযুক্ত পাত্রের অবমাননা বা অমর্য্যাদা করিতেন না। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ ভাব প্রায় লক্ষিত হয় না।

রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইয়া, রাজস্ব-বিষয়ে কোম্পানী বাহাদুরের বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, জবাবদিহী করিবার নিমিত্ত মহারাজকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। মহারাজ এখানে আসিয়া কোন সন্তোষ-জনক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে তাঁহাকে অনেক দিন কারাগারে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময় হইতেই নায়েব দেওয়ানের পদটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। মহারাজ গত কল্য অনেক কষ্টে কারামুক্ত ও পদচ্যুত হইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোন স্থানে রজনী যাপন করিয়া, অতি প্রত্যূষে দামোদর বাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

দামোদর বাবু একে একে সকল কথাই মহারাজের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া দর দর ধারে অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে। এই ব্যাপার দর্শনে দামোদর বাবু অধিকতর ব্যথিত হইয়া, স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার অশ্রু-জল মুছাইয়া দিলেন এবং নানাবিধ প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। মহারাজ কিছুতেই

সুস্থির হইতে না পারিয়া, বারংবার “হা! অনঙ্গ মোহিনী! মা আমার কোথায় আছ? তোমার শৈশব-কালের সেই অস্ফুট বাক্য গুলি আমার স্মরণ হইতেছে। মা আমার! কোথায় আছ? একবার দেখা দিয়া আমার হৃদয়-শল্য উৎপাটিত কর। আমি যখনই বঙ্গে পদার্পণ করি, তখনই তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই,—কিন্তু কোন স্থানেই তোমায় দেখিতে পাই না; তোমার শোকাতুরা জননীর কষ্ট আর দেখিতে পারি না। মা! এক বার দেখা দাও, আমার নয়ন-চকোরের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর,”—এইরূপ নানাবিধ বিলাপ-সূচক বাক্যে দামোদর বাবুর হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন। দামোদর বাবু তাঁহার এইরূপ শোকমোহের কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিলেন,—“দামোদর! দুর্ভাবনা ত আমার একটি নয়।”

দামো। তার সন্দেহ কি, মহারাজ! উচ্চ বৃক্ষেই ঝড় ঝটিকা অধিক লাগিয়া থাকে। তবে আপনকার শোকের কারণ এই অধীনকে বলিতে হইবে।

রাজা। দামোদর! বিষয়ীর দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? সকলই ত একে একে শুনলে। কিন্তু আর একটি বিষম দুর্ভাবনা সময়ে সময়ে আমার হৃদয়কে জর্জ্জরীভূত করিয়া থাকে।

দামো। মহারাজ! আপনি আমার কাছে সমস্তই অকপটে বলুন,—যদি এই অধীনের দ্বারা কোন প্রতিকার হইতে পারে।

রাজা। দামোদর! সে আশা আমার দুরাশা মাত্র। সে বৎসর কোম্পানী বাহাদুরের সহিত হায়দর আলির যে ভীষণ সমর সমুপস্থিত হয়, তাহাতে আমার জামাতা বিজয় কিশোর এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই কাল সময়ে তিনি আহত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র আমার কন্যা অনঙ্গমোহিনী সমস্ত বেশ ভূষা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, গৈরিক বস্ত্র ধারণ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাই— মা আমার এই বঙ্গদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন।

মহারাজের মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঊর্দ্ধ নয়নে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে, দামোদরের সেই ভিখারিণীকে মনে হইল। ভাবিলেন—ভিখারিণীর তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ দেহযষ্টি গঙ্গামৃত্তিকায় বিলেপিত এবং মস্তক ও মুণ্ডিত, কথাবার্ত্তা, আচার ব্যবহার, সমস্তই অতি পরিপাটী, কণ্ঠের স্বর অতি সুমধুর। তবে ভিখারিণীই বা রাজকন্যা— অনঙ্গমোহিনী? এই ভাবিয়া দামোদর বাবু মহারাজের নিকট ভিখারিণীর বিষয় আদ্যোপান্ত সমস্তই বর্ণন করিলেন। মহারাজ যুগপৎ হর্ষ-বিষাদ-সহকারে বলিলেন,— “ভাল তাঁহার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করাইতে পার?”

দামোদর বাবু বলিলেন,—“হাঁ মহারাজ! তিনি প্রত্যহই আমার দ্বারে ভিক্ষা করিতে আইসেন। একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখনই আসিবেন। তাঁহার আচার ব্যবহার অতীব সুন্দর। তিনি ব্রাহ্মণের বাটী ভিন্ন অন্য কাহারও বাটী ভিক্ষা করেন না। তিনি একাহারিণী ও সর্ব্বদাই বীণা বাজাইয়া গান

করিয়া থাকেন এবং রজনীতে চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া মধ্যস্থলে বসিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করেন।”

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাজা গলদশ্রু-লোচনে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“হায়! মা! আমার কি কষ্টেই দিন যাপন করিতেছেন। হায়! যিনি পদ মাত্র গমন করিতেই ক্লেশানুভব করিতেন, এক্ষণে তাঁহাকে এই প্রচণ্ড রৌদ্রে ভিক্ষার্থ কত ক্রোশ পদব্রজে বিচরণ করিতে হইতেছে। হায়! যিনি দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ব্যথিত হইতেন, নিষ্ঠুর কাল আজি তাঁহাকে কুশাসনে শয়ন করাইয়াছে। ভোজনকালে ক্ষীর সর নবনীতেও যাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিত, এক্ষণে তাঁহাকে মুষ্টি-ভিক্ষার নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইয়াছে! উঃ কালের কি বিচিত্র গতি! কি আশ্চর্য্য প্রভাব!!”

দামোদর বাবু রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ! এতদিনে আপনি ‘হারা ধন’ হস্তে পাইবেন সন্দেহ নাই।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় দ্বারদেশে সহসা মধুর বীণা-ঝঙ্কার হইল। উভয়েই ঔৎসুক্য-সহকারে কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন। দামোদর বাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন, ভিখারিণীই আসিয়াছে। নৈরাশ্য ও আশঙ্কা-বশে মহারাজের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তিনি মনোমধ্যে স্থির নিশ্চয় করিলেন—এ ভিখারিণী কখনই আমার কন্যা নহে। দামোদর বাবু মহারাজকে ইঙ্গিৎ করিবা মাত্র, তিনি তুষ্টিম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বীণাবাদ্য-সহকারে ভিখারিণী বারোঁয়া রাগিণীতে একটি গীত আরম্ভ করিলেন,—

পর লাগি রোয়ো কাহে মন?
পর কি সমুঝে কভু পরেরি বেদন?
ফিরত হো বহুদেশ—
মিলা ত বহুত ক্লেশ,
কাঁহা সো মোহন বেশ
কালিয় বরণ?
নবঘন নাহি দেখি
ঝুরিছে চাতকী-আঁখি,—
এহি কি হামারো, সখি!
ললাট-লিখন?

গীত শুনিয়া মহারাজের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি কথঞ্চিৎ ভাব-গোপন করিয়া রহিলেন। দামোদর বাবু ভিখারিণীকে আর একটি গীত গাহিতে আদেশ করিলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ! বলিতে কি এমন সুমধুর সঙ্গীত আমি আর কোথাও শ্রবণ করিয়াছি কি না, স্মরণ হয় না।

পুনরায় বীণা-ঝঙ্কার আরম্ভ হইল। ভিখারিণী ভৈরবী-খাম্বাজ রাগিণীতে আর একটি গীত আরম্ভ করিলেন,—

দেখিনু দেখিনু শ্যামে কালিম যমুনা-কূলে,
অধরে মধুর বাঁশি বাজে ‘রাধা রাধা’ ব’লে।
মনে হেন সাধ করি,
হেরিব পরাণ ভরি,
কেমনে হেরিব হরি?
পূরিল নয়ন-জলে।
পলকে লুকা’ল কালা,
দ্বিগুণ বাড়িল জ্বালা;
বিরহ-বিধুরা বালা,
দহিনু যাতনানলে।
জ্বলিতে এসেছি ভবে,
জ্বলিয়ে জীবন যা’বে;

কেমনে পাইব কবে
সে চরণ-শতদলে ?

উপর্য্যুপরি দুইটি শোক-সূচক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া, মহারাজের চক্ষে জল আসিল। তিনি দামোদর বাবুকে বলিলেন,—"দামোদর! গীতে আর প্রয়োজন নাই, তুমি ভিখারিণীকে থামিতে বল।"

দামোদর বাবু ভিখারিণীকে সম্মুখে আসিতে বলিলেন। ভিখারিণী সম্মুখে আসিলেন এবং দামোদর বাবুর নিকটে স্বীয় পিতাকে সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক হইয়া রহিলেন। অশ্রুজলে নয়ন-যুগল ভাসিয়া গেল—হস্তহইতে বীণা স্খলিত হইল। তিনি অবিলম্বে বিশ্রাম-গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক পিতার চরণে নিপতিত হইয়া, শোক-ভরে অবিরল বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বহু দিবসের পর কন্যাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া, শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"মা আমার! উঠ, উঠ,—এমন ক'রে আর কত দিন দেশে দেশে ভ্রমণ করবে? তোমার এ বেশ আমি দেখিতে পারি না। চল মা! আমার সঙ্গে ঘরে চল, তুমি বিনা রাজপ্রাসাদ অন্ধকার। আমি তোমার অন্বেষণে কত দিকে কত লোক প্রেরণ করিলাম, সকলেই হতাশ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিল। সুতরাং, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া তোমার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই আমি বঙ্গদেশে পদার্পণ করি, তখনই আমার শোক-সাগর উথলিয়া উঠে। আজি দৈব-বশে তোমাকে পাইয়াছি। তোমায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব। বিধাতা আমাকে রাজ-কার্য্যে অবসর দিয়াছেন।"

অনঙ্গমোহিনী একে একে স্বীয় জননী ও অন্যান্য সকলের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সিতাব রায় মর্ম্মবেদনায় অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন,—"অনঙ্গে! সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে,বহু দিবস হইল আমি কাহারও কোন সংবাদ জানি না। তাঁহারা জীবিত কি মৃত তাহাও জানি না। তুমি মা! ঘরে চল—সকলই জানিতে পারিবে।"

অনঙ্গ পিতার এই অসঙ্গত বাক্যের মর্ম্মানুধাবন করিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"বাবা! আপনার কথা যে আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

মহারাজ একে একে সকলই বর্ণনা করিলেন। অনঙ্গ সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাটী-প্রত্যাগমন প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। পিতার অনুনয়ে কেবল এই মাত্র বলিলেন,—"বাবা! আমি এখন কোন কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছি, ব্রত সাঙ্গ হইলে আমি অপনিই বাটী প্রত্যাগমন করিয়া, আপনকার ও মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আপনি এখন ধৈর্য্যধারণ করুন্, বিলাপ বাক্যে আমাকে আর কাঁদাইবেন না। এখন বাটী প্রত্যাগমন করিলে, আমার অনেক অনিষ্ট হইবে জানিবেন।"

সিতাব রায় দেখিলেন, কন্যার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নয়, অগত্যা সম্মত হইলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। দামোদর বাবু আজ আর ভিখারিণীকে ভিক্ষা দিয়া বিদায় না

করিয়া বলিলেন,—"মা! আজ আপনার এই-খানেই সেবা হইবে।" অনঙ্গ সম্মত হইলেন।

দামোদর বাবুর গৃহে মহা সমারোহ পড়িয়া গেল। মহারাজকে ভোজন করাইবার উপলক্ষে, কয়েকজন সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীকেও নিমন্ত্রণ করা হইল। পুষ্করিণীতে জাল ফেলা হইল। কলসী ভরিয়া দুগ্ধ দোহন করা হইল, বাগান হইতে ভারে ভার তরি তরকারি আসিয়া পড়িল। পুরবাসিনি গণ মহা ধুমধামে রন্ধনাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। হৈমবতী স্নানাদি করিয়া, শুদ্ধান্তঃকরণে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপিনান্তে মহারাজ বাটী প্রত্যাগমন করিয়া, কন্যা ও নিমন্ত্রিতগণের সহিত ভোজন করিতে বসিলেন এবং দেব-দুর্ল্লভ অন্ন ব্যঞ্জনাদি আস্বাদন করিয়া রন্ধনের ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ভোজনান্তে সকলে বিদায় হইলে মহারাজ শয়ন করিলেন। অনঙ্গমোহিনীও কিয়ৎক্ষণ পিতার পরিচর্য্যা করিয়া, নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

নিদ্রাভঙ্গে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া স্বদেশযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনঙ্গ মোহিনী পিতার বাটী গমনের সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন। মহারাজ সজল নয়নে কন্যাকে দামোদর বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইলেন। দামোদর বাবু সঙ্গে লোক দিলেন। তাহারা মহারাজের শিবিকা সমভিব্যাহারে চলিল এবং তাঁহাকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিল। দামোদর বাবু অনঙ্গমোহিনীকে থাকিবার স্থান দিলেন এবং তিনিও ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পাঠশালা।

পা ভাঙ্গিয়া অরুণ বাবু এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। কাজ কর্ম্ম সকলই বন্ধ। তিনি আর রাজ-সরকারে চাকরী করিতে যাইতে পারেন না। দেশের বৈদ্য আনিয়া একত্র করিয়া ছিলেন,—কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। লোকে বলে,—"ভগবানের মার, মনুষ্যে কি করিতে পারে।" পৈতৃক যাহা কিছু ছিল, উদরান্নের সঙ্কুলান করিতে গিয়া তৎসমুদয় প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। আজ এটি বিক্রয় করিয়া, কাল ওটি বন্ধক দিয়া, এক প্রকার 'দিনপাত হইতে লাগিল। যাহা হউক—আর চলে না। বৃহৎ সংসার কেমন করিয়া চলিবে, এই চিন্তাতেই তিনি দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিলেন। তাহার উপর আবার পরিবারের গঞ্জনায় ও বন্ধুগণের লাঞ্ছনায়, তাঁহাকে এক প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইয়াছে। বাটীতে বসিয়া কি কাজ করিতে পারা যায়, কিসেই বা দু'পয়সা আসে, অহরহ এই চিন্তা করিতে করিতে, পরিশেষে স্থির করিলেন যে, একটি পাঠশালা খুলিবেন। পেটে কালির অক্ষর আছে, ছেলে পড়াইয়া অনায়াসে ১৫।২০ টাকার সংস্থানও হইতে পারিবে—আর খোঁড়া পা লইয়া কোথাও যাইতে হইবে না।

শুভ দিনে, শুভক্ষণে, বাটীর চণ্ডী-মণ্ডপে

পাঠশালা খোলা হইল। অনতিবিলম্বেই ৪০।৫০ টি পড়ুয়া জমা হইল। অরুণ বাবুর মৃত দেহে ক্রমে জীবন-সঞ্চার হইতে লাগিল। সকাল বিকাল পাঠশালা খোলা হয় এবং ক, খ আঠার ফলা হইতে চাণক্য-শ্লোক, রামায়ণ ও মহাভারত পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। মাসিক মাহিয়ানা ত আছেই,—এ সওয়ায় ছাত্রগণ প্রত্যহ চাল, দাল, তরি তরকারি, তামাক্ প্রভৃতি নিত্য সরবরাহ করিয়া থাকে। অরুণ বাবুর সংসারটাও এক প্রকার চলিয়া যায়।

ক্রমে ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সংখ্যায় বহু হইলেই, পাঁচ রকমের পাঁচটা জুটিয়া থাকে। যে সকল ছাত্রেরা জন্মাবধি দুষ্ট, কেবল অভিভাবকের তাড়নায় পড়িতে আইসে, তাহাদের কিছু হওয়াই দায়। তাহারা মনে করে, আমরা লিখিলে পড়িলে, গুরুমহাশয়ের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হইবে। তাহাদের সঙ্গ-দোষে পাঁচটা ভাল ছেলেও মন্দ হইয়া যায়। বিশেষতঃ, অরুণ বাবুর খঞ্জদশা-নিবন্ধন দুষ্ট বালকেরা নিতান্তই প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। অরুণ বাবু কি করেন, যখন 'গুরুমহাশয়' হইয়া বসিয়াছেন, তখন শাসনও করিতে হইবে। সুতরাং তিনি নিত্য একগাছি লম্বা বেত কাছে রাখিয়া বসিতেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হইত না; কারণ, তিনি বেত উচাইলেই তাহারা একটু তফাতে গিয়া দাঁড়াইত, অরুণ বাবু আর কেমন করিয়া লাগাল পাইবেন? যদি তিনি প্রাণপণ যত্নে উঠিয়া দাঁড়াইতেন, তখন তাহারা "হা শালার খোঁড়া গরুমশাই রে!" বলিয়া দূরে পলায়ন করিত। পড়া শুনা যত হউক বা নাই হউক, অরুণ বাবুর সংসার চলা লইয়া বিষয়। কিন্তু দুষ্ট বালকদিগের হস্তে পড়িয়া, তাঁহাকে কখন কখন নরক-যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। কেহ হুঁকায় জল ফিরাইতে গিয়া কারচুপি খেলিত, কেহ বা তামাকে লঙ্কার বিচি বা কোন প্রকার অস্পৃশ্য বস্তু মিশাইয়া দিত। এই সকল উৎপাত নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে দুই একজন 'সরদার পড়ুয়া'র শরণাপন্ন' হইতে হইয়াছিল। সরদার পড়ুয়ারা দুষ্ট বালকদিগকে তাঁহার নিকট ধরিয়া আনিলে, তবে তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিতেন; সুতরাং, তাহাদের আবদারও তাঁহাকে অনেক সহ্য করিতে হইত। সরদার পড়ুয়াদের তিনি কিছুই বলিতেন না। এরূপে প্রশ্রয় পাইয়া তাহারাও আদরে আট্খানা হইয়া তাঁহাকে নানা কথা শুনাইয়া দিত। অরুণ বাবুর উভয় সঙ্কট,—বেঁধে মারে সয় ভাল।

একদা জীবনকৃষ্ণ নামে একটি সরদার পড়ুয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল,—"গুরুমহাশয়! পূজা ত এলো, আমাদের বন্ধ দেবেন ক'দিন?

অরু। পূজার আবার বন্ধ কেন? আমার এখানে বন্ধ টন্ধ হইবার যো নাই। পূজার ক'দিন সকাল সকাল ছুটী পাবি, পূজা দেখে বেড়াবি।

জীব। সে কি গুরুমশায়! বলেন কি? আমরা ত আর আপনার মত বুড়ো হই নি যে, আমাদের কোন সখ্ নাই,—আর আমাদের পাও খোঁড়া হয় নি যে, ঘরের ভিতর চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌ব।

অরু। দ্যাখ্—বেশি বাড়াবাড়ি করিস্‌নে।

জীব। আমি আর বাড়াবাড়ি কল্লুম কই? আপনিই ত একে বারে রুকে উঠলেন।

অরু। আচ্ছা, আচ্ছা, চার দিন ছুটী পাবি যা; এই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী,—তা' হ'লেই ত হ'বে ?—

জীব। সে কি ? গুরুমহাশয় ! তা'ও কি কখন হ'য়ে থাকে ? নিদেন দশ পনের দিন বন্ধ না পেলে কি আর পূজার আমোদ হ'য়ে থাকে ?

অরু। যা—যা, অত সুখে আর কাজ নাই। আমি দশ পনের দিন বন্ধ দিই, আর বাবুরা টো টো ক'রে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, সব পড়া শুনা ভুলে যান আর কি ?

জীব। আচ্ছা যেন অত দিন বন্ধ দিবেন না—বিজয়ার দিন কি অপরাধ কল্লে ?

অরু। আরে সে দিন আবার ছুটী কেন ? সে দিন ত পূজা শেষ হ'য়ে গেল, কেবল ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জ্জন, আর সন্ধ্যার পর কোলাকুলি, নমস্কার, প্রণাম, ইত্যাদি। তা'তে আবার পড়া শুনা বন্ধ দেওয়া কেন ?

জীব। আপনি কি না কোথাও যেতে পারবেন্ না, তাই জন্যে এমন কথা কচ্ছেন, বুঝেছি।

পাঠশালা খোলা থাকিলে, অরুণ বাবুর ডানি হস্তের ব্যাপারটা চলে ভাল; সুতরাং, ছুটী ছাটার বিষয়ে তিনি নিতান্ত নারাজ। জীবনকৃষ্ণ এরূপ কথা বলাতে, তিনি আন্তরিক রাগান্বিত হইয়া, তাহাকে "ঠোঁট কাটা" বলিয়া গালি দিলেন, আরও বলিলেন,—"বেটা সোণার বেনে! বেটার ছায়া মাড়া'লে, নাইতে হয়; বেটার আবার লপ্ চপানি দেখ, বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা, এখনি নাগ কেটে পাঠশাল থেকে তাড়িয়ে দিব, জানিস্ নে ?"

এই কথা গুলি অরুণ বাবু যদিও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাপি জীবনকৃষ্ণের অন্তঃকরণে আঘাত লাগিল। জীবন, গুরুমহাশয়কে মুখের উপর কিছু বলিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল,—"ওঃ ! আমি হ'লেম 'সোণার বেনে' আমার ছায়া মাড়া'লে নাইতে হয়—বেটা আমার কি ব্রাহ্মণ এসেছেন গো ! বেটা পরদার কর্‌তে গিয়ে,পা ভেঙ্গেছেন, আবার এখানে বাম্‌নামি ফলা'তে এসেছেন। এমন বামুনকে যদি আর কোথাও পেতেম, তা' হ'লে—আর কি বল্‌ব ?"

বাহিরে কোন রাগ প্রকাশ না করিয়া, জীবনকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন গুরুমশায় ! আমাদের ছায়া মাড়া'লে নাইতে হয় কেন ?"

অরু। তোরা যে পতিত—আজ ব'লে নয়—বল্লাল সেনের আমল থেকে তোরা পতিত। তোদের দারুণ অহঙ্কার দেখে বল্লাল সেন তোদের পতিত ক'রে যান—

জীব। তবে গুরুমহাশয় ! আমরা জাত ভাল—কেমন ? কেন না, আমরা আগে উঁচুতে না থাকিলে আর আমাদের নীচে ফলে দিলেন কেমন ক'রে ? যে বরাবর নীচে আছে, তা'কে আর নীচে কি ক'রে ফেল্‌বেন ? যে সোণা সে সোণাই আছে, আস্তাকুড়ে ফেলে দিলে কি তার মূল্য কমে ?

অরু। আর যতই বল, বাছাধন ! খুঁড়িয়ে বড় হ'লে চল্‌বে না—

জীব। আজ্ঞে তা' কি আর হ'য়ে থাকে ? আপনা হ'তেই দেখুন না কেন ?

অরু। আরে—আরে—আরে—এ বেটা

কে যে পারবার যো নাই রে! একটা হাড়ির কি একটা মুচির জল খেতে পারি,—তবু তোদের জল ছুঁতে পারি নে—তা' জানিস্?

জীব। আজ্ঞে, সে টা আমাদেরি শাপে বর হ'য়েছে জানবেন্। আমাদের কতটা রেহাই দেখুন দেখি? এই দুর্ভিক্ষের সময় আপনারা যদি গোষ্ঠি শুদ্ধ আমাদের বাড়ীতে গিয়ে পড়্‌তেন, তা' হ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'ত, বলুন দেখি? মিছে ঝঞ্ঝাট,—আর বাজে খরচ কত বাড়্‌ত?

অরু। আরে, অমন কথা মুখে আনিস্‌নে, এই বুঝি বিদ্যে হচ্চে দিনকের দিন? ব্রাহ্মণকে দিলে কি বাজে খরচ হয়?

জীব। আজ্ঞে হাঁ, তা'ও শুনেছি যে, ব্রাহ্মণকে এক গুণ দিলে, সহস্র গুণে পাওয়া যায়। তবে ব্রাহ্মণ পাই কোথা? সে ত আপনিই ব'লেছেন, সে অনেক দূরের কথা। আমার বাবা সর্ব্বদাই ব'লে থাকেন,—"আপনাদের তিন ফুঁয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যে একটু লেখা পড়া শেখে,সে কাণে ফুঁ দেয়; যে তার নীচে, সে শাঁখে ফুঁ দেয়; আর যে কিছুই জানে না, সে চোঙ্গায় ফুঁ দেয়—এই তিন ফুঁ। এ তিনের ভিতর ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি আছে, বলুন দেখি? আমি ত নিজে কিছুই বল্‌ছিনে, আপনার কাছেই শুনেছি, যে ব্রহ্মকে জেনেছে সেই 'ব্রাহ্মণ।'

অরু। অরে! রাখ্ রাখ্, ঢের জ্যাঠামী শিখেছিস্, ছোঁড়ার মুখে যেন খই ফুট্‌ছে রে!

জীব। আজ্ঞে ফুট্‌বে না ত কি? আপনার ছাত্র।

অরু। তাই বুঝি এই গুরুমারা বিদ্যে হচ্চে?

জীব। আজ্ঞে এমন আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন্ না। তবে কি জানেন—আরসির মুখ—আপনি যদি আমায় 'সোণার বেনে' ব'লে ঘৃণা করেন, তা' হ'লে আমিও কি আপনাকে 'কলির বামুন' বলে ঘৃণা কর্‌তে পারি নে? বিভীষণ যে দিব্য ক'রেছিলেন সে ত আপনিই রামায়ণে পড়িয়েছেন, আমি নিজে ত আর কিছু বল্‌ছিনে।

অরু। অরে! ব্রাহ্মণ হ'লেন উচ্চ জাতি—উচ্চ বর্ণ—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরু।" গুরু নিন্দা করিস্ নে—অধঃপাতে যাবি।

জীব। আজ্ঞে হাঁ—তা' দু'শ বার। উচ্চ জাতি বল্‌ছেন—জগতে কি কারো জাত আছে নাকি? জাত—অজাত সকলই ব্যবসা ধ'রে ত? এই দেখুন না কেন—আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে—আপনি যাগ, যজ্ঞ, পূজা হোম সমস্ত ত্যাগ ক'রে, ফিরিঙ্গির চাকরী করতে গিয়েছিলেন—তবে ত আপনি শূদ্রের দলে প'ড়ে গেলেন, আজ কালই যেন ঠ্যাং খোঁড়া হ'য়ে গুরুমশায় হ'য়ে বসেছেন।

অরু। মার ত বেটা পাজীকে, যত বড় মুখ তত বড় কথা—অরে সে যা হোক্ তুই যে জমীদার বাবুর বাড়ীর কাছে থাকিস্, তোকে একটা কানে কানে কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি।

জীবনকৃষ্ণ কাণ বাড়াইল, অরুণ বাবু কি বলিলেন, তাহা অরুণ বাবুই জানেন, আর জীবনই জানে, কিন্তু কথাটা জীবনকৃষ্ণের বড় ভাল লাগিল না। ক্রোধে ওষ্ঠাধর প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। বলিল,—"গুরুমশায় ও সকল কি কথা? যতই বলি না কেন, আপনাকে গুরু ব'লে মান্য করে থাকি। আপনার স্বভাব যেমনই হোক, আপনি আমা-গুরুমশায় বটেন। কার বাড়ীর কে কেমন,

তা' আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? আপনি অপর ঘরের দোষ দেখেন—গলদ্ দেখেন, আপনি নিজে কি, বলুন দেখি? যা'দের ভিতর দু'শ, আড়াই শ, তিন শ বিবাহ করিবার প্রথা আছে, তা'দের আর মুখ নেড়ে কথা কওয়া ভাল দেখায় না। নিজের গলদ্ না দেখে পরের গলদ্ দেখেন? এত কথা বল্‌তেম না, আপনি কথাটা বড় বেঠিক কইলেন নাকি, তাই বল্‌লেম। আপনি আমার নাম কেটে দিন, আমি আর কাল থেকে আস্‌ব না, যেখানে পড়্‌তেম্ সেই খানে যাব।

অরুণ বাবু দেখিলেন, মহা বিভ্রাট,—একটা সরদার পড়ুয়া কমিয়া যায়। জীবনের গায়ে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন, "এত রাগ কেন?—ছুটী পাবি ভাবনা কি? আর তোরা ভিন্ন আমার আর কে আছে, বল দেখি? দু' এক কথা তোদেরই বলি, আর তোদেরই কাছ থেকে দু' এক কথা শুনি,—আর কোথাও ত আমি যাই নে।

জীবনকৃষ্ণ বলিল,—"আপনি ছুটী দেন আর না দেন, ছুটী আমরা আদায় কর্‌বই। আমার বাবার সঙ্গে প্রতাপ বাবুর বেশ আলাপ আছে। তাঁকে ব'লে দিলে আপনি ছুটী দেবার পথ পাবেন না।

অরুণ বাবুর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল,—মুখ শুকাইয়া গেল। বলিলেন,—"তোমার বাবাকে আর এসব কথা বল্‌তে হ'বে না, আমি নিজেই এ বিষয় বিবেচনা কর্‌ব। ছুটীর জন্যে জমীদারের বাড়ী যাবি, সে কি হ'য়ে থাকে? তোদের ছুটী দিয়ে, আমি মুখ পুড়িয়ে ব'সে থাক্‌ব? ছুটীর চেয়ে অছুটীই আমার পক্ষে লক্ষগুণে ভাল. ছুটো ছুটী কর্‌বার ক্ষমতাও আর আমার নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া জীবনকৃষ্ণ জীবন সদৃশ ঠাণ্ডা হইয়া গেল; বলিল,—"গুরুমহাশয়! দোল, দুর্গোৎসবে ছুটী না পেলে আর হলো কি, বলুন দেখি"—যে দু'টা বাঙ্গালীর প্রধান পরব্।

অরু। দোলটা আমাদের পরব তোরে কে বল্‌লে? ও, ত খোট্টাদের পরব। ওরাই ফাগ্ মেখে হোলি খেলে বেড়ায়।

জীব। এই ত এই ত গুরুমহাশয়! কথাটি বেঠিক কইলেন। এ আপনি আবার কোন শাস্ত্র দেখে বল্‌লেন?

অরু। আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হ'বে; এখন ত আর দোল আসেনি, আজ বল্‌বি দোলের ছুটী দাও, কাল বল্‌বি শিবরাত্রের ছুটী দাও—তা' হ'লেই হ'য়েছে আর কি।

জীব। ঐযে ঐযে—আবার কি বল্‌ছেন? দোলটা হলো খোট্টাদের, আর শিবরাত্রিটা কি তবে মুসলমানদের পরব না কি? ছুটী সব পরবেই চাই। ফাকি দিলে চল্‌বে না।

জীবনকৃষ্ণ প্রতাপ বাবুর নাম করাতেই অরুণ বাবুর ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে। দুই এক কথা যাহা বলিতেছেন—সে কেবল মুখের বড়াই। জীবনের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"অরে বাপু! সে যখনকার কথা তখন আছে, এখনই 'ছুটী ছুটী' ক'রে গোল বাধাচ্চিস্ কেন?"

জীব। এখন পথে আসুন।

অরুণবাবু দেখিলেন ক্ষুদে পিপীড়ার বড় কামড়। কামড় খাইয়া নীরব হইলেন। অপরাপর বালকেরা পরমাহ্লাদে হাততালি দিয়া উঠিল এবং জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া মহা গোলমাল করিতে লাগিল। অরুণবাবু গোল থামাইয়া বলিলেন,—"তোদের কথাও

থাক্, আমার কথাও থাক্, পূজায় বার দিন ছুটী হইবে।”

সকলে হাততালি দিয়া নাচিয়া উঠিল। অরুণবাবু দেখিলেন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, পাঠশালা বন্ধ করিলেন।

অরুণবাবু স্বীয় পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া এত শাস্তি পাইয়াছেন, তথাপি, তিনি সহচরীর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, যদুনাথ গয়া যাত্রা করিয়াছেন। লালসার বশীভূত হইয়া তিনি এই পূজার অবকাশে একদিন যষ্টিভর করিয়া, প্রতাপ বাবুর বাটীর নিকট পর্য্যন্ত গমন করিলেন। দৈবাৎ প্রতাপ বাবুর ছাদের উপর হইতে একখানি বৃহৎ ঝামা তাঁহার পায়ের নিকট পতিত হইল। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া,তিনি কথঞ্চিৎ দ্রুত পদে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং সহচরীর আশায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দিলেন।

ক্রমশঃ

জাতীয় সম্মিলন।

যে যেথায় আছ হও জাগরিত,
শোনি সম্মিলন-সঞ্জীবনী গীত;
কাঁপাইয়া ব্যোম—বিশাল জলধি,
কুমারিকা হ'তে হিমাদ্রী অবধি—
“ছুটিয়া সে ধ্বনি করিছে জ্ঞাপন,—
উঠ, জাগ সবে ভারত-নন্দন!
ভারতের হিত হইবে সাধিত,
ভারত-ললাটে হইয়া উদিত,
ভারতের সুখ-রবি পুনরায়
জগৎ উজ্জ্বল করিবে প্রভায়;
ভুবন ভরিয়া ছড়া'বে কিরণ,
উঠ জাগ সবে—কেন অচেতন?
মিলিয়া সকলে জাহ্নবীর কূলে,
জাতীয়-মিলন-সঙ্গীত গাও।”

শুন, শুন, ওই ভেরীর নিনাদ,—
“ত্যজ অভিমান,—বাদ বিসম্বাদ,
যে যেথায় আছ ভারত-সন্তান
উঠ, জাগ, কেন অবসন্ন প্রাণ?
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টীয়ান্,
মাদ্রাজী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, পাঠান,
ভারত-হিতৈষী—পারশী, ইংরাজ,
কোথা আজি স্বাধ্ রাজা মহারাজ!
ভারত-মাতার দুঃখ অবসান
করিতে, সকলে হও যত্নবান্;
ভারত-উজ্জলা শিক্ষিতা রমণি,
শিক্ষিত যুবক, জেনানা মিশনি!
এস ভাই বোনে সবে এক প্রাণে,
জাতীয়-মিলনে মিলিত হও।”

“এস ভাই! সবে কর প্রাণ পণ,
জননীর দুঃখ করিতে মোচন,
র'য়েছে উন্মুক্ত—উন্নতির পথ,
হ'বে আমাদের—পূর্ণ মনোরথ;

হইয়াছে কাল প্রসন্ন এখন,
হের হইয়াছে সহায় বৃটন;
কেন তবে আর হ'তেছ নিরাশ?
ভারত-বিপিনে বহে সুবাতাস;
তাই বলি, সবে হ'য়ে এক প্রাণ,
ভারতের দুঃখ কর অবসান;
ভারতের দুখে আমাদের দুখ—
ভারতের সুখে আমাদের সুখ—
এস মিলে সবে পুনঃ সগৌরবে,
জাতীয়-পতাকা উড়া'য়ে দাও।"

"আপনার দুঃখ করিতে মোচন,
হইবে বিমুখ কে আছে এমন?
কোন্ হিন্দু-প্রাণ থাকিবে নিশ্চিন্ত
মাতৃ-পূজা-ব্রতে হইয়া বিরত?
এর চেয়ে আর কিবা মোক্ষ-ফল—
আছে এ বিশাল ধরাতলে বল?
কিবা হিন্দু আর কিবা মুসলমান,
ভারতে যাহার আছে বাসস্থান;
কিবা সে খ্রীষ্টান্—কিবা সে আর্ম্মাণী,
ভারত যখন সবার জননী;
তখন, সকলে বৈষম্য ভুলিয়া,
ডাক সমস্বরে জননী বলিয়া;
ভ্রাতৃভাবে মিলে জয়-মাল্য গলে
ভারত-মাতার আশীষ লও।"

জাহ্নবীর কূলে কলিকাতা-পুরী,
হইল শোভিত সুন্দর সাজে;
ভারত-গগনে জাতীয়-পতাকা
উড়া'য়ে অদূরে বাজনা বাজে।

ত্যজি নিদ্রা সবে হইল জাগ্রত
জাতীয়-মিলন সঙ্গীত শুনি;
সবে এক প্রাণে হইল মিলিত
কিবা বৃদ্ধ যুবা দরিদ্র ধনী।

দুঃখ-বিমোচন— পথ-প্রদর্শক
ভারত হিতৈষী বৃটনবাসী—
হইল মিলিত ভারত-সন্তান
ভুলিয়া বৈষম্য সকলে আসি।

হইল মিলিত রাজা মহারাজ,
"ভারত-নক্ষত্র" বাঁধিয়া গলে;
বদ্ধ পরিকর সন্তান-নিকর
জননী-চরণ পূজিবে ব'লে।

উঠ উঠ মাতঃ! ত্যজগো বিষাদ,
হৃদয় খুলিয়া কর আশীর্ব্বাদ;
অভাগা তোমার সন্তান সবে,
উঠ মাতঃ! অশ্রু কর বিমোচন,
আমাদের আশা হইবে পূরণ,
হ'য়েছে বৃটন সহায় এবে;
কেঁদোনা জননি! হইয়া নিরাশ,—
হের পূর্ব্বদিকে ঊষার বিকাশ,
সুখ-সূর্য্য পুনঃ উদিত হ'বে।

কর আশীর্ব্বাদ,—হৃদয় খুলিয়া,—
সকল অভাব যাইবে ঘুচিয়া,
হইব সফল তোমার বরে;
তাই আজি মাতঃ! আমরা সকলে,
পূজিতে তোমার চরণ-যুগলে,
র'য়েছি দাঁড়া'য়ে যুগল-করে;
হৃদয় খুলিয়া কর আশীর্ব্বাদ,
পুরাও জননি! অন্তরের সাধ,
হইব সফল তোমার বরে।

গললগ্ন বাসে ল'য়ে পুষ্পাঞ্জলি
সকলে জননী-চরণ পূজে;
'বৃটনের জয় ভারতের জয়'
অদূরে বিজয়-বাজনা বাজে।

জননীর পূজা করি সমাধান
জয়মাল্য সবে গলায় পরে;
মেলিয়া নয়ন ভারত-জননী
কহিলা, তখন আবেগ-ভরে;—

"ফিরে কি আবার আসিবে সে দিন—
হ'বে দীপ্তিমান্ বদন মলিন!
কাল-গর্ভে যাহা হ'য়েছে বিলীন,
আবার সে দিন দেখিতে পাব!

মম সন্তানের ফিরে কি আবার
এই কোলে বসি করিবে প্রচার
সমগ্র জগতে মহিমা অপার
ফিরে কি জগত-জননী হ'ব!

এযে তোমাদের অসীম বাসনা,
আমি যে ভারত অতি ভাগ্যহীনা,
তোমাদের মধ্যে কে আছে বলনা?
সেই পূর্ব্ব তেজ কাহার আছে?

ছিলাম তখন জগত-পূজিত
শুন সন্তানেরা হবেনা নিশ্চিত
হবে না—হবে না সে দিন উদিত,
সে আশা আমার ঘুচিয়া গেছে।

জগত-উজ্জ্বল—অমূল্য রতন
পূর্ব্বেতে যখন মম পুত্রগণ
"জননী" বলিয়া ডাকিত, তখন
সমগ্র-মেদিনী কম্পিত হ'ত;

বৃথা আশা—আর হ'বেনা সেদিন,
কাল-গর্ভে যাহা হ'য়েছে বিলীন;
ছিল যে তাহারা মাতৃ-আজ্ঞাধীন,
তোরা কি এখন তা'দের মত?

ছিল যে তাহারা দৃঢ় ভক্তিমান্
নাহি যে তোদের হিতাহিত-জ্ঞান,
আত্ম-গরিমায় মত্ত – ক্ষুদ্র-প্রাণ,
কোন্ গুণে তোরা সে শক্তি চা'স্?

গেছিস্ ভুলিয়া হিন্দু-ব্যবহার,
গেছিস্ ভুলিয়া পবিত্র আচার;
দেখিস্ না চেয়ে দুর্দ্দশা মাতার,
কি দেখে হইবে হৃদয়ে আশ?

শোন বলি ওরে অবোধ সন্তান!
এমনি কি তোরা হ'লি হতজ্ঞান—
ভেবেছ কি পুনঃ নিশা অবসান
তোমাদের হ'তে ভারতে হ'বে?

ছিল বটে কিছু আশার সঞ্চার,
এই কোলে যবে করিত বিহার—
রাজা রাধাকান্ত বাছা সে আমার
অথবা সে রামগোপাল যবে।

ভারতের বল ভরসা কি হায়,
যে দিন হরিষ ল'য়েছে বিদায়;
কৃষ্ণদাস যবে লুকায়েছে কায়
মম অঙ্ক-স্থল আঁধার করি;

আছে বটে এক রাজেন্দ্র আমার
সংগ্রামে অটল—অটল কুমার,
জরাজীর্ণ এবে সেও যে আবার;
বাঁধিব এ বুক কাহারে হেরি?

শিশুমতি তোরা—অতীব চঞ্চল,
সকল উদ্যমে হ'তেছ বিফল,
সকল বিষয়ে ঢাল অশ্রুজল,
তথাপি তোদের বিরাম নাই;

এই যে সে দিন "ইলাবতী" বলি
মাতাইল যবে ভারত-নিখিল,
উঠিতে সে কথা অমনি শিথিল
তোদেরি মুখেতে পড়িল ছাই।

সুপ্ত সিংহে বাছা জাগায়ো না আর,
রাখ রাখ ঢেকে বাসনা অপার;
কোটি অস্ত্রাঘাত উরসে আমার,
তোদেরি কারণে সহিয়ে রই;

পদ-বিদলিত হ'য়ে বারবার
তবুও হৃদয়ে দুরাশা-সঞ্চার;
ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কটু ব্যবহার,
তোদেরি কারণে কতই সই।

যে পথে তোমরা করিছ গমন,
হ'বেনা সে পথে স্বকার্য্য-সাধন;
কাহারে দেখাও ভ্রুকুটি ভীষণ—
গ্রাহ্য তোমাদের কেই বা করে?

নিদ্রিত-কেশরী হ'লে জাগরিত,
করিবে আবার পদ-বিদলিত;
তর্জ্জন গর্জ্জন হ'বে তিরোহিত—
কে কোথা তখন পলা'বে ডরে।

এমনি তোদের স্বভাব উদ্ধত,
বলি যদি হিত—ভাব বিপরীত!
পাশ্চাত্য শিক্ষায় হইয়া শিক্ষিত,
বিকৃত-মস্তিষ্ক তোরা যে এবে;

দেখাও আমারে 'উষার বিকাশ,'
হেরিয়া হ'তেছে হৃদয় হতাশ,
হইয়াছে মোর কণ্ঠাগত শ্বাস,
বুঝি বা এখনি জীবন যা'বে।

নহে—নহে—উহা উষার বিকাশ,—
নির্ব্বাপিত-দীপ—জ্বলন্ত প্রকাশ,
এখনি এখনি পাইবে বিনাশ;
ভারতের নাম যাইবে ডুবে।

ডুবিবে এখনি ভারতের নাম,
দেখিস্ না চেয়ে তোরা পরিণাম
বৃটিশের পূর্ণ হ'বে মনস্কাম,
'ইণ্ডিয়া' নামেতে ঘোষিত হ'বে।

ধর্ম্ম-পরিপূর্ণ হিন্দুর আচার,
তাই, হিন্দুস্থান অবনীর সার,
সতীর গৌরবে গৌরব ইহার,
ভারতের কোথা তুলনা বল?

জ্বলন্ত নরক—পাপের বিস্তার,
মূর্ত্তিমতী-বেশ্যা, ঘরে ঘরে যার,
সেই সভ্য দেশ—পূর্ণ ব্যভিচার,
হ'য়েছে তোদের আদর্শ-স্থল!

করিয়াছ ত্যাগ—পবিত্র আচার,
শিখিয়াছ শুধু—ম্লেচ্ছ ব্যবহার,
দেখিতেছি তোরা নিতান্ত অসার;
তোদের মতন দ্বিতীয় নাই।

জরাজীর্ণ এবে—আছে মাত্র প্রাণ,
আর নাহি সহে এত অপমান;
বৃটিশ-সিংহের উদ্যত কৃপাণ
দেখিয়া, মরমে মরিয়া যাই।

কথা নাহি রাখ বলি বার বার
এমনি কি তোরা হ'লি কুলাঙ্গার,
কুসন্তান বটে তোরা যে আমার,
আমি ত কুমাতা কদাপি নই।

সুপ্ত সিংহে বাছা! জাগায়োনা আর,
রাখ রাখ ঢেকে বাসনা অপার;
কোটী অস্ত্রাঘাত উরসে আমার,
তোদেরি কারণে সহিয়ে রই।"

হইনা নীরব ভারত-জননী
মুছিয়া অঞ্চলে নয়ন-নীর;
বিনত বদনে সন্তান সকলে
রহিল দাঁড়া'য়ে স্তম্ভিত, স্থির।

কতক্ষণ পরে জননী আবার
মেলিয়া নয়ন চাহিলা ফিরে;
ধরিয়া তখন জননী-চরণ,
সন্তান-নিকর কহিল ধীরে;—

"হয়োনা বিমুখ—কর আশীর্ব্বাদ,
পুরাও জননি! অন্তরের সাধ,
হইব সফল তোমার বরে;

জয়-মাল্য সবে পরেছি গলায়
হইব সফল তোমার কৃপায়,
হইব সফল তোমার বরে;

হৃদয় খুলিয়া কর আশীর্ব্বাদ,
পুরাও জননি! সন্তানের সাধ,
হইব সফল তোমার বরে।"

শুনিয়া জননী কহিলা তখন,—
"তোরা যে আমার হৃদয়ের ধন,
তোদের আশয়ে ধরি এ জীবন,
কে আছে আমার তোদের সম;

এই হিন্দুস্থান অবনীর সার,
হিন্দুর গৌরবে গৌরব ইহার;
ক'রোনা বিকৃত হিন্দুর আচার,
হইবে তাহ'লে সফল শ্রম।

করি আশীর্ব্বাদ—ঘুচুক দুর্গতি,
করি আশীর্ব্বাদ হউক সুমতি,—
রাখ যদি বাছা! মায়ের মিনতি,
হইবে উজ্জ্বল ভারত-নাম;

তবে যদি যাও—করি আশীর্ব্বাদ,
ঘটে না ঘটে না যেন পরমাদ;
বিজয়ীর সনে ক'রোনা বিবাদ,
তবে ত হইবে সফলকাম।

মাথা পেতে বাছা! লও দুর্ব্বাধান,
তোরা যে সকলে ভারত-সন্তান
জননী-বচন কর অবধান
ভুলোনা, ভুলোনা মায়ের কথা;

ভারতের নামে পূরিত সংসার,
ভারতের নামে ঈর্ষা সবাকার,
ভারতের দুঃখ ঘুচিবে কি আর!
তাই ত মরমে লেগেছে ব্যথা।

মহৎ উদ্দেশ্য বাছা! তোমাদের,
না জানি কি হ'বে অদৃষ্টের ফের,
তোরা যে আমার ধন হৃদয়ের,
কে আছে আমার তোদের মত?

যাও পুত্রগণ! প্রফুল্ল বদনে,
হওগে মিলিত জাতীয় মিলনে,
হইয়া অটল অতি সাবধানে,
"স্বকার্য্য-সাধনে হওগে রত"।

জননী-নিকটে ল'য়ে আশীর্ব্বাদ
করে জয়-ধ্বনি সন্তান সবে;
'ভারতের জয় বৃটনের জয়'
বাজিল বাজনা, গভীর রবে।

কলিকাতা-মাঝে 'ত্রিবলি-উদ্যান'
বিরাজে মোহন সৌন্দর্য্য ধরি—
সমগ্র-ভারত করিয়া কম্পিত,
বাজিল আনন্দে বিজয়-ভেরী—

"ক'রেছে জননী সবে আশীর্ব্বাদ,
ঘুচাও সকলে বাদ বিসম্বাদ;
যে যেথায় আছ ভারত-সন্তান,
উঠ, জাগ, কেন অবসন্ন প্রাণ?
হিন্দু, মুসলমান, শীক, খ্রীষ্টীয়ান্,
মান্দ্রাজী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, পাঠান,
ভারত-হিতৈষী, পারশী, ইংরাজ,
এস তবে, আর রাজা মাহারাজ!
ভারত-মাতার দুঃখ অবসান
করিতে, সকলে হও যত্নবান্;
ভারত-উজলা শিক্ষিতা রমণি!
শিক্ষিত যুবক, জেনানা শিশুনি!
এস ভাই বোনে সবে ফুল্লমনে,
জাতীয় মিলনে প্রমত্ত হও।"

শ্রীরসময় লাহা।

নিতান্ত নীরব থাকা ভাল নয়।

নিতান্ত নীরব থাকা ভাল নয়। মুখ ফুটিয়া দুই একটা কথা বলিতে না পারিলে, দেখিতেছি অনেক সময়ে, সর্ব্বতোভাবে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। যে শিশু রোদন করে না, সে স্তন পান করিতে পায় না; গৃহ-পালিত পশু পক্ষী স্বাভাবিক চীৎকার না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিলে, গৃহস্থ তাহাদিগকে আহার দিতে ভুলিয়া যায়; ভারবাহী বলদ যদি কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ প্রদর্শন না করিয়া পণ্যভার বহন পূর্ব্বক, অকাতরে ইতস্ততঃ গমনাগমন করে, তাহা হইলে,সত্বরই তাহাকে অধিকতর ভারোদ্বহন-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ কি? যে বৃক্ষ নিতান্ত নমিত, তাহা ছাগ-জাতির ভোজ্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ভারতে সুদুর্ল্লভ মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া, নিতান্ত নীরব বা নিতান্ত প্রণত হইয়া কালযাপন করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ফলতঃ, জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল সদ্গুণে বিভূষিত করিয়াছেন, কার্য্য কালে, যদি সেই সকলের সার্থকতা সম্পাদন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমাদের সেই বিফল গুণবত্তায় প্রয়োজন কি? অর্ণব যদি ভীম গর্ব্বে উত্তাল-তরঙ্গ-মালা উৎক্ষিপ্ত না করিয়া,প্রশান্ত ও মৃদুভাবে প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সকলেই, সামান্য উড়ুপ-সহকারে তাহার বক্ষঃস্থল বিদলিত করিয়া যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারিত। কৃশাণু যদি স্বীয় দাহিকতা শক্তির পরিচয় না দিয়া,হিমশিলার

ন্যায় নিতান্ত শীতল ও নিস্তেজ হইয়া অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে, কে তাহাকে সভয়ে ও সযত্নে রক্ষা করিত? অশনি যদি তড়িন্ময়ী ভ্রুকুটি-কুটিল-কটাক্ষ-বিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিকট নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক মুখরিত না করিয়া, মূকভাবে অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে পাপিগণের হৃদয়ে কি কখন ভয়ের সঞ্চার হইত?

সত্য বটে, চিরকাল অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, আমরা ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইয়াছি; আমাদিগের ধন নাই, মান নাই, যশ নাই, গৌরব নাই, সাহস নাই, পরাক্রম নাই; সত্য বটে, অকুতোভয়তা আমাদিগকে এককালে পরিত্যাগ করিয়াছে, মারি খাইয়া আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গে কড়া পড়িয়াছে, গালাগালি খাইয়া আমাদিগের কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে—সত্য বটে, পক্ষীর ন্যায় চিরকাল পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া, আমাদিগের পক্ষ বিস্তার করিয়া উড্ডীয়মান হইবার ক্ষমতা এককালে লোপ পাইয়াছে; সত্য বটে, ইংরাজের উদ্যত কৃপাণ আমাদিগের বিস্ফারিত নয়নকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে; মাতঙ্গ যেমন ক্ষুদ্র চক্ষু বশতঃ স্বীয় অবয়ব দেখিতে পায় না, আমাদিগেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে; কিন্তু যখন আমরা দেখিতে পাই যে, সামান্য পিপীলিকাও পদ-বিদলিত হইয়া দংশন করিতে ত্রুটি করে না, তখন, আমরা মনুষ্য হইয়া কেমন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন নিস্তেজ অবস্থায় কালাতিপাত করিব? আমরা যতই মুখ বুজিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করি, ততই দেখিতে পাই, অত্যাচার আমাদিগের উপর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে কি না সহ্য করিতে হইতেছে? কেবল বাহিরের চাকচিক্য ও বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিয়া থাকিলে কি হইবে? ইংরাজ—বণিক জাতি, বাণিজ্য করিতেই এ দেশে আসিয়াছেন; কোনরূপে প্রজাকে সন্তুষ্ট করিয়া অর্থ-সঞ্চয় করাই ইঁহাদের কার্য্য। ইংরাজ যে স্থলে যেমন দেখেন, সে স্থলে সেই রূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত করেন। যেখানে বিদ্রোহের ভয়, ইংরাজ সেখানে মৃদুতা অবলম্বন করেন; যেখানে হিন্দুদিগের ন্যায় জড় পদার্থের বাস, সেই খানেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করেন। এক শত ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল এদেশে রাজত্ব করিয়া, ইংরাজ কি আমাদিগের ভাব গতিক বুঝিতে পারেন নাই? বিলক্ষণরূপ পারিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে, সমদর্শী ইংরাজের সমুদ্র সমান ভারত-সাম্রাজ্যে, কোন স্থানে আবর্ত্ত, কোন স্থানে বুদ্‌বুদ্, কোন স্থানে তরঙ্গ ও কোন স্থানে প্রশান্তভাব লক্ষিত হয় কেন?

ভ্রাতৃগণ! তোমরা বদ্ধপরিকর হইয়া "টাউন হলে" গিয়া, সাহিত্য ও বক্তৃতায় পারদর্শীতা দেখাইবার নিমিত্ত পরস্পর বাক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পরস্পর গৃহ-বিচ্ছেদ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ে তোমাদের বিশেষ পটুতা লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু দেখিতেছ না, আমরা দিন দিন ইক্ষুদণ্ডবৎ নিস্পিষ্ট হইতে বসিয়াছি; এই অকাল ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত শীর্ণকায় ভারতবাসীর অবশিষ্ট শোণিতবিন্দুও ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। ইংরাজের সহবাসে আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া আমরা দিন দিন পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছি। আমরা হিন্দু হইয়া ঘৃতের সহিত বসা ভক্ষণ এবং শর্করা ও লবণের সহিত অস্থি চর্ব্বণ

করিতে শিখিয়াছি; আর আমাদিগের ভাবনা কি? হিন্দুর মৃত দেহ না হইলে, ছাত্রদিগের অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করা হইবে না; হিন্দুর টাকা লইয়া রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া, হিন্দুকেই সর্ব্ব বিধায়ে প্রবঞ্চনা করিতে হইবে, এই সকল অপ্রীতিজনক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদিগের চৈতন্য হয় না। একে আমাদিগের উদরে অন্ন নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই; তাহাতে আবার নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া, আমাদিগের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়াছে। আমরা যদি প্রাণপণে চীৎকার করি, তাহা হইলেই কি সেই চীৎকার, সেই ক্রন্দন, মহাসাগর পার হইয়া, সেই দয়াশীলা ভায়তেশ্বরীর কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে পারে? না তাহা প্রতি-কূল বায়ু-বশে ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়া, কালক্রমে আমাদিগেরই কালস্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান হয়?

কাঁদিতে গেলে আমাদিগকে অনেক কাঁদিতে হয়। তাই বলি, সকল কান্না একেবারে না কাঁদিয়া, সকল প্রলাপ একেবারে না বকিয়া, এক একটি বিষয় লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। নিত্য নিত্য দুঃখের ক্রন্দন কাঁদিয়াও কোন ফলোদয় হইতে দেখি না। সম্প্রতি, একটি ব্যাপার দেখিয়া আমাদিগের চিত্ত-চাঞ্চল্য সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, অনেক গুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। ইংরাজ-রাজ্যে অনেক দিবসাবধি কাগজপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া, আমাদিগের এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। চেক্ বিল, ষ্ট্যাম্প, প্রমিসরি নোট, সিকিউরিটি, প্রভৃতি সকলই কাগজের কারখানা; কি ধনী কি নির্ধন সকলেই কাগজের গৌরবই করিয়া থাকে। আমার অধিকারে এত গুলি কাগজ আছে, এই কথা যখন মনে হয়, তখনই আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের মন বাবুয়ানার দিকে আকৃষ্ট দেখিয়া, আমাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ভারী জিনিষ বহন করিতে দেন নাই। আমা-দিগকেও অগত্যা এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হইয়াছে যে, "আমাদিগের স্বর্ণ রৌপ্যাদি আমাদিগেরই উপকারের নিমিত্ত বলবান্ প্রহরিগণ কর্ত্তৃক সাগর পারে রক্ষিত হইতেছে।" যাহা হউক, ইহাও সহ্য হইয়া গিয়াছিল। কারণ, আমরা নীতি-শিক্ষানুসারে এই মাত্র অবগত আছি যে, রাজা কখন প্রজার অমঙ্গল চিন্তা করিবেন না, রাজা যদি শোষক হইয়া প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে ধনে প্রাণে নষ্ট করেন, তাহা হইলে আর তিনি কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবেন? বলিতে কি, এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া আপাততঃ অনেকের বিষয় রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রাজবুদ্ধির নিকটে প্রজাগণের ক্ষুদ্র বুদ্ধি কি কখন দণ্ডায়মান হইতে পারে? তৎপরে গবর্ণমেণ্টের দেখাদেখি অনেকে অনেক প্রকার কাগজের কারবার আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যবশে সে সকলও কিয়ৎ পরিমাণে শুভকর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যাঁহা-দিগের অনেক টাকা—ঘরে টাকা রাখিবার জায়গা নাই, তাঁহারাই ঐ সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকেন,—গরিব লোকের ঐ সকল বিষয়ের অধিকার নাই। কিন্তু, আজকাল বাজারে যেরূপ হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা অনেকটা ভাবিত হইয়াছি। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইংরাজ-বণিক-গণ সর্ব্বনাশ-সূচক সুবর্ণ সেয়ারের কারবার

খুলিয়া, সামান্য লোকদিগেরও অর্থ-নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যেমন করিয়াই হউক, বঙ্গবাসিগণ ইংরাজদিগের হস্তের ক্রীড়নক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইংরাজ যখনই স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধি-প্রভাবে কোন একটি নূতন প্রলোভনের আবিষ্কার করেন, বঙ্গবাসিগণ, তখনই গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া সেই দিকেই ধাবমান হয়। কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, তাহা ভাবিয়া দেখে না। কারণ, সকলেই জানে ইহারা রাজার জাতি, রাজবুদ্ধি ধারণ করে; ইহারা যাহা করিবে, তাহার মার নাই। জিজ্ঞাসা করি, বণিকগণের নিজ নিজ কারবারে কি এক্ষণে 'দ' পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে? তাহা যদি না হয়, তবে তাঁহারা গরিব লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে যত্নবান্ হইয়াছেন কেন? এক টাকা করিয়া সোণার সেয়ার শ্রবণ করিয়া, কাহার না হাত পা নিস্ পিস্ করিতে থাকে? সেই নিমিত্ত, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া বণিকগণের জালে পতিত হইতেছেন। বণিকগণ বলিতেছেন,—"সোণার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভূরি পরিমাণে সুবর্ণ উৎখাত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেয়ারের দর এত বাড়িবে যে, তাহাতে সকলের দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে।"

তামাসার বিষয় এই যে, নিত্য নিত্য এক একটি করিয়া সেয়ারের কারবার খোলা হইতেছে এবং অধিকতর তামাসার বিষয় এই যে, কোন কোনটি ক্ষণকাল মাত্র প্রকাশ পাইয়া, ঊষাকালীন তারকা-নিচয়ের ন্যায় অন্তর্ধান হইতেছে। বাজারে, কোলাহলে কান পাতা যায় না। মারা মারি, কাড়া কাড়ি, হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। যাহারা কখন কোন পুরুষে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে যায় নাই, তাহারাও একবার কাগজ কেনা কি মজা, কেমন নির্ভাবনায় রাত্রি যাপন করা যায়, তাহা দেখিয়া লইতেছে। কি দোকানী, কি পেয়াদা, কি খানসামা, কি সইস্, কি কোচম্যান্, সকলেই রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আশয়ে তাড়াতাড়ি সেয়ার কিনিয়া ফেলিতেছে। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, যদি সেয়ার কিনিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে, আমরা প্রাণান্তে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না। কেহ যদি জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, মাথা মুখ খুঁড়িয়া এক পয়সা ভিক্ষা চায়, তাহা হইলেও আমরা তাহা প্রদান করিতে সক্ষম হই না। কিন্তু কি মজার কারখানা, আমরা অনিশ্চিত বস্তুর আশা করিয়া অকাতরে অপরিচিত ব্যক্তির হস্তে বহু আয়াসোপার্জ্জিত অর্থ সকল অর্পণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না!

সেয়ার সকলের নাম অতি অপরূপ। পট্ পট্, ঝট্ ঝট্, হুম্ হুম্ ইত্যাদি। নাম শ্রবণ করিয়াই মনে হয়, যেন কেহ কাহাকে প্রহার করিতেছে। ফলে কি দাঁড়াইবে তাহা ত বোঝাই যাইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন রৌদ্র ও বৃষ্টি ভোগ করিয়াও সেয়ারের দর উঠিতেছে, কি নামিতেছে, ইহাই শুনিবার নিমিত্ত কত লোক তীর্থের কাকের ন্যায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং কাগজ হস্তে করিয়া মহাদম্ভে দালালগণের তোষামোদবাক্যে কর্ণপাত করিতেছে। কি আক্ষেপের বিষয়! যে রাজ্যে কোন স্থানে কেহ দুই চারি পয়সা লইয়া জুয়া বা কুফন্ খেলিতে বসিলে, তৎক্ষণাৎ পুলিশ কর্তৃক

ধৃত হয়, সেই রাজ্যের বুকের উপর বসিয়া বণিকগণ এই ন্যায়-বিগর্হিত আইন-বহির্ভূত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! গবর্ণমেণ্ট কি এ বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন না, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ইংরাজ-রাজ্যে কেহ লুকাইয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। যিনি যেখানে যাহা করুন, পুলিশ প্রহরিগণের শ্যেন দৃষ্টিতে সকলই পতিত হইবে।' তবে ইহাও হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট বণিকগণের পক্ষ; বণিকগণের অনুরোধে ছুটী কমাইয়া দিয়া, বঙ্গবাসিগণের ক্ষত স্থানে লবণ প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন, তখন বণিকগণের অনুরোধে কি আর একটা আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দিতে পারেন না? সে যাহা হউক, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এতকালের সুসভ্য ভারতবর্ষে এই সকল সুবর্ণ-খনি কি এত দিন ধরিয়া লুক্কায়িত ছিল? যে জাতি সত্যযুগ হইতে সুবর্ণ-মুদ্রা, সুবর্ণালঙ্কার ও সুবর্ণ পাত্রাদি ভূরি পরিমাণে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, সে জাতি কি এই সকল স্বুবর্ণ-খনি এতকাল উপেক্ষা করিয়া রাখিয়াছে? আর ইহাও জিজ্ঞাসা করি, গভর্ণমেণ্ট কি এত দিনেও এই সকল খনি আবিস্কার করিতে সক্ষম হন নাই? এক্ষণে যে চক্ষের নিমেষে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার সুবর্ণ সেয়ার বিক্রয় হইয়া গেল, ইহা দেখিয়াও কি গভর্ণমেণ্ট ঔদাস্য-অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? বোধ করি তাহা কখনই হইবে না। এখন শুনিতেছি, কোন ধনাঢ্য বণিক স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে স্বর্ণ সেয়ারের কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিতেও বারণ করিয়া দিয়াছেন। কেন বারণ করিয়াছেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। আবার দুই চারি দিবস হইল, শুনিতে পাই যে, ইণ্ডিয়া আফিসের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও নাকি উক্তরূপ বারণ করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের বিষয়। বণিকগণের ক্রীড়া কৌতুক ক্ষুদ্র প্রাণিগণের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

আমাদিগের কোন কষ্ট উপস্থিত হইলে, আমরা রাজদ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হইব। রাজাই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন; বিশেষতঃ, ইহা কি আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, সেই বিশ্বনিয়ন্তা আমাদিগের গৃহ-বিচ্ছেদ ও নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই ধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের হস্ত হইতে সমদর্শী ইংরাজ-হস্তে আমাদিগের ভারার্পণ করিয়াছেন? ইহা কি আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, আমরা পুনঃপুনঃ ভিন্ন শত্রু হস্তে নিপতিত না হইয়া, এক অজেয় রাজার অধিকারে এক প্রকার সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছি? আমরা নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, তাই মনের আবেগে দুই একটা কথা বলিয়া ফেলি। কিন্তু, ইহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতেশ্বরীর কুশল-রাজ্যে আমরা দুঃখ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশে মুহূর্ত্ত মাত্রও সুখরূপ ক্ষণপ্রভার চাকচিক্য দেখিতে পাই।

ভ্রাতৃগণ! 'অধীনতা অধীনতা,' করিয়া চীৎকার করিলে আর কি হইবে? এক্ষণে যাহাতে স্বীয় সঙ্কীর্ণ আবাস কিঞ্চিৎমাত্র পরিসর করিয়া লইতে পার এবং স্বকীয় গলরজ্জু যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর—নিতান্ত নীরব থাকা ভাল নয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

———

গর্ব্ব।

বৃথা গর্ব্বে অভিভূত কেন হও, মন!
জান যদি এ সংসার নিশার স্বপন?
মনে জান যদি দেহ মুহূর্ত্তের পরে,
ভস্ম হ'য়ে যাবে মিশি মাটীর ভিতরে;
কিম্বা যদি স্থির জান নরক-গমন,
তবে কেন বৃথা গর্ব্বে অভিভূত মন?

যাহা কিছু হেরিতেছ অসার সংসারে,
কিছু নহে,—সকলেই ক্ষণকাল পরে
নানারূপে লয় পেয়ে যাইবে কোথায়;
দেখিতে পাবেনা কেহ আর পুনরায়।
তাই বলি, জান যদি হইবে পতন,
তবে কেন বৃথা গর্ব্বে অভিভূত মন?

জান যদি এ সংসার পাপের নির্ঝর,—
কাম, ক্রোধ আদি যথা রিপু ভয়ঙ্কর
প্রলোভনে ল'য়ে গিয়ে মানব-জীবন,
পাপের সাগরে শেষে করে নিমগন;
জান যদি এই রূপ সংসার-বন্ধন,
তবে কেন বৃথা গর্ব্বে অভিভূত মন!

তাই বলি, মন! আজি থাকিতে সময়,
চিন্তা কর অহরহ কিসে ভাল হয়;
পাইবে অপার সুখ অপর জীবনে,
চিরদিন জাগরিত রহিবে ভুবনে;
কবিগণ, নানারূপ কবিতা-মালায়,
পরা'বে রে মন! সদা তোমার গলায়।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী শেঠ।

শ্মশান-বৈরাগ্য।

গভীর রজনী,—তায় ঘোর অন্ধকার,
ঝিঁঝিঁ-রবে ঝিল্লিগণ ডাকে অনিবার,—
থেকে থেকে শিবাগণ করিয়া চীৎকার,
পথিকের প্রাণে ভয় করিছে সঞ্চার।
অদূরে—খদ্যোৎ-পুঞ্জ বৃক্ষশাখা' পরে,
ভুলা'তে মানব-মন আনন্দে বিচরে।
পতিত-পাবনী গঙ্গা (কুল-কুল-স্বরে)
বহিছে, সাগরোদ্দেশে প্রফুল্ল অন্তরে।
এহেন সময়ে, বসি শ্মশান উপরে,
ভাবিতেছিলাম কত তাপিত অন্তরে।
কত শত চিন্তা মনে হইল উদয়,
লেখনীতে কভু তাহা ব্যক্ত নাহি হয়।
ভাবিতে ছিলাম মনে,—"অনিত্য সংসার
সকলি মায়ার খেলা—কিছু নহে সার।
এই যে জ্বলিছে চিতা সম্মুখে আমার,
কত দম্ভ, পরাক্রম ছিল রে ইহার!
হায় রে! মানব-দেহ এতই নশ্বর,
ক্ষণ পরে কোন চিহ্ন থাকিবে না তার!
ইহারই মত হায়! কিছুকাল পরে,
পুড়িতে হইবে মোরে শ্মশান উপরে!"
হায় রে মানব! তবে কিসের লাগিয়া
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে বেড়াও ঘুরিয়া?
ভাই, বন্ধু, পিতা, মাতা, পুত্র, পরিবার,
ভগ্নী, ভাগিনেয় আদি,—সুখ তরে যার,
খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম করিতেছ সার;
ভেবে দেখ, কেহ তারা নহে আপনার!
এ কথায় যাহার না হইবে প্রত্যয়,
সে যেন শ্মশানে গিয়া ঘুচায় সংশয়।

শ্রীপান্নালাল পাঠক।

দার্জ্জিলিং-ভ্রমণকারীর পত্র।

(তৃতীয় পত্র)

লুইস জুবিলি সেনিটেরিয়ম্, দার্জ্জিলিং, ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮৯।

এখান হইতে হিমাদ্রী-শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়নগোচর হইয়া থাকে। উহা অনন্ত তুষারাচ্ছাদিত। হঠাৎ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়—যেন এক অত্যুন্নত স্ফটিক-শৈল গগন-মণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। নবোদিত সূর্য্য-রশ্মি-প্রভাবে উহার সমুন্নত শিখর সকল স্বর্ণময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং বেলাধিক্য বশতঃ সূর্য্যদেব যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকেন, ততই ঐ সকল শিখরদেশ কনককান্তির পরিবর্ত্তে রজত-সন্নিভ শুভ্র সৌন্দর্য্য ধারণ করিতে থাকে। এইরূপ সৌন্দর্য্য বেলা ৬॥০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে, ক্রমশঃ স্ফটিকবর্ণ হইয়া সন্নিহিত শ্বেতকায় মেঘের সহিত মিলাইয়া যায়; পরিশেষে আর কাঞ্চনজঙ্ঘার কিছুই অনুভব করা যায় না। সেই সময়ে, দুরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে বোধ হয়—যেন বৃহৎ বৃহৎ বরফ স্তূপ সকল গড়াইয়া পড়িয়া, সম্মুখস্থ বৃক্ষ লতাদি সমূলোৎপাটিত করিয়া লইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি যে,—'এখানকার অধিবাসীরা মস্তকে দড়ী বাঁধিয়া, তদ্দ্বারা সকল প্রকার মোট পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া বহন করে;' বোধ হয় এই কারণ বশতঃই ইহাদের কপাল ছোট ও মস্তক চেপ্টা হইয়া যায়। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মৃত্যুর পর ইহাদিগের শব-দেহ কবর দেওয়া হইয়া থাকে। এখানে কলিকাতার ন্যায় জলের নল আছে, ঐ নল একটি উন্নত পর্ব্বতস্থিত জল-প্রপাতের সহিত সংলগ্ন। এই জল-রাশি অতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া ঐ নলের ভিতর বেগভরে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং কল খুলিলেই কলিকাতার কলের জলের ন্যায় জল পড়ে।

কলিকাতা, দিবসে কাক, চটক প্রভৃতি পক্ষিগণের কলরবে, মনুষ্য-কোলাহলে এবং গাড়ী ঘোড়ার শব্দে এক প্রকার সরগরম্ থাকে; এখানে সে সকল কিছুই নাই—কেবল একপ্রকার পতঙ্গ অনবরত শব্দ করিয়া দিবসের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

পানিহাটি, বাঘমারি, প্রভৃতি বাগান-অঞ্চলে, রাত্রিকালে যেরূপ উচুঙ্গা ও ঝিল্লীরব ব্যতীত আর কোন শব্দই শ্রবণ-গোচর হয় না, এখানে দিবসে সেইরূপ এই সকল পতঙ্গদিগের রব এবং মধ্যে মধ্যে দু' একটা দাঁড়-কাক ও দু' একটা চিলের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না।

এই সকল পতঙ্গের মুখ অনেকটা ফড়িঙ্গের মুখের মত; ধরিতে যাইলে ইহারা প্রজাপতির ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের পশ্চাৎ ভাগ ভাঁজ করা। কামারের জাঁতার ন্যায় একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত হয়—ইহারা পীত ও পিঙ্গল বর্ণের হইয়া থাকে।

কলিকাতার চতুর্দ্দিকেই লোকের বাস,

কিন্তু এখানে যে দিকে নয়ন ফিরাও, বিবিধ পাদপশ্রেণী, তৃণাচ্ছাদিত পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ এবং মধুর নাদিনী নির্ঝরিণী দেখিতে পাইবে। এ সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া পুলকিত ও বিমোহিত হইতে হয় এবং বিশ্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের শিল্প-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বোধ হয় যেন জগদীশ্বর এক বিস্তৃত মনোহর উদ্যান সৃজন করিয়া, মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবীকে তন্মধ্যে বিরাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

এখানকার জল-প্রপাতের মধ্যে "ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত" (Victoria fall) অতিশয় সুন্দর। বৃষ্টি হইলে কলিকাতার উচ্চ অট্টালিকার ছাদের নল হইতে যেরূপ জল পড়ে, ইহা হইতে সেইরূপ তদপেক্ষা সহস্রগুণ জলরাশি অনবরত নিম্নের পাহাড়ে পড়িতেছে। এস্থানটি অতিশয় শীতল ও নির্জ্জন; এখানে বসিবার জন্য ২।১ খানি বেঞ্চও আছে।

কলিকাতায় পৌষ মাঘ মাসে যত শীত, এখানে তদপেক্ষা অধিক শীত। এখানে কলিকাতার ন্যায় ইংরাজটোলা, বাঙ্গালী টোলা নাই। যে যেখানে সমতল ভুমি পাইয়াছে, সে সেই খানে বাটী প্রস্তুত করিয়াছে। সমতল-ভূমি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য; তাহার কারণ এই যে, পাহাড় সকল উর্দ্ধে ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত এবং তাহাদের এক একটির শৃঙ্গ-দেশ কাটিয়া, বাটীনির্ম্মাণোপযোগী সমতলভূমি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ব পত্রে ইহার আভাস দিয়াছিলাম।

এখানকার বৃক্ষলতাদি কলিকাতার ন্যায় নহে, অন্য প্রকার। এখানকার জলে চুণ নাই; কারণ, হস্তে সাবান মাখিয়া ধৌত করিলে, এখানকার জলে তাহার পিচ্ছলতা যায় না। জল ও দুগ্ধের স্বাদ নাই—পান করিতে বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি এ পর্য্যন্ত যত স্থানের জল পান করিয়াছি, "সীতাকুণ্ডে"র ন্যায় আর কোনও স্থানের জল আমার নিকট সুস্বাদু বলিয়া বোধ হয় না।

বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য দ্রব্যের দোকান, অধিকাংশই হিন্দুস্থানীরা করিয়াছে। দ্রব্যাদি কলিকাতা হইতে আমদানি হয়। আমি সঙ্গে চাকর না আনিলে কোন কষ্ট হইত না; কারণ, "লুইস্ জুবিলি সেনিটেরিয়মে"র বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম।

দার্জ্জিলিং, হিমালয় পর্ব্বতের একটি অংশমাত্র; পুরাকালে ঋষিগণ ইহার মনোহর সৌন্দর্য্য ও শান্তি-প্রদ গুণে মোহিত হইয়া, ইহাকে দেবতা দিগের আবাসভূমি বলিয়া কল্পনা করিয়া ছিলেন। এখানকার শীতোপযোগী বস্ত্র সকল লইয়া আসিলে, এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। দিল্লি, আগরা প্রভৃতি প্রদেশ মনুষ্য-নির্ম্মিত কোথাও ২।১ খানি সুন্দর অট্টালিকা, কোথাও বা ২।১টি পুরাতন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে; দু' এক বার দেখিলেই আকাঙ্খা মিটিয়া যায়। কিন্তু, এখানে যদি আজীবন অবস্থান করা যায়, তাহা হইলেও, জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় কৌশল ও কারুকার্য্য দেখিয়া, নয়ন মনের চরিতার্থতা সম্পাদন করা যায় না।

অদ্য এই পর্য্যন্ত,—পরবর্ত্তি বিষয় অন্য পত্রে লিখিব।

কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

অভিনয়-সমালোচন।

গত ২০শে পৌষ, শনিবার, আমরা এমারল্ড থিয়েটারে অভিনব সামাজিক নাটক "অনুপমা"র অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। "অনুপমা"—অনুপমাই বটে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়া, যে কি বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, "অনুপমা"য় তাহার জলন্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বেটুয়ার সঙ্গীত,—জহরসিং ও বেটুয়ার কথোপকথন এবং উড়ে কনষ্টেবলের ভাব ভঙ্গি সাতিশয় প্রীতিপ্রদ। গঞ্জিকাপ্রিয় গোবর্দ্ধনের হিন্দি-বাক্য শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। আইনের কুটিল গতিতে বিচারের বিপরীত ফলও ইহাতে দর্শিত হইয়াছে। আমরা এই অভিনয় দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি।

সাহেবস্তোত্রং।

নমস্তে শ্বেতরূপায় নীলবর্ণবিলোকন!
নমস্তে ইণ্ডিয়ারাজ পাদপৃথ্বিপ্রমর্দ্দন!
নমস্তে ত্রিদশাধীন নব্যবঙ্গপ্রপূজিত!
নমস্তে কামিনীসঙ্গফিটনাখ্যসমাশ্রিত!
নমস্তে উগ্ররূপায় দীনদুঃখিবিঘাতন!
নমস্তে মদিরামত্ত দাসবৃন্দপ্রপীড়ন!
নমস্তে চুরুটাস্যায় উচ্চহ্যাটবিভূষিত!
নমস্তে কোটবাসায় বুটপাদসুশোভিত!
নমস্তে শুভ্রকেশায় লম্বশ্মশ্রু বরানন!
নমস্তে চর্ম্মনেত্র যষ্টিহস্তপ্রচারণ!
নমস্তে গৃহিণীসঙ্গ সতীনারীবিবর্জ্জিত!
নমস্তে অবলাধীন চাটুবাদপ্রবঞ্চিত!
নমস্তে ছুরিকাকাঁটাকাচপাত্রপ্রয়োজন!
নমস্তে মমতাশূন্য প্রজাবিত্তবিশোষণ!
নমস্তে সর্ব্বভুক্ সর্ব্ববঙ্গবন্ধুপ্রতারিত!
নমস্তে কল্কিরূপায় অশ্বপৃষ্ঠপ্রধাবিত!

শ্রীভুবনকৃষ্ণ মিত্র।



বিকারগ্রস্ত ত্রাণোদয়।

বিগত ২৪ শে ও ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের ত্রাণোদয়ে আমাদের লিখিত "হিন্দুশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ" বিষয়ের প্রতিবাদ মধ্যে অপরিণামদর্শী স্বল্পমতি সম্পাদক যেরূপ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অধিক বাদানুবাদ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অনুচিত বিবেচনায়, আমরা এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত রহিলাম যে, ত্রাণোদয় মক্ষিকা-দোষে পরিপূর্ণ; কারণ তিনি অতলস্পর্শী ক্ষীরোদসিন্ধু-সদৃশ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া, পরিশেষে তাহার পঙ্কিল পয়ঃ-প্রণালীর দিকে প্রধাবিত হইয়াছেন। তিনি যে লুপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকাশ-ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই; কারণ আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, তিনি মেরু-লঙ্ঘনোৎসুক

বাতুল ব্যক্তির ন্যায় অবিলম্বেই বিকলাঙ্গ হইয়া ভূতলে পতিত হইবেন।

তিনি এতাবৎকাল যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের যাথার্থ বিলোপ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সে সমস্তই ভ্রমাত্মক এবং সে সকল ভ্রম সংশোধন হওয়াও সুকঠিন ; কারণ,শরীরের সর্ব্ব স্থান ক্ষতরোগে আক্রান্ত হইলে, কোথায় ঔষধ বিলেপন করিবেন ? যে বস্তু শাশ্বত, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তাহার সহিত এক ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর তুলনা কেমন করিয়া করিতে পারা যায় ? সমুজ্জ্বল সূর্য্যকান্তমণি-সন্নিভ হিন্দুধর্ম্মের সহিত বৃথা চাকচিক্যশালী কাচ-সদৃশ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কেমন করিয়া তুলনা হইতে পারে ?

যাঁহাদের স্বধর্ম্মের যাথার্থ্যের উপর সন্দেহ আছে, তাঁহারাই যাথার্থ্যসংস্থাপনবিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। আমরা আমাদের নিত্য সত্য বর্ত্তমান ধর্ম্মের যাথার্থ বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দিহান নহি, আমাদের সে সকল চেষ্টার আবশ্যক কি ?

ত্রাণোদয় বলিতেছেন,—"হয় স্বর্গীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র বাইবেল অবলম্বন-পূর্ব্বক হিন্দুশাস্ত্র সকল কল্পিত হইয়াছে, তাহা না হয় হিন্দুশাস্ত্র সকল অবলম্বন-পূর্ব্বক বাইবেল ধর্ম্ম-শাস্ত্র কল্পিত হইয়াছে, এই দুইয়ের একটা স্থিরীকৃত হউক। এই সম্বন্ধে এত কাল কেবল ভারত-নহে, উজ্জ্বল ইউরোপ মহাদেশ ও নিবিড় আঁধারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।" কিন্তু ত্রাণোদয় ! ইউরোপ আঁধারে আচ্ছন্ন নাই, আলোক পাইয়াছে এবং আলোক পাইয়াছে বলিয়াই, ইউরোপীয় পণ্ডিতপ্রবরগণ মুক্তকণ্ঠে কি বলিতেছেন, তাহা দেখুন ;—

"শ্রীযুক্ত কোলব্রুক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের একটি বিবরণ প্রচার করেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ মণ্ডলাদি আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। ভট্ট মোক্ষমূলর তদীয় নূতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরাজয়, অধিকার ও কর্ষণায়ত্ত করিয়া হিন্দুত্ব সংস্থাপন করিতে সহস্র বৎসর (পূঃখ্রীঃ ১৫০০—৫০০) প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক হুইটনী খ্রীষ্টের২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋক্‌বেদ মন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর মার্টিন হগ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋক্‌বেদ প্রণয়ন সময় অবধারণ করিয়াছিলেন। যখন বেদ সংগ্রহ করা হয়, তখন দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বেণ্টলী এবং আর্কডিকন প্রাট নামক দুই জন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১১৮১ অব্দে এই প্রকার অয়ন নির্ণয় হইয়া থাকিবে।

এখন কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং মগধ বংশের ইতিহাস হইতে অবগত হই যে, বুদ্ধ ও কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের মধ্যে ৩৫ জন রাজা রাজ-পদ পাইয়া ছিলেন। প্রত্যেক রাজার রাজত্ব সময় ২০ বৎসর হিসাব করিলে এই গণনায় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যুদ্ধের সময় নির্ণীত হয়।

খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ কি ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিল আবির্ভূত হইয়া সাংখ্যদর্শন প্রচার করিলেন। পরে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ এই সাংখ্য দর্শনের কঠোর ন্যায়-যুক্তির সহিত তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী দয়া এবং মনুষ্য জাতির জন্য প্রীতি যোগ করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, অদ্যাপি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকে সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে আত্মার তৃপ্তিলাভ করিতেছে।

খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং সেই সময় হইতে ঐ ধর্ম্ম শীঘ্রই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে, চতুর্থ যুগ বা বৌদ্ধযুগের আরম্ভ। মহারাজ অশোক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৬০ অব্দে সম্রাট্ হয়েন এবং ২৪২ অব্দে ধর্ম্ম-গ্রন্থ নিরূ-

গণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড বৌদ্ধ-সভা আহ্বান করেন। ইতি পূর্ব্বে গৌতমের মৃত্যু বর্ষে ৪৭৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এবং তাহার শত বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭৭ অব্দে এইরূপ দুই সভা আহূত হয়। কিন্তু অশোক ২৪২ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে যে ধর্ম্ম সভা আহ্বান করিলেন, তদ্দ্বারা নিরূপিত ধর্ম্ম-গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারত সীমা অতিক্রম করিয়া প্রচারিত হইল। **অশোকের ধর্ম্ম প্রচারকগণ সিরিয়া ও প্যালেষ্টিন দেশে যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন, সেই ধর্ম্ম-নীতি হইতেই তাহার দুই শত বৎসর পরে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম-নীতির উৎপত্তি।"**—নব্যভারত।

ত্রাণোদয়! এখন বুঝিতে পারিলেন, কোন শাস্ত্র সর্ব্ব প্রথম? 'হিন্দু-শাস্ত্র বাইবেলের অনুকরণ', এ কথা বলিতে আর স্পর্দ্ধা করিবেন কি? বরং পরবর্ত্তী ধর্ম্মপুস্তকই, আদি ও মূল হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুকরণ, ইহাই সম্ভব পর। যে শাস্ত্র আদি, যে শাস্ত্র মূল, সেই শাস্ত্রই আসল, নিত্য ও সত্য। পুরাতনের নকল করিয়াই আধুনিকের উৎপত্তি। আসল কি কখন নকল হয়? এই সামান্য বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা ত্রাণোদয়ের আছে কি?

আমরা শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, সমস্ত জগৎ তদ্বিষয় লইয়া অন্দোলন করিতেছে; আবশ্যক হইলে, তাহাও দেখাইয়া দিব। আমরা অগ্রে যাহা বলিয়াছি, এক্ষণেও তাহা বলিতেছি এবং পশ্চাতে ও তাহা বলিব। আমাদের বাদানুবাদ বহুকাল সমাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে দেখিতেছি ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ ইহার কণিকা মাত্র অবলম্বন করিয়া, স্বীয় ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া লইতেছে, ইহাও হিন্দুদিগের অতীব গৌরবের বিষয়।

সুবিমল শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আধ্যাত্মিক ভাব সাধারণের অধিগম্য নহে; এই নিমিত্ত অনেকেই অকিঞ্চিৎকর মন বুদ্ধির কল্পনায় যাহা কিছু বলিয়া থাকেন; তাহা অস্মদ্দেশীয় সাধুগণের হাস্যোদ্দীপক হইয়া থাকে।

ত্রাণোদয়! আর প্রলাপ বকিবেন না। যাহাতে স্থির চিত্ত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা দেখুন। বিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় প্রলাপ বকিলে আর কি হইবে? ক্রুশোপরি যীশুর পায়ের উপর পা রাখিয়া পেরেক মারা হইয়াছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পায়ের উপর পা, ও যীশুর পায়ে সেই পেরেক বিদ্ধের চিহ্নের অনুকরণে, শ্রীকৃষ্ণের পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন, বলিলে, কেহ ভুলিবে না। এ সকল প্রকাশে বরং সকলে বুঝিবে যে, আপনার পীড়া বড়ই সাঙ্ঘাতিক। মনে করিবেন না যে, আপনার প্রলাপোক্তি—বাইবেল-অবলম্বনে হিন্দু-শাস্ত্রের উৎপত্তি, জগৎকে বুঝাইতে সক্ষম হইবে। যদি আপনার সামান্য মাত্র বুঝিবার ক্ষমতা থাকিত, কিয়ৎ পরিমাণে হিতাহিত জ্ঞান থাকিত এবং আপনি লালসার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মত্যাগ না করিয়া তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেন যে, হিন্দুশাস্ত্রই মূল-শাস্ত্র। বুঝিতে পারিতেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের অনেক পরে বাইবেলের সৃষ্টি এবং আরও বুঝিতে পারিতেন যে, হিন্দু শাস্ত্রাবলম্বনেই বাইবেলের উৎপত্তি।

হায়! কাহাকেই বা আমরা একথা বলিতেছি। ত্রাণোদয় যে এক্ষণে পূর্ণ বিকারে আচ্ছন্ন, প্রলাপ-উক্তিতে পরিপূর্ণ; ইঁহার সংজ্ঞা ও হিতাহিত-জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়াছে; তবে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হন, তখনই সত্য কথা বাহির হইয়া পড়ে, ইহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি। তাই, ত্রাণোদয় সত্য কথা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়াছেন,—"ভুল হইয়াছে। সম্পাদক বাঙ্গালা জানেন না।" কিন্তু পরক্ষণেই রোগ বৃদ্ধি পাইল, বিকারপ্রভাবে আবার প্রলাপোক্তি আরম্ভ হইল। বলিয়া উঠিলেন,—"বাস্তবিক এই গুরুতর আবিষ্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালা লিখিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষা যে অন্য কোন আবশ্যকীয় কর্ম্মে লাগিবে, সম্পাদকের তাহা বিশ্বাসও

নাই।" মরি মরি! কি জ্ঞানগর্ভ বাক্য! ত্রাণোদয় এই গুরুতর অবিষ্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়াই, বাঙ্গালা ভাষার আবশ্যক হইতেছে; নচেৎ বাঙ্গালা ভাষারই প্রয়োজন নাই। ভাল একটা কথা ত্রাণোদয়কে জিজ্ঞাসা করি—যে ভাষায় ত্রাণোদয়ের কলেবর গঠিত, যে ভাষা ত্রাণোদয়ের অস্থি মজ্জা রক্ত ও মাংস, যে ভাষা লইয়া ত্রাণোদয় ইহজগতে সাকাররূপে বিচরণ করিতেছেন, যে বাঙ্গাল ভাষার সাহায্যে 'বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার জন্য ত্রাণোদয়ের আবির্ভাব' হইয়াছে, সেই বাঙ্গালা ভাষাকে আবার কোন্ মুখে ত্রাণোদয় 'আবশ্যকীয় কর্ম্মে লাগে না', বলিতেছেন? ইহাও তাঁহার "সর্ব্বে সর্ব্বা" প্রভুশিক্ষিত ধর্ম্ম নাকি?

ত্রাণোদয় যে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, তাঁহার প্রতিবাদেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; কারণ তিনি 'ওলাবিবি', 'সত্যপীর' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারিতেন, বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, এসকল কথা, প্রলোভনে বা বিপাকে পড়িয়া স্বধর্ম্মচ্যুত অথবা যে সকল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হিন্দুসন্তান, পাদ্রীপিতার অন্নে জঠরজ্বালা নিবারণ-পূর্ব্বক, হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশের উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য খ্রীষ্টীয়ান্ হইয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ মনে করেন, সেই সকল ব্যক্তিদিগের বংশনিঃসৃত কোন নির্ব্বোধ ও মূর্খ ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়; ত্রাণোদয়ের মুখ হইতে এরূপ বাক্য আমরা আশা করি নাই। কারণ, এসকল ধর্ম্ম বা শাস্ত্রোক্ত নহে, সামাজিক সংস্কার মাত্র। অতএব যাঁহারা ওলাবিবি সত্যপীর প্রভৃতি হইতে হিন্দুধর্ম্মের সারমর্ম্ম অনুভব করেন, তাঁহারা আবার কোন্ সাহসে শাস্ত্র সমালোচন করিতে অগ্রসর হন, বলিতে পারি না!

ত্রাণোদয়ে প্রকাশ যে,—"এখনও প্রতিমাসে এই কার্য্যে আমাদের ৬০।৭০ টাকা ব্যয় হয়, কাহারও সাহায্য আমরা লই না—জীবিত ঈশ্বর ইহা যোগাইয়া দেন।" ভাল কথা ত্রাণোদয়! জীবিত ঈশ্বর আপনাদের টাকা যোগাইয়া দেন। স্বীকার করিলাম "ঊর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা এবং পৃথিবীতে শান্তি, মনুষ্য দিগেতে প্রীতি" লইয়া কপোতাকারে জীবিত ঈশ্বর ত্রাণোদয় বিতরণ করেন, তাই যে বার হইতে "হিন্দু শাস্ত্রে হস্তক্ষেপে"র প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দুই বারের ত্রাণোদয় বুধবারে না পাইয়া যথাক্রমে শনি ও রবিবারে পাইয়াছি। জীবিত ঈশ্বরের কার্য্য কি না, তাই এত ঠিক! যাহা হউক ত্রাণোদয়! আপনার কথাতেই বুঝিতে পারিলাম যে, জীবিত ঈশ্বর আপনার সকল order supply করিয়া থাকেন। কিন্তু, মৃত ঈশ্বরটি কি করেন? তিনি কি স্বীয় মৃতদেহের রক্ত দ্বারা আপনাদের পাপ বিধৌত করেন? তাই নির্ব্বিঘ্নে গোবধ করেন ও নিঃসঙ্কোচে পিরুর দোকানে ও উইল্‌সন্ হোটেলে ভোজন করেন; যদৃচ্ছা পাপ কার্য্যেও আপনার সঙ্কোচ হয় না; কারণ মৃত ঈশ্বরের রক্তে পাপ ধৌত হইবে। বলি হারি!

খ্রীষ্ট আপনাদের স্বাধীন করিয়াছেন, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী করিয়াছেন, তাই আপনাদের মধ্যে স্বাধীন প্রেম (Free love) স্ত্রী-স্বাধীনতা, courtship,—এবং তাই আপনাদের মধ্যে Divorce প্রথা বর্ত্তমান। হৃদয়হীন মনুষ্যের উপযুক্ত সমাজ বটে। বলি হারি ত্রাণোদয়! আপনি আবার হিন্দু সমাজের দোহাই দিয়া, হিন্দু-ধর্ম্মের নিন্দা করিতে চান?*

গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করা, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক দের একটা স্বভাব। আমরা অনেক খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ও পাদ্রীর সহিত তর্ক করিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা যখন সদুত্তর দিতে পারেন না, তখনই কেবল কলহের সূত্রপাত করেন। এইরূপ হইবারই কথা; কারণ, ইহাঁদের মধ্যে যদি কণামাত্র ধর্ম্ম বিরাজ করিত, তাহা হইলে

* সমাজ লইয়া কোন কথা বলিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না; তবে ত্রাণোদয় ঐরূপ বলিয়াছেন, বলিয়াই দু' এক কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

ইহাদের দু'একটা সৎকথা বলিবার ক্ষমতাও জন্মিত। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম থাকিবে কিরূপে? ধর্ম্ম ত আর প্রলোভনের জিনিষ নয়, খেলাইবার সামগ্রী নয় এবং ব্যভিচার পূর্ণ সমাজও নয়। ধর্ম্ম একটি স্বতন্ত্র বস্তু, ধার্ম্মিকেই ইহার কদর বুঝিতে পারে, নির্ব্বোধ ত্রাণোদয় ইহার কি বুঝিবেন! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, পাদ্রীরা বেতন ও যশোবৃদ্ধি লালসার বশীভূত হইয়া অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টয়ান করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা খ্রীষ্টীয়ান্ হন তাঁহারা হয় রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, না হয় হিন্দু-বিগর্হিত গর্হিত আচার ব্যবহার নির্ব্বিঘ্নে ও প্রকাশ্যে করিতে পারিবেন বলিয়া—ধর্ম্মের জন্য নহে। এই জন্যই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদের কেনিয়ে ঝগড়া করা স্বভাব। যাহা হউক, খ্রীলবংশ-বদনোজ্জলকারী ত্রাণোদয় সম্প্রদায়েরও এই স্বভাব বড়ই প্রবল; তাই আমাদের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া, গাত্রজ্বালা নিবারণের জন্য নানা প্রকার আবল তাবল বকিয়াছেন। ত্রাণোদয় আমাদিগকে 'বালক' বলিয়াছেন; কারণ শিশু সর্পের দংশন ত্রাণোদয়ের মর্ম্মান্তিক হইয়াছে। ভয় নাই ত্রাণোদয়! আপনাকে প্রাণে মরিবার আমাদের উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য আপনার রোগের ঔষধ দেওয়া। আপনার রোগ নাকি সাংঘাতিকবিকার; তাই সর্পবিষের ব্যবস্থা করিয়াছি, ভালই হইয়াছে।

আপনাকেও জীবিত রাখিব এবং আপনার প্রভু যীশু খ্রীষ্টকেও বজায় রাখিব। বজায় রাখিয়া দেখাইব যে, খ্রীষ্ট প্রচারিত ধর্ম্ম আপনার নাই এবং আপনি তাহার কিছুই বুঝেন না ও জানেন না কেবল মুখ সর্ব্বস্ব; কিন্তু সে কথা আজ নহে।

ত্রাণোদয় এক স্থলে সুবোধিনীকে 'নাবালক' বলিয়াছেন; কিন্তু, আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, "সুবোধিনী সমস্ত হিন্দুজাতির প্রতিনিধি কি না?" যাহাকে নাবালক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে আবার সমস্ত হিন্দু-জাতির প্রতিনিধি কি না, তাহা জানিবার আবশ্যক কি? যাহা হউক, ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সুবোধিনী সমস্ত হিন্দু-জাতির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া ত্রাণোদুয়ের প্রলাপোক্তির প্রতিবন্ধক হয় নাই; সুবোধিনী স্বতঃই ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কারণ, এই তুচ্ছ বিষয়ের জন্য সমগ্র হিন্দু জাতিকে আবশ্যক করে না, 'নাবালক' 'ক্ষুদ্র-প্রাণ' সুবোধিনীর দ্বারাই ইহার যথেষ্ট প্রতিকার সাধিত হইবে। মশা তাড়াইবার জন্য কামানের প্রয়োজন হয় না—সামান্য ফুৎকারেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়।

গৈরিক-বসন পরিধান, নগর-সংকীর্ত্তন এবং বহুসংখ্যক লোক একত্রে সমবেত হইয়া ভজনালয়ে গিয়া প্রার্থনা,—এই তিনটি বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ত্রাণোদয় নানা প্রকার বাজে কথা লিখিয়া কাগজ পুরাইয়াছেন; আসল কথার নিকট দিয়াও যান নাই। একত্রে সমবেত হইয়া ভজনালয়ে গিয়া প্রার্থনা করিবার প্রথা, খ্রীষ্ট কোথায় বলিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিন, এর ওর উপর বরাত দিলে চলিবে না, কোথায় আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিন।

ত্রাণোদয় বলিতেছেন,—"আমাদের শাস্ত্রে আছে 'পাউল কে? আপলো কে? একমাত্র খ্রীষ্টই সর্ব্বে সর্ব্বা।' ইহার অর্থ এই যে, আমরা শাস্ত্র-কর্ত্তা মানি না, দলপতি বলিয়া কাহার পায়ে ফুল চন্দন দিই না, পাদ্রী বলিয়া কাহাকেও গুরু বলি না, আমরা খ্রীষ্টকেই মানি।"—অথচ, প্রেরিতের মত লইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন। এ চাতুরী মন্দ নয়।

"উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে,
যাক্ শত্রু পরে পরে।"

ইহাও ঠিক সেই রূপ। যখন খ্রীষ্ট ভিন্ন কাহাকেও মানেন না, তখন খ্রীষ্ট আপনাদিগকে এরূপ করিতে কোথায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমরা জানিতে চাই।

গৈরিক্-বসন সম্বন্ধে ত্রাণোদয় দৃষ্টান্ত স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "সুবোধিনী যখন

কোট পেণ্টুলেন অথবা পাজামা চাপকান্ পরিয়া পথে বাহির হন, তখন কি তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়?" কোট পেণ্টুলেন অথবা পাজামা চাপকান কোন জাতি বিশেষের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরিচ্ছদ নহে। স্ববোধিনী যদি উহা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে, পরিচ্ছদের উদ্দেশে—অমুক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য নহে। স্ববোধিনী যদ্যপি পাদ্রী দিগের গাউন পরিধান করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের উপাসনা করিত, তাহা হইলে বরং ত্রাণোদয় দু' এক কথা বলিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু গৈরিক বসন হিন্দুদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরিচ্ছদ; ইহার সহিত হিন্দু ধর্ম্মের ঘনিষ্ট সংশ্রব আছে এবং তাহার মর্ম্মও আছে। শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য পরিচ্ছদ রূপে ইহা ব্যবহৃত হয় না।

কিন্তু, আপনারা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করেন কেন? ইহা দেখিয়া আমাদের "সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভে"র গল্প মনে পড়িল এবং সেই সিংহ-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ যে, সিংহ কর্ত্তৃকই বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা যেন ত্রাণোদয়ের স্মরণ থাকে। যাহা হউক, এ সকল লিখিয়াও ত্রাণোদয় সুস্থ হইলেন না; শেষ তিনি নিস্তার পাইবার জন্য কথাটি কাটাইয়া রাখিলেন—লিখিলেন,—"আমরা যেমন এদেশের লোক, তেমনি এ দেশের লোকের প্রথাই অবলম্বন করিলাম।* তাহাতে স্ববোধিনীর এত গায়ের জ্বালা কেন?" ইহা এক প্রকার মন্দ নয়। আজ খোল করতাল বাজাইয়া নগর সংকীর্ত্তন করিতেছেন, কাল দেখা দেখি শাক ঘণ্টা বাজাইয়া ধূপ ধুনা দিয়া, খ্রীষ্টমূর্ত্তির আরতি করিবেন, পরদিন আবার বসন্ত-রোগের ভয়ে শীতলা দেবীর পূজা দিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেই বলিবেন যে, এ সকল আমাদের দেশীয় প্রথা। এক কথায় সাত খুন মাপ! ভাল, ইজরেল-বংশকুলতিলক শ্রীল ত্রাণোদয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় না হয় এদেশের লোক; কিন্তু এই যে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি সেনা Salvation army দেখিতে পাই, ইহারাও কি সকলে এই দেশীয়? আপনার মতে, আবশ্যক হইলে ইহারা কি জন্মভূমি পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত?

তাই বলি, ত্রাণোদয়! বৃথা বাগাড়ম্বর করিবেন না, বাজে কথায় কাগজ পুরাইবেন না। যখন বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন প্রশান্ত মূর্ত্তিতে ধীরভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। যদি প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা থাকে, যদি যথার্থ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সোজা পথে অগ্রসর হউন, আমাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিন্, বাজে কথায় আমরা ভুলিব না। আপনি খ্রীষ্টিয়ান্, খ্রীষ্ট আপনার প্রভু, আপনি খ্রীষ্টভক্ত এবং খ্রীষ্ট প্রচারিত ধর্ম্মের উপাসক এবং খ্রীষ্টই আপনার 'সর্ব্বে সর্ব্বা', অতএব খ্রীষ্ট কোন স্থানে ও কোন সময়ে গৈরিকবসন পরিধান করিয়াছেন ও নগর-সংকীর্ত্তন করিয়াছেন, অথবা খ্রীষ্ট কোন স্থানে ও কোন সময়ে গৈরিক বসন পরিধান ও নগর-সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিন। তাহা হইলে আমরা জানিব যে, বাইবেল আপনার দৈনন্দিন আহার; নচেৎ, আপনার সমস্তই ভণ্ডামী। অতএব আপনি দায়ুদ রাজা লইয়া old Testament উপস্থিত করিয়া 'গোলে হরিবোল' দিবার চেষ্টা করেন কেন?

আপনি যদ্যপি আমাদের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে সক্ষম হন, অথবা ভদ্রতা-সহকারে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে, আমরা আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিব এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি এইরূপ ছাই ভস্ম লিখিয়া অজ্ঞানতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে অযোগ্য ও ভেকধারী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিব।

* এতদ্দ্বারা ত্রাণোদয়ের স্বীকার করা হইল যে, এ প্রথা খ্রীষ্টপ্রদর্শিত নহে।

সঙ্গীত

৺কুঞ্জবিহারী মিত্র বিরচিত।

দেশ—আড়াঠেকা।

শ্যাম নবজলধর নীপবর-মূলে,
বামে টেড়া শিখী চূড়া বেড়া বনফুলে;
হেন মনে অনুমানি,—
বিধি নিরমিল ফণী,
দেখে সে বিনান বেণী
চাঁচর চুলে।

শ্যামাস্যে ঈষৎ হাসি,
ক্ষরিছে পীযূষ-রাশি;
দেখি শশী নখে আসি
শরণ লইলে;—

তবে যে সুকবিগণ,
পূর্ণচন্দ্র-নিভানন
ব'লে শ্রীমুখ বর্ণন করে,
ভ্রমে ভুলে।

ভালে, চন্দন-তিলক,
ত্রিলোক-সুখ-জনক,
মণিময় মকর-কুণ্ডল
কর্ণে দোলে;—

বৈজয়ন্তী হার গলে,
মুরলী কর-কমলে,
মরি কি বেঁধেছে ধড়া
পীত দু'কূলে।

অদ্ভুত ভুরূ-ধনু,
বিনা বাণে বিন্ধে তনু!
নিরখি নয়ন, নৃত্য
খঞ্জন শিখিলে;—

সুনাসাধর দশন,
মদন মদ-মর্দ্দন,
তিল কুসুমাদি কি
সম্ভবে সমতুলে?

গোচারণ-রেণু অঙ্গে,
শ্রীদামাদি সখা-সঙ্গে,
ললিতত্রিভঙ্গ-রূপে—
নানা রঙ্গে খেলে;

কখন বাজায় বেণু
কখন চরায় ধেনু,
কখন কখন নাচে
কালিন্দীর কূলে।

মঞ্জীর-রঞ্জিত পদ,
নির্গুণজন-সম্পদ,
ভুলাইল ষট্‌পদ,
কোকনদ-ছলে;—

আর নাহি সহে ব্যাজ,
চল ভজি রসরাজ,
লাজের কপালে বাজ,—
কাজ কি এ কূলে?

১ম খণ্ড।] মাঘ। [১০ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে",
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

আঁইন।



সকাল হলো, উঠ্‌লো রবি, গাইছে পাখী গান।
বিকচ ফুলে, মধুপ এসে, কচ্চে মধুপান॥

ঘুম্‌ ভাঙায়ে, চেতন দিয়ে, বইছে শীতল বাত।
ফুল ফুটায়ে, ফুলের সুবাস, দিচ্চে হাতে হাত॥

দিন্‌ দু'পরে, স্বভাব কিবা পূর্ণ কোলাহলে।
সবাই সেজে, আপন কাজে, যাচ্ছে দলে দলে॥

চল্‌লো রবি অস্তাচলে, আঁধার হ'য়ে এলো।
উঠ্‌লো তারা, আকাশ ভরা ফুট্‌লো চাঁদের আলো॥

গ্রীষ্মকালে, দিন বড় হয়, রাতটি হয় ছোট।
শীতকালেতে রাত্‌টি বড়, দিন্‌টি হয় খাটো॥

ফুলের সময়, ফুলটি ফোটে, ফলের সময় ফল।
নিদাঘ্‌ কালে, তীক্ষ্ণ রবি, বর্ষাকালে—জল॥

শরৎ এলো, বিফল মেঘের শব্দ গুরু গুরু।
হেমন্তেতে শুষ্ক পাতা ফেল্‌ছে যত তরু॥

শীতকালেতে, শীতের ভরে, প্রাণটি জড়সড়।
বসন্তেতে দখিণ্‌ বায়ে, আরাম টুকু বড়॥

মায়ের মনে বিমল স্নেহ, বাপের ভালবাসা।
বন্ধু সনে প্রাণের কথা, নারীর প্রেমে আশা॥

আহ্লাদেতে বেরোয় হাসি, দুঃখে—নয়ন-জল।
ধর্ম্ম-পথে থাক্‌লে বিজয়, পাপে—প্রতিফল॥

এ সব আছে 'আইন'-বাঁধা, এ সব আছে জানা।
মরণ যে কার কখন হ'বে নাই কোন ঠিকানা॥

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

হীরক।

অদ্যাবধি জগতে যত প্রকার মণি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে 'হীরক'ই 'প্রধান। এই হীরকের আদর আজ কাল কেন, সেই আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। হীরক এক প্রকার প্রস্তর বিশেষ—সমুদয় মণি প্রস্তর অপেক্ষা ইহার ঔজ্জ্বল্য বেশি। পাঠক পাঠিকাগণ! অদ্য আপনাদিগকে কতক গুলি প্রধান প্রধান হীরকের বিবরণ বলিব। অনেকে হয় ত প্রধান প্রধান হীরকের বিষয় বিশেষরূপে অবগত নহেন। প্রথমতঃ,আমাদিগের "কহিনুর", যাহা আজও ভারতেশ্বরী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শিরোভূষণ, তাহার সম্বন্ধে যত ঐতিহাসিক ঘটনা আছে, তাহাই পাঠক পাঠিকাদিগকে অবগত করান যাইবে—শেষে অন্যান্য হীরকের বিষয় বলা যাইবে। আমার ইচ্ছা ছিল যে,প্রত্যেক হীরকখণ্ডের আকার অঙ্কিত করিয়া দিব,কিন্তু তাহা বড় পরিশ্রমজনক এবং কাগজেও স্থান অল্প, সেই জন্য তাহাদের প্রত্যেকের আকার দিতে পারিলাম না।

প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ কথিত আছে যে, এই অমূল্য রত্ন "কোহিনুর" প্রথমতঃ অঙ্গরাজ কর্ণের অঙ্গে শোভা পাইত; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর, ইহা কোথায় কিরূপভাবে ছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, মালোয়ারাজ ইহা গোদাবরী নদীসৈকতে প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার বংশপরম্পরা ইহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে ইহা আলাউদ্দিনের হস্তগত হয়। আলাউদ্দিনের পর সুলতান বাবর ইহা প্রাপ্ত হন। সুলতান বাবরের পর, ইহা ক্রমান্বয়ে মোগল সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। পরিশেষে সম্রাট্ সাজিহান, যখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক বন্দী হন, তখন তিনি মনে করিয়া ছিলেন যে, এই "কোহিনুর" তাঁহার কোন কুলাঙ্গার সন্তানকে প্রদান করিবেন না, কিন্তু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাটের কন্যা ইহা প্রাপ্ত হন। সাজিহানের কন্যা তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা আরঙ্গজীবকে এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া হারের সঙ্গে এই "কোহিনুর" প্রদান করেন। এইরূপে সাজিহানের পরে,ইহা আরঙ্গজীবের হস্তগত হইয়া, বংশপরম্পরায় মোগল সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছিল। মহম্মদসাহের রাজত্বসময়ে নাদিরসাহ দিল্লি আক্রমণ ও দিল্লির রাজকোষ অধিকার করিয়াও,এই অমূল্য নিধি হস্তগত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরিশেষে তিনি অন্তঃপুরস্থ কোন বেগমের নিকট অবগত হইলেন যে, মহম্মদসাহ ইহা তাঁহার উষ্ণীষের ভিতর ব্যবহার করেন, কখনও বাহির করেন না। যখন সম্রাট মহম্মদসাহ তাঁহার তাতারবংশীয় স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদিগের সম্মানার্থ দিল্লিতে দরবার করেন, তখন নাদির বন্ধুতার ছলে সম্রাটের সঙ্গে উষ্ণীষ বদল করিতে প্রার্থনা করেন। সম্রাট্ তখন ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া নাদিরের বাসনা পূর্ণ করিলেন। উষ্ণীষ বদলের পর,

চতুর নাদির স্বীয় কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া, সত্বর দরবার ভঙ্গ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সেই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার ধন "কোহিনুর" তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। সম্রাট্ মহম্মদ সাহ আমোদে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নাদির সাহের মৃত্যুর পর, ইহা তাঁহার পুত্র সাহরুক প্রাপ্ত হন। সাহরুক আগ্ মহম্মদ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াও, এই "কোহিনুর" সহজে পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু সাহরুকের নিকট হইতে, ইহা আমেদ সাহ দুরাণির হস্তগত হয়; কারণ, আগ মহম্মদের আক্রমণকালে আমেদ সাহ দুরাণি সাহরুকের সাহায্য করিয়াছিলেন। আমেদ সাহ মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র তৈমুর সাহকে উহা প্রদান করেন। তৈমুর সাহ কান্দাহার হইতে কাবুলে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ইহা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহসুজা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হওয়াতে এই "কোহিনুর," কারাগারের প্রাচীর খুঁড়িয়া তাহার ভিতর গুপ্তভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সাহসুজাও এই জন্য প্রথমতঃ ইহার কোন সন্ধান পান নাই। পরিশেষে, ইহার সন্ধান পাইয়া তিনি প্রাচীর হইতে ইহাকে বাহির করেন। প্রধান প্রধান রাজকার্য্যের সময় এই "কোহিনুর" সাহসুজার বক্ষে শোভা পাইত। এই সময়ে এল্ফিনিষ্টোন্ সাহেব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পেশোয়ারে প্রেরিত হন। কিন্তু কাল-স্রোত অনিবার্য্য,—কাহাকেও হাসাইতেছে, কাহাকেও আবার চির দুঃখে ভাসাইতেছে। সুখ দুঃখ চিরকাল কাহারও সমান থাকে না। সাহসুজাও এই দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, পাঞ্জাব-কেশরী রনৃজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং কাবুল হইতে পলাইয়া আসিবার সময় তিনি যে সকল ধন রত্ন আনিয়াছিলেন, সে সকলই রনৃজিৎ সিংহ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ভারতের গৌরবের ধন "কোহিনুর"ও রনৃজিৎ সিংহের হস্তগত হইল। সাহসুজা এই "কোহিনুরে"র পরিবর্ত্তে রনৃজিৎ সিংহের নিকট হইতে ১,২৫,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রনৃজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, ইহা লাহোরের রাজকোষাগারে রক্ষিত হয়। সিপাহিযুদ্ধের পর, যখন পঞ্জাব ইংরেজ দিগের অধিকারভুক্ত হয়, তখন প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইহা উপহার প্রদান করেন। মহারাণী, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন, এই "কোহিনুর" প্রাপ্ত হন। তখন ইহার এক শত সাড়েছিয়াশী ক্যারাট্ ওজন ছিল; পরে আমষ্টার্ডমের কষ্টার-কোম্পানি কর্ত্তৃক কাটাইয়া অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত করা হয় এবং ৮০ ক্যারাট্ ওজন কমাইয়া ফেলা হয়। ইহা কাটাইতে ৮০,০০০৲ অশীতি সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এখন এই বহুমূল্য রত্ন মহারাণীর রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে।

আমরা "কহিনুরে"র কথা লইয়া পাঠক দিগকে এতক্ষণ বিরক্ত করিলাম,—এখন অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ হীরকের বিষয় বলিব। "গ্রেট্ মোগল" নামক অন্য একখণ্ড বৃহৎ হীরক ছিল, তাহা ১৬৩০ কিম্বা ১৬৫০ খৃষ্টা-

ব্দের মধ্যে পাওয়া যায় এবং সম্রাট্ সাজিহান, মিরজুম্লা নামক এক জন বিখ্যাত ভ্রমণকারীর নিকট উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। সাজিহানের পর, ইহা সম্রাট আরঙ্গজীবের হস্তগত হয়। মিরজুম্লা অনেক খনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং সে সময়ে তিনি একজন বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই হীরক-খণ্ড কর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ৯০০ ক্যারাট ওজন ছিল, এবং তাহার মূল্য ৪২,০০,০৯০ পৌণ্ড স্থিরীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু দিল্লির পতন ও নাদির সাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অস্তিত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে।

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডায় যে "গ্রেট্ টেবল্" নামক অন্য একখণ্ড হীরক পাওয়া যায়, তাহারাও বিশেষ কোন বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। "গ্রেট টেবলে"র আকৃতি ঠিক চতুষ্কোণ টেবিলের উপরিভাগের ন্যায় ছিল এবং সম্রাট্ সাজিহান তাহা ব্যবহার করিতেন। ইহা আকারে "কোহিনুর" অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বড় ছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহা পারস্যে কিম্বা কোন পার্‌সির নিকট আছে কি না, অদ্যাবধি নিশ্চয় জানা যায় নাই।

হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের নিকট একখণ্ড হীরক আছে, তাহার মূল্য এখনও ২,০০,০০০ পৌণ্ড। ইহা গোলকুণ্ডার খনিতে পাওয়া যায়।

রুষিয়া রাজের নিকট "অরলফ্" (Orloff) নামক যে হীরক খণ্ড আছে, তাহাও সাজিহান কিম্বা মিরজুম্লা এই উভয়ের কাহারও নিকট ছিল; পরিশেষে আমষ্টার্ডামের যুবরাজ অরলফ কর্ত্তৃক আরমেনিয়ান্ সওদাগরদিগের নিকট' হইতে নগদ ৯০,০০০ পৌণ্ড এবং আজীবন বাৎসরিক ৪,০০০ হাজার পৌণ্ড দিয়া ক্রয় করেন, এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিণ্‌কে উপহার দেন।

"দি মুন্ অফ্ মাউণ্টেন্" নামক আর এক খণ্ড হীরকও মোগল সম্রাট্ দিগের নিকট ছিল এবং দ্বিতীয় ক্যাথারাইন্ ইহা ক্রয় করেন। ইহাই এখন রুষিয়ার রাজমুকুটে শোভা পাইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে "ব্রাগাঞ্জা" নামক একখানি সর্ব্ব বৃহৎ হীরক অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রাজিলিয়ান্ নদীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা আকারে ঠিক্ হাসের ডিমের ন্যায় বড়। ইহার মূল্য তিন কোটী ষ্টার্‌লিং। এখন ইহা পোর্টুগালের রাজমুকুটে আছে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে "ষ্টার্ অফ্ সাউথ্" নামক অন্য একখণ্ড ব্রাজিলিয়ান্ হীরক মাইনাস্ জিরিসের খনিতে এক জন নিগ্রো-রমণী কর্ত্তৃক আবিস্কৃত হয়, তাহার প্রভু ইহা কেবল মাত্র ৩,০০০ হাজার পৌণ্ডে বিক্রয় করেন। অবশেষে ইহা ইউরোপে প্রেরিত হয় এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন এক্‌জিবিসনে দেখান হয় ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিস এক্‌জিবিসনে প্রেরিত হয়। ক্রমে ইহার যশঃ ভারতে প্রচারিত হইল এবং বরোদার গুই কুমার ৮০,০০০হাজার পৌণ্ডে ইহা ক্রয় করেন।

ফরাসি রাজমুকুটে যত বহু মূল্য প্রস্তর আছে, তন্মধ্যে "রিজেণ্ট" নামক হীরকই উৎকৃষ্ট। এই হীরক একজন নিগ্রো দাস ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে পার্টিল্ খনিতে প্রাপ্ত হয় এবং এক জন ইংরেজ নাবিকের উপর

বিশ্বাস করিয়া, দাসত্বমোচনআশায়, তাহার সমস্ত সম্পত্তি রাখিয়া দেয়, তন্মধ্যে ঐ হীরক-খণ্ডও ছিল। কিন্তু সেই বিশ্বাস-ঘাতক নাবিক ঐ বহুমূল্য হীরক প্রাপ্ত হইয়া ঐ দাসকে (Slave) জাহাজ হইতে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, উহা হস্ত-গত করে। শেষে যমচাঁদ (Jumchand) নামক এদেশীয় বিখ্যাত হীরক-ব্যবসায়ীর নিকট ১,০০০ পৌণ্ডে বিক্রয় করেন। এই হীরক পিট্ কর্ত্তৃক ৫০০০ হাজার পৌণ্ড ব্যয় করিয়া লণ্ডনে কাটান হয়। তৎপরে ডিউক অফ্ অর্‌লিন্‌সের নিকট ইহা ১,৩৫,০০০ পৌণ্ডে বিক্রীত হয়। ফরাসি রাজ্যবিপ্লবের সময় ইহা অপহৃত হয়, কিন্তু বহুকষ্টে আবার ইহার পুনরুদ্ধার হয়।

"ইউজিনি" নামক অন্য একখণ্ড হীরক তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট ছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পর ইহা বরোদা গুইকুমার ১৫,০০০ পৌণ্ডে ক্রয় করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ওরেলি নামক এক জন বিখ্যাত শিকারী এবং ব্যবসায়ী, গ্রীকোয়া (Griqua) রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া, সেই দেশস্থ ভান্‌নিল্ কার্ক নামক এক জন পরিচিত উপনিবেশিকের বাটীতে এক রাত্রি অতি-বাহিত করেন। সেই সন্ধ্যার সময়, ভান্‌নিল্ কার্কের একটি পুত্র কতকগুলি প্রস্তর লইয়া খেলা করিতেছিল, এই সকল প্রস্তর ভল্ নদীতে সচরাচর পাওয়া যাইত। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর এত উজ্জ্বল ছিল যে, ওরেলির মন তাহাতে আকৃষ্ট হইল, এবং তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে ইহা চাহিয়া আনিয়াছিলেন। ইহার ওজন সার্দ্ধ দ্বাবিংশতি ক্যারাট ছিল। ওরেলি ঐ হীরক-খণ্ড লইয়া আসিলে পর, ভান্‌নিল-কার্কের স্মরণ হইল যে, ঐরূপ বড় আর এক খানি প্রস্তর আর এক জন উপনিবেশিকের নিকট আছে, এই ভাবিয়া তিনি তাহার সমস্ত সম্পত্তির বদলে উহা আনিয়াছিলেন। উহার ওজন ৮৩ ক্যারাট। সাউথ আফ্রি-কার বণিকেরা ইহা ১১,২০০ পৌণ্ডে খরিদ করেন, ইঁহারা আবার ইহা ডাড্‌লির কাউণ্টেসের নিকট বিক্রয় করেন।

"পোর্টার রোড্‌স্" নামক অন্য একখণ্ড ১৫০ ক্যারেট ওজনের হীরক ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কিম্বরলী খনিতে পাওয়া যায়।

বোর্ণিও দ্বীপে মাটানের (Matan) রাজার নিকট একখণ্ড বড় হীরক আছে, ইহার নাম "মাটান্।" ইহার ওজন ৩৭৬ ক্যারাট। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বোর্ণিওর রাণী, ব্যাণ্টাম্ (Bantam) এর রাজাকে এক খানি বিখ্যাত হীরক উপহার দেন, ইহা গোয়াতে (Goa) কাটান হয়। বোর্ণি-ওতে অন্য একখণ্ড হীরক আছে, তাহার নাম "ষ্টার অফ্ সর্‌বাক্।"

এই সমস্ত হীরক ব্যতীত আরও অনেক বিখ্যাত হীরক আছে—অনাবশ্যক বোধে তাহাদের বিবরণ দেওয়া গেল না। পাঠক পাঠিকাগণের মধ্যে এই সকল প্রস্তরের বিষয় যদি কেহ বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি ষ্ট্রীটারের "দি গ্রেট ডায়-মণ্ডস্ অফ্ দি ওয়ার্‌লড" (The great diamonds of the world.) নামক পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

নীতি ও স্তোত্র।

"দুখ্ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখ্ মে যো হরি ভজে, দুখ্ কাঁহাসে হোই॥"

তুলসীদাস।

১

"এ জগতে সকলেই মগ্ন ভোগ-সুখে,
দিবানিশি পাপ-কার্য্যে রহিয়াছে রত;
চরমে কি হবে কারো নাহিক ভাবনা!
সকলেই কার্য্য করে নির্বোধের মত।
ধরাধাম ছেড়ে যেতে হবে কোন দিন,—
এ কথা ভাবিয়া মুখ কাহার মলিন?

২

প্রিয়তমা প্রণয়িনী—পুত্র প্রিয়তন—
যাদের সুখের লাগি ব্যস্ত অনুক্ষণ,
যাদের লাগিয়া খেটে রক্ত উঠে মুখে,
কাহা হ'তে উপকার হইবে সাধন?
কেহ কি পাপের অংশ গ্রহণ করিবে,
কেহ কি বিপদ্-কালে মুখ তাকাইবে?

৩

কার জন্য করি তবে অর্থের সঞ্চয়,
করি তবে কার তরে পরেরে পীড়ন?
কার লাগি পর সনে করি দ্বেষাদ্বেষি,
প্রতারণা করি তবে কাহার কারণ?
এ জগতে কেহ ত নাহিক আপনার,
কার জন্য খেটে মরি ভূতের ব্যাগার?"

৪

কিছুক্ষণ এই চিন্তা করিলে মানসে,
বুঝিবে—অনিত্য সব এই ধরাধামে;
আত্মসুখে রত সবে, কেবা কার ভাবে?
দারা,সুত, ভাই ভগ্নী,—সে কেবল নামে।
যথার্থ আত্মীয় যিনি তাঁরে ভুলি সবে,
পরেরে আত্মীয় করি রহিয়াছি ভবে!

৫

পিতা মাতা পরিজন আত্ম নহে কেহ,
পথিকে পথিকে যথা পথে পরিচয়;—
কিছু দিন এক সঙ্গে হয় বসবাস,
কাল-চক্রে, সবার বন্ধন ছিন্ন হয়;
ইষ্টানিষ্ট নাহি বুঝি মায়ায় মজিয়া,
যাইছে দুর্লভ জন্ম বৃথায় কাটিয়া।

৬

সংসার-ঘানির গাছে, বলদের প্রায়
যোতা আছি, চক্ষুঃ বাঁধা ঘুরি দিবানিশি;
এ ভব-বন্ধন বল ঘুচাইবে কেবা?
পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত কবে যাবে মিশি।
সে পদ সদত মন! করহ স্মরণ,
নরক-যন্ত্রণা যাতে হবে নিবারণ।

৭

মূঢ় মন! ক'রোনারে দেহ-অভিমান,
কাল-বশে সব যাবে, কিছুই না রবে;
দিবানিশি তাঁরে মন! ডাক অনিবার,
যাঁহার স্মরণে তব মোক্ষলাভ হবে।

জগতে যা কিছু দেখ—সকলি অলীক,
কে তোমার, তুমি কার, কহ দেখি ঠিক?

৮

নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য নিরঞ্জন,—
অখিলের পতি হরি, করুণানিধান!
পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা, তুমি শিবময়,
সদা যেন করি প্রভো! তব গুণগান।
তব পদে চিরদিন থাকে যেন মতি,
তুমি বিনা এ পাপীর নাহি অন্য গতি।

৯

দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, পতিতপাবন,
না জানি ভকতি, স্তুতি, ওহে দয়াময়!
সত্য সনাতন, তুমি সকলের পিতা,
নিজ গুণে মম প্রতি হওহে সদয়;
মায়া-কূপে মগ্ন যেন আর নাহি থাকি,
শয়নে স্বপনে যেন তোমাকেই ডাকি।

১০

বাসুকি-বদন যদি পাই, দয়াময়!
বর্ণিতে না পারি গুণ তথাপি তোমার;
চন্দ্র, সূর্য্য, নদ, নদী,বৃক্ষ, লতা, ফল,—
বহুবিধ দ্রব্য—কত জীব জন্তু আর,
ধরাধামে যাহা কিছু করি দরশন,
আমাদের সুখ তরে তোমার সৃজন।

১১

অপার কৃপার গুণে দিয়াছ যা মোরে,
তাহাতেই তুষ্ট যেন থাকি, দয়াময়!
কৃতজ্ঞ হইয়া যেন তাই ভোগ করি,
পরধনে লোভ যেন কখন না হয়।
ভ্রমেতে যদ্যপি করি বিপথে ভ্রমণ,
কৃপা করি করিও সুপথ প্রদর্শন।

১২

পরদুখে দুখী প্রভো! সদা যেন হই,
ঢাকিতে পরের দোষ শিক্ষা যেন করি;
ভুলেও না করি যেন পরেরে পীড়ন,
সকলের সনে যেন মিত্রভাব ধরি।
হৃদয়ে না হয় যেন বৃথা অহঙ্কার,
সদাই কীর্ত্তন করি মহিমা তোমার।

১৩

কটু কথা মুখে যেন কখন না আনি,
তুমি যাতে রুষ্ট হও সে কাজ না করি;
দেশে দেশে তব গুণ গাহিয়া বেড়াই—
তোমার কৃপায় যেন সুখে কাল হরি;
হিংসা-বিষে জরজর মন নাহি হয়,
হর্ষপূর্ণ থাকে যেন সকল সময়।

১৪

সত্য-হারে কণ্ঠ যেন হয় সুশোভিত,
দয়া-গুণে হৃদি কোষ পূর্ণ যেন হয়;
পর-উপকার-মণি শিরে যেন ধরি,
মনের মালিন্য প্রভো! যেন নাহি রয়;
এ পাপ-সংসারে র'ব যত দিন আমি,
"কুলোক" কেহ না যেন বলে,বিশ্বস্বামি!

১৫

পুণ্য-কর্ম্ম করিতে মানস যায় যেন,
কুকর্ম্মতে ঘৃণা হ'ক, নরকের প্রায়;
কুসঙ্গ ছাড়িয়া, সদা সাধু-সঙ্গে ফিরি,
দিবানিশি এক দণ্ড না ভুলি তোমায়;
এক মাত্র জগতের তুমি সার ধন,
তব কৃপা না থাকিলে বৃথা এ জীবন।

১৬

খঞ্জ চলে, অন্ধ দেখে, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি,
মূক কহে;—কি জানিব তোমার মহিমা;
অনাথের নাথ তুমি, সংসারের সার,
যোগী ঋষি নাহি পায় মহিমার সীমা;
নিজ গুণে কৃপা-কণা করি বিতরণ,
ঘুচাও আমার প্রভো! এ ভব-বন্ধন।

১৭

যত দিন রিপুকুল রহিবে প্রবল—
কেমনেতে মোক্ষলাভ হইবে আমার ?
তাহাদের আজ্ঞাধীন ভ্রমি পাপ-পথে,
দেহ শক্তি—তাহাদের করিতে সংহার ;
শম, দম, শান্তি, ধৃতি, করিয়া আশ্রয়,
ঘোরশত্রু রিপুকুলে করি যেন জয়।

১৮

সন্তোষ-রজ্জুতে বদ্ধ করি বাসনারে,
কালক্ষেপ করিবারে যেন প্রভো পারি ;
অভিমান-পঙ্কে যেন না হই মগন,
ধর্ম্মপথে ভ্রমি যেন—হই শুদ্ধাচারী।
রজ্জু-বদ্ধ বৃষ সম না বেড়াই ঘুরে—
তোমার কৃপায় যেন মনোসাধ পুরে।

১৯

ধূলা মাটী ল'য়ে খেলা করে শিশুগণ,
তেমনি ভবের খেলা নাহিক সংশয় ;
হতজ্ঞান হয় সবে খেলায় মাতিয়া,
ঘর ভাঙি চলে যায়—খেলা সাঙ্গ হয় ;
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে র'ব কত দিন ?
শ্রীচরণে স্থান দেহ আমি দীনহীন।

২০

পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ প্রভো ! করিয়াছি আমি,
তুমি যদি নাহি ক্ষম, ক্ষমিবে কে আর ?
বিতরি চরণ-তরী এ ভব-সাগরে,
দীনহীন এ অধমে কর হরি পার।
তব রাজধানী, যারে "স্বর্গধাম" কয়,
সেই খানে পরকালে বাস যেন হয়।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

প্রশ্নোত্তর-রহস্য।

প্র। সুবোধ ও অবোধে প্রভেদ কি ?
উ। সুবোধ, সয়ে রয়—
অবোধ—রয়ে সয়।

প্র। শিশু ও বৃদ্ধে প্রভেদ কি ?
উ। শিশু—শুয়ে খায়,
বৃদ্ধ—খেয়ে শোয়।

প্র। মনুষ্য ও পতঙ্গে প্রভেদ কি ?
উ। মনুষ্য—ম'রে পোড়ে,
পতঙ্গ—পুড়ে মরে।

প্র। মশা ও সিংহে প্রভেদ কি ?
উ। মশা—খেয়ে মারে,
সিংহ—মেরে খায়।

প্র। শত্রু ও মিত্রে প্রভেদ কি ?
উ। শত্রু—দগ্ধে মরে,
মিত্র—ম'রে দগ্ধে।

প্র। ফলারে ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গালীতে প্রভেদ কি ?
উ। ফলারে ব্রাহ্মণ—খেয়ে চায়,
কাঙ্গালী—চেয়ে খায়।

প্র। রমণী ও স্বর্ণকারে প্রভেদ কি ?
উ। রমণীর গলায় সোণা,
স্বর্ণকার—সোণা গলায়।

প্র। জোঁক ও বানরে প্রভেদ কি ?
উ। জোঁক—ধ'রে ছাড়ে,
বানর—ছেড়ে ধরে।

প্র। শালী ও ভগ্নিপতিতে প্রভেদ কি ?

উ। শালী—কান মলে,
ভগ্নিপতির মলে কান।

প্র। মনুষ্য ও গোরুতে প্রভেদ কি?
উ। মনুষ্য চিবাইয়া খায়,
গোরু খেয়ে চিবায়।

প্র। দণ্ড ও দণ্ডধরে প্রভেদ কি?
উ। দণ্ড—রাজধর্ম্ম,
দণ্ডধর—ধর্ম্মরাজ।

প্র। যুগী ও দর্জীতে প্রভেদ কি?
উ। যুগীর গলায় সুতা,
দর্জী—সুতা গলায়।

প্র। জেলিয়া ও জালিয়াতে প্রভেদ কি?
উ। জেলিয়ার করে জাল,
জালিয়াৎ—জাল করে।

প্র। সন্ধ্যা ও মৃত্যুতে প্রভেদ কি?
উ। সন্ধ্যা—দিনের শেষ,
মৃত্যু—শেষের দিন।

প্র। বিষ্ঠা ও ম্লেচ্ছে প্রভেদ কি?
উ। বিষ্ঠা খায় শূকর,
ম্লেচ্ছ—শূকর খায়।

প্র। সন্দেশ ও গঙ্গাজলে প্রভেদ কি?
উ। সন্দেশ—জলখাবার,
গঙ্গাজল—খাবার জল।

প্র। হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানে প্রভেদ কি?
উ। হিন্দুর—সার বাক্য,
খ্রীষ্টিয়ানের—বাক্যসার।

প্র। "সুবোধিনী" ও "জ্ঞানোদয়ে" প্রভেদ কি?
উ। "সুবোধিনী" শুনিয়া বলেন,
"জ্ঞানোদয়" বলিয়া শুনেন।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন।

বিদগ্ধ হৃদয়।

আজি রে নয়ন-জল, ঝরিতেছে অবিরল,
জ্বলিতেছে শোকানল হৃদয়ে আমার—
এ জীবনে কভু তাহা নিভিবে না আর!

আপনার ভাবি হায়, সঁপিনু পরাণ যা'য়,
হৃদি'পরে যত্নে যারে করিয়া ধারণ,
ধীরে ধীরে প্রেম ফাঁসে করিনু বন্ধন;

শান্তি-সুখ হরি যত, হায় জনমের মত
কোন্ শান্তি-নিকেতনে! লুকা'ল সে জন?
বিষাদ-জলদে ঢাকি হৃদয়-গগন।

সরল অন্তরে মন, করিলাম সমর্পণ,—
তাই হেন বিড়ম্বনা অদৃষ্টে আমার!
হে বিধি! তোমার বিধি লঙ্ঘে সাধ্য কার?

দুঃখ যে কাহাকে বলে, ভাবি নাই কোন কালে,
দুঃখের বারতা কভু—শুনেনি শ্রবণ!
ভালবেসে মাতোয়ারা ছিল মোর মন।

কোথা সেই ভালবাসা, পবিত্র প্রেমের আশা?
জনমের মত সব গিয়াছে যখন,
জানি না কি আশে তবু র'য়েছে জীবন!

গত দিন মনে হ'লে, হৃদয়ে অনল জ্বলে,
নয়নের জলে ভাসে বদন আমার;
শ্রবণ কেবল মম শুনে হাহাকার।

বিকারের রোগীমত, মনে হয় কথা কত,
বলিতে পারি না তাহা—বলিব বা কারে?
প্রাণ যারে চায়, বলি, পাই যদি তারে।

স্বপন সমান সব, হয় এবে অনুভব,
কখন চেতন পাই—কভু অচেতন,
ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পায় হৃদয়-দহন।

পরমেশ-পদ স্মরি, শিশু দু'টি বুকে ধরি,
বাঁচিয়া র'য়েছি এই বন্ধু-হীন দেশে;
নাহি জানি আরো কিবা আছে ভাগ্যে শেষে।

শ্রীহেমন্তকুমার রায় চৌধুরী।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সে গুড়ে বালি।

ভাদ্রমাস,—পনের দিন চাষার, পনের দিন মুচীর। ওদিকে পনের ষোল দিন ভাল রূপ বৃষ্টি হইয়া নদী, নালা, ডাঙ্গা, ডহর সমস্তই জল-পূর্ণ হইয়াছিল; এদিকে আবার কয়েক দিবস প্রচণ্ড রৌদ্রে সকলে উত্তাপিত হইয়া বৃষ্টির আশা করিতেছিল। আশ্বিন মাস পড়িতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, শনিবার হইতে সুরু করিয়া অষ্টাহ বৃষ্টি হইয়া জলের অভাব ঘুচিল, ফসলের বিশেষ উপকার হইল।

বৃষ্টি থামিয়া গেলে দামোদর বাবু এক দিন আপন চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় শান্তিরাম আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তিরাম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামাদি করিয়া কিয়দ্দূরে উপবেশন করিল। দামোদর বাবু কলিকা দিলেন, শান্তিরাম কিঞ্চিৎ অন্তরালে গিয়া তামাকু সেবন করিয়া পুনরায় উপবেশন করিলে, দামোদর বাবু তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, সাধারণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শান্তিরাম বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ কর্ত্তাবাবু! বৃষ্টি বেশ হ'য়েচে—জলের আর অভাব নাই, ঝড় ঝাটির ভয় একটা ছিল, তা ও দেবতা এবার মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন কার্ত্তিক মাস্‌টা ভালোয় ভালোয় গেলেই হয়। কার্ত্তিক মাসে কেবল একটি গা ধোয়ানি পসলা হয়, আর ঝড় ঝাটি না হয়, তাহা হইলেই সর্ব্ব রক্ষে।"

দামো। তা আমাদের কথাই যে র'য়েছে;—

আষাঢ়ে ধূলি, শ্রাবণে পালি,
সিংহি শুকো কন্যা কানে কান।
বিনি বায়ে বর্ষে তুলা কোথা রাখ্‌ব ধান?

শান্তি। কর্ত্তাবাবু! জল ত নয় যেন সোণা বর্ষেছে। আর বছরের কথা মনে হ'লে আর জ্ঞান থাকে না।

দামো। আঃ সে কথা আর বলিস্‌নে। দেবতা আর রেখেছেন কি? এবার যদি এক মুটো না দেন, তা হ'লে আর কিছু

থাক্‌বে না। সে দিন মেঘের ভাব দেখেই বলেছিলেম বৃষ্টি হ'বে। কথায় বলে,—

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
এলো খেলো বয় বা;
চাষাকে বল্‌গে বাঁধ্‌তে আল,
বৃষ্টি হ'বে আজ নয় কাল।

শান্তি। তা কর্ত্তাবাবু দেখুন, যখনকার যা তখন তা না হ'লে সব দিকেই খারাপি। আর বছর কেঁদে মরি আর কি। যে যেম্‌নে ব'সে, আর আকাশে এক ফোঁটা জল নাই।

দামো। কথায় বলে,—

হেসে সূর্য্য বসে পাটে,
চাষার গোরু বিকোয় হাটে।
ঠিক তাই আর কি।

শান্তি। তা কর্ত্তাবাবু! এবার বোনা, রোয়া দুই ভালরূপ হ'য়েছে। ফসল এবার চার পো,—তবে ঐ যে বল্লেম শেষ রক্ষাই রক্ষা। আর কর্ত্তাবাবু! এ কাজ হলো আমাদের বড় কঠিন, একটু এদিক ওদিক ত হ'বার যো নাই। যে সময়কার যা, সব গুলি সুশৃঙ্খলে হলে, তবে না যা বল্‌লেম তাই? কথায় বলে,—

আষাঢ়ে রোয় ফলকে,
শ্রাবণে রোয় দল্‌কে,
ভাদ্দরে রোয় শিষ্‌কে,
আশ্বিনে রোয় কিস্‌কে?

দামো। কথাটি খুব ঠিক। কার্ত্তিক মাস পড়্‌লেই যে যেমন ধান, সব তয়ের হতে হবে। কথায় আছে;—

আশ্বিন যায় কার্ত্তিক আসে,
ছোট বড় ধান গর্ত্তে বসে।

শান্তি। তা কর্ত্তাবাবু! দু' তিন বছর এই রকম হলেই, আবার সাবেক ভাব দাঁড়িয়ে যাবে।

দামো। আহা তাই হোক্, গরিব দুঃখী লোক খেয়ে বাঁচুক্।

শান্তি। কর্ত্তাবাবু! আজ কাল আপনাকে এমন দেখি কেন?

দামো। কি রকম্?

শান্তি। না, বলি এই দিনকের দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন—আর যেন স্ফূর্ত্তি নাই। কেন বলুন দেখি?

দামো। শান্তিরাম! সে কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন?—ছেলেটা মূর্খ হ'য়েই সব দিকেই প্যাঁচ হ'য়েছে।

শান্তি। কেন গা? চণ্ডীবাবু এদিকে ত বেশ!

দামো। ওর গোষ্ঠীর মাথা। ও যদি বেশ, তবে মন্দ কে?

শান্তি। সন্তান মূর্খ হ'লে বড় কষ্ট। লোকে ব'লে থাকে,—

ফুটো ঘটী, ছোঁচ্‌কা গাই,
চোর পড়সী, ছেঁচ্‌ড়া ভাই,
ঘর উড়নে, বেটা মূর্খ,—
ছয় মানুষের বড় দুঃখ।

তা এই যে ছটা মানুষের কথা বল্‌লেম, তার ভিতর দেখ যার সন্তান মূর্খ, তার কথাও বল্লে,—বটে কি না?

শান্তিরাম চণ্ডীচরণ সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন আরও অধিক কিছু শুনিয়াছিল, দামোদর বাবুর কথায় তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। প্রকাশ্যে বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ তা বটেই ত।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিয়দ্দূর হইতে অশ্ব-পদ-ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। অশ্বারোহী ক্রমে নিকটবর্ত্তী

হইয়া, দামোদর বাবুর দ্বারদেশে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আকার প্রকার দেখিয়াই দামোদর বাবু মনে করিলেন মহারাষ্ট্রীয় দূত। শান্তিরামকে ইঙ্গিত করিতেই শান্তিরাম চলিয়া গেল। দামোদর বাবু দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন। দূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চণ্ডীবাবু কোথায়?"

দামো। কেন মহাশয়! চণ্ডীকে কি দরকার?

দূত। এক খানি পত্র আছে।

দামো। কৈ দেখি?

দূত। চণ্ডী বাবু কোথায়?

দামো। কেন? আমি দেখতে পাই না?

দূত। রাওজীর হুকুম নাই।

দামো। ভাল, মহাশয়! রাওজীকে যে এত ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এলেম, রাওজী তবু আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হলেন কেন?

দূত। সে সকল কথা আমি কিছুই বলিতে পারি না।

দামো। বল্‌তে পারেন না,—একথা কে শোনে?

দূত। সে কি! আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না?

দামো। জোর ক'রে কি বিশ্বাস করান যায়?

দূত। আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি না,—আপনি চণ্ডীবাবু কোথায় বলতে পারেন?

দামো। সে হলো মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী,—আমি ভজা ঘরামী হয়ে তার খবর কেমন ক'রে জানব?

দূত। তাই ত আপনি অনেক দেরি করিতে লাগ্‌লেন।

এইরূপ বাক্ বিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময় চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিলেন। চণ্ডীচরণ অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন। অতএব, পিতার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া কর্কশস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বলি বাড়ীর ভিতর ব'সে থাক গিয়ে,বাহিরে এসো না—তোমার কি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে না কি?

দামো। 'আমার না তোর মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে?

চণ্ডী। চিঠীতে 'সাড়ে চুয়াত্তরের দাগ' র'য়েছে—তুমি চিঠী পড়্‌তে চাইছেলে যে?

দামো। 'আহর রেখে দে তোর "সাড়ে চুয়াত্তর,"—ওতে আমি ডরাইনে।

চণ্ডী। আরে যাও যাও—বেশি কথা কয়ো না।

দামো। আচ্ছা আমি এই চল্লুম, তোর যা খুসী, কর্‌গে যা, মর্‌গে যা, হাজ্‌গে যা, যা প্রাণ চায় তাই কর্‌গে—

চণ্ডী। হাঁ, হাঁ, তুমি আপনার ঘরে ব'সে থাক গে, তোমায় কেও মধ্যস্থ হ'তে ডাকে নি। এত বড় বে-আদব লোক ও কোথাও দেখি নি। আমার নামে এলো চিঠী, উনি অমনি কৈ দেখি কৈ দেখি ক'রে গিয়েছেন; তোমায় দেখা'বে কেন?

যে রাত্রে চণ্ডীচরণ রাওজীর নিকটে গিয়া কথা বার্ত্তা সমস্তই ঠিক করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দ্দিবস পরে, দামোদর বাবু তথায় গমন করিয়া ক্রন্দন,দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাকে সে বিষয়ে এক প্রকার অকৃতসঙ্কল্প ও নিরুদ্যম করিয়া আইসেন। দামোদর বাবু স্বয়ং যদিও বড় সহজ লোক নহেন, তথাপি, স্বীয় পুত্রের

অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের পথে কণ্টক বিকীর্ণ না করিয়া, কিরূপে ঔদাস্য-অবলম্বন করিয়া থাকিবেন? ধনুজী বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করিতে না করিতেই, চণ্ডীচরণ পুনরায় তাঁহার নিকটে গমন করিয়া পিতার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দেন। চণ্ডীচরণ ভাল জানিতেন যে, তিনি রাওজীর নিকটে কোন আবদার করিলে, তিনি অবশ্যই তাহা রক্ষা করিবেন। ধনুজী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চণ্ডীচরণের অশান্ত অন্তঃকরণকে কিছুতেই প্রশান্ত করিতে পারেন নাই। চণ্ডীচরণ তাঁহাকে এ বিষয়ে অনুমোদন করাইবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উত্তরীয় বস্ত্রাবৃত কয়েক গুলি অহিফেন ও এক গাছি দৃঢ় রজ্জু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি আত্মঘাতী হইব, তাহা হইলে আর আপনার কোন চিন্তা থাকিবে না; ব্রহ্মহত্যাই যদি আপনকার অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে আপনি আমার কথায় কর্ণ পাতও করিবেন না।" এই অভিমানব্যঞ্জক বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া ধনুজী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি চণ্ডীচরণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"ভাল আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনকার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিব, দুই এক দিবস মাত্র আমাকে অবসর প্রদান করুন।"

চণ্ডীচরণ তাঁহার বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলে, ধনুজী আপন পারিষদগণকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা কি বল? চণ্ডীচরণের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা উচিত কি না? তাহাতে আমাদের লাভ বৈ অলাভ নাই। প্রতাপচন্দ্র একটা প্রকাণ্ড জমীদার,—অনেক ধনের মালিক। আমারও ইচ্ছা,—'মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।' চুনা পুঁটি মারিলে কেবল পরিশ্রমই সার। ভগবান্ পিণাকীর ইচ্ছায় আমরা জয়ী হইলে, অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব। যদি বল কেন তাহার ভাণ্ডার লুঠ করিব, সে কি অপরাধ করিয়াছে?—সে সকল বিবেচনা করা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উচিত নহে। মহারাষ্ট্রীয় শোণিত স্বতন্ত্র ধমনীতে প্রধাবিত হইয়া থাকে, দয়া দক্ষিণ্যাদি আমাদিগের কলঙ্ক-স্বরূপ, বিনা রক্তপাতে দেশ লুণ্ঠনই আমাদিগের ক্ষমা। অশ্বপৃষ্ঠই যাহাদিগের সুকোমল শয্যা,—যুদ্ধ বিগ্রহাদিই যাহাদিগের ক্রীড়া ও আমোদ,—এবং মৃত্যুই যাহাদিগের সুনিদ্রা,—সে জাতি কি কখন স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় দয়ার্দ্রহৃদয়ে কালক্ষেপ করিতে পারে? কাঠিন্যই আমাদিগের অঙ্গের ভূষণ। তোমরা কি বৃদ্ধদিগের নিকট শ্রবণ কর নাই যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা শিবজী নবাব সায়স্তা খাঁকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন? তোমরা মনোমধ্যে নিশ্চিত জানিও, যে কোন কৌশলে শত্রুদমন ও যে কোন উপায়ে উদরভরণই, আমাদিগের চিরানুষ্ঠিত ব্রত। তোমরা নিশ্চিত জানিও, অত্যুন্নত গিরি-শিখর, বা বেগবতী স্রোতস্বতী আমাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম নহে; অতি ভীষণ অশনিকেও আমরা আলিঙ্গন করিতে ভীত হই না; নররক্তই আমাদিগের ললাটদেশে ত্রিপুণ্ড্রক-শোভা সম্পাদন করে, এবং করাল করবালই আমাদিগের মণিময় আভরণ। অতএব, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, কর-কবলিত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করা অতিশয় মূঢ়ের কর্ম্ম।"

পারিষদগণ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহ-সহকারে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদিগের কটিদেশস্থিত অসি সকলের ঝন্ ঝন্ শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহার বাক্য মহামন্ত্রস্বরূপ সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধনুজী বলিলেন,—"অদ্য রজনীতে তোমরা স্বস্থানে গমন কর, কল্য প্রত্যুষে সকলে সমবেত হইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হইবে—বলিয়া দিব।"

সকলে প্রস্থান করিলেন, এবং ধনুজীও নিদ্রা গেলেন। তৎপর দিবস, অতি প্রত্যুষে সকলে একত্র সমবেত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে, তিনি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দূত-হস্তে চণ্ডীচরণের নিকট এক খানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পাঠক মহাশয়! আপনি যাঁহাকে দামোদর বাবুর বাটীতে দেখিতেছেন, ইনিই সেই মহারাষ্ট্রীয় দূত।

দামোদর বাবু পুত্র কর্ত্তৃক এতাদৃশ অবমানিত হইয়াও, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন না। সুতরাং, তাঁহাদিগের কথোপকথনের ব্যাঘাত জন্মিল। চণ্ডীচরণ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া "কেমন তুমি বাড়ীর ভিতর না যাও দেখি", বলিয়া পিতার প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি শালবৃক্ষসন্নিভ দণ্ডায়মান হইয়া সদর্পে তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। চণ্ডীচরণ ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহারাষ্ট্রীয় দূত, ছেদী পাইক ও অপরাপর সকলে মধ্যস্থলে পড়িয়া উভয়কে নিবৃত্ত করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া অনঙ্গমোহিনী স্বীয় আবাস হইতে বহির্গত হইলেন এবং রুদ্রাক্ষ-সংলগ্ন দক্ষিণ হস্ত উন্নত করিয়া "স্থির হও স্থির হও", বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। গিরিবালা হৈমবতীর কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয় অৰ্দ্ধোম্মুক্ত বাতায়ন-পথে এই বিষম ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কর্ত্তাকে বাটীর ভিতর টানিয়া লইয়া আসিবার নিমিত্ত উজ্জ্বলাকে আদেশ করিলেন।

অনঙ্গমোহিনীর সুধাময় প্রবোধ বাক্যে চণ্ডীচরণ ক্ষান্ত হইলেন এবং পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"মনে করিয়াছ গোড়া বাঁধিয়া কার্য্য সমাধা করিবে কিন্তু সে গুড়ে বালি—সে গুড়ে বালি. এই বলিয়া দূতকে লইয়া কোন এক নির্জ্জনস্থানে গমন করিলেন।

দামোদর বাবু সজল নয়নে অনঙ্গমোহিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ মা! আমি এদেশে আর থাকিব না, তোমাদের দেশে গিয়া বাস করিব, তাহা হইলে অনেক স্বচ্ছন্দে থাকিব। আর যদি বাটীর নাম করি তাহা হইলে আমি চণ্ডাল। মা! এইরূপ নিত্য নিত্য ঘটিলে, আমার আর বাঁচায়াই বা কি ফল?"

অনঙ্গমোহিনী তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—"ঘোষাল মহাশয়! এরূপ ইচ্ছা কদাচ করিবেন না—স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়া সুখী হইবেন, ইহাও কি কখন সম্ভব? কথায় বলে,—

স্বদেশে শাকান্নে যদি এ জীবন রয়।
বিদেশের পরমান্ন সেও কিছু নয়॥

তা ঘোষাল মহাশয়! ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া

কোথায় যাইবেন? তবে চণ্ডীবাবু, এক্ষণে কি চান?"

ঘোষাল মহাশয় অনঙ্গমোহিনীর বাক্যের উত্তর দিতে না পারিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।

অন। তা আপনার বলিবার বাধা থাকে—বলিবেন না।

দামো। না বাধা আর কি? তবে কি, তুমি আর সে কথা শুনে কি করবে?

অন। আজ্ঞে সে কথা শুনিবার আবশ্যকতই বা কি?

দামো। যাও মা! তুমি আপনার কাজে যাও,—এরূপ আমাদের প্রত্যহ হইয়া থাকে।

অনঙ্গমোহিনী ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া আপন গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক গ্রন্থপাঠে মনো নিবেশ করিলেন। তিনি কাহারো নিকট এবিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতে উৎসুক হয়েন নাই। উজ্জ্বলা আসিয়া কর্ত্তাবাবুকে প্রবোধ-বাক্যে অন্তঃপুরে লইয়া গেল। ঘোষাল মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে না করিতেই, অশ্বের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, এবং তিনি বাতায়ন হইতে নিরীক্ষণ করিলেন—মহারাষ্ট্রীর দূত স্বগৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন। অদ্য হইতে দামোদর বাবু পুত্রকে প্রবোধপ্রদানে বিরত হইলেন এবং পতিপ্রাণা হৈমবতীও ভবিষ্যৎ সুখের আশায় এককালীন জলাঞ্জলি দিয়া বসিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ—দেশত্যাগী।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইযাছে। শরৎকালীন সূর্য্য সুতীক্ষ্ণ কিরণ-জাল বিস্তার করিতেছেন। হরিচরণের পিতা ক্ষেত্র-কার্য্য করিতে করিতে আক্লান্ত হইয়া হরিচরণকে আদেশ করিল,—"ওরে হরে! একবার শান্তিরামের কাছে যা দেখি, আমার পয়সা ক'গণ্ডা আজ দেবার কথা আছে।"

হরিচরণ তখন একে ক্ষুধার্ত্ত,—তাহাতে আবার প্রায় তিন পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া পয়সা আদায় করিতে যাইতে হইবে, ভাবিয়া অতিশয় কর্কশস্বরে উত্তর করিল,—"আমি যেতে পারব না, তোমার পয়সা তুমি আদায় কর গিয়ে, ক'টা পয়সার জন্যে এই রদ্দুরে কে যায় সে খানে?"

হরিচরণের পিতা এই কর্কশবাক্যে একান্ত কুপিত হইয়া, তাহার কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করিল। হরিচরণ প্রহার খাইয়া মনের দুঃখে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে ক্ষেত্রের বাহিরে গমন করিল, এবং ভাবিল,—প্রত্যহ এরূপ মারি খাওয়া অত্যন্ত অপমানের বিষয়; ভাল এদেশে আর থাকিব না, তাহা হইলেই ত সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া দ্রুত বেগে পা চালাইয়া দিল। এক পোয়া পথ গমন করিয়াই পা থামিয়া গেল; কারণ, রতনমণির গৃহ পশ্চাতে আম্রবৃক্ষ তাহার নয়ন গোচর হইল। ভাবিল—এই আম্রবৃক্ষের শাখায় বসিয়া আপন মনে ছড়া কাটিতে থাকিব,—যদি পোড়ারমুখী সাধিয়া পাড়িয়া কিঞ্চিৎ আহার করিতে দেয়।

আম্র বৃক্ষের একটি শাখা মৃত্তিকার সহিত প্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া আবার ঊর্দ্ধমুখ হইয়াছে; হরিচরণ সেই শাখায় উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল এবং কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া আপন মনে ছড়া কাটিতে লাগিল;—

ছেড়ে দিয়ে লাঙ্গল হাল
হাল্‌সে বেহাল্ হয়ে,
ভেবেছিলাম নৌকা কিনে
বেড়া'ব হাল বেয়ে।

নৌকা কেনা ফস্‌কে গেল
পয়সা হাতে নাই;
কোথা থেকে জুট্‌লো এসে
মৎস্যধরা বাই।

মৎস্য ধরা শক্ত বড়—
গায়ে লাগে কাদা;
কোন কাজ্‌টা পারি আমি
কোন্‌টা আছে সাধা?

চুপ্‌ড়ি বোনা শিখ্‌ব এবার,
কাজ্‌টি বাসি ভালো—
শূন্যপেটে আঁধার হৃদে
জ্বল্‌বে 'মণি'র আলো।

দিনের আলো লাগে ভালো
সইতে নারি রোদ;
ইচ্ছে করি, গুঁজ্‌রী পরি,
কিন্তু পায়ে গোদ।

বাপ্ হলো মোর সুখের সুখী,
দুখের দুখী—মা;
চলে যেতো যেমন তেমন,
ভাল হলে ছাঁ।

কার কাছে যাই, কি করি ভাই!
কে দেবে ঠাঁই মোরে?
ড্যাব্‌রা-চোকী খাইয়ে লাড়ু
জাত্ দিয়েছে মেরে।

দোষ করি নাই, ঘাট্ করি নাই,
তার পাকেতে ঘুরে,
মার্‌টা খেয়ে প্রাণ্‌টা গেল
তাই ত মরি ঝুরে।

রতনমণি তখন আপন গৃহে আহার করিতে বসিয়াছিল। গৃহ পশ্চাতে ছড়া শুনিয়া রতনমণি জানিতে পারিল—হরিচরণ আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া এবং আচমনাদি সমাপন-পূর্ব্বক একটি পান গালে দিল, এবং তামাকের কলিকায় আগুন চড়াইয়া, হুঁকা হস্তে হাসিতে হাসিতে হরিচরণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখে মুখে ছড়া প্রস্তুত করা—হরিচরণের স্বভাবসিদ্ধ-বিদ্যা। রতনমণিকে দেখিয়াই হরিচরণ সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—

পান্‌টি গালে, হেলে দুলে,
আস্‌ছ হেসে খেলে;
আড়নয়নী,—সৌদামিনী
খেলছে মেঘের কোলে।

রতনমণি আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া বলিল,—"হাঁরে হরে! আমাকে দেখ্‌লেই কি তোর ছড়া আসে?—"

হরি। তুমি বুদ্ধিমতী—সাধ্বী সতী,
হৃদয়খানি শাদা;
সেই কারণে, হরিচরণ
ঐ চরণে বাঁধা।

রত। মাইরি—এতও বকৃতে পারিস্ তুই?—তবে—এমন অসময়ে কি মনে ক'রে?

হরি। অসময়ে রসময়
উদয় হ'য়েছে,
রসনাতে রস টুকু নাই
পেট্‌টি জ্বলেছে।

রত। তোর ছড়া টড়া আমি বুঝ্‌তে পারিনে, বাপু! বলি তোর চোখ্ দুটো অত ফুলেছে কেম?

হরি। ও কিছু নয়—

রত। হাঁ, নয় কেন?—বেশ ফুলেছে—

হরি। তবে চল্লুম্—

হরিচরণ সহকার-শাখা হইতে অবতরণোদ্যত হইলে, রতনমণি বুঝাইয়া বলিল,—"না, না যাবি কেন? আমার মাথা খাস্ কি হ'য়েছে বল্। ওমা! এই যে গালে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ র'য়েছে! কে মেরেছে বল দেখি?

হরিচরণের দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিয়া আসিল। লম্বা কোঁচা নাই, কি করে, দুই হস্ত মুখে চাঁপা দিয়া রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রতনমণির সরল হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা লাগিল। সে মনে করিল—হরিচরণ ত কখন আমার সম্মুখে এমন করিয়া রোদন করে নাই—আজ হরিচরণের এ ভাব কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিয়াই গোল বাধাইলাম্—এতক্ষণ বেশ ছড়া কাটিতেছিল, অবশ্যই এমন কিছু ঘটিয়া থাকিবে, যাহাতে, হরিচরণের আমোদ-পরিপূর্ণ অন্তঃকরণেও ব্যথা লাগিতে পারে। রতন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁরে হরি! তোর পেট্ প'ড়ে র'য়েছে কেন? তুই কি বাড়ী যাস্ নি? মা'র কাছে ভাত খেয়ে আসিস্ নি?"

হরিচরণ ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিল,—"না।"

রত। হ্যাঁ—তা বুঝেছি—আজ মার খেয়েই পেট্টা ভ'রে গিয়েছে—না?

হরি। বুঝ্‌তে যদি পেরেছিস্, তবে আর জিগ্‌গেস্ ক'রে লজ্জা দিস্ কেন?

রত। আমার কাছে তোর লজ্জা কি? আমার কাছে তুই কোন্ কথাটা না বলিস্?

হরি। আরে নেকি! বুঝ্‌তে পারিস্‌নে? বুড়ো ধাড়ী হলুম্, আজও বাপের ঠাঁই মার খাই,—সেটা কি লজ্জার কথা নয়?

রত। অবিশ্যি—লজ্জার কথা নয় ত কি? তবে তুই কাজ কর্ম্ম ভাল ক'রে করিস্‌নে কেন?

হরি। আর চাষ বাস আমা হ'তে হবে না,—ও সব আমি ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছি।

রত। তবে এর পর কর্‌বি কি?

হরি। আরে রতনি, পেত্‌নি, ভূতনি! জানিস্‌নে? ও কাজ ক'রে কি এর পর আর অন্ন হবে? এখনই জমীদারের অত্যাচারে প্রাণ বাঁচে না। তুই যতই বল্—আমি ও কাজ কর্‌ব না।

রত। আচ্ছা তা যেন কর্‌বিনে, এখন তোর ক্ষিদে পেয়েছে, কি খাবি বল্ দেখি?

এই সুধামাখা কথা শুনিয়া হরিচরণ আহ্লাদে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল,—

মুখ্ চেয়ে কে খেতে দেবে
রতনমণি বই!
ঐ কারণে ঐ চরণে—
সদাই বাঁধা রই।
ঘর্ ছেড়ে মুই যাবো এখন
বৃন্দাবন-ধাম,
বনে বনে রতনমণির
গাইব গুণগ্রাম।

রত। আর বৃন্দাবন যেতে হবে না, বুড়ো হ, তখন বৃন্দাবন যাবি। ঘরে কি আছে দেখি দাঁড়া—

হরি। ভাই! খুব শীগ্‌গির। বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

রতনমণি গৃহাভ্যন্তর হইতে এক ধামি মুড়ি মুড়্‌কি, আর কয়েকটি নারিকেল-সন্দেশ লইয়া

আসিয়া হরিচরণের হাতে দিল। হরিচরণ চক্ষের নিমেষে সমস্ত পার করিয়া দিল এবং জল পান করিয়া সুস্থির হইয়া বসিল।

রতনমণি জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁরে হরে! তুই যে সেই অনেক দিন হলো একটা খবর দিয়ে গেলি,—সেটা কৈ হলো না?"

হরি। হবে, হবে—পালিয়ে যায় নি।

রত। সে যে অনেক দিন হলো রে।

হরি। হবে না হবে না হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ো অনেক কেঁদে কেটে তাদের সদ্দারের হাতে পৈতে জড়িয়ে ধ'রে ছিল,—তাতে তারা এক রকম নারাজ হয়েছিল। কিন্তু বুড়োর ছেলেকে কম ঠাওরাস্ নি,—সে গিয়ে আবার সব ভেস্তে দিয়ে এসেছে।

রত। কি রকম?

হরি। আরে বুঝ্তে পারিস্নে?—বলি চণ্ডী বাবুর জেদটাই রইল। দেমো এখন ভয় খেয়ে গেছে, তার আর ওসব কাজে গা হবে কেন? কিন্তু দেখ, তাদের যে সর্ব্বনাশ কর্তে যাচ্ছে, তাদের ত কোন দোষ নাই।

রত। তা ভগবান্ আছেন,—ধর্ম্মের জয়ই হবে।

হরি। তা আর হয় কৈ ভাই?

ধর্ম্ম-পথে হাড়ির হাল—অধর্ম্মেতে জয়,
দেখে শুনে হরির মনে লাগ্‌ছে বড় ভয়।

হরিচরণ মনে মনে স্থির করিয়াছিল—আর বাড়ী ফিরিয়া যাইব না, কোন দিকে চলিয়া যাইব; তাহা হইলে, বাবা আবার খোঁজ তল্লাস করিবেন, তখন আবার দেখা দিব। চাষ বাস করা আমার কর্ম্ম নয়। রতনমণি বলিল,—"ওরে হরে! এই বার ত পেট ঠাণ্ডা হ'য়েছে, এখন ঘরে যা। তোর মা হাঁড়ি নিয়ে ব'সে আছে।" এই কথা শুনিয়া হরিচরণ রতনমণির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল,—

আর যাবে না হরিচরণ
মাধব দাসের ঘরে;
ঝুলী নিয়ে ভিক্ষা ক'রে
ফিরবে দ্বারে দ্বারে।
মনের কোণে রতনমণি!
একটু দিও ঠাঁই,—
হরি ব'লে ড্যাং ড্যাঙায়ে
বৃন্দাবনে যাই।

রত। বলি এত দুঃখ কিসে হ'ল শুনি? মার ধোর্ ত তুই খেয়েই থাকিস্—এমন ত কখনও তোকে দেখিনি।

হরি। আর কাজ নাই ভাই! হরে হ'য়েছে দু' চক্ষের বিষ, হরে ম'লে আপদ্ যায়, হরে চাষ বাসও কর্‌ত্তে পার্‌বে না, আর হরে গুড় পানাও লাগ্‌বে না।

রত। না রে বুদ্ধি শুদ্ধি ভাল কর্; মা বাপের মনে কষ্ট দিস্নে,—মা বাপের মতন গুরু জগতে নেই।

হরি। আর তোমার গুরু মশায়ের মত শেখাতে হবে না।

রত। ঐ ত—ঐ ত তোর দোষ,—তুই ভাল কথায় ত কান দিবিনে।

হরি। হরেকে বড্ড বোকা ঠাওরাস্—না?

রত। তুই আবার বোকা!—সত্যি সত্যি কোথাও যাবি নাকি?

হরি। তুই জানিস্—হরিচরণ মিথ্যে কথা কয় না? যাব যে, তাতে কি আর ভুল আছে?

রত। হাঁরে হরে! তবে ডাকাতী হবে,—এটা সত্যি?

হরি। এই দু' চার দিনের ভিতরেই দেখ্‌তে পাবি, বড় যোগাড় হচ্ছে।

রত। তোর দু'চার দিন ত দু'চার মাস।

হরি। আচ্ছা, এইবার দেখে নিস্।

রত। ভাল, তুই এত খবর পাস্ কোথা?

হরি। আমি হলুম্ হরিচরণ,—আমার জান্‌বার ভাবনা? উজ্জ্বলাকে কাল পথের মাঝখানে ধ'রেছিলুম্। তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম্,—"হাঁরে তোদের বাড়ীতে কাল একটা ঘোড়ায় চড়া কে এসে ছিল?" সে বল্‌লে,—"আমি কি জানি? কত আস্‌ছে, কত যাচ্চে।" তাতে আমি গালাগাল দিয়ে বল্লুম,—"দ্যাখ্ আমার কাছে ঢাকৃবি ত বেটার মাথা খাবি।" তাতে সে রাগে গর্ গর্ কর্‌তে লাগ্‌ল, আমাকে কত কথাই শুনিয়ে দিলে। আমি দেখলুম্ বেগতিক, আবার একটু মিষ্টি ক'রে জিগ্যেস্ কল্লুম্,—"উজ্জ্বলা দিদি! আমার মাথা খাও, আমার মরা মুখ দেখ, কে এসেছিল বল না? তোমার পায়ে পড়ি।" তখন সে অমনি একটু টিকে-ধরানো গোচ হেসে বল্‌লে,—"কে জানে বাপু! ওদের কথা ওরাই জানে, ঐ নৈহাটীতে না কোথা ডাকাতী কর্‌তে যাবে কি না, তারই সব পরামর্শ হচ্চে; সে আর আমাদের কথায় কাজ কি ভাই? আমরা হলুম সামান্য লোক। তুই যেন আবার কারু কাছে গল্প কর্ত্তে যাস্‌নে।" আমি বল্লুম্,—"পাগল হ'য়েছে দিদি? তোমায় আমায় কথা হলো—এও আবার জন প্রাণী জান্‌তে পার্‌বে!"—সে মাগী খুসী হয়ে গেল। তা দ্যাখ্ এমনি ক'রে হরিচরণের কোন খবরই পেতে বাকি থাকে না।

রত। তবে তুই আমায় বল্‌লি কেন? আমি যদি ব'লে দি?

হরি। হাঁ, তুই যা ব'লে দিবি তা আমি জানি। তবে কি না কর্ত্তাটির কাছে একটু আদুরেপনা কর্‌তে কর্‌তে যদি দুটো একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, কি বলিস্?

রত। না রে না,—সে ভয় তোর কর্‌তে হবে না।

হরি। তবে এই কথা রইল;—আমি এখন চল্লুম্, বাঁচি ত দেখা হবে।

রত। সে কি হরি! ও কি কথা? মা'র কোল যোড়া হয়ে বেঁচে থাক্।

হরি। ও কথা আর বল না,

বল্‌লে আমার কান্না আসে;
বনে না বাপের সনে,
থাক্‌ব হেথা কিসের আশে?
যদি বল—মা আছে যার,
ভাবনা কি তার এ জগতে?
মা হ'ল বাপের অধীন,
স্থির বাঁধে মন কার কথাতে?

রত। বুঝি, তুই সত্যি সত্যি যাবি নাকি? তবে আমরা কা'কে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌ব?

হরি। হরে ত আর ম'রে যাচ্চে না।

রত। বালাই, অমন কথা বল্‌তে আছে?

হরি। বল্‌ব কি রতন! এবার মনে বড় কষ্ট পেয়েছি, রোজ রোজ মারে, তাও কি কখন সহ্য হয়? তোর কাছে ত আমি কোন কথাই ঢাকৃতে পার্‌ব না, এখন মনে ক'রেছি—দিন কতক একটু গা ঢাকা হয়ে থাক্‌ব। তুই যদি এ কথা প্রকাশ কর্‌বি, তা হলে হরের মাথা খাবি।

রত। আঃ কি কথা কোস্।

হরি। দেখ্, মা যদি তোর এখানে খুঁজ্‌তে আসে, তা হলে তুই বল্‌বি,—"হরে তোমার বেঁচে আছে, তুমি কেঁদোনা।"

রত। আর যদি বলে,—"কোথায় গেছে?"

হরি। তা হলে তুই বলবি,—"কোথায় ছুটে পালাল,—তা কি আমি দেখ্‌তে পেলুম্?"

এইরূপ উপদেশ দিয়া হরিচরণ এক লম্ফে আম্রশাখা হইতে নামিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া নদী-তটে উপস্থিত হইল এবং এক উদ্যমে সন্তরণ দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটীর ঘাটে উঠিল। রতনমণি সহকার-সন্নিকটে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল—হরিচরণ পক্ষীর ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল।

রতনমণি! তুমি আর এখন কি করিবে? হরিচরণের সহিত কথা কহিতে কহিতে তোমার তামাকু পুড়িয়া গিয়াছে। ইচ্ছা হয়, আর এক ছিলিম সাজিয়া খাও,—কিন্তু তা বলিয়া আমরা এখানে গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিব না।

(ক্রমশঃ)

(চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা)

আনন্দে—অভয়।

কি ফল বিলাপে বৃথা?—রোদনে কি ফল?
পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া পাখী উড়েছে যখন,
আর কি আসিবে ফিরে পিঞ্জরে কখন?
ফিরিবে বলিয়া সে ত কাটেনি শৃঙ্খল।
যে যায়—এখান হ'তে—যায় একে বারে;
এ সংসারে—এ অলঙ্ঘ্য বিধি—বিধাতার।
বসন্তে গিয়াছে উড়ি,—তাই হাহাকার;
শীতে—বরষায় গেলে,—কে চাহিত তারে?
যাও তবে—হে বিহঙ্গ!—যাও রে উড়িয়া
সুবিমল পাখা মেলি—অনন্ত আকাশে;
মরতের কোলাহল পড়িছে ঘুমিয়া;—
অমর-সঙ্গীত তোমা স্বাগত সম্ভাষে।
মুক্ত পক্ষ—শুদ্ধ-সত্ত্ব—আত্মা—জ্যোতির্ম্ময়,
খেল চির দিব্যালোকে—আনন্দে—অভয়।

শ্রীঃ—

ধন।

কেবা নহে এ জগতে ধনের কাঙ্গালী?
প্রাণপণে কে না করে ইহার কামনা?
লভিয়ে বিপুল অর্থ, হতে ধনশালী—
লোলুপ নিয়ত বল কার না বাসনা?
প্রাণপণে বহু যত্নে হ'য়ে ধনবান্—
মেটে না মেটে না তবু মেটে না লালসা!
কিছুতে সুস্থির তার নাহি হয় প্রাণ,
কেবল প্রবল হয়—বিষয়-পিপাসা।
ডুবিয়ে অতল তলে, সাগর সলিলে
লভিয়ে রতন-রাজি বাড়ে প্রলোভন;
দুরাশা আশার বশে দেয় অবহেলে
সামান্য রত্নের তরে—মানব-জীবন।
সর্ব্ব আশা পূর্ণ হয় কি ধন পাইলে?
সে পরমধন—তার কে করে যতন।

শ্রীরসময় লাহা।

সহবাসসম্মতির বয়ঃক্রম।

সামান্য বীজ হইতে অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়; স্রোতে ভাসমান্ ক্ষুদ্র বস্তু সকল একত্রে সমবেত হইয়া, বৃহৎ দ্বীপ-রূপে পরিণত হয়; সামান্য অগ্নি-কণা হইতে ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমগ্র গ্রাম দগ্ধ করিতে পারে; পীড়া সামান্য হইলেও কালে সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। অত এব, সামান্য জ্ঞানে কোন বিষয়েই ঔদাস্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।

'সহবাস-সম্মতি'র বয়ঃক্রম লইয়া বহু দিবস হইতে নানা প্রকার বাদানুবাদ হইতেছে। প্রথমে ইহার প্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই,

এবং ইহা হইতে যে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা ভাবেন নাই। প্রথমে ২।৪ জনের মধ্যে, পরে বহু সংখ্যক লোকের মধ্যে, ক্রমে সমাজে সমাজে, গ্রামে গ্রামে, ও নগরে নগরে ইহা পরিব্যাপ্ত হয়—এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা লইয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কুমারিকা অন্তরীপ হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই আন্দোলনে আন্দোলিত; ইহা এক্ষণে অগাধ জলধি অতিক্রম করিয়া বিলাত পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং এই আন্দোলনে, ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া বা তাঁহার প্রতিনিধি বড় লাট বাহাদুরের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছে। অতএব, এবিষয়ে আর উপেক্ষা করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে।

"স্ত্রীর বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইবার পূর্ব্বে, স্বামী তাহার সম্মতিতে হউক বা অসম্মতিতে হউক, তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না; করিলে, সেই সহবাস বলাৎকার বলিয়া গণ্য হইবে ও তন্নিমিত্ত স্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।" এইরূপ রাজ-আজ্ঞা বা আইন হইবার উপক্রম হইয়াছে; উপক্রম কেন সমস্তই ঠিক—কেবল আইন জারী হইতে বাকি।

সুশৃঙ্খলে রাজ্য শাসন, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন এবং অত্যাচার উপদ্রব দমন করিবার জন্যই আইনের প্রয়োজন; অতএব, উক্ত আইনের প্রচলন হইলে, এই সকল উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে, তাহা একটু অনুধাবন করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ,—এই আইন প্রচলিত হইলে সুশৃঙ্খলতার পরিবর্ত্তে, রাজ্য বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হইবে। কে কোথায় আইনোল্লিখিত অপ্রাপ্ত-বয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল, তাহার অনুসন্ধান ও সেই বিষয় লইয়া আদালত ঘর করা লোকের পক্ষে অতিশয় লজ্জাকর ও বিরক্তিজনক হইবে। এতদ্ভিন্ন, সকলেরই শত্রু আছে; হিংসা-পরবশ বা প্রতিকার-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেকে বৃথা অভিযোগ আনয়ন করিলে, তাহা হইলে, যথার্থ সহবাস হইয়াছে কি না, তাহা কিরূপে স্থিরীকৃত হইবে? সকলের সহবাস কিছু আর ফুলমণির ন্যায় অকাল মৃত্যুতে পরিণত হইবে না। কাযে কাযেই, বিচারপতি কর্কুড্, কুমারী বুধিয়ার মোকদ্দমার বিচার কালীন যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বুধিয়াকে পরীক্ষা করিয়া ছিলেন, এরূপ স্থলে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।* ইহাতে রমণীদিগের লজ্জার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। যে লজ্জা হিন্দু রমণীর শরীরের সৌন্দর্য্য, অঙ্গের অলঙ্কার,—যে লজ্জার জন্য হিন্দু-ললনা এতাদৃশ আদরণীয়া,—যে লজ্জার খাতিরে হিন্দু-রমণী প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, হিন্দুরমণীকে সেই লজ্জা হারাইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে। শুধু লজ্জা কেন, হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানের বিষয়

* পাটনা-নগরে কর্কুড্ নামে এক বিচারপতি ছিলেন। একদা বুধিয়া নাম্নী কোন অপ্রাপ্তযৌবনা কুমারী, "গুরুচরণ দোসাদ নামক চোর তাহার ঘটী বাটি চুরি করিয়াছে", বলিয়া উক্ত বিচারপতির নিকট অভিযোগ করে। বিচার কালীন কর্কুড্ সাহেব শুনিলেন যে, "কুমারীর কখন ঘটী বাটি চুরি যাইতে পারে না, বুধিয়া দুশ্চারিণী ও ঘোরতর অসতী।" অতএব, তিনি সুবিচার করিবার জন্য, বুধিয়াকে বিবস্ত্রা করাইয়া, ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

আর কিছুই নাই; অতএব, তাহারা মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিবে।

প্রজার সুখ সন্তোষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু উক্ত আইন প্রচলিত হইলে, সুখ সন্তোষের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক হিন্দু-প্রাণ অসুখীও অসন্তোষময় হইবে। পল্লীগ্রামস্থ দীন হীন প্রজাগণের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। পল্লিগ্রামে পুলিষই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা; পুলিষের ভয়ে তাহারা সতত সশঙ্কিত; তাহার উপর আবার এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, "চোরা যায় ভাঙ্গা বেড়া," সহবাসের ছুতা ধরিয়া পুলিষের অত্যাচার অধিকতর প্রবল হইবে। অধিবাসিগণের মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে এবং তাহারা নিতান্ত নিপীড়িত হইবে, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ বলিতেছেন,—"পতির বিপক্ষে কন্যাদূষণের অভিযোগ করিতে হইলে, অগ্রে মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে 'শমন' বাহির করিতে হইবে। পুলিষ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিতে পারিবে না।" কিন্তু সরলচিত্ত প্রজাগণের নিকট পুলিষই হউন, মাজিষ্ট্রেটই হউন, বা হাইকোর্টই হউন,—সকলই সমান। আদালতের নামেই তাহারা শিহরিয়া উঠে, শমন (Summon) দেখিলেই তাহারা শিয়রে শমন মনে করে—তাহাদের রক্ত শুকাইয়া যায়। সুতরাং, কখন কে তাহাদের বিপক্ষে বৃথা অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে, এই ভাবনায় তাহাদিগকে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ,—ইহাতে আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে। আমাদের শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীর ঋতু হইলেই, সে সহবাসযোগ্যা। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শন হইলে, তাহার স্বামীর সহিত দ্বিতীয় বিবাহ হয়, এবং সেই সময় গর্ভাধানের প্রশস্ত সময় বলিয়া বর্ণিত। যে স্ত্রী ঋতু-স্নান করিয়া স্বামীসহবাস না করিবে, সে নরকগামিনী হইবে ও পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং স্ত্রী ঋতু-স্নাতা হইলে, যে স্বামী তাহার সহিত সহবাস না করিবে, সে ঘোরতর ভ্রূণ-হত্যাপাপের ফল ভোগী হইবে। স্বামী নিকটে না থাকা বা কোন বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া প্রযুক্ত দু' এক স্থলে দ্বিতীয় বিবাহে বিলম্ব হয় বটে, কিন্তু তা' বলিয়া রাজা, প্রজার ধর্ম্মরক্ষক হইয়া, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদের ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হওয়া তাঁহার কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

রাজা বলিতেছেন,—"ইহাতে তোমাদের কিছু মাত্র ধর্ম্মহানি হইবে না।" কিন্তু এ কথা আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? রাজা আইন করিলেন,—"স্ত্রীর বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর না হইলে, তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না।" কিন্তু, আমাদের শাস্ত্র বলিতেছে,—"স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে যে স্বামী উপগত না হইবে, তাহাকে পাপভাগী হইতে হইবে ও সেই স্ত্রীকে পুনঃ পুনঃ বৈধব্য-যন্ত্রণা ও নরক ভোগ করিতে হইবে।" বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অনেক স্ত্রী ঋতুমতী হয়, ইহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি; কারণ, প্রকৃতি কখন সকলের পক্ষে বয়ঃক্রম-অনুসারে, বা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে পরিচালিত হইবার নহে। অতএব ঐ সকল স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হইলেও, আইনের কঠোর আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য যতদিন

তাহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইবে, ততদিন তাহারা স্বামীসহবাস করিতে পাইবে না; সুতরাং, তাহারা ও তাহাদের স্বামীরা ঘোরতর পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে; তাহা হইলে আর ধর্ম্মহানি হইবার ত্রুটি কি? তবে গবর্ণমেণ্ট যদি সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কোন আইন করিতে পারেন যে,—"যতদিন বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ না হইবে, ততদিন কোনও স্ত্রী ঋতুমতী হইতে পারিবে না।" তাহা হইলে,আর আমাদের অসন্তোষের কোন কারণ নাই, এবং আমরা কিছু মাত্র আপত্তি করিতে চাহি না।

স্ত্রীর আদ্য ঋতুর পর, গর্ভাধান বা সহবাস না করিলে যে, কেবল মাত্র স্বামী স্ত্রীকে পাপ ভাগী ও নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহা নহে। শাস্ত্রানুসারে সেই স্ত্রীর গর্ভ অপবিত্র হইবে, এবং সেই গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহারা অপবিত্র ও পিণ্ডদানে অযোগ্য হইবে। অতএব উক্ত আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, কি সর্ব্বনাশই সাধিত হইবে। হিন্দুর চক্ষে সমস্ত হিন্দু সন্তান অপবিত্র বলিয়া দর্শিত হইবে, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!

আমাদের বিবাহ, পাশববৃত্তি চরিতার্থের জন্য নহে। আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।" পুত্রের জন্যই ভার্য্যার প্রয়োজন; কিন্তু সেই পুত্রই যদি অপবিত্র ও পিণ্ডদানে অযোগ্য হইল,তাহা হইলে ত আমাদের বিবাহ পর্য্যন্ত বৃথা হইল।

দোষ অল্পই হউক, বা অধিক হউক, ইহা আমাদের ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট। রাজা কখন কাহারো ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন। অতএব এই দীনহীন ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাগণের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতে বাধ্য করা, কি বহুদর্শী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত কার্য্য?

আমরা হিন্দু,—আমরা কখন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিয়মানুসারে আমাদের ধর্ম্মকে পরিচালিত করিতে পারি না। আমাদের সাংসারিক সুখ, আমাদের গার্হস্থ আচার ব্যবহার, আমাদের দাম্পত্য পবিত্রতা কখনই ভিন্নদেশীয় ভিন্ন জাতীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী দিগের দ্বারায়, আমরা বিকৃতভাবাপন্ন করিতে পারিব না। আমাদের সামাজিক পবিত্রতা, আমাদের ধর্ম্মনীতির নির্ম্মলতা, আমাদের শাস্ত্রানুসারে পরিচালিত হইবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের অন্তঃপুরের শুদ্ধাচারিতা যে, অন্য সমাজভুক্ত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ বা আইনের দ্বারা বিনষ্ট হইবে, ইহা আমাদের শরীরে এক বিন্দু হিন্দু-শোণিত থাকিতে, আমরা কখনই সহ্য করিতে পারিব না। সময়ের গুণে যাহা হইবার, তাহা আপনি হইবে। আমাদের ধর্ম্মের সংস্কার আবশ্যক হয়, আমরা করিব; আমাদের সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, আমাদের সমাজরক্ষকেরা করিবেন। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও অন্য সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ—যাঁহাদের সহিত আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ সামঞ্জস্য ও সংশ্রব নাই—আমাদের ধর্ম্মের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদিগকে কলুষিত ও ধর্ম্মচ্যুত করিবার তাঁহাদের আবশ্যক কি? তাই বলি, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট! ভ্রমে পড়িয়া এরূপ ঘোরতর অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না; না বুঝিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণে নিদারুণ ক্ষোভ ও মর্ম্মান্তিক

বেদনার উদ্রেক করিও না; ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সংসারের কেবল মাত্র সম্বল ও জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ধর্ম্মধন অপহরণ করিও না; চির-পরিতপ্ত হিন্দু প্রাণের এক মাত্র শান্তি-নিকেতন ধর্ম্ম হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিও না; হিন্দুর ধন মান খ্যাতি যশঃ, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তোমার পদতলে; এক মাত্র ধর্ম্ম লইয়া সে অপার আনন্দভোগ করিতেছে, তাহাকে সে আনন্দভোগে বঞ্চিত করিও না। বহুশতাব্দী ধরিয়া যে ধর্ম্ম আমরা কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া আত্মার তৃপ্তিলাভ ও বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছি, যে ধর্ম্মকে আমরা পবিত্র সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, আজ কিনা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই ধর্ম্মের সংস্কার করিবার ছলে, তাহার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যত! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়!

গবর্ণমেণ্ট যে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া কেবল মাত্র সহবাসের বয়স বৃদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হইবেন, তাহা বোধ হয় না। বড় লাট বাহাদুর বলিয়াছেন,—"We propose 'for the present' to limit ourselves to legislation" &. অর্থাৎ আমরা আপাততঃ এইটি করিলাম। এই 'আপাততঃ' 'for the present' কথার অর্থ কি, পাঠকগণ! তাহা বিচার করিবেন। আমাদের ধারণা—"অন্যান্য বিষয় পরে করিব",—এই কয়েকটি কথা উহার সহিত উহ্য আছে। অতএব আমাদের ধর্ম্ম-নাশের যে, ভয়ানক উদ্যোগ হইতেছে, তাহা আর কে না বুঝিতে পারিবে।

হিন্দুর সমস্তই গিয়াছে,—একমাত্র ধর্ম্মের গৌরবে তাহারা আজও গৌরবান্বিত; আজ হিন্দুর সেই অবশিষ্ট ও একমাত্র গৌরব—ধর্ম্মকে নষ্ট করিবার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিবার আবশ্যক কি?

ইংরাজ! তুমি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তোমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। তবে যদি তুমি, শ্বেত ও কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ও নিম্নতার বিজাতীয় ভাবের উদ্দীপন করিয়া, "অহং বিজেতা" জ্ঞানে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যথেচ্ছাচার করিতে কৃতসংকল্প হও, তাহা হইলে, নাচার।

তৃতীয়তঃ,—আমরা এই আইনের কোন আবশ্যক দেখিনা; কারণ, ইহা বিধিবদ্ধ হইলেও কোন ফল হইবেনা—কেহ কিছু আর আদালতকে ডাকিয়া সাক্ষ্য রাখিয়া সহবাস করিবে না। হরিমোহন মাইতির ন্যায় সকলের সহবাস আদালত পর্য্যন্ত না গড়াইলে ত আর প্রকাশ হইবে না; অতএব, এরূপ আইন করিবার উদ্দেশ্য—কেবল মাত্র প্রজাদিগের মধ্যে অসন্তোষ, চিত্ত বৈকল্য ও অশান্তি উপস্থিত করা ভিন্ন, আর কিছুই আমরা দেখিতে পাই না।

শ্রীকালিদাস মিত্র।



সঙ্গীত

৺কুঞ্জবিহারী মিত্র বিরচিত।

বাহার—তেওট।

ঐ হের শ্যাম নবজলধরে,
সখি! দাঁড়া'য়ে ঐ যমুনারি তীরে,
কিবা ত্রিভঙ্গ রূপ ধ'রে—
পদ'পরে রাখি পদ ভঙ্গী ক'রে।

হেরিয়ে, হরিল মম চিত,
হারাইলাম গৃহ-পথ,
আর না চলে চরণ;—
আহা মরি মরি
কিবা রূপ হেরি,
ধৈরজে না মন,
স্খলিত বসন,—
কুল, শীল, লাজ সই! কি করে?

জিনিয়া স্থল-দল,
শ্রীচরণ-কমল,—
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন—ভিন্ন ভিন্ন;
রাহু-ভয়ে বুঝি রবি শশী,
শরণ ল'য়েছে আসি
যুগল-চরণাম্বুজে;
কিবা পদদ্বয় শোভা হয়;
ভানু—পদতলে—
ইন্দু নখ-ছলে;
মানস—রাখি পদ হৃদয়-মাঝারে।

মণিময় নূপুর
ধ্বনি করে সুমধুর;
শ্রবণে মোহিত হয় কুল-বালা,
কটি তটে পীত ধড়া জড়িত,
—নবঘনে যেন তড়িত—
তাহে কিঙ্কিণী-শোভন!
হৃদয় উপরে শোভা করে—
শ্রীবৎস আর কৌস্তভ-হার;
কণ্ঠেতে গজমতি শোভিত থরে থরে।

আপাদ-লম্বিত,
বন-মালা আন্দোলিত,—
বিম্বোষ্ঠাধরে মৃদু মৃদু হাস;
একে সুপ্রসন্ন চন্দ্রানন,
তাহে পুণ্ডরীক-নয়ন;
অলকাবৃত ভাল,—
শীরে—পুচ্ছ-চূড়া,
বামেতে টেড়া,
গুঞ্জর-বেষ্টিত—
অতি সুশোভিত—
কি মোহন মুরলী অধরে!



জার-পুত্রের প্রতি ভারত-মাতা।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

কি মনে করিয়ে বাছা! ভারত-ভুবন রে?
কি দিয়ে তুষিব তোরে আছে কিবা ধন রে?
আমি অতি ভাগ্য-হীনা, বিবশা—মলিনা—ক্ষীণা,
দেখিয়ে আমার দশা, "হাসে শত্রুগণ রে!

সে দিন কি আছে এবে, ভারত-সন্তান যবে
কাঁপা'য়ে মেদিনী দাপে, করিত ভ্রমণ রে?

কোথা সেই বীরগণ, দুখিনীর প্রাণধন?
উজ্জ্বলি'রিত তারা, জননী-বদন রে!

নিয়ত বিদেশী-পদে, পড়িয়ে পরাণ কাঁদে,
আরো কি কপালে আছে, বিধির লিখন রে!

দীপ্ত হুতাশন সম, হিন্দু-বীর-পরাক্রম,
সকলি কালের বশে, পেয়েছে নিধন রে!

দিবানিশি শোক-ভরে, কাঁপে হৃদি থর থরে,
কে আসি মুছা'বে বল? সজল নয়ন রে!

অস্তমিত সুখ-শশী, এবে ঘোর অমানিশি
ঘেরেছে, আঁধার ঘোরে, ভারত-গগন রে!

কি দেখিতে এলে তুমি? শ্মশান— ভারত-ভুমি,
নিদ্রিত ভারত-সুত, হ'য়ে অচেতন রে!

বীরের জননী হয়ে, কি কাজ কলঙ্ক বয়ে,
ডুবুক ভারত আজি, অতল জীবন রে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

মুরসিদ্ কুলি খাঁ।

সহৃদয় ও সমদর্শী ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, হিন্দুদিগের বাহুবল ও বুদ্ধি-কৌশল এতদ্দেশে সুদূর বিস্তৃত মুসলমান-রাজ্য-স্থাপনে সময়ে সময়ে প্রভূত সহায়তা করিতে ত্রুটি করে নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যবনের ভীষণ অত্যাচার-স্রোত হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, তথাপি হিন্দুবীর্য্য কদাপি এককালেই তিরোহিত হয় নাই। বিধর্ম্মী ও চিরবৈরী মুসলমানের ইতিহাসেও আর্য্যবীরের অসমসাহসিক বীর্য্যবত্তা অদ্যাপি স্বর্ণাক্ষরে রক্ষিত রহিয়াছে। প্রতাপসিংহ ও শিবজীর জ্বলন্ত চিত্র, পুরাবৃত্তের পবিত্র পৃষ্ঠা হইতে কথনও বিলুপ্ত হইবার নহে। স্বীকার করি, ইহাঁরা এবং ঈদৃশ মহানুভব ও প্রাতঃস্মরণীয় অন্যান্য বীরগণ আজীবন যবনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন—মাতৃভূমির মঙ্গল-কামনায় অবাধে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু আবার অনেকে জন্মভূমির ভাগ্যদোষে চিরভ্রমে পতিত হইয়া স্ব স্ব অলৌকিক বলবুদ্ধি, আজীবন যবন-সেবায় ক্ষয় করেন। সেই মানসিংহ, তোডরমল্ল ও বীরবল প্রমুখ বীরগণ কি হিন্দুসন্তান ছিলেন না? আবার যে সকল আর্য্যসুতগণ শৈশবে দৈবদুর্বিপাক বশতঃ, ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সুকঠিন পরিশ্রমসহকারে ও প্রতিভা-প্রভাবে স্ব স্ব উন্নতির পথ পরিষ্কার করতঃ, সমাজের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে উত্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহাদেরও ধমনীতে কি আর্য্যশোণিত প্রবাহিত ছিল না? দাক্ষিণাত্যে সুবিস্তৃত বাহমনি রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা, এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বঙ্গদেশের নবাবকুলতিলক মুরসিদ কুলিখাঁও ইহাদেরই মধ্যে একজন।

একদিন যে দীনহীন ব্রাহ্মণ-বালক পথিমধ্যে হাজি সোফিয়া নামক কোন পারসী বণিক কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সেই নিরাশ্রয় বালকই পরে স্বীয় প্রতিভাবলে বঙ্গ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বালক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। হাজি সোফিয়া ক্রয় করিলে পর, তিনি ইস্পাহান নগরে আনীত হন ও যবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মহম্মদ হাদি' নামে জনসমাজে পরিচিত হয়েন। হাজি সোফিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে ইহাঁকে লালন পালন করিতেন; এবং তাঁহারই যত্নে ক্রীতদাস বালক বিলক্ষণ বিদ্যা শিক্ষা করেন। বণিকের মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিয়া ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে মহম্মদ হাদি বেরারে গমন করিয়া, তদানীন্তন স্থানীয় দেওয়ান হাজি আবদুল্লার অধীনে অতি অল্প বেতনে রাজকীয় কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই পদই তাঁহার উন্নতির প্রথম সোপান। এই রাজস্ব-আদায়-সংক্রান্ত-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি এরূপ কার্য্য-দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন যে, কয়েক বৎসর মধ্যেই তাঁহার প্রশংসাবাদ বাদশাহ আরঙ্গজেবের কর্ণ-গোচর হয়, ও তৎকর্ত্তৃক 'কারতলব খাঁ'

উপাধির সহিত হায়দরাবাদের দেওয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই উচ্চ পদে আরোহণ করিয়া তিনি স্বকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, বাদশাহ ১৭০১ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী তাঁহাকে প্রদান করিতে দ্বিধা করিলেন না। তৎসঙ্গে—যে নামে তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ সেই "মুরসিদ কুলি খাঁ" উপাধিও প্রদত্ত হইল।

বাদসাহ আরঙ্গজেবের শাসন-সময়ে বঙ্গদেশে নাজিম ও দেওয়ানের পদ স্বতন্ত্র ছিল। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণ, অন্তর্দ্দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লব নিরাকরণ ও দেশে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন,—এই সকল কার্য্যভারই নাজিমের হস্তে সমর্পিত ছিল। দেওয়ান কেবল রাজস্ব-সংগ্রহ ও রাজ্যসংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাকে নাজিমের অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতে হইত। মুরসিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালায় দেওয়ান-পদে নিযুক্ত হইয়া অবিলম্বে ঢাকা-নগরে গমন করতঃ, রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। আসিবামাত্রেই তাঁহার নয়ন-গোচর হইল যে, দেশ ধনধান্যপূর্ণা বটে, কিন্তু রাজকোষ শূন্যপ্রায়; রাজস্ব প্রায় সমস্তই অপব্যয় হয়। অতএব কালবিলম্ব না করিয়াই, পুরাতন অর্থ-পিপাসু কর্ম্মচারীদিগকে একে একে বিদায় দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিশ্বস্ত নূতন লোক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই অবগত হইলেন যে, বঙ্গদেশের রাজস্ব ক্রোর মুদ্রা অপেক্ষাও অধিক।

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানগণ বঙ্গদেশের অতিশয় দুরবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অস্বাস্থ্যকর ও অনুর্ব্বর জঙ্গল প্রদেশ ভ্রমে, এই শস্যশ্যামল সমতলক্ষেত্র সৈনিক জায়গীরদার দিগকে বিতরিত হইয়াছিল। কেবল অতি অল্প অংশ হইতে রাজস্ব সংগৃহীত হইত; এবং বঙ্গ রাজ্যের নানাবিধ ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য সুবা হইতেও অর্থ সংগ্রহ না করিলে চলিত না। মুরসিদ কুলি খাঁ দেওয়ানপদে নিযুক্ত হইয়াই, জায়গীরগুলি পুনরায় স্বায়ত্ত করিতে বাদসাহকে অনুরোধ করিলেন; বাদসাহও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিলেন না; এবং দেওয়ানের পরামর্শমতে বিস্তৃত উড়িষ্যা প্রদেশ জায়গীরদার দিগকে প্রদান করিলেন। এই রূপে বঙ্গদেশের জমীদার ও তালুকদারগণ দেওয়ানের বশবর্ত্তী হইল, মুরসিদ কুলির নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সমধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইল ও ঋণ-গ্রস্ত রাজ্যের রাজকোষ অতি স্বল্পকাল মধ্যেই অর্থে পরিপূর্ণ হইল। রাজকার্য্যে এইরূপ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করায়,নূতন দেওয়ান রাজ-সরকারে প্রভূত প্রশংসা লাভ করিলেন। সুদূরে—দিল্লীর দেওয়ানখাসেও মুরসিদ কুলির সুখ্যাতি গীত হইল। কিন্তু, আবার এই কার্য্য বশতঃ কেহ কেহ তাঁহার ভীষণ শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইল।

তৎকালে বাদসাহ্ আরঙ্গজেবের পৌত্র, সুলতান বাহাদুর সাহের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ আজিম উশ্‌শান বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই গর্ব্বিত ছিলেন, ও রাজস্বের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রস্তাবে দেওয়ানের আপত্তি ও পরামর্শ কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাতে আবার মুরসিদকুলি দেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া বাদশাহের সবিশেষ অনুগৃহীত ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। এদিকে আবার নবাবের পারিষদ-বর্গও আপনাদের অপরিমিত

ব্যয় সম্বন্ধে দেওয়ানের সর্ব্বদা আপত্তি ও হস্তক্ষেপ বশতঃ তাঁহার উপর বহুদিন হইতে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারাও নবাবকে মুরসিদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে ত্রুটি করিল না। আজিম উশ্‌শান দেওয়ান কে বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

রোমরাজ্যের 'প্রিটোরিয়ান গার্ডের' ন্যায় তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর দিগের এক দল সৈন্য ছিল। তাহারা নবাবের আজ্ঞায় নানাবিধ অসমসাহসিক নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইত। লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড, পুরস্ত্রীর সতীত্বাপহরণ, গর্ভিনীর গর্ভপাত, ধনবানের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন ও অন্যবিধ ঘোরতর নৃশংসাচরণ, তাহাদের দৈনিক ব্যবসায় ছিল; ইহারই জন্য তাহারা রাজকোষের অর্থে স্বতন্ত্র পোষিত হইত। সাধারণ সৈন্যবর্গের ন্যায় তাহারা জমীদারদিগের বেতনভোগী হইত না। তাহারা রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে কদাপি গ্রাহ্য করিত না। তৎকালে 'আবদুল ওয়াহিদ' নামে এক দুরাচার এই সৈন্যসম্প্রদায়ের সেনাপতি ছিল। এইরূপ ব্যক্তি যে, নবাবকে দেওয়ানের প্রাণ-বিনাশে পরামর্শ দিবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ, আবদুল ওয়াহিদই তখন বঙ্গসুবেদারের দক্ষিণ হস্ত। নবাব দ্বিরুক্তি না করিয়া, এই প্রস্তাবেই অনুমোদন করিলেন। মন্ত্রণায় এই স্থির হইল যে,—"রাজদরবারে আসিবার সময় পথিমধ্যে দেওয়ান্‌কে হনন করা হইবে।"

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে, একদিন প্রাতঃকালে দেওয়ান মুরশিদ কুলি খাঁ শিবিকারোহণে নবাবকে অভিবাদন করিতে আসিতে ছিলেন। আজিম উশ্‌শান তাঁহার সহিত যেরূপ শক্রতাচরণ করুন না কেন, তিনি কদাপি নবাবকে সম্মান বা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহাহউক, তিনি অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই, আবদুল ওয়াহিদের দুর্বৃত্ত সৈন্যদল তাঁহার শিবিকা বেষ্টন করিয়া ফেলিল ও উদ্ধতভাবে আপনাদিগের বেতন চাহিতে লাগিল। দেওয়ান সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন ও তাঁহার সহিত কতিপয় অস্ত্রধারী অনুচরও থাকিত। অতএব তিনি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, তরবারি হস্তে শিবিকা হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন ও নিজ ভৃত্যবর্গকে রাজপথঅবরোধকারী দিগকে তথা হইতে অপসৃত করিতে আজ্ঞা দিলেন। ওয়াহিদের সৈন্যদল, দেওয়ানকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহার প্রতি হস্তোত্তোলন করিতে নিরস্ত হইল; সুতরাং তিনিও নির্বিঘ্নে রাজ-প্রাসাদে পৌঁছিলেন। নবাব-সমীপে উপস্থিত হইয়াই, তিনি নির্ভয়চিত্তে আজিম উশ্‌শানকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ও তরবারি হস্তে কহিলেন,—"যদি তুমি আমার প্রাণ লইতে চাও, আইস যুদ্ধ কর; নচেৎ সাবধান, এরূপ কার্য্যে আর কখনও হস্তক্ষেপ করিও না।" দেওয়ানের এইরূপ অসমসাহসিকতায় নবাবের মনে ভয়সঞ্চার হইল। বাদসাহ আরঙ্গজেবের কঠিন দণ্ডাজ্ঞা স্মরণ হইল। তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া শপথ করিলেন; ও আবদুল ওয়াহিদকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগের এবম্বিধ উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য যথোচিত তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু মুরসিদ

কুলি খাঁ কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ দরবারসভায় উপনীত হইয়া, আবদুল ওয়াহিদকে তথায় আহ্বান করিলেন ও তাঁহার সৈন্যদিগের অবশিষ্ট বেতনের হিসাব করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহা নির্দ্ধারিত হইলে, উহাদিগের প্রাপ্ত বেতন প্রদান করিয়া, সেনাপতি সহ উহাদিগকে রাজসরকার হইতে বিদায় দিলেন।

দেওয়ান অতঃপর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, বাদশাহ-সকাশে প্রেরণার্থ এক আবেদন-পত্র প্রস্তুত করিলেন। উহাতে সমস্ত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইল, এবং উহা বহুসংখ্যক রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। আবেদন-পত্র দিল্লি-দরবারে প্রেরণ করিবার পর, মুরশিদ কুলি খাঁ নবাবের রাজধানী হইতে দূরে থাকাই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলেন এবং বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজস্ব-সংগ্রহের সুবিধার্থে, সুবার প্রায় মধ্যস্থিত 'মকসুসাবাদ' নামক স্থানে নিজ বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। অতঃপর নবাবের অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই, ঢাকা নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গ সমভিব্যাহারে মকসুসাবাদ যাত্রা করিলেন। এই নগরই মুরসিদ কুলিখাঁর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'মুরসিদাবাদ' নামে বিখ্যাত রহিয়াছে।

ক্রমশঃ—

শ্রীমন্মথনাথ দে, বি, এ, বি, এল।

ভাগীরথী-বক্ষে—শব।

১

একদা, বসন্তকালে ভাগীরথী-তীরে
র'য়েছি বসিয়া, বহে সায়াহ্ন সমীর;
হেনকালে, হেরিলাম জাহ্নবীর নীরে
ভাসিছে—জীবন শূন্য মানব-শরীর;
হেরিয়া, হইল মম বিচলিত মন,
এই কি মানব-দেহ আমার মতন?

২

এই কি সে নরদেহ?—জীবিত সময়
সজ্জিত হইত যাহা বিবিধ ভূষণে;
তেয়াগিয়া প্রণয়িনী, তনয়া, তনয়,—
কি দুঃখে ভাসিছ বল জাহ্নবী-জীবনে?
কোথায় এখন তব আত্মীয় স্বজন?
এই কি মানব-দেহ আমার মতন?

৩

কোথা সে লাবণ্য-ছটা—নবনীত কায়—
মরিলে, মানব-দেহ হয় কি এমন?
কি ছিল কি হ'ল এবে, মরি হায় হায়!
দারুণ আঘাতে আর হ'বেনা চেতন;
অনা'সে বায়সে বসি খু'লিছে নয়ন,
এই কি মানব-দেহ আমার মতন?

৪

বিকট বদন অহো মূর্ত্তি কি ভীষণ!
মানব-দেহের হায় এই পরিণাম!!
জাহ্নবী-সলিল' পরে করিয়া শয়ন—
ভাসিবে কি এইরূপে তুমি অবিরাম?
শৃগাল, কুক্কুরে ছিঁড়ে করিবে ভক্ষণ,
হবে না হবে না তবু হবে না চেতন!

৫

পরিণামে—মানবের এই দশা যদি,
তবে কেন বৃথা করি দেহ-অভিমান ?
কেমনে হইব পার এই ভব-নদী,
তার তরে কেন হায়! কাঁদে না পরাণ ?
কৃমি—বিষ্ঠা—ভস্মে যাহা হয় পরিণত,
সে দেহের গর্ব্ব কেন করি অবিরত ?

৬

জেনেছি জেনেছি শব! জেনেছি এবার,
কিছু নহে চিরস্থায়ী এই ভূমণ্ডলে;
সকলই মায়াময়—অনিত্য সংসার,
নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে আবদ্ধ সকলে;
শুনিয়াছি—শিবপ্রদ শব-দরশন,
যথার্থ দিলে হে আজি তার নিদর্শন।

শ্রীব্রজবল্লভ রায়।

সংবাদ।

মিসেস্ মিরস্ নামে কোন পতি-প্রাণা রমণী তাঁহার স্বামীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে,—"তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার স্বামী তাঁহার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কতকগুলি জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন"। স্বামী দাম্পত্য-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ও প্রণয়িনীর মান-ভঞ্জনের আশায়, আদালতে দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে,—"তাঁহার দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহার স্ত্রীর যাহা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।" যাহা হউক, তিনি আদালতের ধমক্ খাইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তমার পুণ্যফলে তাঁহাকে আর অন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয় নাই; কিন্তু তিনি এখনও তাঁহার প্রণয়িনীর প্রিয় সমাগম লাভ করিতে সক্ষম হন নাই! প্রণয়ী-যুগল পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

*
* *

পঞ্জাব পুলিষ-রিপোর্টে জানা যায় যে, ঐ স্থানের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলায় একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী, স্বীয় মৃত পতির চিতার সহিত আপনার চিতা প্রস্তুত করিয়া সহ-মরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কোনও ব্যক্তি তাঁহার দাহ-কার্য্যে সহায়তা করে নাই। আইনের শাসন, আত্মীয় বন্ধুগণের নিবারণ, কিছুতেই তাঁহার অবিচলিত চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত করিতে পারে নাই।

*
* *

সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপ খণ্ডে ফ্রান্স নামে এক সভ্যতম দেশ আছে। তত্রত্য অধিবাসী, লকাগী নামক কোন ব্যক্তিকে তিন বৎসর কারাবাস করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার মানিনী গৃহিণীর প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগে, এবং কি উপায়ে তিনি এই ঘোরতর অপমান হইতে নিস্কৃতি পাইবেন, সেই ভাবনায় আকুল হইয়া পড়েন। অনেক চিন্তা করিয়া, তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, এরূপ নীচ ও জেল-ফেরত স্বামীকে গ্রহণ করা, তাঁহার ন্যায় বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী ও সুসভ্যা রমণীর কোন ক্রমেই শোভা পায় না; অতএব এরূপ অযোগ্য স্বামীর সহিত আর ঘর না করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ!

*
* *

শ্রীরামচন্দ্র বসু, নিবাস—ঢাকা, বিক্রমপুর। চট্টগ্রামের অন্তর্গত বান্দিরবনে, একটি স্কুলের শিক্ষক, ও পোষ্টমাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এক দিবস ডাক-ঘরের একটি ৬০০ টাকা পূর্ণ ব্যাগ অপহৃত হয়।

রামচন্দ্র বাবুর বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারে—রামচন্দ্রের ৪ বৎসর সপরিশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হয়। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে তাঁহার পতিব্রতা রমণী মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন, এবং যে দিবস রামচন্দ্র বাবু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, সেই দিবস হইতে তাঁহার পত্নী অন্ন জল পরিত্যাগ করেন। অনেক চেষ্টা ও সাধ্য সাধনা করিয়াও, কেহ তাঁহাকে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করাইতে পারে নাই। এই রূপে ক্রমান্বয়ে একাদশ দিবস নিরম্বু উপবাসে থাকিয়া, সতী প্রাণত্যাগ করেন। তিনি নামধারী রামচন্দ্রের পত্নী হইয়াও যথার্থ রাম চন্দ্রের পত্নীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন।'

*

* *

চৌদ্দ আইন উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু চৌদ্দ আইনের বেহদ্দ আইন জারি হইতেছে। চৌদ্দ আইন বেশ্যার উপর ছিল, কিন্তু এবার কুলবধুর জন্ত আইন হইতেছে !

*

* *

শ্রীযুক্ত বড় লাট সাহেবের সভায় এরূপ এক ভয়ানক আইন করিবার উদ্যোগ হই তেছে যে, হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি যে কোন জাতীয়, কি ধনী, কি গরিব, যে কোন পুরুষ দ্বাদশ বর্ষের কম বয়সের স্ত্রী, ঋতুমতী হউক বা না হউক, তাহার সহিত সহবাস করিবে, তাহাকে ১০ বৎসর জেল বা দ্বীপান্তর বা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। অতএব হে অপ্রাপ্তদ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাগণের স্বামিগণ ! তোমরা সাবধান হও, কি জানি তোমাদের ন্যায় দম্পতী যুগলের প্রতি এক এক জন পুলিষ কনষ্টেবল লইয়া শয়ন করিবার আজ্ঞাই প্রচার হয় !

*

* *

আজ কাল নানা প্রকার সংবাদ ও মাসিক-পত্রিকার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবঞ্চকের দলও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। নানা প্রকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও উপহারের প্রলোভন দেখিয়া, অনেকে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অসদুপায় অবলম্বনে ঐ সকল প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন।

মফঃস্বল হইতে কেহ কেহ পত্র লিখিলেন,—"আমাকে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিয়া নিয়মিত রূপে পত্রিকা পাঠাইবেন, পত্রিকা হস্তগত হইবামাত্র মূল্য পাঠাইব।" নাম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হইল, কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিতরূপে পত্রিকা পাঠান হইতে লাগিল, কিন্তু আর কোন সংবাদ নাই। শেষ—মূল্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হইল—উত্তর আসিল না। অবশেষে ভ্যালুপে এবল পোষ্টে পুস্তক পাঠান হইল, কাহাকেও বা প্রথমেই ভ্যালুপেএবল পোষ্টে পাঠান হইল। তখন আর কি করেন, বেগতিক ও উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, অম্লান বদনে, সাদার উপর কালী দিয়া, বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন,—"Refused", "ফেরত দিলাম"।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, আপাততঃ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও ধাম নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

শ্রীঐশ্বর্য্য কান্ত সেন, পোঃ আমিনপুর, নারায়ণগঞ্জ।

শ্রীকুমেদাপ্রসন্ন ভূঞ্যা, দোরো ধান্য ঘাটা স্কুল, পোঃ দেভোগ, মেদিনীপুর।

নালাল হগনি, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম।

শ্রীরসিকচন্দ্র ভৌমিক, শোলপোন, পোঃ নায়ার, ঢাকা।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, জমীদার, কাইতালা, ত্রিপুরা।



১ম খণ্ড।] ফাল্গুন। [১১ম সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

—

কলিকাতা।

ডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
বিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—তিন আনা।

AN ANALYSIS

OF

MAINE'S ANCIENT LAW

WITH

Explanations of Latin words & Phrases and Explanatory notes on References, Legal, Historical &c, occurring in the Text.

GIVEN TO HIS CLASS BY THE

OFFICIATING LAW LECTURER OF PATNA COLLEGE

PUBLISHED BY

MATHURA NATH SING, B A

To be had at

MESSRS B. BANERJI & CO.

Cornwallis Street, Calcutta

MESSRS S K LAHIRI & CO

College Street, Calcutta

BABOO NALINI KANT, MAITRA

Chowhatta Bankipore

and at

32 MANIKTALA STREET CALCUTTA

PRICE Re 1—8 only

বসন্ত-পঞ্চমী।

শিশির-বিরামে প্রমোদিল কানন,
হাসে সরসী'পর পঙ্কজ-আনন।

গুঞ্জন অলিকুল কুসুম-পরাগে,
কুঞ্জে কোহেলা চূত-শাখ সরাগে।

নীল গগন-তল দিনকর-ভাতি,
বিকশিল—মল্লিকা, মালতী, জাতি।

বাহিত পরিমল মলয় কি বায়ে,
গাহে বিহঙ্গম পলব কি ছায়ে।

আজু সজনি! শুভ পঞ্চমী তিথি,
গাও প্রমোদভর মঙ্গল গীতি।

পীত বসন সখি! পিনহ রঙাই,
আও, স্রোতস্বিনী-তীর চলি যাই।

আও সখাগণ! আব আব নাগরি!
পূত সলিলে ভর্লিযো গাগরি।

কাহেকো রিঝ'পর ফিকির কি ছায়া?
কাহে মলিন মুহু দিল্ পর হায়া?

চূত-পলব ফুলে তোরণ সাজাই,
ছিটি ছিটি চন্দন বাট ভিঙাই।

চারু কদলী-ঘট দুয়ার দুয়ারি,
মরি কিবা শোভন! জন-মনোহারী।

বঙ্গ-নিকেতন পঞ্চমী পূজা,
শ্বেত সরোরুহ দল সিতভুজা।

চরণ কমল'পর মঞ্জির সাজে,
কটিতট মণিময় কাঞ্চি বিরাজে।

কণ্ঠে গজমতি সুচিকণ আলা,
তঁহি পর বন-ফুল সাজত ভালা।

মরকতকুণ্ডল শ্রবণ বিরাজে,
মুকুট মণিময় শির'পর সাজে।

বিমল রজতনিভ নিরমল কায়া,
চারু নীলাম্বর জলধর-ছায়া।

বীণ-বিলম্বিত বাহু-মৃণালে,
সাজে সরস্বতী কুবলয়-জালে।

বেদ-জননী দেবী—বেদ বেদাঙ্গ,
স্মের বরানন অমৃত অপাঙ্গ।

বিল্ব—তুলসীদল কুসুম কি সারি,
চূত-মুকুল—যব—পাবন-বারি।

লাও সজনি! আজু মানস কায়ে,
ভকতি সচন্দন পূজিব মায়ে।

বাজিল দুন্দুভি—মধুর নিনাদ,
বাজে দামামা কাড়া বিনু অবসাদ।

বাজে সেতারা আজু বাজে সারঙ্গ,
বাজে মুরজ মৃদু—বাজে মোচঙ্গ।

সকল সজনী মিলি গাহ সুতানে,
যাপ শ্রীপঞ্চমী মঙ্গল গানে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

ভূতের উৎপাত।

প্রতাপচন্দ্রের বাটী খানি অতিশয় বৃহৎ। সিংহ-দ্বার অতিক্রম করিয়াই, এক বৃহৎ প্রাঙ্গণ; তাহার এক দিকে অশ্বশালা, অপর দিকে গোশালা; তৎপরে আর এক দ্বার, দ্বারের দুই পার্শ্বে দ্বারবান্ ও অন্যান্য ভৃত্যদিগের বৃহৎ বৃহৎ গৃহ। দ্বার অতিক্রম করিয়াই আর এক সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ; তাহার একদিকে পূজার দালান, দুই দিকে বৈঠকখানা, এবং এক দিকে দপ্তর খানা। এই মহলের পশ্চাতে, আর একটি প্রাঙ্গণ; তাহার এক দিকে শ্রীশ্রী৺ দশভুজার মন্দির ও অপর তিন দিকে অতিথি ও লোক জন খাওয়াইবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ দালান। এই মহলের সহিত অন্তঃপুরের অনেকটা সংস্রব আছে। এই মহলটি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জনতায় পরিপূর্ণ হয়, নচেৎ ইহা নির্জ্জন ও বৃক্ষ-লতাদি-শোভিত রমণীয় স্থান। ইহার পরেই অন্তঃপুর। অন্তঃপুরও অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু অন্তঃপুরবাসিনিগণ সংখ্যায় তাদৃশ অধিক নহেন—কেবল মাত্র শারদাসুন্দরী ও কাত্যায়নীর মহলই সর্ব্বদা কোলাহলে পূর্ণ থাকে, নচেৎ সকল গৃহে লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই পার্শ্বের গৃহগুলিও একেবারে শূন্য পড়িয়া থাকে; রাত্রে কেহ ঐ সকল গৃহের পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে চাহেন না। কেবল ক্রিয়া কাণ্ডে কুটুম্বিনিগণ আসিয়া ঐ সকল গৃহ অধিকার করেন, নতুবা অপরাপর সময়ে উহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়—যেন গিলিতে আসিতেছে। বাটীর এই অংশটিই কেবল দ্বিতল; অন্তঃপুরের পশ্চাতে—পুষ্করিণী ও পুষ্পোদ্যান। এই সমস্ত এক উন্নত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ গড়খাই।

যদুনাথ গয়া যাত্রা করিলে, কয়েক দিবসের মধ্যে বাটীতে একটা ভয়ের লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইলে, সকলে নিদ্রা গেলে, কে যেন বাটীতে আসিয়া উপদ্রব করে। শারদা সুন্দরীর শয়ন-কক্ষের অগ্নিকোণে, ছাদে যাইবার এক সোপান আছে; ঐ সোপানের উপরিভাগে একটি দ্বার আছে—ঐ দ্বার খুলিয়া দ্বিতল গৃহের ছাদে যাওয়া যায়। এক্ষণে প্রত্যহ রাত্রি অধিক হইলেই, ঐ দ্বার হঠাৎ খুলিয়া যায়, এবং ছাদের উপর কে যেন দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। এই শব্দে অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ হয় বটে, সকলেই উহা সভয়ে শ্রবণ করেন বটে, কিন্তু, কেহই উহার তথ্যানুসন্ধান করিতে চাহেন না। সকলেই ইহা জ্ঞাত আছেন যে, ঐ অন্ধকার সোপান-মার্গ দিয়া ঐ বিস্তীর্ণ ছাদের উপর কেহই কখন যাইতে সাহস করেন নাই এবং এত অধিক রাত্রে তথায় যাইবার কারণও কিছু লক্ষিত হয় না। দিনমানে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই অস্বীকার করেন। গৃহমধ্যে এরূপ

দেখিতে পাওয়া যায় যে, অদ্যরাত্রে যে বৃক্ষ ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে, তাহা প্রাতে হয় ত কোন নাগদন্তকে দোদুল্যমান; অথবা, অদ্য যাহা ভিত্তিসংলগ্ন লৌহ-কীলকে অবস্থিত, কল্য তাহা ভূমিতলে সংস্থাপিত রহিয়াছে! এরূপ কে করে?—এরূপ করিবার আবশ্যকই বা কি আছে? কেহ কেহ গম্ভীর বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—"যদুনাথ গয়ায় পিণ্ড দিতেছে, তাই ভূত যদুনাথের বাটী ছাড়িয়া, এখানে আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে;—যাহা হউক, সকলের সাবধান থাকা উচিত, অন্ধকার-গৃহে একাকী প্রবেশ করা, কোন মতেই বিধেয় নহে।"

সন্ধ্যার পর, ছাদের দিকে আর কেহই তাকায় না, কি জানি যদি ভূতযোনির বিকট মূর্ত্তি হঠাৎ দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। সাবধানের মার নাই।

প্রতাপ বাবুর বাটীতে নিত্য নিত্য এইরূপ অনর্থপাতের বিষয় নৈহাটীর প্রায় সকলেই জানিতে পারিল। অন্ধকার রাত্রের ত কথাই নাই, চাঁদনী রাত্রেও, সন্ধ্যার পর, কেহই আর ঘরের বাহির হইতে চায় না। যাহাদিগকে সর্ব্বদা বাহিরে কাজকর্ম্ম করিতে যাইতে হয়, এবং রাত্রিতে বাটী প্রত্যাগমন করিতে হয়, তাহারা প্রাণান্তে জমীদার বাবুর বাটীর নিকট দিয়া গমনাগমন করে না। কোন স্থানে খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইলেই লোকে চম্‌কিয়া উঠে,—দেওয়ালে কোন বস্তুর ছায়া দেখিলে আঁতকিয়া উঠে। অন্ধকার গৃহ প্রবেশ করিবার সময় সকলের মনে হয়—ভূতের কণ্টকাকীর্ণ দেহ তাহাদের গাত্রে সংস্পর্শ হইলে, কি সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইবে। বাজারে লণ্ঠন মহার্ঘ হইল, কেন না প্রায় সকলেরই এক একটি হাত-লণ্ঠনের আবশ্যক হইয়া উঠিল। ওঝা মহাশয়দিগের পসার ও প্রভুত্ব বাড়িতে লাগিল; কারণ তাঁহারা জানেন যে, ভূত তাঁহাদিগের মাসতুত ভাই। খই, দই ও কলা খাইতে পাইলে, শুধু ভূত কেন, ভূতের ওঝা পর্য্যন্তও নিরস্ত হইবে। সন্ধ্যার পর, ছেলে বুড়া সকলেই একত্র হইয়া রামায়ণ শ্রবণ করে—কিন্তু আতঙ্ক কিছুতেই যায় না।

প্রতাপ বাবুর বাটীতে এইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইবার দুই এক মাস পূর্ব্বে হইতে, আর একটি ভয়াবহ জনরব শুনা যাইতেছিল;—বঙ্গোপসাগরের এক আলোকস্তম্ভে একজন দীপ-রক্ষক বাস করিত। দুই এক দিবসের জ্বরে তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার প্রেতাত্মা তথায় বাস করিতে লাগিলেন এবং তদীয় কার্য্য সকল সমাধা করিতেও ত্রুটি করিতেন না। নাবিকগণ তাঁহাকে যথার্থ মনুষ্য জ্ঞানে আহার সামগ্রী ও বস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। একদা, ওলন্দাজদিগের এক খানি জাহাজ সেই স্তম্ভের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় কতকগুলি পোতবাহক তাঁহার বিকট মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শিহরিয়া উঠে। তাহারা এইরূপ গল্প করিয়াছিল যে, "তিনি স্তম্ভের উচ্চ শিখরে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া, সুদীর্ঘ পক্ষদ্বয় বিস্তার-পূর্ব্বক গগন-মার্গে উড্ডীয়মান্ হইলেন, এবং মহাবেগে রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া দিগ্‌বলয়ে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।" এই জনরব কিঞ্চিৎ পুরাতন হইতে না হইতেই, আবার এই এক উপদ্রব সমুপস্থিত। দান, ধ্যান, পূজা, হোম প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও, প্রেতযোনির উপদ্রব কমিতেছে না।

এই উপদ্রব লোকের মনে এতদূর আতঙ্কের উদ্রেক করিয়াছিল যে, তাহাতে একটি যুবাবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছিল। গয়ারাম বাগ্‌দীর এক পুত্র রাত্রি দেড় প্রহরের পর, প্রতাপ বাবুর বাড়ীর নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে, সহসা দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর এক শুভ্রবসনা স্ত্রী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। তাহাতে সে ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাম রাম" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া, স্বকীয় কুটীর-দ্বারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তাহাতে তাহার পিতা মাতা সত্বর বাহিরে আসিয়া, মুখে জল দিয়া ও বাতাস করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে। ছেলেটি চৈতন্য লাভ করিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জ্বর-বিকার-রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইল। পীড়িতাবস্থায় সে যখন কোন দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, তখন তাহার চক্ষে ভয়ের লক্ষণ দেখিয়া তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিত,—"বাবা, নিধিরাম! ও দিকে কি দেখ্‌ছিস্, বাবা?" নিধিরাম বিকট চীৎকার করিয়া বলিত,—"ঐ রূদ্র পিশাচ!—ঐ রূদ্র পিশাচ!" মাতা যদি জিজ্ঞাসা করিত,—"রূদ্র পিশাচ কা'কে বলে?" তখন সে বলিয়া উঠিত,—"যার গায়ে মাংস নাই, খালি হাড়! খালি হাড়!" তাহার সেই ভয়ানক বাক্যে সকলে শিহরিয়া উঠিত। কিয়দ্দিবস পরেই সেই যুবকের মৃত্যু হইল।

একদা প্রতাপ বাবু কপোলে কর সন্নিবেশ পূর্ব্বক এই সকল অনর্থপাতের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একজন ওঝা আসিয়া নিবেদন করিল,—"মহাশয়! আপনকার বাটীতে যে, চণ্ডের উপদ্রব হইয়াছে শুনিতেছি, তাহার কি কোন প্রতিকার করিবার ইচ্ছা আছে?—হয় ত বলুন, আমি সে বিষয়ে প্রস্তুত আছি।"

প্রতাপ বাবু বলিলেন,—"অগত্যা ইহার একটা উপায় করিতে হইবে। যখন নিত্য নিত্য এরূপ হইতে চলিল, তখন আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। আপনার কি কি আবশ্যক, তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া দিন,—আমি অদ্যই তাহার আয়োজন করিয়া দিব।"

প্রতাপ বাবুর আজ্ঞা পাইয়া, ওঝা মহাশয় তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম লইয়া ফর্দ্দ করিতে বসিলেন। জমীদার বাবুর বাটীতে চণ্ড নামাইতে হইবে, অতএব ফর্দ্দটাও কিছু আজগুবি রকমের হইল। প্রতাপচন্দ্র সরকার ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া ভূত নামাইবার সমস্ত আয়োজন করাইয়া দিলেন।

রজনী সমাগত হইলে, ওঝা মহাশয়েরা আগমন করিলেন, এবং ভূতের আহার সামগ্রীগুলি হস্তে লইয়া একটি অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া তথায় সমাগত হইলেন এবং ভয়বিহ্বল-চিত্তে ভূতযোনির আশ্চর্য্য কাণ্ড সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে বিকট শব্দ সকল শ্রবণ-গোচর হইতে লাগিল। সকলেই জানিল—চণ্ড আবির্ভূত হইয়াছেন। ক্রমে সপ্ সপ্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। সকলে জানিল ভূত ফলার করিতে বসিয়াছেন। গৃহমধ্যে আলোক জ্বালিবার আদেশ নাই; কেন না, তাহা হইলে চণ্ড আবির্ভূত হইবে না। ওঝা মহাশয়েরা অনেক মন্ত্র তন্ত্র পাঠ করিয়া, ভূতের আগমন রোধ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং প্রতাপচন্দ্রের কিছু অর্থও ধ্বংসাইয়া গেলেন; কিন্তু উপদ্রব কিছুই কমিল না।

পর দিবস প্রাতঃকালে, প্রতাপচন্দ্র অভয় শিরোমণিকে ডাকাইলেন। অভয় শিরোমণি নিতান্ত চালকলা-বাঁধা যজমেনে ব্রাহ্মণ নহেন; গণনায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। তাহার যশ কেবল নৈহাটীতে নহে, তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর গ্রাম, এমন কি কলিকাতা পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি বলিতেন,—"অতি প্রত্যূষে মস্তিষ্ক বেশ শীতল থাকে; সুতরাং গণনা করিয়া সেই সময়েই যাহা কিছু দুই একটা বলিতে পারা যায়। যে-সে সময়ে গণনা করা অসম্ভব। মূঢ় ব্যক্তিরাই স্বীয় সন্তোষের নিমিত্ত, যখন তখন ভিক্ষুক-গণকদিগকে ডাকাইয়া আপনাদিগের করকোষ্ঠী গণনা করাইয়া লয়। তাহারা যদিও গণনার কিছুই জানে না, তথাপি, বাক্‌চাতুর্য্য ও তোষামোদ দ্বারা, মূর্খ গৃহস্থের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। শিরোমণি মহাশয় যাহা বলিতেন, বর্ত্তমান কালে তাহা আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। চুনাপুঁটি অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কেইবা গ্রাহ্য করে? তবে রুই কাত্‌লা দিগের উপদ্রবে অনেক বড় বড় ঘরও প্রবঞ্চিত হইতেছে—ইহাই অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। সম্প্রতি একটি সাইন বোর্ডওয়ালা রোহিত মৎস্য বড়ই লম্প ঝম্প করিতেছে, কিন্তু অতি শীঘ্রই জালে পড়িবে। বড় বড় লোকে তাঁহার বাক্য-কৌশল ও গৈরিকবস্ত্র দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহাকে যে কোন দুরূহ কার্য্যে নিয়োগ করিতে চাহেন, তিনি তাহা অকাতরে গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কখনই সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন না।

জুয়াচোরদিগের কথা কহিতে গেলেই, কেমন রাগ উপস্থিত হয়, তাই অনেক গুলা যা নয় তাই মুখে আইসে। সে যাহা হউক, এখন আমাদের শিরোমণি মহাশয় ভূতের উপদ্রবের বিষয় কিরূপ গণনা করেন, দেখা আবশ্যক।

অনেকে সভায় সমাগত হইয়াছেন দেখিয়া, শিরোমণি মহাশয় আচ্ছা করিয়া এক ছিলিম তাম্রকু সেবন করিয়া, স্থির হইয়া বসিলেন এবং খড়ি দ্বারা ভূমিতলে অনেক অঙ্কপাত করিলেন এবং মুহুর্মুহু মাথা নাড়িতে লাগিলেন। এই ব্যাপার সকলেই স্তম্ভিত ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, কোনও দিকে টুঁ শব্দটি নাই, এমন সময় শিরোমণি মহাশয় সজোরে নিশ্বাস ফেলিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"কৈ ভূত প্রেত ত কিছুই দেখিতেছি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বাটীতে শীঘ্র একটা অমঙ্গল ঘটিবে,—ইহা একবারে অকাট্য।"

প্রতাপ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপ অমঙ্গল?" শিরোমণি মহাশয় উত্তর করিলেন,—"ডাকাইতি।"

এই কথায় কেহ কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না করিতেই, জনতার পশ্চাৎ হইতে একজন বলিয়া উঠিল,—

ঠিক্ বলেছ বামন ঠাকুর!
তোমার কথাই ঠিক্,
হাজার টাকা হা'রব আমি
হয় যদি গরঠিক্।

এই কথা সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, কেন না গৃহটি তখন ও নিস্তব্ধ ছিল। ছড়া শুনিয়া সকলেরই দেখিতে ইচ্ছা হইল—লোক্‌টা কে। প্রতাপ বাবু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে হে বাপু তুমি?" উত্তর হইল,—

দুঃখী আমি মিথ্যে কথা
কহিতে নাহি জানি;

আমার কথায় এত লোকের
কাট্‌বে চোখের ছানি।

প্রতাপ বাবু বলিলেন,—"বটে!—এমন!—তবে তুমি এদিকে এস দেখি—তোমার নাম কি?" উত্তর হইল,—

নাম্‌টি এখন বল্‌ব নাক
পাছে পড়ি ধরা;
সময় বুঝে বল্‌ব তখন—
এত কেন ত্বরা?

প্রতাপ বাবু বলিলেন,—"তুমি এদিকে এস—তোমার কিছু ভয় নাই!" উত্তর হইল,—

ছেঁড়া টেনা প'রে আছি—
যাব কেমন্‌ ক'রে?
কর্ত্তা বাবুর আজ্ঞে হ'লে
যাব কাপড় প'রে।
বামন ঠাকুর যা বলেছে
কথাটা নয় মিছে;
কিছু মিছু জানি আমি,
—বল্‌ব সে টা পিছে।

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে তুমি একটু ব'স, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

প্রতাপ বাবুর মন বুঝিয়া একে একে সকলেই বিদায় হইল। শিরোমণি মহাশয়ের বাক্যে ভূতের ভয় টা গেল বটে, কিন্তু আবার একটা ভয় আসিয়া জুটিল। কেহ বা বলিলেন,—"শিরোমণি মহাশয়ের গণনাটা ঠিক বটে, কিন্তু উপদ্রব আর না হয়, তবে বুঝ্‌তে পারি।" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"আর বাপু! অকাল দুর্ভিক্ষের সময় এমন কত ভূতের উৎপাত হয়ে থাকে—ও সব কিছু নয়।" সকলকে আশ্বাস দিয়া শিরোমণি মহাশয় বিদায় হইলেন।

জনতা ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রতাপ বাবু দেখিলেন,—একটি তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তি একটু ছিন্ন বস্ত্র-খণ্ড পরিধান করিয়া বৈঠক-খানার দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র সে নিকটে আসিল। প্রতাপ বাবু ভৃত্যকে আদেশ করিলে, সে এক খানি কাপড় আনিয়া দিল। কাপড় পরা হইলে, প্রতাপচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাক?" সে উত্তর করিল,—

নাম্‌টি আমার হরিচরণ,
হুগলী-জেলায় বাসা;
ভিক্ষা ক'রে বেড়াই বটে,
জেতে আমি চাষা।

প্রতাপ বাবু "হুগলী-জেলায় বাসা,"—এই কথা শুনিয়াই, সন্দিহান হইয়া তাহাকে এক গুপ্তস্থানে লইয়া গেলেন, এবং তাহার মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলেন। হরিচরণকে আর তিনি ছাড়িলেন না—বাটীতেই ভৃত্য করিয়া রাখিলেন এবং তিনি এ কথা আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিলেন না।

আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভূতের ভয়টা অনেকেই অমূলক বলিয়া স্বীকার করেন। পঞ্চানন্দ ওঝাকে দধির সহিত পারা খাওয়াইয়া অবধি, ভূতের উৎপাত অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। শুধু পারা নহে, তদুপরি প্রহার পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তখন অনেকে বলিয়া উঠিয়াছিল,—"শুনিয়াছি 'মারের চোটে ভূত পালায়'। এখন দেখিতেছি ভূতের ওঝা পর্য্যন্ত পলায়।" যাহা হউক, এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে ও ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে, পঞ্চানন্দ ঠাকুরেরা ঝাড়ে ঝোড়ে, পাহাড়ে, জঙ্গলে এবং পড়ো-বাড়ীতে লুকাইয়াছেন। কিন্তু প্রতাপ বাবুর আমলে,

লইয়ে বসিয়া উপদ্রব করিতেন। অবলা রমণিগণের উপরেই উপদ্রবটা কিছু অধিক হইত!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পথিমধ্যে।

ন্যূনাধিক চল্লিশ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, যদুনাথ বিংশতি দিবসে পুনপুনায় গিয়া পৌঁছিলেন। পুনপুনায় সন্ধ্যা হইল। যদুনাথের সহিত কেবল দুইটি ভৃত্য ও অপর দুইটি তীর্থযাত্রী ছিল। তীর্থযাত্রীদ্বয় বর্দ্ধমান হইতে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। সকলে একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিতেছিলেন; সুতরাং পথ শ্রম তাঁহাদিগের পক্ষে আমোদজনক হইয়া উঠিয়াছিল। একটি চটী অন্বেষণ করিয়া সকলে তথায় রজনী যাপন করিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে সকলে গাত্রোত্থান করিয়া, পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, একটি বৃক্ষ-তলে আশ্রয় লইলেন। সেখানে রন্ধনাদি করিয়া সকলে ভোজন করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ দ্রুতপদ-সঞ্চারে গমন করিয়া, তাঁহারা সন্ধ্যার প্রাক্কালেই জাহানাবাদে গিয়া পৌঁছিলেন। সেথান হইতে চটী অনেক দূর। পিপাসায় সকলের ছাতি ফাটিতেছে, কিন্তু নিকটে জলাশয় নাই। গোধূলি-সময় সমুপস্থিত দেখিয়া, কেহ আর জলান্বেষণে অগ্রসর হইতে চায় না। অবশেষে যদুনাথ সাহসে নির্ভর করিয়া, যষ্টিমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সূর্য্য-দেব অস্তমিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রান্তর অপেক্ষা বনান্ত ভূমির ছায়া অধিকতর মেদুরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গিয়াই, যদুনাথ পথ হারাইয়া গেলেন। ক্রমে বদনমণ্ডল শুষ্ক হইয়া আসিল, তথাপি আবাস-প্রত্যাগমন-প্রমুখ উভচর পক্ষিগণের কলরব শ্রবণ-পূর্ব্বক সাহসে নির্ভর করিয়া জলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে আর্দ্র অনুভব হইতে লাগিল। তখন তিনি পিপাসা-শান্তি-বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া, ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতিদূরে জলাশয় দেখিয়া তত্তীরে উপনীত হইলেন।

যদুনাথ যথেচ্ছ জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন বটে, কিন্তু কিরূপে সঙ্গিগণের নিকট প্রত্যাগমন করিবেন, এই দুর্ভাবনায় তাঁহার বদনমণ্ডল পরিম্লান হইয়া আসিল। আকাশে দুই একটি করিয়া নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। "এখন কি হইবে,—উপায় কি? এমন কি কেহই এখানে নাই, যে আমাকে পথ দেখাইয়া দিতে পারে? কেনই বা জল অন্বেষণ করিতে আসিলাম?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেছেন, এমন সময়ে একজন অসিতবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ তাঁহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই আর একজন আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে যষ্টি কাড়িয়া লইল। যদুনাথ দেখিলেন— এই নির্জ্জন স্থানে চীৎকার করিলে বিপরীত ফল হইবে, সুতরাং তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, তাহাদিগকে অনেক

অনুনয় করিতে লাগিলেন। পাষণ্ডদ্বয় বরং তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত এক বৃক্ষতলে লইয়া গেল এবং কটিদেশ বেষ্টিত রজ্জু লইয়া বৃক্ষকাণ্ডে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল।

যদুনাথ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন এবং জীবনাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক ইষ্টদেবতার নাম স্মরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দস্যুদ্বয় কুঠার অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত গৃহাভিমুখে গমন করিল।

লোভজনক বস্তুর মধ্যে যদুনাথের হস্তে এক খানি সুবর্ণ-নির্ম্মিত ইষ্টকবচ ছিল। দ্বিতীয় দস্যু মনে করিল,—"দুইজনে কুঠার অন্বেষণ করিতে না গিয়া, বরং একজন শিকার চৌকী দেওয়া যাউক।" এই ভাবিয়া সে বনের ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া দেখিতে লাগিল, পাছে কেহ কিছু দেখিতে পায়। এইরূপে সে আপন মনে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প হটাৎ তাহার উরুদেশে দংশন করিল। রজ্জুগাছটি হাত-ছাড়া হইয়াছে, এখন কি করে, কেমন করিয়া বিষের সঞ্চার নিবারণ করে? জ্বালায় ছট্‌ফট করিয়া লতা প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে করিতে, হটাৎ অজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এমন সময়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী কামিনী ভৃঙ্গার ভরণাশয়ে জলাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামিনী দেখিলেন—অদূরে একটি সুন্দর যুবা-পুরুষ বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছেন। দেখিয়া তাঁহার মনে কিছুমাত্র ভয় বা বিস্ময়ের সঞ্চার হইল না, কেন না এরূপ ব্যাপার তিনি অনেক দেখিয়াছেন। কামিনী মরালগমনে যদুনাথের সন্নিকটে আসিয়া, সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া, তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। যদুনাথ তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং কাতরস্বরে বলিলেন,—"মা! যদি অধমের প্রতি এতই অনুগ্রহ করিলেন, তবে রাজমার্গ দেখাইয়া দিয়া প্রাণ দান করুন।"

কামিনী ঈঙ্গিত করিবামাত্র, যদুনাথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া রমণী তাঁহাকে একটি সহজ পথ দেখাইয়া দিলেন, এবং ঐ জলপূর্ণ ভৃঙ্গার তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এ পথে কোন ভয় নাই, সচ্ছন্দে চলিয়া যাও।"

যদুনাথ পরম আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া, দ্রুতপদ-সঞ্চারে অবিলম্বে রাজ-মার্গ প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার ভৃত্যদ্বয় ও সঙ্গিগণ অকূল ভাবনায় পতিত হইয়াছে। যদুনাথকে দেখিয়া তাহারা আনন্দে গাত্রোত্থান করিল এবং সমস্ত সমাচার অবগত হইয়া ভয় ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। যদুনাথ ভৃঙ্গারস্থিত জল প্রদানে, সকলের পিপাসা শান্তি করিলেন। তৎপরে সকলে একটি আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করিয়া, তথায় রজনী যাপন করিলেন।

দুই দিবস পথ পর্য্যটন করিয়া, যদুনাথ, সঙ্গী ও ভৃত্যগণের সহিত গয়া-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্রই গয়ালিগণ মধুমক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। অবশেষে যে পাণ্ডা যদুনাথের পিতা ও পিতামহের নাম বলিতে পারিল, যদুনাথ তাহারই সমভিব্যাহারে গমন করিয়া তাহারই আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

অপর যাত্রীরা তাঁহাদিগের স্ব স্ব পাণ্ডার গৃহে আশ্রয় লইলেন।

গয়া-তীর্থ-স্থানটি অতি মনোরম। যদুনাথ দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া, শ্রীশ্রী৺গদাধরের পাদ-পদ্মে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন।

একদা, তিনি সঙ্গিগণের সহিত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, আকাশগঙ্গার সুরম্য উপত্যকা-প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় নানাবিধ বনচর পক্ষিগণের মধুর নিনাদ ও বন-ফুলের সৌগন্ধে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইল। তিনি একবার মনে করিলেন —"যদি দুই বেলা দুই মুষ্টি আহার করিতে পাই, তবে এই সকল রমণীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাই না। এখানে বাস করিলে, বিপদ্রূপ গ্রাহ-সঙ্কুল সংসারার্ণবের ভীষণ নির্ঘোষ শ্রবণ-পটহ স্পর্শ করিতে পারে না। দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ হস্ত পদাদি বন্ধন-পূর্ব্বক আমাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, এক পা'ও অগ্রসর হইতে দেয় না। মনীষিগণ সংসার-ভারে ভীত হইয়াই, অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া থাকেন।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, অদূরে একটি ব্যাঘ্র চর্ম্মোপবিষ্ট—বিভূতিবিলেপিতাঙ্গ—জটাজুট-শোভিত যোগী দর্শন করিলেন। যোগীবরের চক্ষুদ্বয় লোহিত বর্ণ,—দেখিলেই বোধ হয় মদ্য পান করিয়াছেন। যদুনাথ দেখিলেন, যোগীবর দরিদ্রদিগকে তাড়াইয়া দিতেছেন এবং ধনশালী ব্যক্তিগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। যাত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদুনাথ জানিতে পারিলেন যে, যোগীর নাম 'বামাচরণ লাহিড়ী'।

নাম শুনিয়া যদুনাথ চিনিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন দুরাত্মা পূর্ব্বে কাশীধামে রাজ-সরকারে কাযকর্ম্ম করিত—এক্ষণে বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে আসিয়া সাধুরূপে পরিগণিত হইতেছে! যদুনাথ আরও শুনিলেন যে, যোগীবর পঞ্চমুদ্রা মূল্য লইয়া অমূল্য সনাতন-ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়াই, তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, নিকটে গমন করিলেন। নিকটে গিয়া যদুনাথ যোগীবরকে যথাবিহিত সম্মান ও প্রণামাদি করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, যোগীবর তাঁহাকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। যদুনাথ বলিলেন,—"আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছি, ত্বরায় বাটী গমন করিব; এক্ষণে অনুমতি হয় ত গাত্রোত্থান করি।" তাহাতে লাহিড়ী মহাশয় কপট সঙ্কোচ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,—"সে কি মহাশয়! এখনই ভগবান্ চন্দ্রশেখরের ভোগ হইবে; ভোগাবসানে প্রসাদ পাইবেন,—অল্প সময়ের জন্য প্রসাদে বঞ্চিত হইবেন না।"

যদুনাথ "যে আজ্ঞা" বলিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে তথায় বসিয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই, পূজার উপকরণাদি আনীত হইল এবং লাহিড়ী মহাশয় পূজায় বসিলেন। যদুনাথ তাঁহার সমস্ত কার্য্য বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যদুনাথ দেখিলেন—লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলের প্রথানুসারে আচমনাদি করিলেন এবং সেই উচ্ছিষ্ট জল পূজার সমস্ত উপকরণের উপর ছড়াইয়া পড়িল। অন্ধের ইহা নয়নগোচর হইল না যে, পূজার অগ্রেই তিনি সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিলেন।

যদুনাথ অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"মহাশয়! প্রসাদ পাইবার বিষয়েও এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম; এক্ষণে আজ্ঞা হয় ত সকলে গাত্রোত্থান করি।" সকলে অবাক হইলেন। যোগীবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন মহাশয়! কি হ'য়েছে?"

যদু। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট আহার করি না।

যোগী। সে কি! আমি কি আপনাকে উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে পারি?

যদু। একটু অপেক্ষা করিলেই উচ্ছিষ্ট আহার করিতে হইবে।

যোগী। কেন?

যদু। ভোগের অগ্রে আপনিই প্রসাদী করিয়াছেন।

যোগী। আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

যদু। তা কেমন করিয়া পারিবেন?

যোগী। কত রাজা—জমীদার—কত বড় বড় লোকে—এখানে প্রসাদ পাইয়া যায়; আপনি এরূপ আপত্তি করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

যদু। তাল সে সকল কথা পরে হইবে—এক্ষণে আপনি পূজা সমাপন করিয়া লউন।

সঙ্গিগণ যদুনাথের এই অসঙ্গত আচরণে, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল বটে,কিন্তু ভাব গোপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় অবাক হইয়া পূজায় বসিলেন এবং অবিলম্বেই পূজা সমাপ্ত করিয়া, যদুনাথ ব্যতীত আর সকলের হস্তে প্রসাদ প্রদান করিলেন। যদুনাথ বলিলেন,—"কেবল আমিই বঞ্চিত হইলাম।"

যোগী। আপনার অদৃষ্টে না থাকে, আমি কি করিতে পারি?

যদু। এমন্ অদৃষ্টে কাজ কি?

যোগী। ভাল—উচ্ছিষ্ট কেমন করিয়া হইল?

যদু। আচমনীয় জল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল,—উচ্ছিষ্ট আর না হইল কেমন ক'রে?

যোগী। ওঃ আপনি এত দূর গিয়াছেন!—আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

যদু। তা কি আর সহজে বুঝা যায়?

যোগী। তা—আমাদের উহাতে দোষ নাই। আমরা ব্রাহ্মণ—আমাদের মুখেই দেবতারা আহার করিয়া থাকেন।

যদু। কি কথায় আপনি কি উত্তর দিতেছেন? আমি ত আর পাঁচ বৎসরের শিশু নই যে, আপনি যাহা হউক একটা কথা বলিয়া পার পাইবেন?

যোগী। বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? আপনার যদি ভক্তি নাই, তবে এখানে আসিয়াছেন কেন?

যদু। অভক্তির্ পাত্রকে ভক্তি কর্‌ব কেমন ক'রে?

যোগী। পাত্রাপাত্র ভেদ করিবার ক্ষমতা আপনার জন্মিয়াছে! তবে ত আপনি সামান্য লোক নন।

যদু। তা নয় ত কি?

যোগী। এরূপ পাত্রই ত আমি চাই—এইরূপ পাত্রই ত শিষ্য করিবার উপযুক্ত।

যদুনাথ দেখিলেন—ব্রাহ্মণ কথা পালটাইতেছে। আরও দেখিলেন যে, অর্থ-প্রয়াসী প্রবঞ্চকদিগকে সহজে আঁটিতে পারা যায় না,—ইহারা পদদলিত হইয়াও ম্রিয়মাণ হয়

না। অর্থই ইহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে আমাকে শিষ্য করিবেন, আমি যাহা চাহিব, তাহা দিতে পারিবেন?

যোগী। অবশ্য—ভক্তিমান্ পাত্রের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য কি আছে?

যদু। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কিরূপ?

যোগী। ঈশ্বর—নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ।

যদু। তবে আপনি সাকার ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন কেন?

যোগী। তাঁর অসাধ্য কি আছে? তিনি ইচ্ছা করিলে সাকারও হইতে পারেন,—ইচ্ছা করিলে, নিরাকারও হইতে পারেন।

যদু। তবে তাঁহাকে কি বলিতে পারি?

যোগী। তাঁহাকে আপনি "সাকার নিরাকার" বলিতে পারেন।

যদু। এ কথাটি আপনি বড় অসম্ভব বলিতেছেন।

যোগী। ভাল, তাহা যদি না বলেন, তবে তাঁহাকে "ঘন-নিরাকার" বলিতে দোষ নাই।

যদু। 'ঘন-নিরাকার' কিরূপ?—মিহির উপর থাপ্ নাকি?

সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। যোগীবর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অভক্তের কাজ নয়। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" যদুনাথ বলিলেন,—"মহাশয়! ভক্তি যে গোড়াতেই খেয়ে দিয়েছেন।"

যোগী। আমি আর কেমন ক'রে খেয়ে দিলেম্? যার আদৌ ভক্তি নাই, তার ভক্তি আর খাবো কোথা থেকে?

যদু। নাই, যদি জানেন, তবে একটু দিন না,—তা হলে আমি আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকি।

যোগী। দিতে পারি কি না পারি, পাঁচটি টাকা কাল হাতে ক'রে আস্‌বেন, তা হলে দেখ্‌তে পাবেন।

যদু। তবে কি ভক্তির সের আজ কাল পাঁচ টাকা ক'রে বিকচ্ছে? আমি গরিব্ লোক—আমাকে একটু কম্ জম্ ক'রে দেবেন; কি বলেন মহাশয়?

যোগী। কম্ জমের কথা আপনি কি বল্‌ছেন, আপনি পাঁচ সিকা দিলেও হইতে পারে।

যদু। না মহাশয়! রেট্ কমা'বেন না। আমি যদি পাঁচ সিকায় পাই, তা হলে আবার আর একজন এসে পাঁচ আনায় পেয়ে যাবে।

যোগী। তবে আপনি কাল পাঁচ টাকাই লইয়া আসিবেন। আপনি দেখ্‌চি খুব্ বুদ্ধিমান্ লোক। আপনার বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয়?

যদু। আজ্ঞে আমি নৈহাটীর জমীদার বাবুর বাটীতে কাজ কর্ম্ম করি।

যোগী। ওঃ তবে আর হবে না? তা কি বলেন? কাল এদিকে শুভাগমন হবে কি?

যদু। আজই আমি খাওয়া দাওয়া ক'রে রওনা হব,—কাল আর আপনি আমাকে পাবেন কোথা?

যোগী। অদ্যই যাওয়া হবে? তবে আপনি পাঁচ টাকা জমা দিয়ে যান, আমি চিঠীর ভিতরে "বীজ-মন্ত্র" পাঠাইব।

যদু। ইস্ তাই ত! আবার চিঠীর ভিতরেও চলে বুঝি! এ যে আপনার ব্রহ্ম-অস্ত্র দেখ্‌তে পাই!

যোগী। হাঁ—তা নয় ত কি?—এর ক্ষমতা—অসীম।

যদু। যে আজ্ঞে সেই কথাই ভাল। তবে কিনা, ঠিক্ ঠিক্ ওজন দেবেন।

যোগী। ঐ-ত, আপনি উপহাস কচ্চেন—

যদু। না, না,—উপহাস কেন? মহাজনের কাছ থেকে মাল্‌টা বুঝে লওয়া চাই।

যোগী। এক একটি কথা আপনি বলেন ভাল, দেখ্‌ছি!

যদু। আর একটি কথা?—

যোগী। বড়ই কটো-মটো—জমীদারীতে থাকেন কি না, তাই এমন শিক্ষা পেয়েছেন।

যদু। কথাটা কি, জান্‌লেন, লাহিড়ী মহাশয়! আমাদের সঙ্গে আর কেন? আপনি কি ঠকা'বার আর লোক পেলেন না? যেমন ক'রে হোক্ পেট্‌টা চলে যাচ্চে, যাক্। এ একটা ভেক্ নিয়েছেন মন্দ নয়! ভেকেই ভিক্ষা। যে ক'টি টাকা বৃত্তি পান, তাতে বুঝি চলে না?

যোগী। আর সকলই যদি জানেন, তবে আর আপনাকে কি বলব?

যদুনাথ প্রণামাদি করিয়া বিদায় লইলেন। সঙ্গিগণ তাঁহার বিচক্ষণতা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। যদুনাথ বাসায় প্রত্যাগমন, কালে দুই একটি উলঙ্গ পাগলকে দেখিতে পাইলেন; তাহারা বামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্য হইয়া এই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা যদুনাথ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে দেখিয়া, মুখ ভঙ্গী-সহকারে বলিয়া উঠিল,—

সাবাস্ সাবাস্ সাবাস রে ভাই!
দেখি তোদের জোর কপাল;
তোরা এড়িয়ে গেলি গুড়ো জাল।

যদুনাথ তাহাদের কথা বুঝিতে পারিলেন এবং তাহাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি সমাপন করিলেন এবং বাটী প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বেলা তিন প্রহর অতীত হইল—স্থানে স্থানে ছায়া পড়িয়া আসিল—সকলে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ

প্রহেলিকা

(৪)

অন্তঃপুর-বাসিনী, রমণী কিন্তু নহে;
দিনকর-পরশন গাত্রে নাহি সহে।
খাদ্য দ্রব্য—শির কাটি রাখি দুই ভাগে,
জরাসন্ধ বধ যেন পাণ্ডবের আগে।
মাঙ্গলিক সর্ব্ব কার্য্যে তার প্রয়োজন,
বল দেখি, কি জিনিষ আছয়ে এমন?

(৫)

কর্কশ কণ্ঠের স্বর—অপ্রিয় সবার,
এই হেতু, দিনে নাহি দরশন তার।
যার মাংস কোন জন্তু করে না ভক্ষণ—
তার সঙ্গে তাহার শত্রুতা বিলক্ষণ;
মানবের উপকারী, কিন্তু, নানামতে,
বল দেখি, কোন্ প্রাণী সেই এ জগতে?

শ্রীরাধাজীবন রায়।

বসন্ত ।

সহসা যে গাহিল কোকিল,—
আইল কি সুখের বসন্ত ?
আলোময় সরসী-সলিল
কেন হ'ল ?—কর রে তদন্ত ।

যুঁই, বেল, মল্লিকা, চামেলী
ঘুচাইল—ঘোমটার বাস ;
মলয়-হিল্লোলে হেলি দুলি,
শ্রমে—ছাড়ে সুরভি নিশ্বাস ।

হরিতিমা চারু পরিধান,
নাচে কেন বিলোল বল্লরী ?
মধুমাখা বিহগের গান
শুনি কেন, শিহরি শিহরি ?

নিরমল তটিনীর জলে—
মরাল, মরালী করে স্নান ;
তরুণ, তরুণী দলে দলে
কেন সবে সরস-বয়ান ?

গুণ গুণ গাহিছে অলিন,
মধুপানে বিঘোর নয়ান ;
এল সুখময় মাধবের দিন ;
হ'ল শিশির নিশির অবসান ।

শ্রীকালিদাস মিত্র ।

মাতাল ।

'মাতাল' হওয়া ভাল বটে,
যদি না ছোটে নেশা ;
আপন ভাবে থাক্‌বো ব'সে,
মিট্‌বে সকল আশা ।

তেমন মদ ভাই ! কোথায় আছে,
কোথায় পাব বলো ?
সেই মদ যে পরম-সুধা
নাই যে তাহার তুলো ।

পরম সুধা—হরিনাম
খুঁজে মেলা ভার ;
কোন্ মহাজন খুলেছেন
ইহার কারবার ?

প্রাণপণে ভাই ! খুঁজে দেখ,
খুঁজ্‌লে পাবে ঠাঁই ;
পেট ভরে খাও'বেন সুধা
পরম গোঁসাই ।

পাই যদি ভাই ! একবার ঠাঁরে,
ঘুচাই জঞ্জাল—
নাম সুধারস চেয়ে নিয়ে,
খেয়ে, হই মাতাল ।





প্রমদাসুন্দর বাবু।

প্রমদাসুন্দর বাবু একজন সমাজ-সংস্কারক। ইনি নিঃস্বার্থভাবে সমাজ-সংস্কারের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন। বিশেষ—ইহাঁর প্রিয়-বাদিতা ও বক্তৃতা-গুণে মোহিত হইয়া,ভ্রাতা ও ভগিনীগণ একবাক্যে ইহাঁর প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি বক্তৃতাকালে যখন সভাস্থলে দণ্ডায়মান হন, তখন ইহাঁর আজানুলম্বিত শ্মশ্রুরাজি,—কুঞ্চিত কেশ-কলাপ শোভিত সুচিকণ টেরি কাটা মস্তক এবং গম্ভীর গোঁজ-মোহন মুখশ্রী দেখিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনী-দিগের কোমল কর-পল্লব আপনা আপনি পটাপট্ শব্দ করিতে থাকে এবং ভাবের আবেশ বিশেষে নয়ন-পল্লব মুদ্রিত হইয়া আইসে। সে সৌন্দর্য্য, সে প্রতিভা, সে স্বর্গীয় ভাব—বড়ই মধুর, বড়ই হৃদয়গ্রাহী!

পাঠকগণ! নিরাশ হইবেন না,আপনাদের কৌতুহল নিবারণ জন্য উপরেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। দেখুন দেখি—এক বার স্থির-নেত্রে প্রাণের সহিত দেখুন দেখি, শ্মশ্রুরাজি কি স্বাভাবিক শোভা ধারণ করিয়াছে!—যেন চরণ-যুগল চুম্বন করিবার জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে! আবার বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া, কেমন কোমলতার পরিচয় দিতেছে! আপনারা হাসিবেন না, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে হাসিবার কিছুই নাই।

এক্ষণে, প্রমদাসুন্দর বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। যে সময়ে দৈত্যানন্দ শ্বেনাচার্য্য মহাশয়ের খুব প্রতিপত্তি, যখন তিনি খোল করতাল বাজাইয়া বৈষ্ণবদিগের

মন মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেন, বক্তৃতা-প্রভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত যুবক-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেন, ও 'হরিমা' বলিয়া ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিরস ঢালিয়া দিতেন (অথচ তাহার মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধও থাকিত না) সেই সময়ে ঢাকা-নিবাসী কামিনীকিঙ্কর নামে এক যুবক, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার বক্তৃতাগুণে বিমোহিত হইয়া, নিরাকারোপাসনায় কলিকাতাতেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তখন ইহাঁর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসর মাত্র।

কামিনীকিঙ্কর বাবু, উপদেশ-ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে,নিরাকার পিতার চক্ষে, চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়ই সমান,হীরক ও অঙ্গার দুই সমান, বিধবা ও কুমারী দুই এক। তবে, আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, যতক্ষণ চন্দন পাইব, ততক্ষণ নিরাকার পিতার 'চরণ যুগল' চন্দনচর্চ্চিত করিব,—বিষ্ঠার দিকে যাইব না। যতক্ষণ হীরক পাইব, তাঁহারই উদ্দেশে ধারণ করিব, তখন অঙ্গারের আবশ্যক কি? এবং বিধবা ভগিনী দেখিলেই, তাহার সহিত পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইব, কুমারী বিবাহের প্রয়োজন কি? অহো! বিধবা ভগিনীদিগের দুঃখ দূর করাই ভ্রাতাদিগের কর্ত্তব্য ও পরমপিতার ন্যায়ানুমোদিত। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, যাঁহারা পবিত্র ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বিধবা-উদ্ধারই ইহজীবনের সার ও প্রধান ব্রত। এই জন্য তিনি স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—"আমি বিধবাব্যতীত কাহারও সহিত বিবাহ করিব না;" সুতরাং, কামিনীকিঙ্কর বাবু বিধবা-উদ্ধারের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে, কামিনীকিঙ্কর বাবু কিছু দিনের মধ্যে জানিতে পারিলেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশে তাঁহার খুল্লতাত সম্পর্কীয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নীর অভিভাবক কেহই নাই, অথচ উক্ত বিধবার হস্তে কিঞ্চিৎ সম্পত্তিও আছে। রমণীর বয়স তখন সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র। পূর্ব্বে তাহার দুই একটি সন্তানাদি হইয়াছিল, কিন্তু অকালেই তাহারা কাল কবলিত হইয়াছে। কামিনীকিঙ্কর বাবু সুযোগ বুঝিয়া, ইহাঁর তত্ত্বানুসন্ধানে [illegible] হইলেন এবং নিরাকার পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অত্যাশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে সহজেই সেই বিধবা-রমণীর দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইলেন। তাহাকে কলিকাতায় আনা হইল ও বিধিমতে পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল।

কামিনীকিঙ্কর প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, উক্ত বিধবার নিকটে যাইতেন ও বিধিমতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে তিন মাস অতীত হইবার পর, কামিনীকিঙ্কর সেই বিধবা ভগিনীর দুঃখ নিবারণার্থে স্বাধীন মতানুসারে তাহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পবিত্র ধর্ম্মের স্বর্গীয় প্রভায় সকলকেই বিমোহিত করিলেন।

এই পরম পবিত্র সম্মিলনের পর, মাস সপ্ত অতীত হইতে না হইতেই, কামিনীকিঙ্কর একটি পুত্র রত্ন লাভ করিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে পবিত্র ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। পাঠক! সেই পুত্ররত্নের নাম—প্রমদাসুন্দর।

প্রমদাসুন্দর স্বাধীন প্রেমের স্বভাবজাত সন্তান বলিয়া, দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া মাতৃ-অঙ্ক অলঙ্কৃত ও পিতার নয়নানন্দ বর্দ্ধন

করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ের জলন্ত প্রমাণ তাঁহার বক্তৃতাতেই প্রকাশ আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি।

যখন ইনি 'বাল্য-বিবাহ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, তখন গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন যে,—হিন্দুদিগের অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণই 'বাল্যবিবাহ'; কেন না, আমার মাতা যখন হিন্দু ছিলেন, তখন তাঁহার সন্তান হইবামাত্রই কালগ্রাসে পতিত হইত, এবং তাঁহার পূর্ব্ব স্বামী বাল্যবিবাহের ফল বলিয়া অকালে কালকবলিত হইয়া মাতাকে বৈধব্য-যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া যান। কিন্তু নিরাকার ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা!! পিতা আমার তাঁহার বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করিয়া তাঁহার সহিত পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার যে গর্ভ মৃত সন্তান প্রসব করিত, যৌবনের সম্মতি-সহবাসে সেই গর্ভে আমি জন্ম লাভ করিয়াছি; এবং স্বাধীন প্রেমের স্বভাবজাত সন্তান বলিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছি। অকালমৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধাও করে না। অতএব, স্ত্রীলোকের সহবাসের সময়, যাহাতে পঞ্চ-বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর নিরূপিত হয়, তজ্জন্য কোন একটা রাজ আইন হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য।" কথিত আছে যে, কিশোর বয়সেই ইনি ক্রমান্বয়ে মাতৃ পিতৃ-হীন হন। এবং ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই "চাঁদা-সংগ্রহ-ফণ্ডে"র অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। ইনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য স্বয়ং একটি থলের আকারে 'ব্যাগ' নির্ম্মাণ করেন; এবং তস্করগণ তস্করপাতের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই ঐ মুদ্রাপূর্ণ ব্যাগটি গলদেশে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিতেন। সাধারণে বলিয়া থাকে যে, সেই সময়ে ইহাঁর বর্দ্ধনোন্মুখ শ্মশ্রুরাজি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহারা ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়া বলে যে,—"মুদ্রাপূর্ণ থলের ভার দাড়ির উপরে পড়ায়, মধ্যাকর্ষণ-যোগে এইরূপ আজানুলম্বিত দাড়ির উৎপত্তি।" কিন্তু ইহা তত দূর বিশ্বাস-যোগ্য নহে; কারণ, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি দাড়িতে "সুদীর্ঘকেশী তৈল" মাখাইয়া শ্মশ্রুরাজীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছেন এবং নবনীত মাখাইয়া ইহার কোমলতা সম্পাদন করিয়াছেন,—এ বিষয়ের এই পর্য্যন্তই জানা আছে। তবে ইনি "চিত্তসংযম"-বিষয়ের বক্তৃতার স্থান বিশেষে দাড়ি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে,—"দাড়ির কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কি মনোহর মূর্ত্তি! দাড়ি হীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে; দাড়ি-হীনের গৌরব নাই! য়ুরোপ ও আমেরিকা সভ্যতার জন্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, শ্মশ্রুশোভিত ব্যক্তি, দাড়িহীন লোক অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট; পূর্ণিমার অমিয়ময়ী শুভ্র ত্রিযামার সহিত ঘোরান্ধকারাবৃতামানিশার যেরূপ প্রভেদ দাড়্যালোকালোকিত সুসভ্য আঢ্য ব্যক্তির সহিত আঁধারময় আদেড়ে অসভ্য জাড্যময় লোকের তদ্রূপ প্রভেদ।" উক্ত বক্তৃতায় আরো বলিয়াছেন যে, "আমাদের যৌবনাগমে অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের শুক্রের সঞ্চার হয়, সেই সময়েই দাড়ি বিকাশ পায়; অতএব দাড়ির সহিত শুক্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই জন্য যাঁহারা দাড়ি ত্যাগ করেন তাহারা বীর্য্য-ক্ষয়াপরাধে অপরাধী, অর্থাৎ ভ্রূণ-হত্যার পাপভাগী। দাড়ি ফেলা বন্ধ করিয়া, বরং কোর্টসিপ-প্রথা প্রচলন করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

"অতএব হে ভ্রাতৃ-মণ্ডলি! যদি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে না চাও, যদি ভ্রূণ-হত্যাপাপে লিপ্ত হইতে না চাও, যদি দেহের মধ্যে 'ইলেক্ট্রীসিটি' বাড়াইয়া চিত্ত সংযম করিবার বাসনা থাকে, তবে, ভ্রম-ক্রমেও দাড়ি ফেলিও না" !!

প্রমদাসুন্দর ভ্রাতাদলভুক্ত হইলেও, 'হরি-সুন্দর' অথবা 'ঘন নিরাকার' ভক্ত ছিলেন না; কারণ, ইনি সমাজ-সংশোধনেই সতত ব্যস্ত। এ সমস্ত পরিচয় সাধারণ হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে; যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

একদিন ইনি 'বিবাহের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন বলিয়া, চারিদিকে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। অদৃষ্ট ক্রমে এক খানি বিজ্ঞাপন আমার হস্তগত হইল, তাহাতে লেখা আছে,—

"অদ্য গোধূল্যাবসানে !

অদ্য গোধূল্যাবসানে !!

অদ্য গোধূল্যাবসানে !!!

সমাজ-হিতৈষী—প্রমদাসুন্দর বাবু

'বিবাহের প্রয়োজনীয়তা'

সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন—

বক্তৃতা-স্থান—সুসভ্য সমাজ গৃহ।"

বিজ্ঞাপন খানি পাঠ করিয়া ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে, সেই ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যাকালে, শরীর অসুস্থ থাকিলেও, না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিতে আমাকে কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই। ভিতরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়—অব্যক্ত, লেখনীর দ্বারা তাহা বর্ণন করিতে পারা যায় না; তবে যতদূর পারি, আপনাদের ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য চেষ্টা পাইব।

সভা-গৃহ সুন্দররূপে গ্যাসালোকে আলোকিত করা হইয়াছিল। ডিসেম্বরের শীত প্রযুক্ত অনেক ভ্রাতা, কোট পেণ্টেলুন দ্বারা দেহ-যষ্টিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগিনিগণও নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া, নির্দ্ধারিত স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকেরও সমাগম হইয়াছিল; আমিও চাদর মুড়ি দিয়া সভাগৃহের এক পার্শ্বে একটি সিট্ (seat) অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম। বক্তা মহাশয় যে স্থানে বক্তৃতা দিবেন, সেই স্থানটি অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ। দেখিলাম—তদুপরি একটি আলুলায়িত-কেশিনী ভগিনী পিছন করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বেও সুগোল ভাবে ভগিনী-মণ্ডলী ভূষিতা হইয়া দণ্ডায়মানা। ব্যাপার খানা কি—বুঝিতে পারিলাম না। সভাগৃহে শুনিয়াছিলাম যে,—"ঠিক ৬৷৹ টার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হইবে;" কিন্তু, ঘড়ীতে ৬৷৹ হইতে ২ মিনিট বাকি, তথাপি, বক্তা এখনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন না। অথচ, ভগিনী একজন বক্তার স্থান অধিকার করিয়া, পিছন ফিরিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন; সুতরাং, আমি অনিমিষ লোচনে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলাম; কিন্তু এমনি অভাবনীয় কৌশল—যেই ঘড়ীর কাঁটা ৬৷৹ টার ঘরে উপস্থিত হইল, অমনি কেশরাজির মধ্য হইতে একখানি বদন বিকাশ পাইয়া, জলদ-গম্ভীর রবে সভাস্থল কাঁপাইয়া বলিল,—"হা অবলা ভগিনিগণ!

তোমরা কি পাপে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হও, বলিতে পারি না!”

আমি ত এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলাম এবং কিছুই আমার শ্রুতি-গোচর হইল না। সেই সৌন্দর্য্য, সেই অতুল শোভা নিরীক্ষণ করিয়া কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিলাম না। মনে হইল—যেন মেঘ-জাল অপসৃত করিয়া এক পূর্ণচন্দ্র বিকাশ পাইতেছে! কলঙ্করূপ কৃষ্ণবর্ণ ভ্রু-বিশিষ্ট নয়নযুগল যেন তদুপরি বিরাজিত, ভগিনী-রূপা নক্ষত্রগণ নিবিড় মেঘজাল মধ্যে বিকাশ পাইয়া, পূর্ণচন্দ্রের অতুল সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি করিতেছে। সে শোভা—সে প্রাণ মনোমুগ্ধকারী শোভা—সে অনন্ত শোভা বর্ণন করা কি আমার সাধ্য! তখন অসুস্থতা যেন দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে; কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিলাম—আমি কোথায়? স্বপ্ন দেখিতেছি না জাগ্রত রহিয়াছি?

সুস্থির হইয়া দেখিলাম—এ স্বপ্ন নয়—আমি বাস্তবিকই সভাগৃহে রহিয়াছি; বক্তৃতা-স্রোত অনবরত চলিতেছে ও সভাকে সরগরম্ করিয়া তুলিয়াছে। আমার ভাগ্যে বক্তৃতা শুনা ঘটিল না—আমি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম এ কিরূপ হইল? বক্তা যে স্থান হইতে বক্তৃতা দিতেছেন, সেই স্থানে একটি ভগিনী-মূর্ত্তির আবির্ভাব ছিল; হঠাৎ কিরূপে ভ্রাতা উদিত হইলেন! সুতরাং, প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য, বক্তার মূর্ত্তিখানি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, এবং সেই সুপরিচিত, দোদুল্যমান, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুরাজি সন্দর্শন করিয়াই, বুঝিতে পারিলাম যে, ইনিই প্রমদাসুন্দর,—কৃষ্ণবর্ণ ব্যারিষ্টারী Gown দ্বারা সমগ্র শরীর আচ্ছাদন করিয়াছেন, কেবল মস্তকটি অনাবৃত। বক্তৃতাকালে হস্তদ্বয় উত্থিত হইবামাত্রই, দেখিতে পাইলাম যে, হস্তদ্বয় ও কৃষ্ণবর্ণ গ্লভস্ (Gloves) দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্ব্বে যে স্ত্রী মূর্ত্তি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল দেখিয়াছিলাম, সেটি আমার সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ, ইনি ভগিনীদের বিবাহ-দুঃখে দুঃখিত হইয়া, কৃষ্ণবর্ণ গ্লভস্ মণ্ডিত করদ্বয়ে স্বীয় বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন এবং ঠিক ৬৷৷০ টার সময় প্রাণের উচ্ছ্বাস থাকিতে না পারিয়া, হস্ত উত্তোলন-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—“হা অবলা ভগিনিগণ! তোমরা কি পাপে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হও, বলিতে পারি না!”

এই বক্তৃতা প্রায় ২৷৷০ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল, এবং বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন যে,—“বিবাহ-প্রণালী কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি বিবাহ তাঁহার অনুমোদিত হইত, তাহা হইলে, পশু-সমাজেও বিবাহ-প্রথা প্রচলিত থাকিত; কিন্তু বিবাহ যখন আমাদিগের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করে, তখন হে প্রিয় ভ্রাতা ও প্রেয়সী ভগিনিগণ! তোমরা আর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার লোপ করিয়া ঈশ্বরের নিয়ম পদ-দলিত করিয়া, তাঁহার অকৃতজ্ঞভাজন হইও না ও স্বদেশ-উদ্ধারের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিও না।”

এই বক্তৃতার পর পাঁচ মাস অতীত হইতে না হইতে, একদিন গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছি, দেখিলাম নৌকা হইতে ত্রিশূল হস্তে গৈরিক বসনাবৃত একটি মূর্ত্তি অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত শ্মশ্রু-রাজি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে,

ইনিই প্রমদাসুন্দর বাবু। হঠাৎ ইহাঁর এই অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া, আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; নানা প্রকার সন্দেহে আমার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল, এবং অনেক বারের "অনুসন্ধানে"ও ইহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

একদা, প্রভাতে বাগ্‌বাজারের খালের ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল,—"ঠাকুর মশায়! প্রণাম হই।"

আমি দেখিলাম যে, রামধন কামার আমাকে প্রণাম করিতেছে; অনেক দিন পরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি রামধন! ভাল আছ ত? কাজ কর্ম্ম চল্‌ছে কেমন?"

রাম। আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা ভাল আছি—কাশীপুরের কারখানা খুলে আজ কাল বেশ রোজকার হচ্চে।

আমি। কাশীপুরের কারখানায় তুমি কি কাজ কর?

রাম। আপনি প্রমদাসুন্দর বাবুকে চেনেন ত? তিনি আজ কাল নিষ্কাম ধর্ম্মে ব্রতী, আর যোগিচর্য্যায় নিযুক্ত। তিনি অনেক গুলি স্ত্রীলোককে যোগিনী ক'রেছেন, এবং প্রত্যহই তিনি নূতন নূতন স্ত্রীলোককে যোগিনী-ধর্ম্মে দীক্ষিত কচ্ছেন। সেই জন্য 'ত্রিশূল' ও 'গেরুয়া কাপড়' প্রত্যহই দরকার হয়। আমি সেই ত্রিশূল যোগাইয়া থাকি, আর ভূতনাথ আমার দোকানের পাশেই এক খানি গেরুয়া কাপড়ের দোকান খু'লেছে—এতে আমাদের দু'জনার বেশ রোজকার হচ্চে—তা হবে না কেন, বলুন? প্রমদাসুন্দর বাবু যথার্থই একজন সাধু ব্যক্তি, তাঁর কৃপা থাক্‌লে উপায়ের ভাবনা কি?

আমি। রামধন! তোমার যে দু'পয়সা উপায় হচ্চে, তা শুনে বড় খুসী হলেম।

রাম। ঠাকুরমশায়! তবে এখন আসি;—প্রণাম হই।

আমিও রামধনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলাম। মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম যে, প্রমদাসুন্দর বাবু এক্ষণে স্ত্রীলোক লইয়া নিষ্কাম ধর্ম্মে ব্রতী! এমন না হ'লে কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম হয়? বিশেষ—স্ত্রীলোক না হ'লে নিষ্কাম ধর্ম্ম করবে কে? তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ—আজকালের "দেবী চৌধুরাণী।"

কালের বিচিত্র গতি কে রোধ করিতে পারে? কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল যে, প্রমদাসুন্দর বাবু একটি স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে পবিত্র যোগিনী-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া, আদালত ইহার বিচারভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারপতি মহাশয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রমদাসুন্দর বাবু নিস্পৃহ ও নিষ্কাম ব্যক্তি ও একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ, পার্থিব কোনও সুখে ইহাঁর স্পৃহা নাই—এই যে আজানুলম্বিত শ্মশ্রুরাজি তাহাও তিনি সখের জন্য রাখেন নাই! বিচারপতি মহাশয়, এই সমস্ত গুলি উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়া, প্রমদাসুন্দর বাবুর নির্ম্মায়িকতা দেখাইবার জন্য, সেই দাড়ি গুলি ফেলাইলেন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্জ্জনে হইলে ভাল হয় বুঝিতে পারিয়া, ছয় বৎসর কাল 'শ্রীআশ্রমে' বাস করিবার আদেশ দিলেন; আর ইনি পৌত্তলিকতার ঘোরতর বিরোধী জানিতে পারিয়া, বড় বড় 'শিব' ভাঙ্গিবার কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। যাহা হউক, শুনিতে পাই যে, প্রমদাসুন্দর বাবুর দাড়িটি 'London Exhibition' লণ্ডন এক্‌জিবিসনে

পাঠান হইয়াছিল ও সেই খানেই তাঁহার শ্মশ্রুরাজি, ধর্ম্ম কর্ম্মের পরিচায়ক হইয়া, তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীঅপ্রিয় দর্শন শর্ম্মণঃ।

অর্দ্ধোদয়-যোগ

২৭শে মাঘ—সন ১২৯৭ সাল।

পবিত্র ভারত-ক্ষেত্র—অবনীর সার,
উরসে জাহ্নবী যাঁর বহে অনিবার;
প্রসন্ন-সলিলা মাতা—শিব-সীমন্তিনী,
তারিতে তাপিত জনে আইলা মেদিনী
অপার মহিমা মুখে বলা নাহি যায়,
বারেক পরশে জীব মোক্ষ-পদ পায়;
ধন্য সূর্য্য-বংশ—ধন্য ভগীরথ নাম,
যাঁহার কারণে সবে পূর্ণমনস্কাম;
মায়ের মাহাত্ম্য হেতু ভারত-গৌরব,
ভূতলে অতুল যশ—অতুল সৌরভ।

সুখদা রটন্তী নিশি হ'ল অবসান,
পূর্ব্বাকাশে পরকাশ উষার বয়ান;
ভীম রবে উঠিয়াছে ঘোর কোলাহল,
গরজে গভীর যথা সাগরের জল;
সমগ্র ভারত-ভূমি করি তোলপাড়,
জয়নাদে কাঁপাইয়ে নগর, পাহাড়;
আবাল যুবক বৃদ্ধ, নারী কুলবতী,
কুলবতী-কূলে যায় হরষিত মতি;
প্রফুল্ল নয়ন সবে মুখে মাত্র ধ্বনি,—
"জয় মাতঃ! জয় গঙ্গে! জগত-জননি!"

কে বলে শ্রীরাম-সৈন্য না যায় গণনা?
কে বলে সমুদ্র সম কৌরবের সেনা?
কে বলে তারকা-রাজি সংখ্যা নাহি হয়?
কে বলে অগণ্য তৃণ পর্ণ সমুচয়?
হের হে জাহ্নবী-কূলে অদ্ভুত ব্যাপার!
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী কাতারে কাতার!
হেলায় গণিতে পারি পিপীলিকা-সারি,
তথাপি এ জন-স্রোত গণিতে না পারি!
সাগর-সঙ্গম হ'তে—তীর্থ হরিদ্বার,
ঘাট বাট তট মাঠ,—সব একাকার।

বেদ পাঠ করে বিপ্র—বৈষ্ণবে কীর্ত্তন,
বাদ্য করে বাদ্যকরে, নর্ত্তকী নর্ত্তন;
গায়কে গাইছে গীত, ললিত-বিভাষ,
চারিদিকে, নানা রঙ্গরসের বিকাশ;
ভিক্ষুকে পাইছে ভিক্ষা অঞ্জলি ভরিয়া,
কেহ নাহি যায় ফিরে বিমুখ হইয়া;
ধন-ধান্য-পরিপূর্ণ ভারত-ভাণ্ডার,
পুণ্যের সঞ্চয় কর যথা ইচ্ছা যার;
'অভাব' কাহারে বলে জানে কি এদেশ?
এদেশে অভাব শুধু—"বিদেশী প্রবেশ।"

আজি চতুর্দ্দশী তিথি, অর্দ্ধোদয় যোগ,
স্নানেতে অশেষ ফল—অন্তে স্বর্গ-ভোগ;
'কোটী সূর্য্য-গ্রহণ-কালীন স্নান-ফল,'—
'অর্দ্ধোদয়' স্নানে পাবে মানব সকল!
উষায় করিছে সবে রটন্তীর স্নান,
দশ দণ্ড পরে, অর্দ্ধোদয়ের বিধান;—
সায়াহ্নে আছয়ে পুনঃ স্নানের ব্যাপার,
তরিতে ত্রিকোটী কুল হইবে উদ্ধার;

চল চল নর নারী! চল যুবা জরা!
স্বপুণ্য সঞ্চয় হেতু সবে কর ত্বরা।

কেহ বা চলিছে বুকে পুত্র আগুলিয়া,
কেহ বৃদ্ধ মাতা-পিতা-হাতটি ধরিয়া;
কেহ বা শকটে যায়, কেহ নরযান,
কেহ বা তরণী, কেহ পদব্রজে যান;
দোকানী পশারী, কিবা ভাঁড় বাজিকর,
সকলেই অর্থলাভ করে বহুতর;
গঙ্গার দু'কূলে যত দেবতার স্থান,
সকলে তথায় পূজা করিছে প্রদান;
জাহ্নবী-পশ্চিম-কূল—বারাণসী প্রায়,
স্নান হেতু কত লোক ধাইছে তথায়।

সপুষ্প তুলসী—বিল্ব—নবদূর্ব্বাদল,
সন্দেশ শর্করা মিষ্ট, নারিকেল ফল,
আতপ তণ্ডুল—পক্ক রম্ভার বেষ্টন,
ভক্তি-ভরে মাতৃ-পদে করে নিবেদন;
তৈজস বস্ত্রাদি করে ব্রাহ্মণেরে দান,
দেবতা-দর্শনে কেহ যায় বেগবান্;
কোথা ছিল এত লোক, এল কোথা হ'তে?
তিল মাত্র নাহি স্থান, চলা ভার পথে;
কন্যা-অন্তরীপ হ'তে হিমাদ্রি-শিখর,
গঙ্গার কূলেতে আসি বাঁধিয়াছে ঘর।

কেহ বা হারায় স্বামী, কেহ বা বনিতা,
কেহ বা হারায় পুত্র, কেহ বা দুহিতা;
কেহ হয় মৃত প্রায় লোকের চাপানে,
তথাপি, তিলেক ভয় নাহি হয় প্রাণে!

এত করি করে লোক পুণ্যের সঞ্চয়,
দেখিয়ে বিধর্ম্মী-মনে ভয় নাহি হয়!
ভারতের সমদেশ এজগতে নাই,
যা নাই ভারতে, তাহা ভারতে না পাই;
ম্লেচ্ছ আসি শিক্ষা দিবে হিন্দুর আচার!
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল শত শত বার।

কে বলে ভারতে নাই ধর্ম্মের বন্ধন?
কে বলে যথেচ্ছাচারী হিন্দুর নন্দন?
সারবাক্য, সৌম্যমূর্ত্তি, সরল ব্যাভার,
অতিথি-সেবন, সত্য, সদা সদাচার,
তৃণ, জল, ভূমি, মিষ্ট মুখের বচন,—
এ সবে হিন্দুর পুত্র না হয় কৃপণ;
ব্রত, পূজা, হোম, যাগ, দেব-আরাধনা,
সতীত্বে সবার শ্রেষ্ঠ ভারত-ললনা;
এমন ভারতে যেই করে ব্যভিচার,
ডুবুক্ নরকে শীঘ্র সেই কুলাঙ্গার!

দেখ্ রে বিদেশি! দেখ্ নয়ন মেলিয়া,
কি দেখি ভারতবাসী যাইবে ভুলিয়া?
কিবা ধন আছে তব, কিবা নাহি তার?
ধর্ম্ম-ধনে পরিপূর্ণ ভারত-আগার;
দেখা'তে ধর্ম্মের তেজ—ধর্ম্মের বন্ধন,
যে জাতি অনলে কায়া করে বিসর্জ্জন,
'আইন' দেখা'য়ে তার কর ধর্ম্ম নাশ,
হউক—হউক তব বিফল প্রয়াস;
বিনয়-বচনে যদি বধির শ্রবণ,
হরিবে তোমার দর্প শ্রীমধুসূদন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।



সার-কথা

সু — কু

৺কৈলাসচন্দ্র রায় সঙ্কলিত।

সু

পুরাণের উক্তি, বুদ্ধিমানের যুক্তি,
—বিপদের মুক্তি।
কথামত কাজ, কুলবধূর লাজ,
—শুভকর্ম্ম, আজ।
ভগবান্-গীত, স্বদেশের হিত,
—মোকদ্দমায় জিত।
পিপাসায় জল, একতার বল,
—মরে যদি খল।
কচি ছেলের বোল, কচি আমের ঝোল,
—চেত্তোল মাছের কোল।
চারি দিকে চোক্, পরদুঃখে শোক,
—জ্যোৎস্নার আলোক।
গ্রীষ্ম কালে পাটী, আপনার বাটী,
—লোক, মন খাটি।
বালকের খেলা, সদ্গুরুর চেলা,
—ধর্ম্ম-জন্য মেলা।
বন্ধু সহ বাস, সময়েতে চাষ,
—অনুগত দাস।
আহারান্তে পান, কুটুম্-বাড়ী যান,
—ধনাঢ্যের দান।
ভালবাসার গাল, শীতকালে শাল,
—চৈত্রে, কচি তাল।
সন্দেহ-ভঞ্জন, প্রতিজ্ঞা-পূরণ,
—বার্দ্ধক্যে মরণ।
বিভু-আনুরক্তি, দান—যথাশক্তি,
—গুরুজনে ভক্তি।
গর্ব্বহীন ধনে, দয়া সর্ব্বজনে,
—পরিতোষ মনে।
হরি-সঙ্কীর্ত্তন, গুরুর বচন,
—রিপুর শাসন।
বন্ধু—হিতকারী, দ্বিজ—শুদ্ধাচারী,
—পতিব্রতা নারী।
স্বদেশীয় রীতি, পণ্ডিতের নীতি,
—শস্য-পূর্ণ ক্ষিতি।

কু

কই মাছ কোটা, খাট নোড়ায় বাটা,
—ডেলা-বনে হাঁটা।
ম'রে ফুটে দান, টেনে টুনে মান,
—গলা নাই গান।
পর-গৃহে বাস, মর্ম্মহীনে হাস,
—নির্ধনের দাস।
যাত্রাকালে হাঁচি, খাদ্য-দ্রব্যে মাছি,
—বিধবার বাঁচি।
ক্রূদ্ধমতী জায়া, বাহিরেতে মায়া,
—ছোট লোকের পায়া।
শৃগালের যুক্তি, নির্ব্বোধের উক্তি,
—অধামুখের চুক্তি।
অরসিকের রঙ্গ, উদ্যমের ভঙ্গ,
—নীচ লোকের ব্যঙ্গ।
শাদা বস্ত্রে কালী, বাড়া ভাতে বালি,
—অজবুক শালী।
অসময়ে পাকা, পরাধীনে থাকা,
—দুর্বৃত্তের টাকা।
ঘরে, চোর পোষা, শুধু মুখে তোষা,
—নির্গুণের গোসা।
পর-বস্ত্র পরা, চির-রোগে জরা,
—মন, গর্ব্বে ভরা।
মূর্খজনে গড়া, সপ্তমেতে চড়া,
—মন নাই পড়া।
ছাত্র নাই টোল, দুগ্ধাভাবে ঘোল,
—গোরু-শূন্য গো'ল।
উত্তরকারী দাস, কুকর্ম্মে প্রয়াস,
—সজ্জনের নাশ।
অপরের গ্লানি, আমি সব জানি,
—নিদারুণ বাণী।
অরণ্যে-রোদন, কৃপণ-সেবন,
—পরেরে যতন।
কাটা ঘায়ে লূণ, শত্রু, তার গুণ,
—কাঁচা বাঁশে ঘুণ।

আইনের পরিণাম।

আমরা ইতি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে,'সহবাস-সম্মতি'র আইন প্রচলিত হইলে, প্রথমতঃ রাজ্য বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ হইবে; দ্বিতীয়তঃ আমাদের ধর্ম্মনাশ হইবে, এবং তৃতীয়তঃ আমরা এরূপ আইনের কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ইহাতে লোকের মানসিক ও সামাজিক অবস্থা যে, কতদূর, বিকৃত ভাব ধারণ করিবে, সে বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

হিন্দু-রমণী যে হিন্দুর নিকট কতদূর আদরের জিনিষ, হিন্দু-রমণী যে হিন্দু-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী ও হিন্দু-সংসারের কুল-লক্ষ্মী এবং হিন্দুদিগের পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়ের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা যথার্থ হিন্দু মাত্রেই বিশেষ রূপ অবগত আছেন; বিধর্ম্মী,—অহিন্দু, বা রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার-ভ্রষ্ট হিন্দু-নামধারী ব্যক্তিরা তাহার ছায়ামাত্রও অনুভব করিতে পারে না; অতএব তাহারা যে এইরূপ অসঙ্গত আইনের পক্ষ সমর্থন করিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

হিন্দুরমণী বালিকা বয়স হইতেই জানে ও তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে,—"পতিই তাহার এক মাত্র অধিকারী এবং পতিই তাহার একমাত্র অবলম্বন ও উপাস্য দেবতা। একমাত্র পতি-পদে তাহার মান, রূপ,যৌবন, জীবন,—সমস্তই ইহকাল ও পরকালের জন্য সমর্পিত। হিন্দু-ললনার পক্ষে দুস্তর ভব-সমুদ্রে, পতিই একমাত্র কর্ণধার। পতির পরিচর্য্যা ও তুষ্টি সম্পাদন করা,হিন্দু রমণীর ইহ জীবনের কেবল মাত্র লক্ষ্য ও পালনীয় কার্য্য এবং পতির চিত্ত বিনোদনই, পতি পরায়ণার পরম ব্রত"। হিন্দু রমণী আরও জানে যে,—"পতিকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, তাহার ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ, চতুর্বর্গ ফললাভ হইবে।" অতএব, সেই হিন্দু রমণী যখন জানিবে যে, তাহার সহিত ধর্ম্মতঃ সহবাস জন্য অথবা ঐ রূপ মিথ্যাভিযোগের নিমিত্ত,তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব—সংসারের একমাত্র অবলম্বন এবং হৃদয়-কন্দরের প্রতিষ্ঠিত দেবতা—স্বামী দ্বীপান্তর বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে চলিল, তখন, তাহার মনের ভাব কিরূপ হইবে! সে কি তখন আত্মঘাতিনী হইতে প্রস্তুত হইবে না? সংস্কারকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, একবার স্থির চিত্তে সেই ভাব মনোমধ্যে কল্পনা করুন দেখি—সে ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা, বিদ্যা ও ক্ষমতা আমাদের নাই।

যে হিন্দু-রমণী স্বামীর সংসার-সঙ্গিনী, যাগ যজ্ঞ, তীর্থ-দর্শন,দেবতাদি অর্চ্চন প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, এবং সুখ দুঃখের সমভাগিনী; হিন্দু দাসত্ববৃত্তি মস্তকে ধরিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, যে হিন্দু-স্ত্রীকে সুখে রাখিবার জন্য সতত লালায়িত, যে হিন্দু স্ত্রীর প্রফুল্ল বদন-সরোজ নিরীক্ষণ করিয়া, ও পতি-পরায়ণতা-গুণে মুগ্ধ হইয়া,হিন্দু,সংসারের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়, যে হিন্দু স্ত্রীর পবিত্র প্রণয়ে ও সান্ত্বনা-বাক্যে, চির-পরাধীন ও বিজাতি-পদ-দলিত হিন্দুর

ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে সমস্ত দুর্ব্বহ ভার অপনীত হয়, এবং যে প্রেমময়ীর হস্ত ধারণ করিয়া, হিন্দু, সংসারের বিষম কণ্টকাকীর্ণ পথেও পরম সুখে বিচরণ করে, সেই হিন্দু-স্ত্রীর সহিত—সেই ঋতুমতী হিন্দু স্ত্রীর সহিত—স্বামী ধর্ম্মতঃ সহবাস করিয়াছে বলিয়া, অথবা এইরূপ মিথ্যা অভিযোগে যখন তাহাকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, তখন সে কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভোগ করিবে! সে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন পাশ্চাত্যদিগের বিবাহ-বন্ধনের ন্যায় ছায়া-বাজী নহে। আজ স্ত্রীপুরুষে রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, পরস্পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম; আবার দুই দিন বাদে ভাল লাগিল না, বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইলাম, —এরূপ সভ্যতম বিবাহ-প্রথা অসভ্য হিন্দু জাতি জানে না। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন অকাট্য; রাজা ত তুচ্ছ কথা, সর্ব্ব সংহারকারী কালান্তক কালও তাহাদের বিবাহ-বন্ধন তিলার্দ্ধ পরিমাণেও ছিন্ন করিতে সক্ষম নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামী পরলোক গমন করিলে, তাহার স্ত্রী পার্থিব সমস্ত আমোদ প্রমোদ ও ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, সেই পরলোকগত স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া, একাগ্র চিত্তে তাঁহারই ধ্যানে জীবনের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করে। স্বামীই হিন্দু-রমণীর হৃদয় সর্ব্বস্ব। সধবা হউক, বিধবা হউক, এই স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, হিন্দু-ললনা সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিয়া, অন্তে সদ্গতি লাভ করে। অতএব, এইরূপ ঋতুমতী স্ত্রী ও তাহার স্বামী সহবাস করিলে, সেই সহবাস 'বলাৎকার' বলিয়া গণ্য হইবে! এবং তন্নিমিত্ত স্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে! ইহাতে কোন্ ভীরু ও কাপুরুষের অন্তর উদ্বেলিত না হইবে! এবং মনের আবেগে মুখ ফুটিয়া দু' এক কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিবে!

গবর্ণমেণ্ট বালিকাদিগকে অকাল-সহবাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ঘৃণিত আইন করিতেছেন, কিন্তু, পতিব্রতা হিন্দু-রমণীর অভিষ্টদেবতা স্বামীকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়া না রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদের অন্তরে যে, কি ভয়ানক অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করিবেন, ও তাহার পরিণাম যে, কিরূপ বিষময় হইবে, তাহা ভাবিলেও, আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

'অপ্রাপ্তদ্বাদশবর্ষীয়া কামিনীর সহিত স্বামীসহবাস করিয়াছে',—এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইলে, বিচারের সময় অবশ্যই উক্ত দম্পতিদ্বয়কে পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে; কিন্তু হিন্দু-পুরস্ত্রীগণকে প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত করা যে, কতদূর অপমানকর, লজ্জাকর ও সুকঠিন কার্য্য, তাহা লোকাচার ও কুলাচার-প্রথার বশবর্ত্তী হিন্দুমাত্রেই, যথেষ্ট অনুভব করিতে পারেন। অবশ্য, যিনি আপন স্ত্রীকে 'অর্দ্ধ মেম ও অর্দ্ধ বাঙ্গালি'র পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, মস্তকে কুসুম-কোরক-সংশ্লিষ্ট পাগড়ী পরাইয়া, মেয়ে মর্দ্দানী করিয়া মিস্ট্রেস্ সাজাইয়া কংগ্রেসে, থিয়েটারে বা প্রকাশ্য সমাজে পাঠাইতে পারেন; যাঁহার স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি ভারত-উদ্ধারকারিণী-রূপে আমাদের বৈঠকখানা ও বিলাস-ভবনের শোভা সম্বর্দ্ধন

করিতেছে, এবং যিনি সময়ের গুণে হিন্দু-ধর্ম্ম লোপ করিবার জন্য একখানি নগণ্য কাগজ বাহির করিতেছেন ও স্বয়ং সংস্কারকদলাভিষিক্ত হইয়া, অপরকে 'সংস্কারক' বলিয়া গালি দিতেছেন!—তাঁহার ন্যায় লোকের অন্তরে ইহাতে আঘাত না লাগিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে, ইহা নিতান্ত অন্তর্দাহ উপস্থিত করিবে এবং ইহা অপেক্ষা মৃত্যুকে সাদরে অভ্যর্থনা করা, তাঁহার নিকট শত গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে,—"যাহারা এরূপ বৃথা অভিযোগ করিবে, তাহাদের জন্য কোন কঠিন দণ্ডের বিধান হউক, তাহা হইলে আর বৃথা অভিযোগ হইবে না।" কিন্তু, অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিচার না করিলে ত আর স্থিরীকৃত হইবে না; সুতরাং অভিযোগ বৃথা হইলেও, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিতে হইবে, এবং তাহাদিগকে সপরিবারে আদালতে হাজির করিতে পারিলেই, অভিযোগকারীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,—তৎপরে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হইবে, তাহা সকলেই অবগত আছে; তথাপি, অনেকে খুন করে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিয়া থাকে।

তাহার পর—অভিযুক্তা স্ত্রী, সহবাস করিয়াছে কি না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কি ভয়ানক কথা! যে হিন্দুকুল-বধূ, বিবাহের পর শ্বশ্রূগৃহে আসিয়া, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে সাহসী হয় না, যে শ্বশ্রূগৃহের পরিজনবর্গের সহিত, এমন কি পুরাতন দাসীর সহিতও মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারে না; গবর্ণমেণ্ট বহুজনপূর্ণ প্রকাশ্য আদালতে বিচারপতির সম্মুখে সেই হিন্দুকুল বধূর মুখ হইতে বলাইবেন যে,—"সে স্বামীর সহিত সহবাস করিয়াছে কি না!" কোন্ হিন্দু-কুল বধূ এ কথা ব্যক্ত করিতে সক্ষম হইবে? বলিতে পারি না গবর্ণমেণ্ট সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে কি বুঝিয়াছেন! আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে দৃঢ় বিশ্বাস যে, এরূপ অবস্থা ঘটনার পূর্ব্বে, সে বিষাক্ত দ্রব্য সেবন বা অন্য কোন উপায়ে আত্মঘাতিনী হইবে। আবার দেখুন,—ইহাতেও যদি সহবাস হইয়াছে কি না, তাহার প্রকৃত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ডাক্তার দ্বারা উক্ত স্ত্রীকে পরীক্ষা করান হইবে। কিন্তু কোন হিন্দু স্ত্রী, প্রাণ থাকিতে এই জঘন্য কার্য্যে সম্মতা হইবে?

পূর্ব্বে, বেশ্যাদের জন্য 'চৌদ্দ আইন' প্রচলিত ছিল; জাতি, কুল, সমাজ ও ধর্ম্মচ্যুত ব্যভিচারিণিগণ,—যাহাদের প্রেমের দ্বার সাধারণের জন্য অহরহ অবারিত, এবং দুই চারি আনার বিনিময়ে প্রণয় বিক্রয় করা যাহাদের উপজীবিকা, তাহারাও এই জঘন্য ও লজ্জাকর কার্য্যে সম্মত হইতে পারে নাই! তাহারা লজ্জার খাতিরে ও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, দূর হইতে ইংরাজ-রাজকে প্রণাম করিয়া, ইংরাজ-রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফরাসডাঙ্গায় পলায়ন করিয়াছিল—কেহ কেহ আত্মঘাতিনীও হইয়াছিল; আজ কিনা অন্তঃপুরবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হিন্দুকুল-বধূ তাহাতে সম্মতা হইবে!!

হিন্দুগণ! বলুন্ দেখি, আপনাদের মধ্যে কাহারও পুরস্ত্রী স্বামী সহবাস করিয়াছে কি

না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য যদি উক্ত স্ত্রীকে আদালতে উপস্থিত করিয়া ডাক্তার দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করান হয়, তাহা হইলে, আপনারা কি তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন?—কখনই নহে। সুতরাং, উক্ত স্ত্রী সমাজ হইতে পতিতা ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবে। অতএব, গবর্ণমেণ্ট বালিকাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া, তাহাদিগকে অসহায়া ও পথের কাঙ্গালিনী করিবেন; সুতরাং ঐ সকল স্ত্রীলোকের, পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন অন্য উপায় আর কি আছে? অতএব এই আইন প্রচলিত করিয়া, গবর্ণমেণ্ট স্বামীকে দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া এবং স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করিয়া, প্রজাগণের যে কি হিত সাধন করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

ইংরাজ! তোমরা সভ্য জাতি বলিয়া আত্ম-গৌরব করিয়া থাক; অতএব এরূপ সুসভ্য আইন তোমাদের সভ্যতম দেশে ও সমাজে চলিতে পারে,—তোমাদের স্বাধীন প্রেমের পবিত্র দৃষ্টির নিকট ইহাতে দোষ স্পর্শ না হইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশে কুল-কলঙ্কিনী দুশ্চারিণী ও অতিশয় নীচ বেশ্যারাও এরূপ আইন অতিশয় জঘন্য ও লজ্জাকর বলিয়া ঘৃণা করে! অতএব, এরূপ আইন হিন্দু সমাজে যতক্ষণ একজনও হিন্দু বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ কোন ক্রমেই চলিবে না।

গবর্ণমেণ্ট আইন জারি করিলেন যে,—"স্ত্রীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে, তাহার সহিত স্বামী, সহবাস করিতে পারিবে না।" কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন কিরূপে? তবে, এই হইতে পারে যে, বিবাহের পর, স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পর পৃথক রাখা, এবং স্ত্রীর বয়ঃক্রম যত দিন দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইবে, ততদিন তাহাকে স্বামীর সহিত একত্রে অবস্থান করিতে না দেওয়া; কিন্তু এরূপ করিলে—শুধু ধর্ম্ম নহে—আমাদের আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত লোপ পাইবে। বিবাহের সহিত আমাদের কতকগুলি স্ত্রী-সংস্কার ও আচার আছে, যে গুলি অবশ্য-পালনীয়। মনে করুন, বিবাহের পর, আমাদের মধ্যে 'ফুল শয্যা' প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে নববিবাহিত দম্পতিদ্বয় একত্রে এক শয্যায় রজনী যাপন করিয়া থাকে। অতএব, এ প্রথা উঠাইয়া দিতে হইবে; না দিলে, "নববিবাহিত স্বামী স্ত্রী ফুলশয্যার রজনীতে আইনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে",—এরূপ মিথ্যা অভিযোগ হইবে না, সে বিষয়ে কেমন করিয়া স্থির নিশ্চয় করিতে পারি! শুধু ফুল-শয্যা নহে, এরূপ আরও অনেক আচার আছে, যে গুলি আইনের খাতিরে তুলিয়া দিতে হইবে।

ইংরাজ! তোমরা আমাদের রাজা, আমরা তোমাদের প্রজা; তোমরা শাসনকর্ত্তা—আমরা তোমাদের শাসনাধীন; তোমরা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতেছ ও করিবে এবং আমরা নিরুপায় ভাবিয়া নির্ব্বিরোধী হইয়া, সে সকল সহ্য করিতেছি ও করিব এবং তোমাদের পদ-দলিত হইয়া থাকিব; না থাকিলে, পদ-দলন গুরুতর হইবে এবং আমরা নিষ্পেশিত হইব, এ সকল সমস্তই সত্য এবং আমরাও তাহা জানি;—কিন্তু তোমরাও স্থির জানিও যে, হিন্দুদের ধর্ম্ম-ভক্তি বড়ই প্রগাঢ় এবং তাহারা প্রাণ অপেক্ষা মান ও

লজ্জার আদর অধিক করিয়া থাকে। আমাদের কথায় বলে,—"যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।" এবং এই জন্যই পুরাকালে হিন্দুগণ যবনের অত্যাচার ও আক্রমণ রোধ করিতে গিয়া, যখন অন্যায় যুদ্ধে অক্ষম হইতেন, তখন পরাজয়, অপমান ও লজ্জা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, প্রজ্জ্বলিত অনলে সপরিবারে আত্ম-সমর্পণ করিতেন।

তোমরা যখন সভ্যতার আদর্শ দেখাইয়া রাজ্য শাসন করিতেছ, প্রতি কথায় প্রতি মুহূর্ত্তে সভাসমিতি সংগঠন করিতেছ এবং সাধারণের অভিমতে ও প্রজাগণের সন্তোষ এবং মঙ্গল-কামনায় কার্য্য করা তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা স্বীকার করিতেছ; তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে বাধ্য হইয়া দু' এক কথা বলিতে অগ্রপদ হইয়াছি।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে, আমাদের দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোক ঋতুমতী হয় এবং স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে যে, তাহার কাম-প্রবৃত্তি বলবতী হয়, ইহা বোধ হয় সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু সে সময়ে যদি তাহাদিগকে স্বামী-সহবাস করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ দুর্দ্দমনীয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া, অথবা কোন কুলোকের পরামর্শে ও প্রলোভনে পড়িয়া, গোপনে তাহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া, স্বীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তির তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা তাহাদের গর্ভ-সঞ্চারও হইতে পারে। এরূপ ঘটনা গৃহস্থ ও ভদ্র পরিবারের মধ্যে না ঘটিতে পারে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে, এবং যাহাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধিনতা-প্রথা প্রচলিত ও যাহারা সতীত্বের মাহাত্ম্য বুঝে না, তাহাদের মধ্যে সংঘটন হওয়া, অসম্ভব নহে। সুতরাং, এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে, গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন? এই দুশ্চারিণী কি আত্মীয় স্বজন ও বহুজনপূর্ণ প্রকাশ্য আদালত-সমক্ষে স্বীকার করিবে যে,—"সে পরপুরুষগামিনী হইয়াছে"?—কখনই নহে। সে অবশ্যই তাহার স্বামীকে ইহাতে জড়ীভূত করিবে এবং বিচারে নিরপরাধী স্বামী বেচারা দ্বীপান্তরীত হইবে, না হয়, জেলে যাইবে। ধন্য আইন!!

ইংরাজ! সত্য বটে আমরা আজন্ম-পরাধীন ও পর-পদানত থাকিয়া, নানা প্রকারে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি ও নিদারুণ দুঃখে দিনপাত করিতেছি; কিন্তু এ সকল অসুখ ও অশান্তি সত্বেও আমরাও এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া থাকি এবং তোমাদের এত অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিয়াও অন্তরে এক প্রকার বিমল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য-শাসন-সন্তোষ ও বিমল আনন্দ তোমরা অতুল বল বিক্রমশালী হইলে,—সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইলে এবং সমগ্র মানব জাতিকে তোমাদের পদানত করিলেও অনুভব করিতে পারিবে না। আমাদের অধিকারে এই ক্ষুদ্র রাজ্য এবং অন্তরে এই বিমল আনন্দ আছে বলিয়াই, আমরা জন্মাবধি পর-পদানত হইয়া, নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি; নচেৎ ভারতের নাম এত দিনে কবে অতল জলধি-জলে লুক্কায়িত হইত, না হয় স্বর্ণাক্ষরে স্বর্গের সোপানে শোভা পাইত। আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য, অসংখ্য সৈন্যের আবশ্যক করে না, ইহার

সুশাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বা টেলিগ্রাফের প্রয়োজন হয় না। আমরা এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়া রুষ-রাজের আক্রমণ ভয়ে ভীত নহি; আমাদের রাজ্যের অল্প সংখ্যক অধিবাসিগণ ট্যাক্সের জ্বালায় বিব্রত নহে; আমরা আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজাগণের নিকট হইতে তাহাদের উপার্জ্জনের অংশ, রাজস্ব-স্বরূপ (Income tax) গ্রহণ করি না;—তাহাদের আপদ্ বিপদ্ সহায় সম্পত্তি, সমস্তই আমাদের উপর নির্ভর করে এবং সম্পূর্ণরূপে তাহারা আমাদের মুখাপেক্ষী। আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, শত শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার ও অপমান সহ্য করিয়া, যৎসামান্য উপার্জ্জন করি, তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজাবৃন্দের মুখে দুই বেলা, অন্ততঃ এক বেলাও দু'টি অন্ন দিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি এবং সাধ্যমতে তাহাদিগকে সুখে রাখিয়া অন্তরে বিমল আনন্দ অনুভব করি। আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত ও নিপীড়িত হইয়া, আমাদের স্ব স্ব রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রজাগণের প্রফুল্ল মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিলেই, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই এবং আমরা যখন আমাদের রাজ-কর্ম্মচারী ও অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করি, আমাদের অন্তর তখন অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়।

অতএব হে ইংরাজ-রাজ! আমরা অনুনয় করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা কর,—অব্যাহতি দাও। আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অপহরণ করিও না; আমাদিগকে এ রাজ্য-ভোগ হইতে বঞ্চিত করিও না, আমাদের অন্তর হইতে এই বিমল আনন্দ অন্তর্হিত করিও না। এরূপ অসঙ্গত জঘন্য আইন বিধিবদ্ধ করিও না।

শ্রীকালিদাস মিত্র।

সর্প ও ভেকগণ।

গত হ'ল বহুদিন, নবদ্বীপে—বলহীন
—মহাকায়, বৃদ্ধ এক ফণী—
পেটে পেটে ধরি ছল, পুষ্করিণী-পাড়ে থল,
রহে যেন, মরিবে এখনি!
পাশ দিয়া ভেক যায়, দেখেও না দেখে তায়,
রুচি যেন নাহি আহারেতে;
তাই দেখে হরিগণে, ভরসা পাইয়া মনে,
দল বেঁধে, আসে নিকটেতে।

বলে,"ভাই! কি কারণে, শুয়ে হেথা অনশনে?
খাদ্য প্রতি নাহি অনুরাগ;
মলিন বদন কেন? মনে সুখ নাহি যেন!"
শুনি কয়, দুষ্ট সেই নাগ;—
"জিজ্ঞাসিলে যদি সবে, প্রিয়গণ! বলি তবে,
মনোযোগে শুনহ কারণ—
আজ ভোরে উঠে আমি, হইয়া আহারকামী,
নানা স্থানে করি পর্য্যটন।

শুন কিবা ঘটিলেক, চোখে পড়ে এক ভেক ;
তেড়ে তারে যাইনু ধরিতে ;
প্রাণ-ভয়ে সেই হরি, পলাইল শীঘ্র করি,
আর নাহি পাইনু দেখিতে।
ভাসিয়া বিষাদ-নীরে, ফিরিতেছি নতশিরে ;
দেখি কোন দ্বিজের নন্দনে ;
নাহি তার অপরাধ, 'কাম্‌ড়া'তে গেল সাধ,
মোলো দ্বিজ আমার দংশনে।
ভেক প্রতি যত কোপ গেল,দ্বিজে মারি চোপ ;
তার পরে শুন ভাই ! সবে ;
পুত্র-শোকে পেয়ে তাপ,বিপ্র-পিতা দিল শাপ,—
'ভেকের বাহক হ'য়ে রবে।'
শুনিয়া বিপ্রের কথা, অন্তরে পাইয়া ব্যথা,
আসিলাম 'বাহক' হইতে ;
তোমাদের আজ্ঞাধীন, রহিব হে চিরদিন ;
মাথে চড় পুলকিত চিতে।"
শুনিয়া সর্পের সাজা, আনন্দিত ভেক-রাজা,
বলে, "তবে চল মোরে নিয়ে।"
ছল ক'রে হ'ল ফল, পুলকিত সর্প খল,
লইলেক ফণাতে তুলিয়ে।
মন্ত্রী-আদি ভেক যারা, পৃষ্ঠোপরি চড়ে তারা ;
—স্থানাভাবে কেহ পিছু ধায় ;
কেহ গড়াইয়া পড়ে, ছুটে অন্যজন চড়ে,
এইরূপে সকলেতে যায়।
দেখিয়ে অহির গতি, ভেক-রাজা তুষ্ট অতি,
প্রশংসা করিছে দশমুখে,—
"চড়িয়াছি অশ্বে,গজে,তাতে কি হে মন মজে?
সর্প-মাথে যাই মহাসুখে !"
দিন গেল এইরূপে ; সন্ধ্যা দেখি, ভেক-ভূপে
কহিতেছে ভুজঙ্গ তখন,—
"সন্ধ্যা হ'ল, নৃপবর ! আজি ছাড় যাই ঘর,
কল্য আসি জুড়াইব মন।"
রাজার বচনে তবে, সর্প হ'তে হরি সবে,
একে একে পড়ে লাফ দিয়া ;
সর্প গেল নিজ স্থানে, ভেকেরা পুকুর-পানে
যায়, তবে, বিদায় হইয়া।
যামিনী পোহা'য়ে গেল, প্রভাতে পন্নগ এল ;
মুখ চেয়ে ছিল হরিগণ—
রাজার সহিত সবে, নাগ-পৃষ্ঠে উঠে তবে,
সকলেরি হর্ষ-পূর্ণ মন।
ভুজঙ্গ দারুণ খল, তখন, করিয়া ছল,
ঢিমে চালে চলিতে লাগিল ;
ভেক-পতি তা দেখিয়া, সর্পে কহে সম্ভাষিয়া,
—"আজ কেন এরূপ হইল ?
কল্য দেখে খর গতি, হ'য়েছিনু তুষ্ট অতি,
সেইরূপ চল পুনঃ আজ।"
সর্প বলে, "শক্তি নাই, চলিতে অক্ষম তাই,
অনাহারে আছি, মহারাজ !"
শুনিয়া ফণীর বাণী, সত্য মনে অনুমানি,
মণ্ডূক খাইতে তারে দিল ;
এইরূপে রোজ রোজ, চেষ্টা বিনা পায় ভোজ,
সুখে সর্প থাকিতে লাগিল।
ক্রমে ক্রমে ভেক যত, চক্ষুঃশ্রবা করে হত ;
—অবশেষ খাইল রাজারে !
ভেকেরা নির্ব্বোধ ভারি,সাপে ভাবি হিতকারী,
ফল পেলে কার্য্য-অনুসারে।
করিয়া কিরূপ ছল, কার্য্য সাধি লয় খল,
সকলেতে কর দরশন ;
খলের সমান, ভাই ! ধরাধামে শত্রু নাই,
শঠ-সঙ্গ,—অনর্থ কারণ।
'শত্রু' বলি জানি যারে, বিশ্বাস করিলে তারে,
এইরূপ দশা হয়, ভাই !
বিস্তারিয়া কব কত, ধরাধামে শত শত
ঘটিতেছে—সন্দেহ ত নাই।
মিত্র হ'য়ে শত্রু এল, তখনই বুঝা গেল,—
মনে দুষ্ট অভিসন্ধি আছে ;

শত্রুতায় নাহি পারে, মিত্র সেজে নাশিবারে,
হাস্যমুখে দেখা দিল কাছে।
শত্রু-বাক্যে ভুলে যেই, অতিশয় মূর্খ সেই,
তারি হাতে মারা সেই যায়;
'বিজ্ঞ' ব'লে তাঁরে মানি, আগে বুঝি লাভ, হানি,
কার্য্য যিনি, করেন ধরায়।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

সংবাদ।

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায়, বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদের যেরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গালা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা পরীক্ষার্থী বালক-নিপাতের এক অমোঘ অস্ত্র; এজন্য অনেকেই বালকদিগের সর্ব্বনাশ-আশঙ্কায় দুঃখিত। কিন্তু দুঃখিত হইবার কারণ কিছুই দেখিতে পাই না; কেন না, 'সিণ্ডিকেটে' সকল প্রকার বিদ্যাই বর্ত্তমান—বালক-নিপাত বিদ্যাটা আর নূতন নহে। বরং, আহ্লাদের বিষয় এই যে, এবার সংস্কৃতে—পণ্ডিত সাহেব টনি, সিণ্ডিকেটে সাহেবী-বাঙ্গালার অভাব মোচন ও সিণ্ডিকেটের গৌরব বর্দ্ধন জন্যই, পরীক্ষক হইয়া বাঙ্গালা লিখিলেন,—"শৃগাল বড় গ্রাহক ও ঈর্ষ্যাপরবশ"—ইত্যাদি। সাহেব কষ্ট করিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছেন—এমন কি পরীক্ষক হইয়াছেন—ইহা ভাগ্য করিয়া না মানিয়া আবার অনুতাপ! এই জন্যই ত দেশের উন্নতি নাই!

*

* *

'সিণ্ডিকেটে' পণ্ডিত-মণ্ডলীর অভাব নাই, তাঁহাদের দ্বারাই বা উক্ত সাহেবী-বাঙ্গালা সংশোধিত হয় নাই কেন? ইহাই আশ্চর্য্য! সাহেবের বাঙ্গালা যে, ঐরূপ হইবে, তাহা কিছু আর আশ্চর্য্য নহে। আমরা শুনিয়াছিলাম,—এক জন সাহেব অতিশয় বাঙ্গালা ভাষা-প্রিয় ছিলেন। তিনি সখ্ করিয়া বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় কথা কহিবেন বলিয়া, একজন বাঙ্গালী ভৃত্যও রাখিয়াছিলেন। এক দিন, প্রত্যুষে সাহেব সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"রামকনাই! একটি গধ্বা লইয়া আগমন কর।" রামকানাই চতুর লোক, তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ রজকের বাটী হইতে একটি ভারবাহী গর্দ্দভ আনিয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিল। সাহেব গর্দ্দভ দেখিয়া বলিলেন,—"রামকনাই! টুমি হামার স্বরূপ গর্ডভ লইয়া আগমন করিলে কেন? মেম্-সাহেব সড়ৃস গধ্বা লইয়া আইস; হামার বৎস ডুগ্ঢ় পান করিবে।" রামকানাইএর চক্ষু স্থির!!

*

* *

যত গোল 'প্রবেশিকায়'! পূর্ব্বে সুদূরদর্শী সিণ্ডিকেট নিয়ম করিয়াছিলেন যে,—"বালকগণ ১৬ বৎসরের না হইলে, শিক্ষিত হইলেও, প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না।" আর আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিতেছেন যে,—"বালিকাগণ

ঋতুমতী হইলেও,পূর্ণ বার বৎসরের না হইলে, সংসারে প্রবেশ বা স্বামী-ঘর করিতে পারিবে না।" সিণ্ডিকেটের মস্তক, পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরিপূর্ণ ছিল না বলিয়া, ১৬ বৎসর বা ১৬ বৎসরের পর, যাহারা পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইত,তাহারা পরীক্ষা দিতে পাইত। ১৬ বৎসর হইলেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, এরূপ নিয়ম হয় নাই, কিন্তু, আমাদের গবর্ণমেণ্টের মস্তক সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় পূর্ণ; তাই, তাঁহার চক্ষে পুরুষ-সহবাসে অনুপযুক্তা —অপুষ্পিতা ১৩ বৎসরের বালিকা-সহবাসে দোষ নাই। কিন্তু পুষ্পিতা পুংসহবাসে সমর্থা অসম্পূর্ণ ১২ বৎসর বয়স্কা,এমন কি ১১ বৎসর ১১ মাস,২৯ দিন, ২৩ ঘণ্টা, ৫৯ মিনিট, ৫৯ সেকেণ্ড বয়স্কা স্ত্রী-গমনে,পুরুষের একেবারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ব্যবস্থা! প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ এমন সর্ব্বনেশে আইন কেহ কখন কোন দেশে কোন সমাজে আছে, শুনিয়াছেন কি? গবর্ণমেণ্ট এই আইনের বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন, তাই ইহার বিরুদ্ধে সভা-সমিতি হইতেছে, আপত্তি হইতেছে, পরিণাম ও কুফল দেখান হইতেছে। কিন্তু, তুমি আমি যদি এ কথা উত্থাপন করিতাম, তাহা হইলে, এত দিনে উন্মাদ-আশ্রমে আমাদের বাসস্থান স্থিরীকৃত হইত, সন্দেহ নাই! ধন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা!!

*

* *

CRITICISMS ON THE AGE OF CONSENT BILL:—By Kissory Nath Mittra, Calcutta, 1891.

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে ইংরাজী ভাষায় 'সহবাস-সম্মতি'র আইনের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও ব্যাখ্যা সহ তাহার উত্তর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

ধন্বন্তরী আর সি চান্দ্রার অভিমত, মিঃ মনোমোহন ঘোষের আইনের দ্বারা পরিচালিত কুটিল-মস্তিষ্ক প্রসূত জটিল ও কৌতুকাবহ প্রস্তাব,বিদ্যা-দিগ্‌গজ উইলসন সাহেবের প্রমাণ প্রয়োগ এবং সহসোত্থিত, সংস্কারক "সেন বাবু"র আত্মম্ভরীতারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে গ্রন্থকারের স্বধর্ম্মানুরাগ ও কুলাচার-প্রিয়তা দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম।—পুস্তক খানি বিনা মূল্যে বিতরিত।

* *

*

এলাহাবাদে সিরসোয়ান বিভাগে এক পুষ্করিণীতে একটি সদ্য-জাত শিশুর মৃত-দেহ পাওয়া যায়। ধর্ম্মাবতার পুলিষ এই ভ্রূণ-হত্যারূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতারণার বিষয় অবগত হইয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সাজগোজ করিয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাত্মাগণের পক্ষে, কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রকৃত অনুসন্ধান করা সর্ব্বাংশে অনুচিত বিবেচনায়, তাঁহারা একটি নিরপরাধিনী রমণীকে গ্রেপ্তার করিয়া 'ভ্রূণ-হত্যা কারিণী' বলিয়া হাজির করিলেন। দেশীয় ধাত্রীদিগের দ্বারা তাহাকে উল্টে পাল্টে আষ্টে পৃষ্টে বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষা করান হইল —কিন্তু কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া গেল না। যাহা হউক পুলিষ পেছ্‌পাও হইবার নহেন,—তাঁহাদের তাল সহজে ফস্কায় না। তাঁহারা উক্ত রমণীকে হাজতে রাখিয়া, নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"যদি সে আপনাকে 'ভ্রূণ-হত্যা

ব্যারিণী" বলিয়া স্বীকার না করে, তাহা হইলে ষণ্ডামার্ক পুরুষ ডাক্তারদিগের দ্বারা, তাহাকে পরীক্ষা করান হইবে।" রমণীর প্রতি এতাবৎকাল ধরিয়া যে সকল অত্যাচার করা হইয়াছিল, সে সমস্তই অবাধে সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু পুরুষ ডাক্তার দ্বারা পরিক্ষিত হইতে হইবে শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না, লজ্জার খাতিরে আপনাকে দোষী বলিয়া স্বীকার করিল এবং আদালতেও পুলিষ মহাশয়ের পরামর্শানুসারে জবানবন্দী দিল। বিচারনিধান তাঁহার প্রতি ৩ মাস কারাদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। হতভাগিনী কারাগারে নিক্ষিপ্তা হইল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কলিকালে ধর্ম্ম কি একেবারেই গিয়াছে? তাহা না হইলে আর ধার্ম্মিক, ন্যায়বান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিষ মহোদয়ের এরূপ শীর্ষ স্থানীয় ও আদর্শস্বরূপ সুমহৎকার্য্যে কুফল ফলিবে কেন? হতভাগিনী এক মাস মেয়াদ খাটিবার পর প্রকাশ পাইল যে, সে পুর্ণ গর্ভবতী! অগত্যা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং সে কারানিক্রান্তা হইবার অষ্টাহ পরে, একটি চাঁদপানা সন্তান প্রসব করিল!!

হায়! ইহাতেও কি গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইবেনা? সহজেই এতদূর, ইহার উপর আবার **সহবাস-সম্মতির আইন** !!!

*

* *

আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত ঘটনা! কখন দেখি নাই, শুনিও নাই! গত ১৪ই ফাল্গুন, জন কতক অধঃপতন ভেতো কালা বাঙ্গালী ঘোড়-দৌড়ের মাঠে দৌড়া দৌড়ি গিয়া উপস্থিত হয়! ব্যাপার খানা কি? মানুষ-দৌড় নাকি? না—না—সভা—সভা—'সহবাস সম্মতি'র আইনের বিরুদ্ধে সভা। হা অদৃষ্ট! যে বাঙ্গালীর মধ্যে ২।৪ জনের ঐক্য হয় না—যাহারা আন্দোলনের ধার দিয়াও যায় না,—যে বাঙ্গালী "ভাত খাই কাঁসি বাজাই," এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের আবার সভা! তাহারা আবার মুসলমান, শিখ্, মারওয়ারি, পঞ্জাবী প্রভৃতী ভারতবাসীদিগকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সভা করিতেছে! আর এ সভার ফলই বা কি? গবর্ণমেণ্টের ইহাতে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক করেনা, কারণ ইহা কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া লোকের সভা,—বিশেষতঃ এই সভায় মোটে ২ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল এবং বিস্তৃত ময়দান ব্যতিত অন্য কোথাও ইহার অধিবেশন-স্থান সঙ্কুলন হয় নাই। এই অসংখ্য পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ নগণ্য জাতি যে, তাহাদের ধর্ম্মের জন্য, সমাজ রক্ষার জন্য, স্ব স্ব পরিবারের মান সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য, কাতর কণ্ঠে "আইন চাই না, আইন চাই না", বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিতেছে, তাহাতে প্রজারক্ষক গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া কি উচিত? প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করা যাঁহাদের সভ্যতার চরম সীমা এবং সেই জন্যই যাঁহাদের বিড়ালাক্ষী সতীলক্ষ্মীরা বিকৃত স্বরে (affected tone) পরপুরুষের সহিত প্রেমালাপ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃতিপ্রণালী-পরিচালিত ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ, অসভ্য ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুর যুক্তি, ন্যায়সঙ্গত হইবে কেন? বিলাতি সোণার (chemical gold) সহিত কাচেরই সমাবেশ হইয়া থাকে, হীরক তাহার কাছে কোন ছার!!

১ম খণ্ড।]　　　　চৈত্র।　　　　[১২শ সংখ্যা।

সুবোধিনী।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)।

শ্রীকালিদাস মিত্র সম্পাদিত।

ও

কলিকাতা, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ৩২ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

"শীতলে শারদ-শশী সুধা বরষিয়া,
গরজিয়া অজগর উগরে গরল ;
স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া,
অধম নিন্দুকে নিন্দা করয়ে কেবল।"

[তাপস-বনিতা।

কলিকাতা।

৩নং বীডন্ স্কোয়ার, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"
শ্রীবিহারীলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য—তিন আনা।

বসন্তসমাগমে।

একি গো প্রকৃতি রাণি! সহসা একি গো হেরি,
আলোময় দশদিশি র'য়েছে উজ্জল করি?
সহসা এ ভাব কেন গো?
বিমল বদনে তব—ভাবের কুসুম-রাশি,
কোমল অধর প্রান্তে ফুটিছে প্রেমের হাসি,
প্রসন্ন বদন কেন গো?
এত শোভা—এত হাসি,—কেন এত ফুলসাজ!
কেন রাণি! আসিছে কি প্রাণেশ বসন্তরাজ?

তাই কি গো উষা আসি সুধীরে তোমার
ঘুচাইলা—ঘোমটার বাস?
মুছাইলা ধীরে ধীরে নয়ন আসার,
দিয়ে নিজ অঞ্চলের পাশ;
'আসিছে প্রকৃতি রাণি। প্রাণেশ তোমার,'
—শুনাইলা আশ্বাস বচনে;
তাই কি নলিন-আঁখি মেলি চারি ধার,
হেরিতেছ—আনত আননে!

রঞ্জিত মেঘের কোলে,—তরুণ অরুণ দোলে,
কুসুমের রেণু মাখি—কুসুমের পরিমলে
অলিকুল মত্ত কেন আজ?
হরিত বসনে মরি কিবা সুচিকণ কাজ!
সেজেছে প্রকৃতি রাণী—এসেছে বসন্তরাজ।

ওই শোন,—ওই শোন, কুহরে কোকিল,
—কুহুকুহু রবে—
সহকার-শাখে বসি লুকাইয়া কায়,
নবীন পল্লবে!
[illegible] [illegible] তার—ছোটে চারি ধার,
[illegible] আকুল।

কেন রাণি। কাঁপে তব হৃদয়-সরসী
মলয়ে মৃদুল?

সুরভি সমীর বয়, স্নেহময় কিশলয়,
আবেশে ঘুমায় সুখে—শব্দহীন দশ দিশ,
বিমুক্ত বিমানে ভাসে শ্যামার সরস শিস;
চমকে উথলে ধায় নদীর হিল্লোল,
উল্লাসে মাতিয়া গায় তুলিয়া কল্লোল!
সৈকত-পুলিন'পরে
ঝরিছে পবন-ভরে,
পুলকে বকুলবালা হইয়া আকুল;
পেতেছে ফুলের কিবা আসন অতুল!
বাহু ধরি পরস্পরে
বিলোল বল্লরী ডোরে
বেঁধেছে শ্যামল কিবা সাধের নিকুঞ্জবন,
এসেছে বসন্তরাজ—প্রকৃতির প্রাণ ধন।

নিরাশ হৃদয় তব ছিল সুখশান্তিহীন;
এসেছে বসন্ত, রাণি! তোমার সুখের দিন;
এসেছে প্রাণেশ তব; ছিলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
আজিকে সৌভাগ্যবলে মৃতদেহে পেলে প্রাণ,
দুর্ব্বহ বিরহানলে,
এতদিন ছিলে জ্বলে,
তাই ব'লে যেন আর ক'রনাক অভিমান!

জান ত সকলি রাণি! তুমি চির অভাগিনী,
তুমি চির-বিরহিনী—ছিলে হ'য়ে অনাথিনী,
হায় এত কাল!
যখন ভাগ্যের জোরে, পাইয়াছ প্রাণেশ্বরে,

যখন সৌভাগ্যবলে, তোমার পুণ্যের ফলে,
ঘুচেছে জঞ্জাল!
তখন, তখন আর বৃথা অভিমান ক'রে,
দিওনা, দিওনা ব্যথা দিওনাক প্রাণেশ্বরে।

তুমি রাণি! সাধ্বী সতী পড়িয়ে চরণে তাঁর,
কহিও কাতর স্বরে—তব দুঃখ সমাচার।
ব'ল, "অধিনীরে আর যেওনা যেওনা ফেলে,
তা হ'লে দহিতে হ'বে নিদাঘ বিরহানলে।
নাথ! তুমি চলে গেলে শুখাইবে ফুলবাস,
প্রবল ঝটিকা সম বহিবে দুঃখের শ্বাস।
তোমার বিরহে নাথ! জলেছি নিদাঘকালে,
ভাসিত হৃদয় মম বরষা নয়ন-জলে।
ভয়ে চমকিত প্রাণ—
বিষম বিদ্যুৎ-বাণ
বিদীর্ণ করিত হিয়া—করিতাম হাহাকার;
অজস্র অশনি শিরে সহিয়াছি শতবার!
নিবিড় নীরদ-জালে আবরিত চারি ধার,
আমারে গ্রাসিত আসি ঘোরতর অন্ধকার।
তথাপি, হৃদয়ে হ'ত আশার সঞ্চার মোর,
ভাবিতাম দিবানিশি হইয়া ভাবনা ভোর;
ভাবিয়া তোমায় নাথ! যেতাম সকলি ভুলে,
হেরিতাম মূর্ত্তি তব হৃদয়-কপাট খুলে;
অলক্ষে বদনে মোর ফুটিত মৃদুল হাসি;
ভ্রুকুটি করিত কত হাসিয়া শরত-শশী!
চাঁদের ভ্রুকুটি হেরে,
যেতাম মরমে ম'রে,
—ভাবিতাম আর বুঝি পাব না তোমায়!
কুহেলিকা-বাস পরে
হেমন্ত তুহিন-নীরে
ভাসিত নয়ন মোর—ভাসিত হৃদয়—
কুহেলিকা-বাসে শেষে ঢাকিয়া বয়ান,
তোমার বিরহে নাথ! হইতাম ম্রিয়মান!!

যেমন পোহা'ত নিশি,
প্রিয়সখী—উষা আসি
হেরিয়া মলিন মোরে ফেলিত নিশ্বাস—
জুড়া'ত হৃদয়, দিয়ে কতই আশ্বাস।
সে আশ্বাসে হ'ত হৃদে আশার সঞ্চার!
ভাবিতাম পাব নাথ তোমায় আবার;
তাই হ'য়ে রাজরাণী
সেজেছিনু সন্ন্যাসিনী;
তোমার বিরহে নাথ! তোমার কারণ
সঙ্কুচিত শীতকালে
ত্রিপুণ্ড্র-অঙ্কিত ভালে
গাঁদার গেরুয়া-বাসে তনু আবরণ—
করিয়া, তোমার তরে
রেখেছি এ প্রাণ ধরে
তোমার বিহনে নাথ! তোমার কারণে—
অধিনীরে আর যেন ঠেল না চরণে।"

কোমল কোরক কিবা,—কানন কুসুম শোভা!
অস্তমিত তপনের উজ্জল রক্তিম আভা,—
পশ্চিমে পড়েছে খসি সোণার আঁচল;
বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি বিহ্বল!

একি গো, একি গো হেরি, একি গো আবার,
এ কেমন বেশ?
বিনোদ কবরী বেঁধে
প'রেছ মনের সাধে
নক্ষত্র প্রসূন-রাজি—শোভার আধার,—
এমনি আবেশ!
ধরে না ধরে না রাণি! অধরে কৌমুদীহাসি,
কোথাছিল এত রূপ—এত প্রেম-শোভারাশি?
বসন্তের প্রেম-পূর্ণ চুম্বনে চমকে প্রাণ,
কোথা রাণি! কোথা তব লাজ-মাখা সে বয়ান?
প্রেমের নয়নে লাজ থাকিতে কি পারে আর!

কটাক্ষে উথলে উঠে প্রেমপূর্ণ পারাবার।

থাকিয়া থাকিয়া গাহিছে পাপিয়া
—প্রণয়-সঙ্গীত;
সে গান শুনিয়া,
প্রকৃতির হিয়া, উঠে শিহরিয়া,
হ'য়ে পুলকিত।
পেয়েছে প্রকৃতি রাণী—প্রাণেশের ভালবাসা,
—কোমল পরশ!
সচুম্বন প্রেম গানে, পুরেছে প্রাণের আশা
শরীর—অলস।

বসন্তের আলিঙ্গন—প্রণয়-সম্ভাষ,
উল্লাসে অবশ রাণী—এলোথেলো বাস!

মাধবের ফুলবাস—সুরভি নিশ্বাস,
মাধবের মাতোয়ারা—মলয়-বাতাস;
মাধবের প্রেম-পূর্ণ—পাপিয়ার বন-গান,
আকুল ক'রেছে হৃদি বিভোর ক'রেছে প্রাণ!

শোন গো প্রকৃতি রাণি! কি হ'বে উন্মত্ত হ'লে?
পরাও—প্রেমের ফাঁস বসন্ত-রাজের গলে।

শ্রীরসময় লাহা।

অন্তিম-মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিথ্যাপবাদ।

অভয় শিরোমণি মহাশয় গণনা করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ভূতের উৎপাত কিছু মাত্র কমিল না। অনেকে মনে করিয়াছিলেন,—বামুন ঠাকুর এই যে গণনা করিয়া গেলেন, ইহাতেই উৎপাত কমিবে; কিন্তু গণনায় উৎপাত কমিবে, ইহারই বা কারণ কি? শিরোমণি মহাশয় ত আর 'ওঝা' নহেন।

একদা, গভীর রজনীতে ছাদের উপর পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্যামার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্যামা নিতান্ত ভীত হইয়া,শয্যামধ্যে সহচরীর অন্বেষণ করিতে লাগিল; ইচ্ছা—সহচরীকে আলিঙ্গন করিয়া কথাবার্ত্তায় কোন প্রকারে ভয় দূর করিবে। কিন্তু সহচরী শয্যামধ্যে নাই। শ্যামা মনে করিল—সহচরী এখনই আসিবেন। ব্যগ্রতা-নিবন্ধন অল্প সময়ও অধিক বোধ হইতে লাগিল। মনে দারুণ ক্রোধ উপস্থিত হইল, এবং সহচরীর চরিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, মনে মনে নানা প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিল। শ্যামা মনে করিল,—"সহচরী নিত্য এইরূপ উঠিয়া যায়। এ সকল উৎপাত ভূতের নহে,—সহচরীই কোন ভৃত্যের সহিত অলক্ষিতভাবে ছাদের উপর গিয়া পদ-চারণ করে, এবং সেই জন্যই প্রত্যহ রাত্রে দ্বার খুলিবার শব্দ পাওয়া যায়। যাহা হউক, কপট নিদ্রায় অভিভূত হইয়া দেখিতে হইবে, সহচরী কখন ফিরিয়া আইসে। সহচরীর চরিত্র-বিষয়ে কোন প্রকার কলঙ্ক প্রকাশ করিতে পারিলেই, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।" এই ভাবিয়া শ্যামা অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে আবার আতঙ্ক-প্রযুক্ত মশারির বাহিরে গিয়া প্রদীপ জ্বালিতেও সাহস হইল না।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতীত হইলে, গৃহ-দ্বার খুলিয়া গেল,—সহচরী ফিরিয়া আসিলেন। শ্যামা নিদ্রিতা কি জাগরিতা, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, সহচরী যেরূপ প্রত্যহ তাহাকে মৃদুস্বরে ডাকিয়া থাকেন, অদ্যও সেইরূপ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সই! জেগে?"—উত্তর নাই। সহচরী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সই! ভূতের ভয়ে ঘুমিয়ে কাদা হ'য়েছ যে?"—তথাপি উত্তর নাই। সহচরী ভাবিলেন—আর কাজ নাই আস্তে আস্তে শয়ন করা যাউক।

সহচরী শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। শ্যামা ভাবিল,—"সমস্ত দেশটা ভূতের ভয়ে কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু সহচরীর ভয় নাই! সহচরী তবে কেমন চরিত্রের স্ত্রীলোক? এই অন্ধকার রাত্রে, আর এই ভয়ের সময় সহচরী এতক্ষণ কোথায় ছিল? যাহা হউক, প্রাতে উঠিয়া এই সকল কথা শারদা সুন্দরীকে জানাইতে হইবে, এবং যাহাতে সহচরীর উপর তাঁহার বিষদৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে,—ভগবান্ ভাল সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শ্যামার নিদ্রাকর্ষণ হইল—দুইটি বিভিন্ন হৃদয় এক শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। সহচরি! তুমি জানিতেছ না যে,—"ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ প্রীতি র্বিপত্তেঃ কারণং মতং।"

রজনী প্রভাত হইলে, উভয়েই প্রায় এক সঙ্গে গাত্রোত্থান করিল। রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সহচরী ক্ষণকাল বিমর্ষভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্যামা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—"সই! মন আমার অত্যন্ত উতলা হ'য়েছে, তোমরা যেন আমার কাছে কেহই নাই, আর আমি যেন একটা প্রকাণ্ড মাঠে একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—আর, গিরিবালা যেন আমার দুঃখ দেখিয়া টীট্‌কারী দিতেছে। তা—সই! তাই হবে না কি? কি জানি পোড়া বিধাতা ভাগ্যে কি লিখেছে!"

শ্যামা। সই! ও সব কিছু নয়,—আমিও অমন কত স্বপ্ন দেখে থাকি; তা সে সব সত্যি হয় কৈ?

সহ। তবে সই! তোমার কথা শুনে ও সব মন থেকে পুঁছে ফেলি?

শ্যামা। হ্যাঁ।

সহ। একটু বসো না সই! দুটো একটা মনের কথা কই।

শ্যামা। হ্যাঁ, ঠিক সময় বটে! তুমি রঙ্গ নিয়েই আছ,—আমার ত আর ওসব পোষা'বে না।

সহ। তোমার কি পোষা'বে?

শ্যামা। আজ আমার অনেক কাজ আছে, যাই ভাই!—এখনি আবার বকুনি খেতে হবে। আমাকে বকুনি খাইয়ে ত তোমার আশ মেটে না। আচ্ছা সই! আমাকে বকুনি খাওয়া'তে কি তুমি এতই ভাল বাস?

সহ। সে কি সই! তোমায় আমি বকুনি খাওয়া'ব,—তা কি হতে পারে? তুমি হ'লে আমার **প্রাণের সই!** বকুনি খেয়ে তোমার মুখখানি কেমন দেখায়, তাই দেখ্‌ব ব'লেই তোমায় বকুনি খাওয়াই।

শ্যামা। সেও বড় মন্দ কথা নয়। 'কারও সর্ব্বনাশ—কারও পৌষমাস।' তা সই! বকুনি খেয়ে আমায় কেমন দেখায়?

সহ। ঠিক যেন—'অমাবস্যার চাঁদ'।

শ্যামা। 'পূর্ণিমা'র নয়?

সহ। সে কি এত ভাল? তাতে যে কলঙ্ক আছে, সই!

শ্যামা। ওঃ—এতও জান!

সহ। তা দেখ সই! ভাল যাকে বাসা যায়, তার কাছে সব আবদারই খাটে। কিন্তু, যা বল সই! তোমায় ভাল বাসি কি না বাসি, তা ত আমি জানি না, ভগবানই সেটা বল্‌তে পারেন; কিন্তু তোমায় না দেখে ত এক দণ্ডও থাক্‌তে পারিনে।

শ্যামা। জগতের খেলাই ঐ। আমি ত বলি,—ভালবাসার চেয়ে না বাসাই ভাল। ভালবাসা লোকে একটি শক্ত কথা কইলে, মর্ম্মান্তিক হ'য়ে উঠে, অপর লোকে যতই বলুগ্‌ না কেন, গায়েই মাখেনে।

সহ। এটি বড় ঠিক কথা ক'য়েছ, সই!

শ্যামা। যাই ভাই! আপনার কাজকর্ম্ম দেখি গে, বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে আর কি হবে? তুমি এদিক্‌কার সব সারো সোরো।

রাত্রের কথা সমস্তই শ্যামার মনে আছে। সহচরীকে সে সকলের বিন্দু বিসর্গও জানিতে দিল না।

ঈর্ষা! তুমি সকলই করিতে পার, তোমার সর্ব্বনাশিনা শক্তির গতিরোধ করা বড়ই কঠিন! মনুষ্য তোমার বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় ক্ষতি-বৃদ্ধি-বিষয়েও অন্ধ হইয়া পড়ে। তুমি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে সকল হৃদয়েই বাস করিতেছ। যিনি তোমার পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন, তিনিই অধঃপাতে গেলেন। তোমাকে যিনি দমন করিতে পারিলেন, তিনিই পরম সুখী। তুমি মনুষ্য-জীবনে অসন্তোষ-স্রোত প্রবাহিত করিবার নিমিত্তই জগতে বাস করিতেছ! তুমি ধনীর ধন-নাশ, সুখীর সুখ-নাশ ও মহারাজাধিরাজকেও পথের ভিখারী করিতে পার! ধন্য তুমি,—ধন্য তোমার পরাক্রম!!

কালক্ষয়ে কার্য্য হানি, বিবেচনায় শ্যামা মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব না করিয়া, শারদা সুন্দরীর নিকট গমন করিল। অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত কবাটের অন্তরাল হইতে দেখিতে পাইল—শারদা-সুন্দরী নিদ্রিত স্বামীর পদ-সেবা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, প্রতাপচন্দ্রের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল, তিনি ইষ্ট-দেবতার নাম করিতে লাগিলেন এবং শারদা সুন্দরী বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে শ্যামাকে দেখিয়া শারদা সুন্দরী অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের ন্যায় ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিলো! সকাল বেলাই কি মনে ক'রে?"

শ্যামা। একটা কথা আছে—

শার। কি কথা?

শ্যামা। কথাটা কিছু গুরুতর।

শার। যাই হোক্‌, বলতে যখন এসেছ,—ব'লেই ফেল।

শ্যামা শারদা সুন্দরীর কানে কানে সমস্তই বলিল। শারদা সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন ক'রে জান্‌তে পারলে?"

শ্যামা। কাল রাত্রি দুপুরের পর, তাকে এক ঘণ্টা বিছানায় দেখ্‌তে পাই নাই।

শার। সকালে উঠে তোমায় কিছু বল্লে?

শ্যামা। অনেক কথা হ'ল বটে, কিন্তু ও কথার নাম গন্ধ নাই।

শার। তাই ত—কথাটা যে বড় খারাপ হ'ল; এই ভয়ের সময় রাত্রে কেহ দরজাটি পর্য্যন্ত খুল্‌তে সাহস করে না,—আর সে এক ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এলো!

শ্যামা। ভয় টয় ও কিছু নয়—ওই ছাদের

উপর যায়। ও নেমে আস্‌তে আর ত কিছুই শোনা গেল না। তবেই বুঝুন্ না কেন,—এ সব কে করে।

শার। ঠিক ব'লেছ—না জেনে শুনে জায়গা দিয়ে, কত অসুখ দেখ দেখি?

শ্যামা। তা নয় ত কি? টাকা নষ্ট, কড়ি নষ্ট, ভয়, আতঙ্ক,—অসুখ নয় ত কি?

শার। ভাল; তুমি আপনার কাজে যাও। ঠাকুর-ঘরের কাজ আর কা'কেও দাও গে; আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

শ্যামার মনস্কামনা সিদ্ধির উপায় হইল। সে মহানন্দে আপনার কাজে চলিয়া গেল।

শারদা সুন্দরী প্রতাপচন্দ্রের নিকট সমস্তই নিবেদন করিলেন। প্রতাপচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অবশেষে এই মাত্র বলিলেন,—"ভাল, তাঁকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারিলে, এ বাটীতে থাকিতে পাইবেন না; এ সংসারে ও সকল অপরাধের মার্জ্জনা নাই।" এই বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীর বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, শারদা সুন্দরী সহচরীকে ডাকাইলেন। সহচরী তীরবেগে ছুটিয়া আসিলেন;—শারদাসুন্দরী সহচরীর চক্ষের দিগে ভাল করিয়া তাকাইলেন। যেমন করিয়াই হউক, সহচরী কোন একটি কার্য্য গুপ্তভাবে করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্তে দিন যাপন করিতে হয়। শারদা সুন্দরী তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ দৃষ্টিপাত করায়, তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং মুখ বিবর্ণ হইয়া আসিল। বুদ্ধিমতী শারদা তাঁহার মুখ দেখিয়াই জানিতে পারিলেন—সহচরী অপরাধিনী।

সহচরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমায় ডাক্‌ছেন?"

শার। হাঁ—তোমায় ডেকেছি।—তুমি প্রত্যহ রাত্রে কোথা যাও?

সহচরীর মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া দিব?—ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া শারদা সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চুপ্ ক'রে রইলে যে? তোমায় বল্‌তে হবে কোথা যাও।"

সহ। কৈ মা! আমি ত কোথাও—

শার। সত্যি কথা কইবে, বেশি বক্‌তে পার্‌ব না তোমার সঙ্গে।

সহ। কোথায় আবার যাব? এই বাড়ীতেই ত আছি।

একে শারদা সুন্দরীর ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে, তাহাতে আবার সহচরীর বাক্-চাতুর্য্যে অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—আর তোমায় এ বাড়ীতে থাক্‌তে হবে না—এখন তুমি আপনার পথ দেখ গে।

সহ। কেন মা! আমি কি ক'রেছি?

শার। সে যাই কর, তুমি এখানে থাক্‌তে পাবে না।

সহ। শিরোমণি মশায় গণনা ক'রে গেলেন—

শার। গণনা ক'রে গেছেন—তা কি? দেখি তুমি কত কথা সাজিয়ে বল্‌তে পার?—বল—

সহ। তাই আমি দেখ্‌তে যাই, কথাটা—ঠিক কি না।

শার। কৈ আর ত কেউ দেখ্‌তে যায় না—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? তুমি ভাল লোক নও। তুমি এখনই বাড়ী পরিত্যাগ কর,—তা নইলে অপমান হবে।

এই নিষ্ঠুর বাক্যে সহচরী রোদন করিতে লাগিলেন—কোন কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। দৃঢ়তর সন্দেহ শারদা সুন্দরীর অন্তঃকরণ অধিকার করিল, তিনি একবারেই স্থিরসঙ্কল্প হইলেন—এ পাপ এখনই বিদায় করা ভাল; যখন কুপথগামিনী হইয়াছে, তখন, আর ভাল হইবার নয়। উড়ুক্ষু পক্ষী পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতে ভাল বাসে না। এই ভাবিয়া শারদা সুন্দরী আবার বলিলেন,—"যাও কাঁদ্‌লে আর কি হবে? তোমার এখানে থাকিবার হুকুম নাই।"

সহ। কেন মা! আমি কি ক'রেছি?

শার। তুমি শুধু অপরাধিনী নও,—আবার মিথ্যা কহিতেছ।

সহ। আমার কথা আগে শুনুন—

শার। আমি সাজান কথা শুন্‌তে চাই না।—আজ কাল ব'লে ত নয়, অনেক দিন তুমি এইরূপ ক'রে বেড়াচ্চ।

সহ। কি ক'রে বেড়াচ্চি?

শার। আমি বেশি কথা কইতে পারিনে, তুমি অসতী—এখন শুন্‌লে ত?

এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া সহচরীর দুঃখ-সাগর উথলিয়া উঠিল। নয়ন-যুগল হইতে দ্বিগুণতর বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মনে করিলেন—যে কলঙ্কের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এতদূর স্বীকার করিয়াছি,—যে অবমাননা-ভয়ে ভীত হইয়া, পিতৃতুল্য ঘোষাল মহাশয়ের বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, আজি দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ সেই দুরপণেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতে হইল,—অকারণ সেই অবমাননা সহ্য করিতে হইল!

ফলতঃ, সহচরীর অবস্থা এক্ষণে বড়ই শোচনীয়। পিতা নাই, মাতা, নাই, বন্ধু নাই,—কেহই নাই; স্বামী—বিদেশে, আশ্রয়দাতা নিতান্ত বিমুখ। সহচরীর শোকে, দুঃখে অধীর হইয়া, আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভূতলে উপবেশন করিয়া, মুহুর্মুহু কম্পিতা হইতে লাগিলেন,—কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল। শারদা সুন্দরী তাঁহার সেই ভাব অবলোকন করিয়া, দ্রবীভূতা হইলেন বটে, কিন্তু, সহচরী গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী বলিয়া, অন্তরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। তিনি সহচরীকে সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। সহচরী বলিলেন,—"মা! আমাকে আর দিন কতক এখানে থাকিতে দিন।"

শার। না—এক দণ্ডও তোমায় থাক্‌তে দিতে পারিনে—তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও। তুমি মনে ক'রেছ যে,—যদুনাথ এসে তোমায় ঘরে নেবে? তা মনেও করো না। যদুনাথ কুল-কলঙ্কিনী নিয়ে ঘর কর্‌বে না। সে এমন রীতের লোক নয়। আমরা আবার তার বিবাহ দিব। যদুনাথ যদি তোমায় ঘরে নেয়, তা হইলে সেও এখানে থাক্‌তে পাবে না। এখানে সকল অপরাধের মাপ আছে, এ অপরাধের মাপ নাই। তুমি আর কোথাও আশ্রয় না পাও, যেখানে ছিলে সেই খানেই যাও। আমার ত আর অনিচ্ছা নয়, তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুলের চোপ মার্‌লে, আমি কি করিতে পারি?

সহচরী বিষম বিপাকে পড়িলেন। শারদা সুন্দরীকে কি করিয়া বুঝাইবেন? তিনি একটি কথাও শুনিতে চাহেন না। সত্য কথা কহিতে গেলে, তিনি বলিবেন,—"সাজান কথা"। উপায়ান্তর না দেখিয়া সহচরী স্বীয় মনকে দৃঢ় করিলেন। চতুর্দ্দিকে

বিপদ্রাশি বিকট বদন ব্যাদান করিয়া, তাঁহাকে গ্রাস করিতে লোলুপ হইয়াছে; নৈরাশ্য-পবন খরবেগে 'বহমান' হইতেছে,—চতুর্দ্দিক শূন্যময়,—কোনও দিকে একটু, স্থল কূল নাই যে, তথায় গিয়া আশ্রয় লইবেন। বৃহৎ বৃক্ষ ভগ্ন হইল—কুলায়সহ বিহঙ্গিনী ভূতলে পতিত হইল।

সহচরী আবেগ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"মা! তোমাকে আমি মা ব'লে ঐ চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেম, কিন্তু মা! তুমি আমায় চরণে স্থান দিলে না। আমি কি অপরাধ ক'রেছি বল্‌তে গেলেম, বল্‌তে দিলে না—একটি কথাও কানে পূর্‌লে না, আমি সতী কি অসতী, তা মা! তোমার জান্‌তে বাকি নাই,—আমি নিতান্ত দুর্ভাগা,—তা নইলে মা কখন ও সন্তানকে পায়ে ঠেলে? তবে মা! প্রণাম করি, বিদায় দাও,—জন্মের মত বিদায় দাও। জগতে সহচরী নাম ঘুচে যাক্; আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন এ মুখ দেখা'তে না হয়। কঠিন প্রাণ! এখনও দেহে আছিস্! পাষাণ হৃদয়! ফেটে যাও, আর কেন এ যন্ত্রণা ভোগ কর? সহচরি! তুই যে দুর্ভাগা, তোর কপালে যে, এক তিলও সুখ নাই। বিধাতা তোরে বিমুখ; তুই জোর ক'রে সুখ ভোগ করবি,—তাও কি কখন হ'তে পারে!"

শারদা সুন্দরী নীরব হইয়া রহিলেন। সহচরী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন এবং পশ্চাৎবর্ত্তী দ্বার দিয়া, বাটী পরিত্যাগ করিলেন। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেহ একটি কথাও কহিল না।

অহো কি দুরদৃষ্ট! গ্রহ যখন বিগুণ হয়, তখন আমাদিগের শুভানুধ্যায়ীবন্ধুবর্গও বৈরিভাব ধারণ করে! কথায় আছে,—

"আপদামাপতন্তীনাম হিতোপ্যায়াতি হেতুতাম।
মাতৃজঙ্ঘাহি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে॥"

বিধাতা দুঃখ-রাশি একত্র করিয়া সহচরীকে সৃজন করিয়াছেন। সহচরীর স্বপ্ন পর্য্যন্ত সত্য হইয়া দাঁড়াইল! শ্যামা!—বিশ্বাসঘাতিনি! শব্দভেদী বাণ-প্রয়োগ করিয়া কোথায় লুকাইলে? মর্ম্মাহতা কুরঙ্গিনী, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, একবার আসিয়া নিরীক্ষণ কর। সহচরী তোমার কি করিয়াছিলেন? সহচরী যে, এই মাত্র তোমার সহিত ভালবাসার কথা কহিতেছিলেন। তোমার পাষাণ হৃদয় কি সে সকল মধুমাখা কথায় দ্রবীভূত হয় নাই? এখনও—এখনও আসিয়া বল,—"যাহা বলিয়াছি, সকলই উপহাস"; এখনও, এখনও আসিয়া বল,—"সহচরী অকলঙ্ক ইন্দু"। অবলা বাঁচিয়া যাউক। অনাথিনী এখন কোথায় যায়? স্থান-ভ্রষ্ট—নিরাশ্রয়া—সহচরীকে এখন যে আশ্রয় প্রদান করিবে? যুপকাষ্ঠ-বদ্ধ মেষশাবক যেমন বিশ্বস্তভাবে ঘাতুকের হস্ত লেহন করে, সহচরি! তুমিও সেইরূপে শ্যামাকে বিশ্বাস করিয়াছিলে। শ্যামা! তুমি কাল ভুজঙ্গিনী-রূপে সহচরীকে দংশন করিয়াছ।

শারদা সুন্দরি! তোমার হৃদয়, কুসুম অপেক্ষাও মৃদু হইয়া, এক্ষণে বজ্রাপেক্ষা কঠিন হইল কেন? বুঝিয়াছি,—সহচরীর অদৃষ্ট বড়ই মন্দ—তোমার দোষ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন।

শিব-চতুর্দ্দশী

সর্ব্ব রত্ন-বিভূষিত—কৈলাস-শিখর ;
আহা মরি কিবা তার শোভা মনোহর !
পুষ্প-গন্ধে আমোদিত, নানা শাখি-সুশোভিত ;
স্নিগ্ধছায়া কত দ্রুম করিতেছে শোভা,
কুসুমিতা কত লতা, কিবা মনোলোভা !

মন্দ মন্দ গন্ধবহ, বহে অনুক্ষণ,
সুরভি কুসুম-গন্ধে পুলকিত মন।
শাখী'পরে পাখী সবে, সমধুর কণ্ঠরবে,
শ্রবণ-রঞ্জন,—কিবা সুললিত গায় ;
শুনিয়া কাহার নাহি হৃদয় জুড়ায় ?

মৃগগণে মনোসুখে করে বিচরণ,
হেরিলে, কাহার নহে হরষিত মন ?
মনোহর সিংহাসনে, একদা, প্রফুল্লমনে
বিরাজিত হরগৌরী—মানস-মোহন—
নন্দী, ভৃঙ্গী, করিতেছে চামর ব্যজন।

দেবতা, দানব—কত গন্ধর্ব্ব, চারণে
সমবেত হইয়াছে, চরণ-বন্দনে।
অতিশয় মনোহরা, নাচে—গায় অপ্সরা ;
যোগী, ঋষি, মুনি আদি সিদ্ধগণ কত,
হর-পার্ব্বতীর পাশে সবে সমাগত।

হর প্রতি হৈমবতী কহেন বচন,—
"আপনার কাছে এক, আছে নিবেদন।
যদ্যপি প্রসন্নমতি হন, প্রভো! দাসী প্রতি,
মর্ম্ম-কথা প্রকাশিতে পারি তবে আমি ;"
সে কথায়, সায় দেন, কৈলাসের স্বামী।

শিবা কন, "ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-মূল—
কিসে তুমি তুষ্ট ? কহ, বিবরণ স্থূল।
তপস্যায়, যোগে, ব্রতে, কিম্বা নাথ! অন্যমতে?
প্রকাশিয়া কহ মোরে—করিব শ্রবণ ;"
শিবারে সম্ভাষি কন শঙ্কর তখন ;—

"ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষে, নিশি চতুর্দ্দশী—
উপবাসী-জনে তুষ্ট মোর চিত্ত-শশী।
স্নানে, বস্ত্রে, কিম্বা ধূপে, অর্চ্চনায় সেই রূপে,
নহি তুষ্ট ;—যেইরূপ পূজা-'বিল্বদলে,'
যে পূজায় হৃদি মোর আনন্দেতে গলে।

"ত্রয়োদশী-স্নান-অন্তে পূজা-সমাপন ;
করিবে 'হবিষ্য' করি দিবস যাপন।
আমারে স্মরণ করি, শোবে কুশাসনোপরি ;
রাত্র-শেষে, গাত্রোত্থান যে জন করিয়া,
স্নান করি, বিল্বদলে আমারে পূজিয়া—

"চতুর্দ্দশী,—দিবানিশি,—উপবাসী রবে ;
অহাতে, আমার তুষ্টি-লাভ তার হবে।
থাকে ভাল, শিবালয়, (কিম্বা যদি নাহি রয়)
নদী-কূলে, নিশিতে, যাইয়া ভক্তগণ
করিবে আমার পূজা, হ'য়ে একমন।

"মৃত্তিকায় লিঙ্গ গঠি,—বিল্বে সংস্থাপন;
বিল্ব-পত্র দিয়া পূজা করিবে তখন।
পাইতে আমার প্রেম, পুষ্প, মণি, মুক্তা, হেম,
তুষ্টি-সম্পাদন মোর কিছুতে না হবে ;
এক বিল্ব-পত্রে, কিন্তু, তাহাই সম্ভবে।

"প্রথমে, 'দুগ্ধে'তে স্নান করা'বে আমায়,
'দধি'তে হইবে স্নান—দ্বিতীয় যে বার।
তৃতীয়েতে,—'ঘৃত' দিয়া, 'মধু'তে, চতুর্থ ক্রিয়া ;
মূল-মন্ত্র পাঠ করি যদি ভক্ত পূজে,
অতিশয় প্রীত তারে হই, দশভুজে !

"অভুক্ত ব্রাহ্মণে ডাকি করা'বে ভোজন,
তদন্তে, করিবে সেই আপনি পারণ।
'শিবরাত্র' এই ব্রত,' ইহাতে যে জন রত,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—লাভ তার হয়,
আমার বচন, শিবে! মিথ্যা কভু নয়।

"বারাণসী-বাসী ব্যাধ,—দুরাচার অতি,—
জানিত সুস্বর নামে, সেই পাপমতি।
এক দিন সে নলিয়া, বিজন বিপিনে গিয়া,
অনাহারী—করিতেছে মৃগ-অন্বেষণ,
দিবসান্তে, এক মৃগে করিল নিধন।

"সন্ধ্যা-সমাগমে, সেই, মহাভীত মনে,
মাংস-ভার লয়ে দ্রুত ফিরে নিকেতনে।
নিষাদ বিপদাপন্ন; রজনী—তমসাচ্ছন্ন,
মহা কুহেলিকা-ঘোরে ব্যাপিল গগন,
ব্যাধের হইল তায়, অসাধ্য গমন।

"শ্বাপদ-সঙ্কুল বন; (মনে ভয় বাসি)
বিল্ব-বৃক্ষে উঠে, সেই ব্যাধ—উপবাসী।
চিন্তা,মাংস কোথা রাখে, বুদ্ধি এল, বাঁধি শাখে,
আপনি বৃক্ষের ডালে রহিল বসিয়া,
প্রাতে নামি, নিজালয়ে যাইবে চলিয়া।

"ফাল্গুনের চতুর্দ্দশী—দৈব-সঙ্ঘটন,
বৃষ্টিপ্রায়, নিশায়, নীহার-নিপতন।
মম লিঙ্গ দৈবাধীন, বৃক্ষ-মূলে সমাসীন;
বায়ুর হিল্লোলে সেই বিল্ব-বৃক্ষ নড়ে,
হিম-মৃগরস-যুত পত্র লিঙ্গে পড়ে।

"তিথির মাহাত্ম্যে মোর মহাতুষ্টি হয়,
প্রত্যূষেতে ব্যাধজন যায় নিজালয়;
মাংস রাঁধে ব্যাধ-নারী; হেনকালে,অনাহারী
অতিথি আসিল এক, নিষাদ-ভবন;
সাদরে নিষাদ তারে করায় ভোজন।

"অজ্ঞানেতে ব্যাধজন 'শিবরাত্র' করে,
আমার বরেতে তার সর্ব্ব পাপ হরে।
পরের ঘটনা প্রিয়ে! কহিতেছি বিস্তারিয়ে;
নিষাদের উপস্থিত হয় মৃত্যুকাল,
দূতগণে নিতে তারে পাঠা'লেন কাল।

"শমন-আদেশ তারা করিতে পালন,
নিষাদের নিকটেতে করে আগমন।
মম পদে সেই বন্দী, আগলি' রেখেছে নন্দী;
যম-দূতগণ সহ মহাদ্বন্দ্ব হয়,
নন্দীর উপরে তারা রূঢ় কথা কয়:—

"নরকে করিবে বাস এ পাপী নলিয়া,
তুমি রাখিতেছে কেন আটক করিয়া?
মোরা শমনের দাস, ব্যাধে লব তাঁর পাশ;
নন্দী কহে,—শিব-লোকে যাইবে এ জন,
ব্যাধ-পাপমুক্তি-কথা করায় শ্রবণ।

"শমনের দূতগণ যাইল ফিরিয়া,
মহাসুখে, শিবলোকে গেল সে নলিয়া।
আমার করুণা হেতু,—পার হ'য়ে ভব-সেতু,
ধরাধামে দেখ কেতু তুলিল নিষাদ;
অবশেষ,—স্বর্গ-সুখ করিল আস্বাদ।"

গূঢ় তত্ত্ব শুনি সতী পুলকিত মন—
'শিবরাত্র',—ব্রত-কথা হ'ল সমাপন।
এ কথা শুনিলে পুণ্য, পাপী হয় পাপ-শূন্য,
শিবরাত্র-ব্রত যেই করে আচরণ,
চতুর্ব্বর্গ-ফল লাভ করে সেই জন।

শ্রীরাধাজীবন রায়।

বাইবেল-সমালোচনা।

মন্তব্য।

আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত জাতীয় জীব জন্তু দেখিতে পাই, তন্মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;—অন্ততঃ, আত্মগৌরবপ্রিয় আত্মাভিমানী মানবের, বিবেক, বুদ্ধি ও বিচার-অনুসারে মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—অথবা মনুষ্যের সমতুল্য কোনও প্রাণী এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। আমিও সেই মনুষ্যজাতীয় একটি ক্ষুদ্র পরমাণু বিশেষ; সুতরাং আমিও মনুষ্যকে অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে অসম্মত নহি। যদিও জীব বিশেষের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতা মনুষ্য অপেক্ষা অধিক থাকিতে পারে, যদিও কোন কোন জীবের কোন কোন গুণ বা ক্ষমতা মনুষ্যের সমতুল্য হইতে পারে, তথাপি, মনুষ্যে একাধারে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোন একটি জীবে সেরূপ দেখা যায় না,—ইহাই মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ ও অপরাপর প্রাণীকে নিকৃষ্ট বলিবার একটি সাধারণ ও স্থূল কারণ। কিন্তু, কেবল তাহাতেই যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে; মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের আরও অনেক গুলি প্রধান কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি কারণ এই যে, মনুষ্য উন্নতিশীল সামাজিক জীব। যদিও অনেক নিকৃষ্ট প্রাণিদিগকেও সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু, তাহাদের সামাজিক অবস্থা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, যৎকালে মনুষ্যের সমাজ ক্রমান্বয়ে নূতন নূতন সংস্কার দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে। নিকৃষ্ট জীবদের সমাজ, সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একই প্রকার নিয়মের অধীন; কিন্তু সমাজ, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়মের অধীন। অন্যান্য প্রাণিদিগের সামাজিক নিয়ম সকল প্রত্যেক প্রাণীর স্বভাবজাত ও মনোগত; কিন্তু মনুষ্যের সামাজিক নিয়ম সকল পারস্পরিক প্রতিলব্ধ বা পুঁথিগত। মনুষ্য-জাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নিবারণ, সুখ-বর্দ্ধন এবং উন্নতি-সাধনার্থে, যে দেশে, যে কালে, যেরূপ স্বভাবের মনুষ্য হইয়াছে, সেই দেশে, সেই সময়ে, সেই প্রকার সামাজিক নিয়মও গঠিত হইয়াছে এবং সেই সকল নিয়ম-লঙ্ঘনকারীদের সামাজিক দণ্ডের ব্যবস্থাও হইয়াছে; কিন্তু সমাজ ত সকল সময়ে সকল স্থানে থাকে না—কেহ ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বা নির্জ্জনে, অথবা লোকের নিদ্রাকালে, সমাজের অজ্ঞাতসারে নিজের, অথবা সমাজের অন্য কাহারও সুখনাশক বা দুঃখবর্দ্ধক কোন কর্ম্ম করিলে, সমাজ সকল সময়ে তাহাকে ধরিতে ও শাস্তি দিতে পারে না; সুতরাং সমাজকর্ত্তৃগণ লোকদিগকে কেবল সামাজিক দণ্ডের ভয়ে বশীভূত করিতে না পারিয়া, কতকগুলি পারলৌকিক দণ্ডের ভয়ও দেখাইয়া রাখিলেন। এইরূপে, সামাজিক নিয়ম সকল দিন দিন পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংস্কৃত হইয়া পূর্ণাবয়ব

প্রাপ্ত হইতে ও মনুষ্যের মনে মনে, মুখে মুখে ও কানে কানে চলিয়া আসিতে লাগিল। কালে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন মনুষ্য, মনের ভাব চিহ্নে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল, অর্থাৎ যখন লেখার আবিষ্কার হইল, তখন এই সকল সামাজিক নিয়ম ও তৎ-পালনের বা লঙ্ঘনের, সামাজিক ও পারকালিক, শাস্তি বা পুরস্কার, এই সকল বিষয়, মনুষ্যের শ্রুতি, স্মৃতি ও উক্তি হইতে রঞ্জিত, অতিরঞ্জিত ও অলঙ্কৃত হইয়া পুঁথিগত হইল। সময়ে, মনুষ্য ঐ সকল সামাজিক নিয়ম-সম্বলিত পুঁথিকে "ধর্ম্ম-শাস্ত্র" বলিয়া স্বীকার ও সমাদর করিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালে যতপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকটাই স্বদেশহিতৈষী সাধু পণ্ডিতগণের বিরচিত সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্র, অন্ততঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস এইপ্রকার। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র কোন দেশে কোন কালে কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে পরমেশ্বর প্রকাশ করেন নাই এবং প্রকাশ করিবেন, এরূপ আশাও করি না। কিন্তু সময়ে দর্শন ও বিজ্ঞানের বলে, মনুষ্যের হৃদয় হইতে মায়া ও মোহরূপ ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হইলে, যখন উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে হৃদয় আলোকিত হয়, তখন মনুষ্য নিজ হৃদয় মধ্যে স্বরূপ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুক্তির মহানির্ব্বাণের বা স্বর্গের পথ দেখিতে পায়। অধ্যাত্মিক ধর্ম্মশাস্ত্র আমার আলোচনার বিষয় নহে, এবং সে শাস্ত্রে আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী; সুতরাং অনালোচ্য বিষয় লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করা অনুচিত বোধে ক্ষান্ত হইলাম। আমি কোন প্রকার সামাজিক ধর্ম্মের বা ধর্ম্মশাস্ত্রের স্তাবক নহি, অথচ বিরোধীও নহি; কারণ, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরের প্রকাশিত, অভ্রান্ত ও নিশ্ছিদ্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না; অথচ, প্রত্যেক ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রকেই মনুষ্যের হিতজনক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সোপান-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করি। তবে কিনা যে দেশের যে ধর্ম্ম, সেই দেশেই সেই ধর্ম্মের শোভা হয় ও সেই ধর্ম্ম সেই দেশেরই লোকেদের পক্ষে উপযোগী ও অধিকতর হিতসাধক হয়—এক দেশের সামাজিক ধর্ম্ম অন্য দেশের লোকের পক্ষে তত উপযোগী ও হিতজনক হইবার সম্ভাবনা নহে। কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী-সঞ্চালন করা, আমার নিতান্ত অপ্রিয় ও অনভিপ্রেত হইলেও, ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মের বিস্তৃতির দ্বারা স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগিনিগণের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বৃদ্ধি না হইয়া, তাঁহাদের সুখ নষ্ট ও দুঃখ বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, অবোধ যুবকগণ যাঁহারা ধর্ম্মের কিছুই জানেন না, কেবল কোন প্রকার ভ্রান্তি বা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বার্থপর, লোভী ও কপটী খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া, শেষে পাদ্রীগণ কর্ত্তৃক তাড়িত, লাঞ্ছিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া, কেবল মুষ্টিমেয় উদরান্নের নিমিত্ত হাহাকার করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, অথবা উদর পূরণ করিবার জন্য অবস্থার বাধ্য হইয়া, নিজ নিজ বিশ্বাস ও বিবেকের বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের দুঃখে কাতর হইয়া, এবং স্বয়ংও নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া, স্বদেশবাসীদিগকে সাবধান করিবার জন্য, পাদ্রী-প্রপীড়িত বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয়ানদের হিতার্থে এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের

কাপট্য দূর করিবার ও সরল এবং সৌজন্য-ব্যবহার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র, অর্থাৎ 'বাইবেল'-সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি বাইবেলের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই বলিব না; কিন্তু বাইবেলেরই আদি ভাগের প্রথম পুস্তক ও অন্তভাগের প্রথম পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত, উক্ত শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইব যে, বাইবেল—কুসংস্কার, কুরুচি, ভ্রম এবং বাল্য-ভাবে পরিপূর্ণ। এই শাস্ত্রের প্রধান নায়ক শয়তান। ইহা প্রাচীন কালের অসভ্য পণ্ডিত গণের কল্পনা-সম্ভূত এবং ইহা কোন মতে ঈশ্বর দত্ত বা ঈশ্বরের প্রকাশিত ধর্ম্মশাস্ত্র নাম গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। *

এক্ষণে হে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারকগণ! হে প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ানগণ! আপনাদের নিকটে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, কেহ যদি পবিত্র আত্মাকে পাইয়া থাকেন—কাহারও যদি ত্রাণোদয় হইয়া থাকে—তাহা হইলে, (Scott's) স্কটস্ বাইবেল, (Henry's) হেন্‌রিস্ বাইবেল ও (Barne's Notes) বার্ণস্ নোটস্ প্রভৃতি বাইবেলের যত গুলি টীকা আছে, খুলিয়া বসুন এবং যদি পারেন, আমি নিজ আত্মার ক্ষমতায় সাধারণের মনে যে সংশয় জন্মাইয়া দিতেছি, তাহা আপনি 'পবিত্র আত্মার' সাহায্যে সরলচিত্তে সন্তোষ-জনক সদুত্তর দানে ভঞ্জন করুন। আর যদি সন্তোষজনক সদুত্তর দানে সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে অক্ষম বোধ করেন, তাহা হইলে, অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, সত্যের খাতিরে না হউক, অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে অকপটে স্বীকার করুন; তাহাতে যদি বড়ই লজ্জা বোধ হয়, তাহা হইলে, এখন হইতে সাবধান হউন—বৃথা বাক্যাড়ম্বর ও মিথ্যা বাক্‌চাতুরীর জালে জড়িত করিয়া—"বঁড়শী লুকাইয়া টোপ দর্শাইয়া," "বিষ লুকাইয়া সুবর্ণের বাটি দর্শাইয়া," আর অবোধ যুবকদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন না,—অন্যের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এ কাল পর্য্যন্ত আপনাদের চাতুরী-জালে যে সকল মূঢ় মানব-মৎস্য পড়িয়াছে, তাহাদের সহিত সরল ও সৌজন্য ব্যবহার করুন এবং খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করা যদি নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা হইলে, রাস্তায় ঘাটে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গীত-বাদ্য-সহকারে প্রচার না করিয়া, প্রত্যেকে ঘরের কোণে বসিয়া, নিজ নিজ সদ্ব্যবহার ও সুদৃষ্টান্ত দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করুন। তাহা হইলে আপনাদেরও

---

* আমার সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ভাবিতে পারেন, এবং মিথ্যাবাদী খ্রীষ্টিয়ানরাও এই সমালোচনাকে মূল্য-হীন করিবার জন্য উপায়ান্তর না পাইয়া, আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার দোষারোপও করিতে পারেন; সুতরাং নিতান্ত আবশ্যক বোধে এই স্থানেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, আমার পিতা আমার জন্মের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, আমিও চিরকাল খ্রীষ্টীয় সমাজ-ভুক্ত ছিলাম এবং কোনও পাদ্রী বা খ্রীষ্টীয়ান্ শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না যে, আমার কোন অপরাধের কারণ, আমাকে কখন সমাজচ্যুত—সমাজ হইতে স্থগিত বা অন্ততঃ বিচারিত হইতে হইয়াছিল; বরং তদ্বিপরীতে আমি প্রমাণ দেখাইতে পারি যে, তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমি স্বইচ্ছাতেই উক্ত সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আশালতায় দশগুণ ফল ফলিবে এবং দেশেরও বিস্তর হিতসাধন করিতে পারিবেন। খ্রীষ্ট বলেন,—"মনুষ্যদের সাক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হউক, তাহাতে তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করিবে"। [মথি ৫ ; ১৬।]

বাইবেল সমালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাইবেলের সংক্ষিপ্ত স্থূল বিবরণ জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা আবশ্যক। এসিয়া মাইনারে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহার কলেবর প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমটির নাম "আদি ভাগ" (Old Testament)—তাহা পরমেশ্বর ইব্রীয় (হিব্রু) ভাষাতে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত আদি ভাগ আবার ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকেও ঐ সকল পুস্তক অধ্যায় ও পদে বিভক্ত। দ্বিতীয়টির নাম "অন্তভাগ" (New Testament)—যাহা ঈশ্বর সর্ব্ব প্রথমে গ্রীক্ ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাও আদিভাগের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকেও ঐ সকল পুস্তক অধ্যায় ও পদে বিভক্ত। ঈশ্বর যদিও তাঁহার নিজ বাক্য প্রথমে কেবল ইব্রীয় ও গ্রীক্ ভাষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ভক্তেরা ঈশ্বরের বাক্যকে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতিমধ্যে প্রচার করা কর্ত্তব্য বোধে প্রায় সকল প্রকার ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং উক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে সর্ব্ব ভাষায় প্রচারিত হওয়া যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, যে ঈশ্বর পূর্ব্বকালে তাঁহার নিয়মের দশ আজ্ঞা মনুষ্যদিগকে জানাইয়া, পাছে তাহারা কিছু ভুল করে, এই ভয়ে, স্বহস্তে দুই খানি প্রস্তরফলকে লিখিয়া দিয়াছিলেন,(দ্বিতীয় বিবরণ ৪ ; ১৩) সেই ঈশ্বর যে, তাঁহার দত্ত শাস্ত্র অনুবাদকালে অনুবাদকারীদিগকে বিশেষ সহায়তা করেন নাই ও ভুল হইতে দিয়াছিলেন, তাহা কোন্ ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান্ বিশ্বাস করিতে পারেন? সুতরাং, আমি ইব্রীয় ও গ্রীক্ ভাষা না জানিলেও, উক্ত দুই ভাষা হইতে যে ইংরাজি ও বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছে, তাহাই অভ্রান্ত অনুবাদ বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম; বলিয়া রাখা ভাল যে, অনুবাদের ভুল বলিয়া কেহ আমাকে দোষী করিবেন না—সে দোষে যদি কাহাকেও দোষী করিতে চাহেন, তবে অনুবাদকারিগণকে ও তাঁহাদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষাকারী ঈশ্বরকে দোষী করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমার পরম বন্ধু 'সুবোধিনী'র সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পত্রিকার পদ-প্রান্তে আমাকে 'বাইবেল সমালোচনা' প্রকাশ করিবার জন্য স্থান প্রদান করিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিলাম। এই বাইবেল-সমালোচনা, আমি স্বীয় বিশ্বাস ও বিবেচনা-অনুসারে লিখিতেছি।

জনৈক খ্রীষ্টীয়ান্-তনয়।



পাষণ্ড-দলন।

মুলুক্ জুড়ে, আইন-আগুন, জ্বল্‌তে লেগেছে,
যত উন্‌পাঁজুরে, বরাখুরে, বাতাস দিতেছে।
এদের বল্‌ব কি ভাই! সরম ত নাই! ধরম-খেগোর জাত,
এরা মাগের মাথায়, পাগ্‌ড়ি দিয়ে, কর্‌ছে বাজি মাৎ।
এদের নাই কোন ঠিক্, জন্ম বেঠিক্, সঠিক্ ব'লে যাই,
এদের মতন, নাৎখোরা আর এ জগতে নাই।
যে সে কাজ নয় ত—সমাজ, ধর্ম্ম-পথে হানা,
শূকর-খেগোর জুতো চাটে, শূকর-খেগোর জানা।
যত সব পৈতাফেলা, বাজিয়ে গলা, দিচ্ছে তাতে সায়!
এরা ঘরে ঘরে, ছাবাল পেয়ে, এড়ায় বিয়ের দায়।
বিশ-বছুরী, বুড়ী গুলো, এদের কাছে খুকী,
দাড়ির লোমে লোমে, বদ্‌মায়েশি মার্‌ছে উঁকি ঝুঁকি।
হ'লেই বা আইন কানুন, কায়েত, বামুন,—এরা ত কেউ নয়,
এরা সব বার-জেতে, অধঃপেতে, এদের কিবা ভয়?
এরা সব স্বভাব জাত, সত্যব্রত, স্বাধীন প্রেমের ফল;
ভাই বোনে ক'রে কেলি, হচ্চে 'বেলি', এ বড় এক কল।
বাবুরা মেোর ভেড়া, মেজাজ তেড়া, বাইরে জারিজুরি,
শুধু কাজের বেলায়, মুখটি শুখায়, বেরোয় ভারিভুরি।
বনিতার 'বনেট্' আঁটা, মেয়ে—বেঁটা চেনা হ'ল ভার!
মরি কি রূপের ছটা! মেঘের ঘটা! বলব্ কত আর?
একবার এসো প্রিয়ে! বাহার দিয়ে ব'স, সিটিং-ঘরে,
বাঁকা চাউনি দেখে, সাহেব সুবোর মগজ্‌টা যাগ্ ঘুরে।
ধনি! উচ্চ বুকে, রুকে রুকে, দাওনা দু'চার বোল,
তবে,— জোঁকের মুখে, পড়্‌বে লবণ, মিট্‌বে যত গোল।
এত যে আঁটন সাঁটন, কাটন কোটন ভেস্তে যাবে সব,
সাহেব মদন-বাণে, পড়্‌বে ঘুরে, ছাড়্‌বে হা-কা রব।
ধনি! তোমরা এখন, 'লাইট' পেয়ে, 'রাইট' হ'য়েছ,
আবার 'ফাইট' ক'রে, 'কাইট্' সম উড়্‌তে শিখেছ।
'সায়ন্স' পড়ে, 'বয়াল্সি'তে এমন্ আছে কেবা?

তুমি এ সংসারে, যেমন দেবী, তেম্‌নি তোমার দেবা।
তোমরা ত ভাই! নারী জাতি, নারীর বেদন জান,
তবে আপ্‌নার দিন কিনে কেন পরের বুকে হান?
এদিকে, কলির হাটে, ভদ্র মুটে, হচ্ছে একাকার,
যত চাষার ছেলে লাঙ্গল ফেলে, 'সাজ্‌ছে 'রিফর্ম্মার।'
কি হবে প'রে চটি, করছ মাটী, হিঁদুর ছেলে পিলে,
কেন না 'এম্ ডি' হয়ে মেমটি লয়ে বিলাত-বাসে গেলে'?
স্যার- রস্ব ভেয়ে, ছুটীর দায়ে খেয়ে গালাগাল,
এবার মানে মানে সইটি দিয়ে, মিটিয়েছে জঞ্জাল।
কিন্তু লাজের কথা বলব কোথা? শুন্‌লে হাসি পায়,
কোম্পানিকে জিগেস্ করে হিঁদুর সভায় যায়।
যা বল ভাই! মহাসভায় একটি হ'ল জ্ঞান,—
আজও, হিঁদুর আছে, হিঁদুয়ানী, হিঁদুর আছে প্রাণ।
নৈলে কেন লাট্-ভবনের চারটি ফটক আঁটা?
'এডিসনাল্ সেন্‌ট্রি' কেন চার্ তরফে বাঁটা?
সবে গভীর নাদে, "চাই না আইন," বল্‌ছে বারে বার,
শঙ্খনাদে কোবল ভায়ার, গোগোল হ'ল বার।
ওরে কি হ'ল হায়! ভারত জুড়ে দেখ্‌তে একি পাই?
যত ভারত-ছাড়ার আদর আছে! গুণীর পূজা নাই।
'পেন্‌সোনিয়র,' স্যার রমেশের ওজন টা নয় ভারি!
এখন নল্‌করেতে, দিচ্ছে শলা,—হরিবোল্ হরি!
মালবারীতে মলের কাঁড়ি কচ্চে এনে জড়,
দেশের হিঁদুর কথা ভেস্তে গেল, তার কথাটাই বড়!
'এডিটর্' কলম পিষে, হারায় দিশে দেখে দেশের দশা,
সময়ে শিয়াল-ছানা সিংহ হ'ল! হস্তী হ'ল মশা!!
একদিকে স্কোবল্, হাচিন্স, নল্‌কর্, ব্লিস্; রমেশ আর এক ভিতে,
পাঁচজনেতে, যুক্তি করে 'সিলেক্ট কমিটিতে।'
ভাই! বল্‌তে হবে, রমেশ বাবু বাপের বেটা বটে,
চারটে বাঘে খেতেএল—তবু না যায় হটে।
তুমি পরাণ ধ'রে, কৃপাণ করে লড়্‌লে ভাল, ভাই!
মোরা যে কপাল-পোড়া—হতচ্ছাড়া—ভাগ্যে মোদের নাই।
বেল্লক শাস্ত্রী ভায়া মিস্ত্রী হয়ে, বেদ্ মেরামত করে,
এরা সাহেব 'পেন্সার' পা'বার তরে জাত্‌টি দিতে পারে!

শাস্ত্রী বটে, রাজেন্দ্র চাঁদ কচ্ছে সমাজ আলো,
হিঁদুর ছেলে, হিঁদুর চেলে ;—সেই ত দেখায় ভালো।
কোন্ সাহেব না গিয়াছিল বিদ্যাসাগর-ঘরে ?
গায়ে হাত বুলা'য়ে মতটা বুঝি নিতে বিলের 'ফরে' !
সেখানেতে, শক্ত ঘানি, নয় ত যথা তথা—
খুব্ ক'রেছে, হাঁকিয়ে দেছে, মুখ হ'য়েছে ভোঁতা।
কংগ্রেসেতে হিউম সাহেব হদ্দ মজা নিলে,
পথ দেখা'য়ে প্রাণের ভয়ে পেছু কাটা'য়ে গেলে।
কে বল ভাই ! শুধু শুধু বল্‌বে পরের তরে ?
'সল্ট লেকে'তে নুণটা খেয়ে, গুণটা গেয়ে মরে।
মতিভ্রম আর কারু নয় "নেটিভ"দেরই সেটা,
এত দিনে চিন্‌লেনাক কে ভাল, কে ঠেঁটা।
বিপদ্‌কালে ব্রাড্‌লা সাহেব দিল শিঙে ফুঁকে,
কে বল আর ভারত তরে বল্‌বে রুকে রুকে ?
সেই ছিল এক স্বার্থত্যাগী—মানুষ বলি তারে,
ছার কপালে, মুখ-চাওয়া লোক, থাক্‌বে ক'দিন ধ'রে ?
বিলাত থেকে জর্জ্জ বার্ডউড্ বলছে গভীর নাদে,—
"এই বারেতে ব্রিটিশ রাজে লাগ্‌ল বিষম বাদে।"
অন্য কাজ নয় ত—হিঁদুর ধর্ম্মধনে হাত,
সাহেব হ'য়েও, তাই ব'লেছে কড়া কড়া বাত।
শুনে যা পৈতা-ফেলা—দাড়ি-ও'লা ! বিদেশী কি বলে,
তোদের গুণে ভারত মাতা ম'লেন জ্বলে জ্বলে।
নারীর গোলাম হ'য়ে তোদের বুদ্ধি হল হত—
জান না 'ডেড্ লেটারে' হ'য়ে যাবে আইন পরিণত।
দেখে যা বাঁদর গুলা, অজার মুখে মাখিয়ে গেল দই !
বিলাত-বাসী বাপ্ খুড়ো হয়, আমরা কি কেউ নই ?
চুনা পুঁটি এড়িয়ে গেল স্মরণ হ'লনাক,
সময় বুঝে বলব্ আবার একটু খানিক থাক।
যা বল ভাই ! কোম্পানিকে সাবাস্ দিতে হয়,
এক চাপড়ে থামিয়ে দিলে, কংগেরেসের ভয়।

—

দোল-যাত্রা।

"দোলায়মান গোবিন্দম্ মঞ্চস্থ মধুসূদনম্।
রথস্থ বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥"

হিন্দু-শাস্ত্র-সমূহ রূপক-ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার কুটিল অর্থ ও অধ্যাত্মিক ভাব সকল সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া ইদানীন্তনকালে অনেক ইংরাজি-শিক্ষিত যুবা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন; কিন্তু, তাঁহারা যদি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, ইহার নিগূঢ় অর্থ সকল উপলব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে, অবশ্যই দেখিতে পাইতেন যে, ইহার সুদূর গহ্বরে কি অমূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু, যখন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত—মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহাশয়—ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, শাস্ত্রাধ্যায়ী ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইয়া, সংস্কৃত-কলেজের সম্পাদক হইয়া, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়া, এবং ইংরাজ-রাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া, অধিকতর অনুগ্রহ লাভ করিবার আশয়ে, বৃদ্ধ বয়সে অম্লানবদনে লিখিয়াছেন,—"দোল হিন্দুর পর্ব্ব নহে," তখন যে কোন কোন অবোধ যুবা, বিজাতির শাসনাধীনে থাকিয়া, বিজাতি ভাষা শিক্ষা করিয়া, বিজাতির সহবাসে থাকিয়া, বিজাতীয় রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া, বিজাতির প্রলোভনে ও বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া এবং পবিত্র সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের কঠোর ব্রত সকল প্রতিপালন করিতে অক্ষম ও তাহার গূঢ় অর্থ সকল নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তাহার উপর অনাস্থা প্রদর্শন করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, এই সকল কথা লইয়া পাঠকগণের সময় নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে,—উদ্দেশ্য "দোলযাত্রা" কথঞ্চিৎ বর্ণন করা। তবে, মনের আবেগে দু' এক কথা বাহির হইয়া পড়ে,—সেটা পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

নারায়ণের দ্বাদশ যাত্রার মধ্যে "দোল" একটি প্রধান। "বাসন্তী পঞ্চমী" বা "সরস্বতী-পূজা"র দিবস ইহার সূচনা এবং "রামনবমী"র দিবস—ইহার সমাপ্তি। এক্ষণে কলিকাতায় আমরা সচরাচর এরূপ দোলযাত্রা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বৃন্দাবনে ও পশ্চিমাঞ্চলে এরূপ প্রথা অদ্যাপিও প্রচলিত আছে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই—পূর্ণিমার দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, কেহ প্রতিপদে, কেহ দ্বিতীয়ায়, কেহ তৃতীয়ায়,—এইরূপে শ্রীরামনবমী পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব প্রচলিত প্রথানুসারে এক এক দিন দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। দোলযাত্রার পূর্ব্ব রাত্রে "বহ্ন্যুৎসব" বা "মেড়া-পোড়া" উৎসব প্রচলিত আছে। এই প্রথানুসারে একটি বংশ প্রোথিত করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে খড় জড়াইয়া দেওয়া হয়

এবং একটি "মেষে"র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার নিম্নে রাখিয়া দেওয়া হয়,—তৎপরে তাহাতে অগ্নি প্রদান-পূর্ব্বক সে সমস্ত দগ্ধ করিয়া "মেড়া-পোড়া" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর দিবস দোল। সেই দিবস একটি কৃত্রিম দোলায় রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি আরোহণ করাইয়া দোল দেওয়া হয় এবং তাহাতে রাশি রাশি আবীর ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে আমরা দোলযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? কতক গুলি খড় বাঁশ দগ্ধ করিয়া একটি কৃত্রিম দোলায় অকিঞ্চিৎকর পুত্তলিকা বসাইয়া দোল দিলে এবং তাহার প্রতি রাশি রাশি আবীর নিক্ষেপ করিলে কি বাস্তবিক দোল-যাত্রা-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? কখনই নহে,—ইহার অবশ্য অন্য কোন অর্থ আছে।

দোল-যাত্রার অর্থ—দোলায় গোবিন্দদেবকে দর্শন করা। কিন্তু সে কার্য্য কৃত্রিম দোলায় পুত্তলিকা বিশেষ রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি বসাইয়া সমাধা করা কি কখন সম্ভব?

অতএব, এখানে "দোলা" অর্থে কৃত্রিম দোলা নহে—আমাদের দোদুল্যমান চঞ্চল চিত্তই এখানে প্রকৃত দোলা এবং সেই চঞ্চল চিত্ত-রূপ-দোলায় গোবিন্দদেব বা ভগবানের দর্শন করার নামই প্রকৃত "দোল-যাত্রা।" কিন্তু এরূপ দোল-যাত্রা করা সহজ নহে। মায়া-মোহ-জড়িত সংসারের অকুল চিন্তা-সাগরে ভাসমান অস্থির চিত্তের সহসা স্থিরতা সম্পাদন-পূর্ব্বক, তাহাকে অকস্মাৎ সম্যক-রূপে ভগবানের ধ্যানে নিয়োজিত করা অসম্ভব। সেই জন্য দোল-যাত্রার পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে কতক গুলি প্রক্রিয়া, অর্থাৎ ব্রত পালন করিতে হয়। অতএব, দোলযাত্রা বর্ণন করিতে হইলে, ঐ সকল প্রকরণ বা ব্রত পালনের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি সম্বন্ধে দু' এক কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সরস্বতী-পূজার দিবস হইতে দোলের সূচনা। বৎসরের শেষে বসন্তের আগমনে, আমাদের কাম-প্রবৃত্তি বলবতী হয় এবং চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অতএব, সেই সময় পাছে অবিদ্যা আসিয়া আমাদের চঞ্চল চিত্তকে অধিকার করে, সেই ভয়ে আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার জন্য বিদ্যা-স্বরূপা সরস্বতীর আরাধনায় নিযুক্ত হই।

প্রথমতঃ,—সরস্বতী-পূজার দিবস আমাদিগকে "ষট্‌পঞ্চমী"-ব্রত করিতে হয়। 'ষট্' অর্থাৎ ষষ্ঠ, 'পঞ্চমী' অর্থাৎ পঞ্চ, 'ব্রত' অর্থাৎ সংযম। অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য,—এই ছয় রিপুর দমন করা এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত, অর্থাৎ নাসিকা জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক ও কর্ণ, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম করা; অথবা উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয়—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পঞ্চ বিষয় হইতে পৃথক হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ,—সরস্বতী-পূজার সময় আমরা সরস্বতীর পাদ-পদ্মে 'আবীর' ও 'অভ্র' প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু যথার্থ পক্ষেই যে আবীর ও অভ্র নামক দুইটি পদার্থ প্রদান করিতে হইবে, তাহা নহে। এখানে "আবীর" অর্থাৎ লোহিত বর্ণ পদার্থ, অর্থাৎ আমাদের রজোভাব এবং "অভ্র" অর্থাৎ বৃথা চাকচিক্যশালী পদার্থ, অর্থাৎ পার্থিব

আমোদ প্রমোদ ও ভোগ সুখাভিলাষ—অর্থাৎ সত্ত্বভাব বা শান্তি পাইবার জন্য আমাদের রজোভাব এবং অকিঞ্চিৎকর ঐহিক কামনা সকল পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

অতএব, আমরা যদি অন্তরের সহিত ষট্-পঞ্চমী-ব্রত সাধন ও সরস্বতীর পাদ-পদ্মে আবীর ও অভ্র প্রদান করি, অর্থাৎ আমরা যদি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য, এই ছয় রিপুর দমন, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্,—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংযম এবং আমাদের রজোভাব-রূপ আবীর ও বৃথা পার্থিব ভোগ-সুখাভিলাষ-রূপ অভ্র পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমরা আমাদের চঞ্চল-চিত্ত-রূপ দোলাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থিরভাবে আনিলে আনিতে পারি।

তৎপরে "শীতল-ষষ্ঠী"-ব্রত; অর্থাৎ আমাদের ষড়্‌রিপুর শীতলতা বা স্থিরতা সম্পাদন করা। অতঃপর,—"ভীম-একাদশী"। অন্যান্য একাদশী অনেকে প্রতিপালন করেন না; কিন্তু ভীম একাদশী, ধনী, নির্ধন, ইতর ও ভদ্র প্রায় সর্ব্ব সাধারণ লোকেই অতিশয় কঠোর ব্রত জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ভীম একাদশী করিতে হইলে, নিরম্বু উপবাস করিতে হয়; নিরম্বু উপবাস করিলে শরীর শুষ্ক হয়, সুতরাং, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি সকল কথঞ্চিৎ দমিত হয়।

তাহার পর "শিবরাত্রি," অর্থাৎ কালরূপী রুদ্র-দেবের উপাসনা করা, অর্থাৎ আমাদের মস্তকের উপর সর্ব্বসংহারকারী কাল বিরাজ করিতেছেন এবং আমাদিগকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে ইহা স্মরণ করা; কারণ আমাদিগকে মরিতে হইবে, একথা যখন আমাদের মনে হয়, তখন আর আমাদের পার্থিব ভোগ-সুখে স্পৃহা হয় না ও আমাদের অন্তরে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়।

তাহার পর "বহ্ন্যুৎসব" বা "মেড়া-পোড়া।" শাস্ত্রে আছে,—'মেঢ্রাসুর' নামক এক ছাগ-জাতীয় অসুর ছিল। সে কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বৃন্দাবনের স্ত্রীলোক দিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত। তজ্জন্য নারায়ণ তাহাকে সংহার করেন এবং তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া, তাহার মৃত শরীর দগ্ধ করেন।

এদিকে, বসন্তাগমে আমাদের কাম-প্রবৃত্তি অধিকতর উত্তেজিত হয় এবং আমাদের সেই কাম-প্রবৃত্তি রূপ মেঢ্রাসুরকে দগ্ধ করা, অর্থাৎ আমাদের কাম-রিপুকে দূরীকৃত করার নামই প্রকৃত মেড়া-পোড়া—তদ্ভিন্ন বাঁশ খড় ও একটি মেষের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দগ্ধ করিলে, প্রকৃত মেড়া-পোড়ার কার্য হয় না।

অতঃপর, পর দোল যাত্রা। আমরা সরস্বতী পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া, এই সকল ব্রত পালন করিয়া দোল-যাত্রার জন্য অগ্রসর হইলাম, অর্থাৎ আমরা সাধ্যানুসারে নানা প্রকারে আমাদের রিপুকুলের সংযম করিয়া, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল দমন করিয়া, রজোভাব পরিত্যাগ করিয়া, পার্থিব ভোগ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এবং বসন্ত-সহচর মদনের নিধন সাধন করিয়া, চঞ্চলচিত্তরূপ দোলার স্থিরতা সম্পাদন ও তন্মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দোল একেবারে থামিল না, চঞ্চল চিত্ত সম্যক্ রূপে স্থির হইল না,—দোল চলিতে লাগিল। পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতিপদ,

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী,—প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে রাম-নবমী পর্য্যন্ত দোল চলিতে লাগিল, অর্থাৎ আমাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য কিছুতেই দূর হইল না এবং তাহা দূর করিবার শক্তিও আমরা পাইলাম না; তখন চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া স্থিরতা সম্পাদনার্থ শক্তিসম্পন্ন হইবার জন্য, আমরা মহাশক্তি—"বাসন্তী দেবী" বা "দুর্গা"র আরধনায় নিযুক্ত হইলাম; সুতরাং দোলের সহিত দুর্গা-পূজার ঘনিষ্ঠ সংস্রব এবং সেই জন্যই আমাদের কথায় বলে,—"দোল-দুর্গোৎসব।"

অতঃপর একাগ্রচিত্তে ক্রমান্বয়ে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী ধরিয়া সেই মহাশক্তির উপাসনা করিয়া, আমরা সর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলাম, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ রামচন্দ্রের উদয় হইল—এই জন্যই এই নবমীর দিবস "রাম নবমী"র ব্রত করিতে হয়।

এতক্ষণে দোল সমাপ্ত হইল, অর্থাৎ চঞ্চল চিত্ত স্থির হইল এবং আমরা তন্মধ্যে ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করিলাম—আমাদের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল এবং আত্মজ্ঞান উপস্থিত হওয়ায়, অনাবশ্যকবোধে পর দিবস পার্থিব দেবী-মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া শান্তি লাভ করিলাম।

বসন্তকালে, স্বভাবতঃ, আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বলবতী ও চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং সেই সময়ে আমরা ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইতে পারি। অতএব, আমাদিগকে বিপথে গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ইন্দ্রিয়-উত্তেজক বসন্তকালে দোল-যাত্রারূপ কঠোর ব্রতের ব্যবস্থা এবং যাহাতে আমরা প্রথম হইতে সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতে পারি, সেই জন্যই পূর্ব্ব হইতে ইহার এত আয়োজন এবং বসন্তের প্রারম্ভে সরস্বতী-পূজার দিবস হইতে ইহার সূচনা; অতএব আমরা যদি বসন্তের প্রারম্ভ হইতেই, এই সকল ব্রত পালন করিয়া ক্রমাগত আমাদের ইন্দ্রিয়ের দমন, রিপুর শাসন, রজোভাব বর্জ্জন, ভোগসুখ বিসর্জ্জন এবং আমাদের চিত্তকে ভগবানের ধ্যানে নিমজ্জন করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে, আমাদের বিপথগামী ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এই সকল রিপু-শাসন, ইন্দ্রিয়-দমন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া, ঈশ্বরোপাসনায় চিত্ত সন্নিবেশিত করা সংসার-মোহ মুগ্ধ মানবের পক্ষে অতিশয় সুকঠিন এবং সেই জন্যই পৌত্তলিক-প্রথা আমাদের মধ্যে এতাদৃশ আদরণীয়; কারণ আমরা যদি একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে পূজা করিতে থাকি, তাহা হইলে, আমারা আমাদের চিত্তকে অন্যান্য বিষয় হইতে বিরত করিয়া, কিয়ৎ-পরিমাণে সেই প্রতিমূর্ত্তি আরাধনারূপ ঈশ্বর-ধ্যানে নিয়োজিত করিতে পারি, এবং এইরূপ অধ্যবসায় ও ভক্তি-সহকারে আমরা সেই প্রতিমূর্ত্তিরূপ ঈশ্বর-আরাধনায় যতই অগ্রসর হইতে থাকি, আমাদের অন্তর ততই ভক্তি-রসে পরিপূর্ণ ও তন্ময় হইয়া উঠে এবং ক্রমে আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি। কিন্তু, যখন এতাদৃশ কঠোর বার ব্রত ও নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, সাধ্যমতে আমাদের চঞ্চলচিত্তের স্থিরতা-সম্পাদন ও তাহাকে আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়া এবং

প্রতিমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর জ্ঞান করিয়াও সাকার ঈশ্বরের আরাধনা করিতে আমরা অক্ষম হই, তখন যে পার্থিব ভোগ-সুখে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া, নানা প্রকার ইন্দ্রিয়-উত্তেজক বিলাস-দ্রব্যে পরিপূর্ণ, সৌখীন সমাজ-গৃহে বন্ধুবর্গের সহিত প্রবেশ করিয়া, মহা আড়ম্বরের সহিত, আসর জমকাইয়া, উপবেশন করিয়া, ইচ্ছা করিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিবা মাত্র, আমরা আমাদের চিত্তকে একেবারে সমস্ত পার্থিব বিষয় হইতে বিভিন্ন করিয়া, নিরাকার—অনিশ্চিত ঈশ্বরের উপাসনায় নিয়োগ করিতে পারিব এবং তদ্দ্বারা আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, ইহা কতদূর সম্ভবপর?

এই সকল আধ্যাত্মিক ভাব পরিত্যাগ করিয়াও, আমরা যদি অন্ধ হইয়া বিশ্বস্তভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ-আচরিত আচার ব্যবহার সকল প্রতিপালন করি, তাহা হইলেও আমাদের অনেক মঙ্গল সাধিত হয়। দোলের সময় আমাদের মধ্যে "হোলি-খেলা" বা ফাগ্-মাখা প্রথা প্রচলিত আছে এবং এই সময়ে—বসন্তকালে ফাগ্ মাখিলে, সহসা "বসন্ত" বা ওলাউঠা-রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অনেক পরিমাণে কম হয়। কিন্তু এ সকল দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আজকাল অনেক পাশ্চাত্য-সভ্যতা-প্রিয় নব্য বাবুরা ফাগ্ মাখা, অসভ্যতা বিবেচনা করিয়া, হেয় জ্ঞান করেন এবং "ফুট্‌বল," "ক্রিকেট" খেলিয়া দেহের উপকার সাধন করিবার চেষ্টা করেন,—স্বদেশের সুরভি পরমান্নের আস্বাদন না করিয়া, বিদেশের দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট গলিত মাংসের জন্য লালায়িত হয়েন!

শ্রীকালিদাস মিত্র।

ঘুমন্ত শোভা।

পাতি রূপ-ফাঁদ, ঢালিতেছে চাঁদ,
মধুর জোছনা আকাশময়;
প্রেমেতে বিভোরা, প্রেমে মাতোয়ারা,
প্রেমের কাহিনী প্রিয়ারে কয়।

হাসিছে যামিনী, মোহিনী চাঁদিনী,
মাখিয়া সোহাগে আপন কায়;
সুধার প্রয়াসে, সুনীল আকাশে,
হাসিয়া চকোর, চকোরী ধায়।

অতি সঙ্গোপনে, ধরিয়া যতনে,
প্রসূন-কলিকা চাঁদের ছায়া;
হাসিছে—নাচিছে, ঢলিয়া পড়িছে,
ফুটাইছে মরি আপন কায়া!

হেন মনোলোভা, মধুময় শোভা,
হেরিয়া ঝঙ্কারে মানস-তার;
মন-মুগ্ধকরী সে তান-লহরী,
মরি কি মধুর মাধুরী তার!

কবির কল্পনা, নাহিক তুলনা;—
তবে কেন চাঁদ বিভোল প্রাণে,—
বাতায়ন দিয়া, উঁকিটি মারিয়া,
হেরিছে আমার প্রাণের প্রাণে?

উজল আননে, মধুর কিরণে,
মিশিয়া, মধুর শোভা বিকাশে ;—
যেন—শশধর, বিষাদ-অন্তর,
আবরি' বদন সরম বাসে—

কহিছে বালারে,— "হেরিয়া তোমারে,
গরব আমার গিয়াছে দূরে ;
তোর মুখ খানি, তৃষিত পরাণী,
দেখুক্ লো ধনী, পিয়াসা পূরে।"

জান না কি, শশী— কলঙ্কের মসী,
সাধিয়াছে বাদ তোমার সনে ?
এ চাঁদে যে চাঁদ, নাহি কোন বাদ,
দেখে কি প্রতীতি না হয় মনে ?

ঘুমে আচ্ছাদন, সুন্দর নয়ন,
মুদিত, কমল—যেন রে স্থলে !
প্রফুল্ল নলিনী, কেন বিমলিনী ?
দেখিয়া, বিষাদে হৃদয় জ্বলে।

হ'ক বিকশিত ; হেরিয়া মোহিত,
হউক আমার জীবন—মন ;
নবীন মাধুরী, নয়নে নেহারি,
হাসিবে, চন্দ্রমা—তারকাগণ।

প্রাণ মাতাইয়া, কম্পিত হইয়া,
অধর হইতে ফুটুক কথা ;
উষার প্রকাশে, আমোদেতে হাসে,
ফুটিয়া কমল সোহাগে যথা।

হৃদয়ের গাথা— হৃদয়ের ব্যথা,
হৃদয় খুলিয়া বলিয়া তারে ;
মধুর চুম্বনে প্রেম আলিঙ্গনে
রাখিব যতনে হৃদয়াগারে !'

হবে না—হবে না, তা প্রাণে সবে না,
ঘুমন্ত সুষমা আমি ভাঙ্গিব না ;
প্রাণের বন্ধন রবে আজীবন
সে প্রেম বন্ধন কভু খুলিব না।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

দার্জ্জিলিং-ভ্রমণকারীর পত্র।

(চতুর্থ পত্র)

লুইস জুবিলি স্যেনিটেরিয়ম্, দার্জিলিং, ১৭ অক্টোবর, ১৮৮৯।

গত কল্য আমি ভুটিয়াবস্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা ছোট লাট্-সাহেবের বাটীর নিকটবর্ত্তী একটি নিম্নতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ভুটিয়াদের গৃহগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র,—মাটীর দেয়াল ও পাতার ছাউনি দ্বারা নির্ম্মিত। কলিকাতার খোলার ঘর ইহার নিকট অট্টালিকা বলিয়া বোধ হয়। এই সকল ঘর দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার অধিবাসীরা অতিশয় দরিদ্র। আমি একজন ভুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, "তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ধনবান্, তাহাদের কত সম্পত্তি আছে ?" তাহাতে সে

উত্তর করিল যে,—"আমাদের মধ্যে যাহার দুই তিন শত টাকা আছে, সে আপনাকে ধনবান্ বলিয়া জ্ঞান করে।"

দার্জ্জিলিংএ কাক, শালিক-পক্ষী ও শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা বলে যে, "ইহারা পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, বর্দ্ধমানের মহারাজা পীড়িত হইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যখন এখানে আসেন তখন তিনি স্বদেশ হইতে কতকগুলি কাক, শালিক ও শৃগাল আনিয়া এখানে ছড়িয়া দেন। সেই অবধি ইহারা এখানকার অধিবাসী হইয়াছে, এবং ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে।" দার্জ্জিলিংএ শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা ও শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক। এখানে সাহেব, বিবি ও বাঙ্গালী সকলেই সকালে ও বৈকালে বেড়াইয়া থাকে। বেড়াইবার জন্য পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে 'ম্যালরোড্' নামে একটি রাস্তা আছে।

এখানে পার্ব্বতীয় এক জাতীয় টাট্টু ঘোড়া আছে, তাহার উপর আরোহন করিয়া পর্ব্বতে বেড়াইতে বেশ সুবিধা। আমি সাহস করিয়া ঘোড়ায় চড়ি না, কিন্তু প্রত্যহ সকালে ও বৈকালে ২।১ ঘণ্টা বেড়াইয়া থাকি।

এখানে কলিকাতার ন্যায় ঘোড়ার গাড়ী বা উড়ে বেহারার পাল্‌কী নাই, কারণ এখানকার উচ্চ নিম্ন ও সংকীর্ণ রাস্তা সকল গাড়ী ও পাল্কীর গমনাগমনের যোগ্য নহে। ডাণ্ডিই এখানকার একমাত্র যান, দূরে যাইতে হইলে ডাণ্ডির সাহায্যে যাইতে হয়। কোন ডাণ্ডি চারি জন, কোনটি বা তিন জন ভুটিয়ায় স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

যে সকল বাঙ্গালীরা অল্প কালের জন্য এখানে আসে তাহারা শীতে বিলাপ করে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের উষ্ণতা হইতে হঠাৎ পার্ব্বত্য-প্রদেশের শীতলতা অনেকের পক্ষে প্রথমে অসহ্য বোধ হয়। নির্জ্জনে একাকী থাকিলে পীড়ার আশঙ্কা হয় এবং মনে হয়, পীড়িত হইলে কে সেবা করিবে? এখানে অনেক দিন বাস করিলে, গালের রং লাল বর্ণ হয়।

এখানকার অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকে উভয়েই মদ্য পান করে। এ দেশের মদকে "মারুয়া" কহে, কিন্তু সুরাভক্ত হিতৈষী ইংরাজের সংস্পর্শে ও অনুগ্রহে ইহাদের মধ্যে বিলাতী ব্রাণ্ডির প্রচলন হইতেছে এবং দেশীয় মারুয়ার প্রতি ক্রমশঃ বিশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। এই সকল লোক এক কালে সরল ও লোভহীন বলিয়া বিখ্যাত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সভ্যকরণরূপ সৌগন্ধে তাহাদের সরলতা ও লোভহীনতারূপ দুর্গন্ধ সকল ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে।

এখানে মশা নাই,—পথে কলিকাতার ন্যায় ধুলা নাই; গাছের ফুল শীঘ্র শুষ্ক হয় না, কারণ কুয়াশা, (যাহার অন্য নাম মেঘ) সদা সর্ব্বদাই উড়িয়া যাইতেছে, এবং গাছপালা ও পাহাড়কে সিক্ত করিয়া রাখিতেছে।

আমি আগামী কল্য বেলা ১১টার সময় রেলগাড়ীতে উঠিব এবং তৎপর দিন কলিকাতায় পৌঁছিব, এই আমার এখানকার শেষ পত্র।

লেখনী-সঞ্চালন-পূর্ব্বক দার্জ্জিলিং বর্ণনা করা, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যতদূর সম্ভব তাহা করিলাম; যাহা বাকি রহিল, তাহা ফিরিয়া গিয়া—হাতমুখ নাড়িয়া—বুঝাইয়া দিব। পাঠকগণ! সে সুখে বঞ্চিত রহিলেন, কি করিব ——নাচার!

কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

সংবাদ।

—:০:—

অধিকাংশ ভারত-বাসীর অনবরত প্রতিবাদ ও ঘোরতর অসম্মতি উপেক্ষা করিয়া, বৃটিশ-রাজ স্বেচ্ছাপরবশ হইয়া, স্যার. আণ্ড স্কোবল সাহেবের প্রস্তাবিত "সহবাস সম্মতির বয়ঃক্রমের আইন" গত ৭ই চৈত্র—২০শে মার্চ্চ তারিখে পাশ করিয়াছেন। এই আইন অনুসারে :—

১। যে কোন পুরুষ, এমন কি দ্বাদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক বালক পর্য্যন্তও, আপনার দ্বাদশ বৎসরের অল্পবয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে, 'বলাৎকার'-অপরাধে অপরাধী হইবে।

২। ঐ স্ত্রীর যদ্যপি মাসে মাসে ঋতু হইতে থাকে, তাহা হইলেও, তাহার সহিত স্বামী সহবাস করিলে, বলাৎকার-অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে।

৩। সহবাসে স্ত্রীর সম্মতি ছিল, অথবা স্ত্রী স্বামীকে ইহাতে উত্তেজিত করিয়াছে, স্ত্রীর সহবাস-জনিত কোনও কষ্ট হয় নাই,—এই সকল প্রমাণ হইলেও, স্বামী অব্যাহতি পাইবে না।

৪। শাস্ত্রানুযায়ী, সামাজিক প্রথানুযায়ী সহবাস হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইলেও, স্বামী অব্যাহতি পাইবে না।

৫। স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া স্বামী সহবাস করিয়াছে; কিন্তু বিচারের সময় যদ্যপি উক্ত স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১২ বৎসরের অল্প ইহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও স্বামী আইনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে না।

৬। (১) অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেটকে অভিযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। (২) পুলিষ রিপোর্ট করিলে, অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে হইবে। (৩) অন্য লোক অভিযোগ করিলেও অভিযোগ লইতে হইবে। (৪) নিজে জানিতে পারিলে, বা সন্দেহ করিলে মাজিষ্ট্রেটও অভিযোগের আয়োজন করিবেন।

৭। বিচারের জন্য স্ত্রীকে আদালতে হাজির করা হইবে, এবং তাহার প্রতি যদৃচ্ছা প্রশ্ন করা হইবে।

৮। স্ত্রী যদ্যপি ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের অব্যবহিত পরে সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে, ধরিয়া লওয়া হইবে যে, বার বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে তাহার সহিত সহবাস হইয়াছে; সুতরাং, ইহাতেও নালিস চলিবে এবং স্বামীর দণ্ড হইবে।

এইরূপ সহবাস বা বলাৎকার-অপরাধের দণ্ড—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

*

* *

আইন পাস হইল,—বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িল—সংস্কারকদের আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল—ভদ্র লোকের ঝি বৌ নষ্ট করিবার একটা সুবিধা হইল। বিড়ালেরা এতদিন ওৎ পাতিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া বসিয়াছিল, যেই শিকা ছিঁড়িল, অমনি গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল—যেই আইন পাশ হইল, অমনি তাহার ফলও ফলিল!

কলিকাতা বেনেটোলায় অধরচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী লইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছিল। তাহার স্ত্রীকে দেখিলে

বার বৎসর বয়ঃক্রম অপেক্ষা অল্প বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহের সময় হইতে বয়ঃক্রম ধরিয়া হিসাব করিলে, বার বৎসরের অধিক হয়। বিন্দু দাস উক্ত অধর দাসের শ্বশুর। বিন্দু দাস অতিশয় নীচ প্রকৃতির লোক—সে ইতিপূর্ব্বে তাহার অন্য দুইটি কন্যাকে বেশ্যা-বৃত্তিতে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহার পর এই কন্যা,—অধর দাসের স্ত্রী, তাহার লক্ষ্য হয়; কিন্তু কন্যা স্বামী-সঙ্গিনী, অতএব তাহাকে স্বামীর নিকট হইতে পৃথক না করিলে, অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায় নাই।

একটু কৌশল খাটাইলে বিন্দু দাস, নূতন আইনের সাহায্যে, তাহার জামাতা অধর দাসকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া নিষ্কণ্টক হইতে পারিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কারকদিগের ন্যায়, বিন্দু দাসের বুদ্ধি তত দূর প্রখরতা প্রাপ্ত হয় নাই, সেই জন্য সে এই সোজা পথে না গিয়া, অন্য উপায়ে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল। কামিনী নাম্নী কোন এক আত্মীয়া রমণীকে জামাতার বাটীতে প্রেরণ করিল এবং স্বীয় কন্যা অধর দাসের স্ত্রীকে তাহার দ্বারা ফুসলাইয়া গোপনে আপন আবাসে আনয়ন করিল।

অধর দাস এই ঘটনায় যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইল এবং বেগতিক দেখিয়া বিচারালয়ে কামিনী ও অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন শ্বশুর বিন্দু দাসের বিপক্ষে "স্ত্রী চুরির" অভিযোগ উপস্থিত করিল। সুবিজ্ঞ বিচারপতি মহাশয় প্রমাণ গ্রহণ, মস্তিষ্ক আলোড়ন বিলোড়ন ও গভীর গবেষণান্তে, স্ত্রীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর অপেক্ষা অল্প, ইহা স্থির করিলেন এবং বলিলেন যে, সহবাস-সম্মতির আইনানুসারে অপ্রাপ্ত-দ্বাদশ-বর্ষীয়া স্ত্রীকে স্বামীর সহিত অবস্থান করিতে দেওয়া কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। অধর দাস নিরুপায় দেখিয়া করপুটে বিচারপতির নিকট প্রার্থনা করিল যে,—আমার শ্বশুর অতিশয় দুঃশ্চরিত্র। এ জন্য আমি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিয়া আমার স্ত্রীকে তাহার নিকট রাখিতে সম্মত নহি; বিশেষতঃ আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, আমার শ্বশুর আমার পত্নীকে অন্য ব্যক্তির সহিত আবার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছে—অধিকন্তু শ্বশুর মহাশয় তাহার অন্য দুইটি কন্যাকে বেশ্যা-বৃত্তিতে নিয়োজিত করিয়াছে; অতএব একান্তই যদি আমার স্ত্রীকে আমার নিকট থাকিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে, অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট তাহাকে রাখা হউক। কিন্তু উক্ত স্ত্রীর পিতা ও পতি ভিন্ন অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়, স্বামীর অবিশ্বাস ও অসম্মতি সত্ত্বেও তাহাকে তাহার পিতার সহিত বাস করিবার জন্য হুকুম বাহাল হইল। স্বামীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।

সহবাস-সম্মতির আইনানুসারে দ্বাদশ বর্ষের অল্প-বয়স্কা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতেই নিষেধ আছে; কিন্তু তা বলিয়া যে, স্বামী তাহার বালিকা-স্ত্রীকে দুঃশ্চরিত্র ব্যক্তির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না ও আপনার নিকট রাখিতে পারিবে না,—ইহা কোথা হইতে আসিল, আমরা তাহা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, বুঝিতে না পারাই আমাদের ঘোরতর মূর্খতা; কারণ, যখন প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ এরূপ বিসদৃশ আইন-বিচক্ষণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাশ হইতে পারে, তখন যে তাহার ফলও এইরূপ

অসঙ্গত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বিশেষতঃ, এরূপ না হইলে আর সংস্কারকদের এত আনন্দ হইবে কেন?

***

আহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা! কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই ক্ষমতা ও মহিমা প্রভাবে সময়ে সময়ে মহাত্মা খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রীগণ পিতা মাতার ক্রোড় হইতে স্নেহময় সন্তান-রত্নকেও অপহরণ করিতে পশ্চাৎ-পদ হন না।

সম্প্রতি, একজন খৃষ্টীয়ান পাদ্রী, একটি হিন্দু বালকের ত্রাণোদয় করিতে গিয়া অবশেষে স্বীয় ত্রাণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের স্বর্গীয় মাহাত্ম্যে তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কারও লাভ হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাদ্রী রেভারেণ্ড বার্ড সাহেব কোইম্বাটোর-নিবাসী এক মান্দ্রাজী—হিন্দু ব্রাহ্মণ-তনয়কে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য আনয়ন করেন। বালকটির অভিভাবকেরা ইহা জানিতে পারিয়া, স্থানীয় মুন্সেফের আদালতে, পাদ্রী সাহেবের বিপক্ষে অভিযোগ করে। বিচারপতি মহাশয় বালকটিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত ও স্থানান্তরিত করিতে নিষেধ-সূচক আজ্ঞা দেন; কিন্তু নরোত্তম শ্বেতাঙ্গ বংশ-নিঃসৃত ও ঈশ্বর-প্রেরিত স্বর্গীয় দূত, পাদ্রী সাহেবের পক্ষে একটা সামান্য দেশী মুন্সেফের আজ্ঞা প্রতিপালন করা কখন সম্ভবপর নহে; সুতরাং তিনি বালকটিকে স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু মুন্সেফের আজ্ঞা অহেবলা করার দরুণ "আদালতের অবমাননা" করা অপরাধে, বিচারে, পাদ্রী সাহেবের প্রতি ছয় মাস কারাবাসের আজ্ঞা প্রদত্ত হয়, গোলযোগ দেখিয়া পাদ্রী সাহেব ডিষ্ট্রীক্ট জজের নিকট দরখাস্ত করেন; ক্রমে হাইকোর্ট পর্য্যন্তও তলব করিয়াছিলেন,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ধার্ম্মিক পাদ্রী সাহেবকে মানে মানে ৬ মাসের জন্য শ্রীঘরে প্রবেশ করিতে হইল। যাহা হউক, পাদ্রী সাহেব জেলে যাইবার কিছু দিবস পরেই, বালকটিকে আদালতে হাজির করা হয় এবং তখন পর্য্যন্ত তাহাকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয় নাই, ইহা প্রকাশ হওয়ায়, পাদ্রী সাহেব খালাস পাইয়াছেন। হায়! ইহাতেও কি খৃষ্টীয়ান্ পাদ্রীদের পরের জাত মারিবার স্পৃহা কমিবে না? যাহা হউক, খৃষ্টান্ পাদ্রীদের পসারটা বড় কমিয়া গিয়াছে; আবার একটা দুর্ভিক্ষ না হইলে, ইহাঁদের অভ্যুদয়ের উপায় নাই। একটা উপায়ছিল—রূপলাবণ্যে মুগ্ধ করিয়া দীক্ষিত করা; কিন্তু সে উপায়টাও আজকাল দাড়ীওয়ালা চসমাধারী ভগ্নী-প্রেমিক নৈরাকারীকেরা, বিলক্ষণ নকল করিতে শিখিয়াছেন। (ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—গত ২৪এ চৈত্র তারিখে ব্রাহ্মিকা-হত্যা) কাজেই খৃষ্টান পাদ্রীদের এক্ষণে 'ছেলেধরা' প্রভাবটা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

***

খৃষ্টীয়ান পাদ্রীগণ পথে ঘাটে, হাটে মাঠে, ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া গীত বাদ্য করিয়া, বক্তৃতা ছড়াইয়া, অপরকে খ্রীষ্টীয়ান হইতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তাঁহারা যে স্বয়ং অপনাদের ধর্ম্ম কত দূর প্রতিপালন করেন, সে বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখেন না। গত ২৫ মার্চ্চ তারিখে, জেনারেল আসেম্ব্রি ইনষ্টিটিউসনে বাবু কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় "আইন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তদুপলক্ষে তথায় স্যার আণ্ড্রু স্কোবল, রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড সাহেব, পার্শি

মেটা ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্রচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক ভদ্র ব্যক্তি বক্তৃতার সময় প্রতিবাদ-সূচক দু' এক কথা উচ্চারণ করেন, তজ্জন্য তিনি পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত, অবমানিত ও থানায় প্রেরিত হন, ও তথায় নিরপরাধী বিবেচিত হইয়া বেকসুর খালাস পান। তৎপরে তিনি 'অযথা পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত ও অবমানিত হইয়াছেন',—বলিয়া পুলিষ-ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলের বিপক্ষে অভিযোগ করেন। ইহাতে পাদ্রীকুল-চূড়ামণি সদাশয় রেভারেণ্ড সাহেব সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য, ক্ষেত্র বাবুর বিপক্ষে "অনধিকার প্রবেশ"র দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। কারণ,ইহা রেভারেণ্ড পাদ্রীর উপযুক্ত কার্য্যই হইয়াছে;—কেন না তাঁহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র বাইবেল-অনুসারে খ্রীষ্ট বলিতেছেন,—যদি কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে, তুমি তাহাকে বাম গাল পাতিয়া দিবে। সুতরাং স্বধর্ম্মানুরাগী প্রবীন পাদ্রী-পুঙ্গব মহাশয় দেখিলেন যে, ক্ষেত্র বাবুর ডান গালে চড় মারা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত ও অবমানিত করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বাম গালে চড় মারিতে হইবে, নচেৎ প্রভুর বাক্য লঙ্ঘন হইয়া যায়, সুতরাং তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোথা হইতে এক—"অনধিকার প্রবেশ" দাবী বাহির করিয়া, তাহার নামে নালিশ করিলেন। অতএব আমরা এই খৃষ্টীয়ান পাদ্রীকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরিচালিত হইতে দেখিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পত্রপত্রিকাগুলি আমরা বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছি।

১। সময় ২। বঙ্গনিবাসী ৩। ত্রাণোদয় ৪। সুরভি ও পতাকা ৫। সম্বলপুর হিতৈষিণী পত্রিকা ৬। বামাবোধিনী পত্রিকা ৭। নব্য ভারত ৮। অনুসন্ধান ৯। জন্মভূমি—নিয়মিতরূপে।

১০। রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ ১১। নবযুগ ১২। আর্য্যদর্পণ ১৩। কাশীপুর নিবাসী ১৪। বেদব্যাস ১৫। প্রতিমা ১৬। সাহিত্য ১৭। সঙ্গিনী ১৮। চিত্রদর্শন—অনিয়মিতরূপে।

১৯ মজলিস্—মজলিসি ঢঙে।

২০। সঞ্জিবনী—সময়ে সময়ে।

২১। People—চৈত্র মাস হইতে।

২২। যমুনা—১ম খণ্ড মাত্র।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

—*0*—

আমাদের গ্রাহকগণ সকলেই তাঁহাদের স্ব স্ব অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

প্রহেলিকার উত্তর:—

—:*:—

১—জানালা।

২—পঙ্ক।

৩—মশাল।

৪—পান।

৫—পেচক।

বর্ষ-বিদায়।

১

কেন উষা আজি
পূরব গগনে,
বিষাদের ভরে
মেলিছে আঁখি ?
কেন কেন আজি
বিরস বদনে,
বিষাদের গান
গাইছে পাখী ?

২

কেন ভাষে অলি
গুঁজরি গুঁজরি
কুসুমের কানে
দুখের কথা ?
কেন শিখিগণে
ভুলেছে নাচনি !
মরমে কি তারা
পেয়েছে ব্যথা ?

৩

কেন শুনি আজি
সহকার-শাখে
গাইছে কোকিল
দুখের গান ?
কেন সহকার
বিনত বদনে—
র'য়েছে দাঁড়ায়ে
আকুল প্রাণ ?

৪

কেন বনলতে !
এলা'য়ে কবরী
শোক-ভরে তোর
ঝুরিছে আঁখি ?
কেন কুবলয় !
কাঁদিয়ে আকুল
মৃণাল-করেতে
বদন রাখি ?

৫

কেন কুলুকুলু
বহিছে জাহ্নবী—
রোদনের ধ্বনি
মিলা'য়ে তায় ?
কেন রে গগন
নীরব—নিভৃত,
নীলবাসে আজি
ঢেকেছে কায় ?

৬

যে দিকেতে আজি
ফিরাই নয়ন,
নিরখি সকলি—
বিষাদ-মাখা।
যে দিকেতে আজি
চ'লেছে চরণ—
বিষাদের জালে
র'য়েছে ঢাকা !

৭

হায় ! আমি কি রে
উৎসবের দিনে,
দেখিনু স্বপন,
নয়ন মেলে ?
"নয়, নয় ইহা
নিশার স্বপন,"—
ওই যেন ফেরে
ডাকিয়া বলে।

৮

"বৃদ্ধ—বর্ষরাজ,
ত্যজি সিংহাসন
বিরাম কারণে
বিদায় লয়ে,—
লইবেন আজি
অনন্ত আশ্রয়",
তাই সবে রহে
বিরস হয়ে।

৯

তাই, শোক-ভরে
বাজিছে দামামা,—
তাই শোক-ভরে
বাজিছে কাড়া ;
তাই জগ'জনে
জানা'বার তরে,
ভারত-ভুবনে
পড়েছে সাড়া।

১০

উঠ, উঠ বর্ষ-রাজ ! ঘুমা'ওনা আর, সমুদিত নবীন তপন ;
লইয়া তোমার তরে পরিমল-ভার, উপনীত প্রভাত-পবন।
সাজা'বে প্রকৃতি আজি ফুলময়-হারে—মনোমত—তোমারে রাজন !
সকলেই সমাগত দেখ তব দ্বারে, পূজিতে ও যুগল-চরণ।

১১

হের হে রাজন!
নয়ন মেলিয়া,
এসেছে সকলে
তোমার আশে;
এসেছে প্রকৃতি
করিতে বরণ,
ঢাকিয়া বদন
বিমল বাসে।

১২

তরুলতাগণে
এসেছে সকলে
ফুল-ফল-ভারে
নমিত কায়;
নবোদিত ভানু
ঢালিছে কিরণ—
বিতরিছে মধু
বিমল বায়।

১৩

লহ লহ দেব!
লহ উপহার;
স্বভাবের এই
বিপুল দান;
দিগাঙ্গনাগণে,
জলধর সাথে
গাইতেছে শুন
বিরাম গান।

১৪

গাইতেছে আজি
অচল গহন,
প্রতিধ্বনি আসি
মিলিছে তায়;
গাইতেছে আজি
নদ-নদিগণে;—
বিরামের গান
সকলে গায়।

১৫

ব'স ব'স দেব!
ব'স সিংহাসনে,
দেখিবে সকলে
নয়ন ভ'রে।
আর ত তোমায়
পাবে না দেখিতে
সাধে যদি চির-
জনম ধ'রে!

১৬

আজি নিশি-ভোরে
তুমি হে রাজন!
লভিবে বিরাম
অনন্ত কোলে;
তাই তাড়াতাড়ি
এসেছে সকলে
তুষিতে তোমায়
মধুর বোলে।

১৭

দেখ, দেখ দেব!
নয়ন মেলিয়া,
দাঁড়া'য়ে তোমার
দুয়ারে আসি,
চির পরাধীন—
চির ভাগ্য-হীন—
আমরা যতেক
ভারত-বাসী।

১৮

নাহিক সাহস,
নাহি পরাক্রম,
দুখানলে সদা
হৃদয় দহে;
মানস-গগনে
ঘেরি চারিধার,
নিরাশা-পবন
সতত বহে।

১৯

তপ্ত অশ্রু-জলে
ভাসে বক্ষঃস্থল,
হারায়েছি সবে
নয়ন জ্যোতিঃ,
হারায়েছি মোরা
বল-বুদ্ধি-যশ,
হ'য়ে আছি এবে
ঘৃণিত অতি।

২০

সত্য বটে বর্ষ রাজ! তোমার শাসনে—শস্যপূর্ণ ভারত-আগার;
অনাথ ভারতবাসী দুর্ভিক্ষ-পীড়নে, করে নাই সদা হাহাকার!
সত্য বটে ঘন-দলে ঘোর—গরজনে বরষিল অমিয়-আসার;
সত্য বটে কৃতান্তের করাল দশনে মরে নাই অসংখ্য—অপার।

২১

কিন্তু, কাঁপে হিয়া
কেশরী গর্জ্জনে,
চমকি চমকি
উঠিছে প্রাণ!
চির ভাগ্যহীনা
ভারত-জননী ;—
কে রাখিবে বল
তাঁহার মান?

২২

কেবা মুছাইবে
নয়ন-সলিল,
কে করিবে তাঁরে
প্রবোধ দান?
ধীর—ভ্রাতৃগণ
শারদ গর্জ্জন,
শুনিয়ে শুনিয়ে
বধিরকান।

২৩

সাক্ষী—বিন্ধ্যগিরি
সাক্ষী—হিমাচল,
সাক্ষী—জহ্নু-সুতা
যমুনা আর;
সাক্ষী—সিন্ধু নদ
সাক্ষী—সে নর্ম্মদা,
কত যে স'য়েছে
বুকেতে মা'র।

২৪

কাঁদে বঙ্গদেশ,
কাঁদিছে কাশ্মীর ;
আর কত শত
কাঁদিছে আজ ;
কি করিয়া গেলে
তাহাদের তুমি?
বল হে বল হে
বরষ-রাজ!

২৫

ভারতের দশা
বড়ই কঠিন,
দুখময় এবে
ভারত-ধাম ;
যত কুলাঙ্গার
জুটিয়া পুটিয়া,
ডুবা'তে বসেছে
ভারত নাম।

২৬

করিবারে চায়
দেশের উদ্ধার,
উদরের ভাত
নাহিক জুটে!
আছে ধর্ম্ম-ধন
এক মাত্র সার,
তা'ও বার ভূতে
খেতেছে লুটে!

২৭

হাত-মুখ-নাড়া
লাফানি ঝাঁপানি;
বক্তৃতার চোটে
মেদিনী কাঁপে ;
নিজ নিজ স্বার্থ
করিতে সাধন,
চলিয়াছে সবে
প্রচণ্ড দাপে।

২৮

চাষা ভুষো লোকে
হ'য়েছে পণ্ডিত,
গো-খাদক কাঁদে
ভারত তরে!
পাষণ্ডের মুখে
ধরম-সংগীত,
এ দুখ-বারতা
জানা'ব কারে?

২৯

ম্লেচ্ছ—শিক্ষা সেয়
হিন্দুর আচার!
বিলাত বাসিনী,
বিমল প্রেম!!
কাচ—কণ্ঠ হার
অঙ্গের ভূষণ!
পদ-বিতাড়িত
বিশুদ্ধ হেম!!

৩০

চল, চল বর্ষরাজ! কলঙ্ক-পসরা শির'পরে করোনা বহন ;
পবিত্র ভারত-ক্ষেত্র—পাপ-রাশি ভরা—দেখোনাক ফিরা'য়ে নয়ন।
বসন্তে সঙ্গেতে লও-সামন্ত করিয়া, করিবেক চামর ব্যজন,
লভহ বিরাম আজি পরাণ ভরিয়া, এ দিকেতে চেওনা এখন।

৩১

মানস-সরসে
আশা কুমুদিনী,
মলিনিল তারে
তুষার ত্রাস,
হৃদাকাশে ছিল—
বিমল কৌমুদী,
নিরাশা-নীরদে
করিল গ্রাস!

৩২

বিধি-লিপি, দেব!
কে করে খণ্ডন?
অদৃষ্টে যা আছে
বিফল নয়;
কাল পূর্ণ হ'লে
অরিষ্ট বিনাশ,
করিবেন আশু
করুণাময়।

৩৩

চিরদিন কার
কোথা যায় ভাল?
কাহার পতন
নাহিক ভবে?
'পিপীলিকা-পাখা
মরণ কারণ,'—
মিথ্যা সে বচন
হ'য়েছে কবে?

৩৪

শুন বর্ষরাজ!
তোমায় চরণে,
এক নিবেদন
আছয়ে মম;
পালিতেছ তুমি
এত দিন ধ'রে
"সুবোধিনী"-ধনে
দুহিতা সম।

৩৫

বসন্তে দিয়াছ
ফুলময় হার,
নিদাঘে রেখেছ
পল্লব ছায়;
শরতে দিয়াছ
মধুময় ফল;
কত ভাল বাসা
বেসেছ তায়।

৩৬

কর, কর দেব!
কর আশীর্ব্বাদ,
চির দিন যেন
কুশলে রয়;
এই চাই দেব!
আমরা সকলে—
সুবোধিনী যেন
অমর হয়।

৩৭

ওই শুন দেব!
শ্রবণ পাতিয়া,
আকাশ-বচন
ডাকিয়া বলে,—
"আয় আয় পুনঃ
নিদাঘ, বরষা,
শিশির—বসন্ত,
আয় রে চলে।"

৩৮

আজি মহারাজ
ত্যজি সিংহাসন,
বিরাম কারণে
বিদায় লয়ে;
লইবে হে তুমি
অনন্ত আশ্রয়,
তাই সবে রয়
বিরস হয়ে।

৩৯

তাই শোক-ভরে,
বাজিছে দামামা,
তাই শোক-ভরে
বাজিছে কাড়া;
তাই জগজনে
জানা'বার তরে,
ভারত-ভুবনে
পড়েছে সাড়া।

৪০

উঠ, উঠ বর্ষরাজ! ঘুমা'ওনা আর, সমুদিত নবীন তপন;
লইয়া তোমার তরে পরিমল-ভার, উপনীত প্রভাত-পবন।
সাজা'বে প্রকৃতি আজি ফুলময় হারে—মনোমত—তোমারে রাজন!
সকলেই সমাগত দেখ তব দ্বারে, পূজিতে ও যুগল চরণ।

শ্রীকালিদাস মিত্র।